علم الطبّ على ضوء الإسلام

ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান

Medical Science in the Light of Islam

(Prophetic Medicine)

ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন

علم الطبّ على ضوء الإسلام

ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান

Medical Science in the Light of Islam

(Prophetic Medicine)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয়া খালাম্মা মোসাম্মাৎ আনোয়ারা বেগম, যিনি শৈশবে আম্মার ইন্তিকালের পর থেকে আদর-যত্ন ও সোহাগে আমাদের লালন-পালন করেছেন, সুপ্রিয় সহধর্মিণী অধ্যাপিকা বেগম মাহমুদা মুশাররফ, যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ও প্রশিক্ষণের ফলে আমার ছেলে-মেয়েরা আজ আদর্শ ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আমার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ ছেলে-মেয়ে: দীনা, মাহমুদ, বুশরা ও নুসরাহদেরকে, যাদের জিহ্বা সর্বদা সিক্ত থাকে 'রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানী সগীরা' পাঠে।

প্রকাশক : **এস এম রইসউদ্দিন**
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১, ৯৫৭১৩৬৪

প্রথম প্রকাশ : হিজরী ০৪ জিলহাজ্ব, ১৪৩৪
বাংলা ২৫ আশ্বিন, ১৪২০
ঈসায়ী ১০ অক্টোবর, ২০১৩

বর্ণবিন্যাস : রিজওয়ান, আতিয়ার, ইতি, ওমর ফারুক, জামাল উদ্দিন, মাওলানা সাইফুল ইসলাম ও মোঃ আব্দুল লতিফ

প্রচ্ছদ : এম এ তাওহিদ

মেকআপ : মো. আব্দুল লতিফ ও মো. ওসমান গণি

মুদ্রণে : বসুমতি প্রিন্টিং প্রেস, নয়া পল্টন, ঢাকা।

ISBN : 984-7024410063-4

হাদিয়া : টাকা ২০০০.০০, US$ 100.00, UK £ 75.00, SR 400.00

Medical Science in the Light of Islam (علم الطبّ على ضوء الإسلام) authored by Dr. Muhammad Musharraf Hussain and published by Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 125 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000.

علم الطبّ على ضوء الإسلام

ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান

Medical Science in the Light of Islam

(Prophetic Medicine)

ইসলামিক টিভি আয়োজিত কুরআন ও হাদীসের আলোকে রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ক ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠানে আলোচিত বিষয়বস্তুর লিখিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ

ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন

পিএইচডি (ফার্ম), পোস্ট-ডক (জাপান), হার্বাল মেডিসিন (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত)

আলোচক, ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইসলামিক টিভি, ঢাকা, বাংলাদেশ।
সাবেক সহকারী অধ্যাপক, ফ্যাকালটি অব ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস
আহমাদু বেল্লো ইউনিভার্সিটি, জারিয়া, কাদুনা স্টেট
ও
ইউনিভার্সিটি অব জস, জস, প্লাটু স্টেট, নাইজেরিয়া
এবং
সাবেক অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শাহীন কলেজ
কুর্মিটোলা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

ঢাকা-চট্টগ্রাম

ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান

ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন

গ্রন্থসত্ব : ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন

: **ডাক্তার দীনা এ এস হুসাইন,** এমবিবিএস (ঢাকা), এমফিল (ঢামেক), এফসিপিএস (পার্ট-২)
সহযোগী অধ্যাপক, শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, উত্তরা, ঢাকা

: **ডক্টর মাহমুদ মুস্তাকীম হুসাইন,** পিএইচডি (ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভ্যানিয়া)
রিসার্চ এসোসিয়েট, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা

: **ডাক্তার বুশরা হুসাইন,** এমবিবিএস (ঢাকা), এমপিএইচ স্টুডেন্ট (আমেরিকা)

: **নুসরাহ্ হুসাইন,** পিএইচডি ক্যান্ডিডেট, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভ্যানিয়া, আমেরিকা

এ গ্রন্থটি প্রণয়নে যারা বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন ও অণুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তারা হলেন :

* **ডা. এস এম রেজা-ই-রাব্বি,** কনসালটেন্ট, লেজার মেডিকেল সেন্টার ও
  লেজার এয়েসথেটিক্স, ঢাকা
* **এন এম মোশারফ কবীর চৌধুরী,** এম. ম্যাথ. (কানাডা)
  পিএইচডি ক্যান্ডিডেট, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, যুক্তরাষ্ট্র
* **আব্দুল্লাহ আল-নাঈম,** পিএইচডি, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

এই বিশাল গ্রন্থে উল্লেখিত প্রায় বারো শতাধিক হাদীসের উদ্ধৃতি ও সূত্রসমূহ যাচাই-বাছাই ও বিশুদ্ধতা নির্ণয় করেছেন নিম্নবর্ণিত এক দল বিদগ্ধ আলেমে দীন যাঁদের নিকট লেখক অত্যন্ত কৃতজ্ঞ :

* **মুফতী মাওলানা আবদুল মালেক,** মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া, ঢাকা
* **মুফতী আবদুল হান্নান আল-আযহারী**
* **মাওলানা মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম আল-আযহারী**
* **মুফতী শেখ আমিনুল হক আল-আযহারী**
* **মুফতী মুহাম্মদ রিদওয়ানুল কারীম** এবং
* **মুফতী মা'সুম বিল্লাহ**

পান্ডুলিপির এডিটিং ও প্রুফরিডিংয়ের কাজে যাঁরা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন:

* **অধ্যাপক ড. আবুল হাসান**
* **ডা. মো. হাফিজুর রহমান ইবনে কুদ্দুস**
* **কালাম আযাদ**
* **মুফতী মা'সুম বিল্লাহ**
* **মাওলানা আবু তৈয়ব মো. রফিউদ্দীন**
* **আবুল কালাম আজাদ**
* **নজরুল ইসলাম**

তাঁদের সবার প্রতি লেখকের গভীর কৃতজ্ঞতা রইলো।
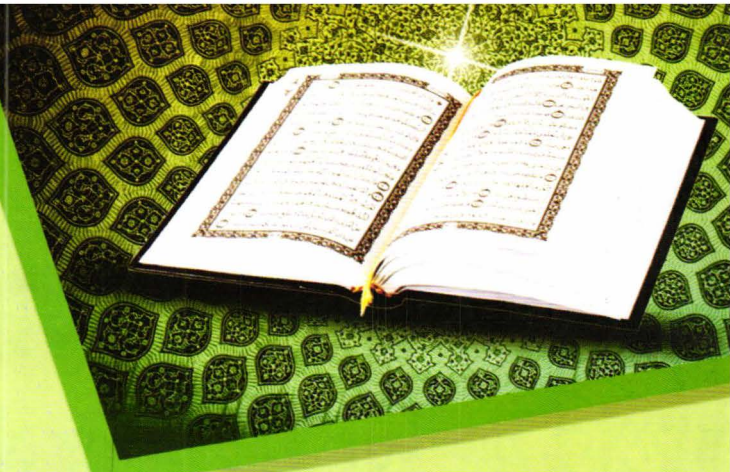
এক নযরে কুরআনের আলোকে রোগ-ব্যাধি ও তার নিরাময়

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

"হে মানবজাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসে গেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরসমুহে যা আছে (রোগ-ব্যাধি) তার নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য পথ-নির্দেশনা (হিদায়াত) ও রহমত।" [ইউনুস ১০:৫৭]

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

"আমি কুরআনে যা অবতীর্ণ করেছি তা হলো মুমিনদের জন্য সকল রোগের নিরাময় (চিকিৎসা) ও রহমত।" [বনী ইসরাঈল ১৭:৮২]

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾

"আমি যখন অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই (আল্লাহ্) আমাকে রোগমুক্ত করেন বা নিরাময় দান করেন।" [আশ্ শুয়ারা ২৬:৮০]

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾

"এদেরকে বলো, এ কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়াত (পথ-নির্দেশ) ও রোগমুক্তি (ব্যাধির প্রতিকার) বটে।" [হামীম আস-সাজ্দাহ্ ৪১:৪৪]
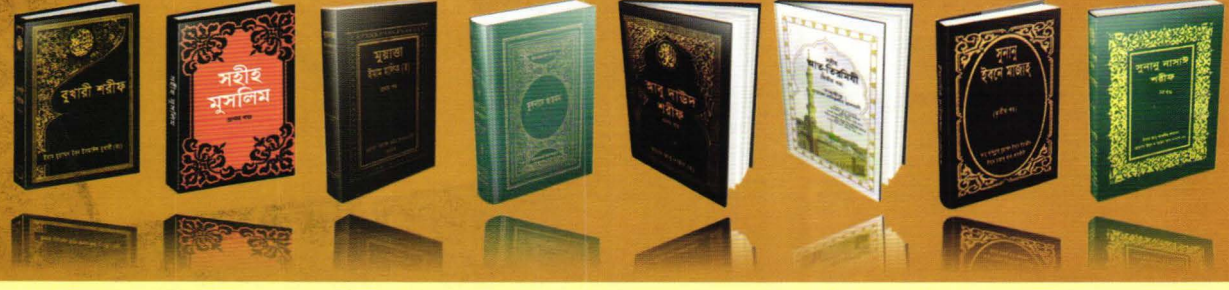
এক নযরে সুন্নাহ্ (হাদীস) এর আলোকে রোগ ও চিকিৎসা

"আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক তিনি পাঠাননি কিংবা ওষুধ সৃষ্টি করেননি।" [আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, সহীহ আল-বুখারী]

"সকল রোগের ওষুধ রয়েছে। যখন রোগ অনুযায়ী সঠিক ওষুধ দেয়া হয় তখন রোগ আল্লাহ্র ইচ্ছায় ভালো হয়ে যায় (আল্লাহর রহমতে রোগ নিরাময় হয়)।" [জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, সহীহ মুসলিম]

"তোমাদের জন্যে অবশ্যই দুটো ওষুধ রয়েছে, একটি হচ্ছে কুরআন আর অপরটি মধু।" [আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, ইবনে মাজাহ]

আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন কয়েকজন বেদুঈন আসে এবং নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করে, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা চিকিৎসা গ্রহণ না করলে কি আমাদের গুনাহ হবে?" নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা একটিমাত্র ব্যাধি ব্যতীত আর কোনো ব্যাধি সৃষ্টি করেননি যা দূরারোগ্য।" তারা জিজ্ঞেসা করলো, "হে আল্লাহ্র রসূল! সেটি কোন্ ব্যাধি?" তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সেটি হলো বার্ধক্য বা old age." [হযরত উসামা ইবনে শারিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাউদ, আত-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসতাদরাক]

সূচিপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক রাষ্ট্রপতি
অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর জ্ঞানগর্ভ অভিমত
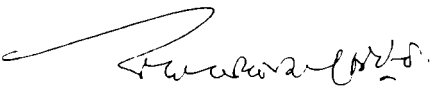
ড. মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন মূলত একজন ফার্মাসিস্ট বিশেষজ্ঞ। এছাড়া হার্বাল মেডিসিনে তিনি অভিজ্ঞ। ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান নামে তিনি অনেক বড়ো এ বইটি লিখেছেন। এতে তিনি স্বয়ং আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন এবং আমাদের রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে তা সন্নিবেশিত করেছেন।

এমন এক সময় ছিলো যখন আরব জাতি চিকিৎসা বিজ্ঞানে সবচেয়ে অগ্রগামি ছিলো। আবূ আল ইবনে সিনা (আভিসিনা)-এর রচিত Canons of Medicine থেকেই জ্ঞান আহরণ করে বর্তমান অগ্রগামী পশ্চিমা মেডিসিনের সূত্রপাত হয়েছে।

ড. মুশাররফ হুসাইনের তথ্যপূর্ণ এ বইটির বেশ কিছু অংশ পড়ে আমার মনে হয়েছে যে, এ বইয়ে আধুনিক চিকিৎসকদের ভাবনার খোরাক রয়েছে। এ ছাড়া বেশ কিছু রিসার্চ করার মতো উপাদান তিনি উপহার দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যসমূহ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

Prophetic medicine এর দুটো উপাদান রয়েছে। একটি হচ্ছে পার্থিব ওষুধ বা physical medicine, অর্থাৎ বস্তুগত জিনিস বা গাছ-গাছড়ার মাধ্যমে চিকিৎসা, যে ব্যবস্থাপত্রের যথার্থতা ও কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য গবেষণার দুয়ার উন্মুক্ত। অপরটি হচ্ছে রূহানী ওষুধ বা spiritual medicine. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে দু'য়া ও প্রার্থনার মাধ্যমে রোগমুক্তি লাভ। রোগ নিরাময়ে যখন বিদ্যমান সকল চিকিৎসা ব্যর্থ হয়, তখন আমরা রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে পারি। আর এ দু'য়ের সমন্বয়ই হচ্ছে Prophetic medicine. শুধুমাত্র দু'য়ার মাধ্যমে মুঘল সম্রাট বাবর তাঁর দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ছেলে হুমায়ুনের রোগমুক্তি করিয়েছিলেন। বাবর তাঁর দু'য়ায় নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও আল্লাহর কাছে হুমায়ুনের আরোগ্য কামনা করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর দু'য়া কবূল করেন। ফলে বাবর অসুস্থ হয়ে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আর তাঁর ছেলে হুমায়ুন সুস্থ্য হয়ে তাঁর পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এসব দৃষ্টিকোণ থেকে রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণে বইটি বেশ উপকারে আসবে বলে আমি মনে করি। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

(অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী)
এমবিবিএস (ঢাকা), টিডিডি (ওয়েলস্), এফআরসিপি (লন্ডন, এডিনবার্গ ও গ্লাসগো), এফসিপিএস (বাংলাদেশ)
রোগ বিজ্ঞান অধ্যাপক ও সাবেক রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এবং
চেয়ারম্যান, হেলথ এবং ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও মহিলা মেডিকেল কলেজ
উত্তরা, ঢাকা।

তারিখ : সেপ্টেম্বর ১০, ২০১৩

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ নজরুল ইসলামের সুচিন্তিত অভিমত

ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা ভেষজ বিজ্ঞানী ও গবেষক। তাঁর লিখিত ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান নামে এ বইটি প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এর বিষয়বস্তু তার ইংরেজীতে লিখা অপর বইটি (Medicine and Pharmacy in the Prophetic Traditions)-র বিষয়বস্তুর সাথে অনেক মিল রয়েছে। সে বইটির ভূমিকায় আমি বেশ কিছু অভিমত ব্যক্ত করেছি।

পবিত্র কুরআন মানব জাতিকে রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকতে এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে উত্তম, সজীব, স্বাস্থ্যকর ও হালাল খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। অপরদিকে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঠিক ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অনেক মূল্যবান উপদেশ রেখে গেছেন। তিনি মুসলিম উম্মাহকে অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, তবে হারাম বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। একইভাবে তিনি হালাল ও স্বাস্থ্যকর খাবার ও পথ্যের তালিকা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। লেখক বইটিতে ভুল চিকিৎসায় রোগীর ক্ষতি বা প্রাণহানি, ধূমপান ও অন্তরের ব্যাধির প্রতিকার এবং পানি, বায়ু, মাছি ও ইঁদুর বাহিত রোগ প্রতিরোধে অনেক সহীহ হাদীস আলোচনা করেছেন যা আমাদের জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজে অনেক উপকারে আসবে। 'রোগ ও চিকিৎসা' অধ্যায়ে লেখক বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব হার্বাল মেডিসিনের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রয়োজনবোধে ঐসব ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ সেবন করে রোগ থেকে নিরাময় লাভ করতে পারি। বর্তমান বিশ্বের জনগোষ্ঠীর বিরাট একটি অংশ হারবাল মেডিসিনের মাধ্যমে নিরাময় লাভ করে আসছে।

লেখক বইটিতে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা বিধানের মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, একজন আধুনিক চিকিৎসকের ওষুধ নির্ভর করে অনুমানপ্রসূত মতামত, অভিজ্ঞতা, ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বস্তুবাদী গবেষণার ফলাফলের ওপর। অপরদিকে বিশ্বনবীর চিকিৎসা বিধানের ভিত্তি হচ্ছে ঐশী প্রত্যাদেশ, ইলহামভিত্তিক অনুপ্রেরণা (divine inspiration), প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞানের উৎকর্ষতা ও পূর্ণতা এবং সর্বোপরি নব্যুওয়াতের বিশেষ মর্যাদা। তাই আমার একান্ত অভিমত, রোগ নিরাময়ে আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি অথবা বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি (Alternative System of Treatment) হিসেবে এটা আমাদের মুসলিম সমাজে চালু করা যেতে পারে। কারণ আমরা জানি যে বিদ্যমান চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনটিই সকল প্রকার রোগ নিরাময়ে একক কৃতিত্বের দাবি করতে পারে না এবং প্রত্যেকটিরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করছি যে বইটি আমাদের দেশের মেডিকেল কলেজগুলোতে পাঠ্যসূচির তালিকায় আনা যেতে পারে। ফলে একজন মেডিকেল গ্রাজুয়েট modern allopathic medicine এর পাশাপাশি Prophetic medicine সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার সুযোগ পাবে।

আমার একান্ত বিশ্বাস, দুর্লভ তথ্যে সমৃদ্ধ এ বিশাল বইটি আধুনিক চিকিৎসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক বলে বিবেচিত হবে। সকল প্রকার চিকিৎসার পরও যখন কোনো রোগী আরোগ্য লাভে ব্যর্থ হন তখন চিকিৎসক তাকে এ পদ্ধতির চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। কারণ নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত কম ব্যয়বহুল এবং এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার আবিষ্কার বলতে যখন কিছুই ছিলোনা, ঠিক সে সময়ে ইসলামের মহান নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাহর সার্বিক কল্যাণে ল্যাবরেটরীতে কোনো প্রকার গবেষণা ছাড়াই গাছ- গাছড়া, ফল-মূল ও সঠিক খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে এ চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করেছিলেন, যা ছিল সত্যি বিস্ময়কর এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ।

আমি বইটির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার কামনা করছি।

(অধ্যাপক ডাক্তার মোঃ নজরুল ইসলাম)
এমবিবিএস (ঢাকা), এমফিল (ঢাকা), পিএইচডি (লন্ডন), এফসিপিএস (বাংলাদেশ)
সাবেক বিভাগীয় প্রধান, ভাইরোলজী বিভাগ এবং
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।

তারিখ : সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৩

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের অভিমত ও দু'য়া
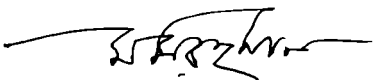
ড. মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও খ্যাতনামা ভেষজ বিজ্ঞানী। তিনি প্রায় ১৩ বছর ধরে পশ্চিম আফ্রিকার বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ নাইজেরিয়ার আহমাদু বেল্লো বিশ্ববিদ্যালয় ও জস বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদে অধ্যাপনা করেছেন। তাছাড়া তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে দু'দশক যাবত বিভিন্ন উর্ধ্বতন পদে কাজ করেছেন। একাডেমিক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মাসিস্ট হিসেবে তাঁর এই সুদীর্ঘ কর্মজীবন অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তিনি ৬টি বই লিখেছেন। তার সর্বশেষ বইটির নাম Medicine and Pharmacy in the Prophetic Traditions. বইটি ২৭টি অধ্যায় ও আট শতাধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত। বইটিতে আমার লেখা ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে এটি International Islamic Publishing House, Riyadh, Saudi Arabia-তে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

ড. মুশাররফ নাইজেরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, ভারত ও বাংলাদেশের অনেক জাতীয় সেমিনার ও সম্মেলনে ভাষণ দেন ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে In Search of Truth নামে একটি পুস্তিকা লেখেন, যা সমগ্র নাইজেরিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এজন্য রাবেতা আলম আল-ইসলামী, মক্কা ও ইকরাহ্ চ্যারিটেবল সোসাইটি, জেদ্দা তাকে পুরস্কৃত করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছাড়াও ফার্মাসিস্ট হিসেবে টিভি ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ড. মুশাররফের অংশগ্রহণ ব্যাপক। তিনি ১৯৮১ সালে নাইজেরিয়ার কাদুনা স্টেট টেলিভিশনে Know Your Religion Islam (কুরবানির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য) সম্পর্কে ইংরেজিতে এক গুরুত্বপূর্ণ (সচিত্র) ভাষণ দেন, যা পরপর তিনবার ঈদের দিনে নাইজেরিয়ার টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া ১৯৮৩ সালে ওষুধের অপব্যবহার, অপচয় ও তার প্রতিরোধ শীর্ষক বিষয়ের ওপর কাদুনা স্টেট টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ ৬০ মিনিটব্যাপী দু'দিনের এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। ড. মুশাররফ ২০০৭ সাল থেকে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল ইসলামিক টিভিতে ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান শীর্ষক সাপ্তাহিক ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা ও আলোচনা করে আসছেন। তার এই ধারাবাহিক বক্তৃতা ও আলোচনার বিষয়বস্তুর লিখিত ও পরিবর্ধিত রূপই হচ্ছে ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান নামক বর্তমান এ গ্রন্থটি।

আমি আশা করি, মানবকল্যাণে বিশেষ করে রোগ প্রতিরোধ, নিরাময় ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বইটি যথেষ্ট অবদান রাখবে। যে সকল মুসলমান কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকতে বদ্ধপরিকর, তাদের জন্যে বইটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। হাদীসের বৈজ্ঞানিক দিকগুলোর বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ ও চিন্তাশীল পাঠকবৃন্দ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক হাদীসের সুপ্ত প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সহজে অনুধাবন করতে পারবেন। বইটি সকল যুগে সকল দেশের বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দৈনন্দিন ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ হতে পারে।

I opine that this book is a priceless marvel of Islam on the science of healing, and I strongly recommend that it is studied at the undergraduate levels in our medical colleges. আমি বইটির সর্বাধিক প্রচার ও প্রসার কামনা করছি। সেই সাথে লেখকের জন্য আন্তরিকভাবে দু'য়া করছি, আল্লাহ রব্বুল আলামিন যেনো তাঁকে সুনামের অধিকারী করেন। তাঁর এ বই সাদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে যুগ যুগ ধরে মুসলিম সমাজে বিকশিত হোক, এ আমার কামনা। (আমিন)

(ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান)
এমএম, এমএ (আরবি), পিএইচডি (লণ্ডন)
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

তারিখ : সেপ্টেম্বর ০১, ২০১২

ইসলামিক টিভির সম্মানিত চেয়ারম্যান মরহুম মেজর (অব.) সাঈদ ইস্কান্দারের অভিমত ও দু'য়া

ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষ্ঠানটি আমাদের এই স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও পাঠক সমাজের বিরাট চাহিদার কথা বিবেচনা করে অনুষ্ঠানটি ইসলামিক টিভি তার জন্মলগ্ন থেকে ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচার করে আসছে। বস্তুত স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা বিধানের ওপর অনুষ্ঠান সম্প্রচার বিশ্বে এই প্রথম। বর্তমানে সউদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম বিশ্বে এ অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই সউদি আরব, কাতার, আবুধাবি, দুবাই, কুয়েত ইত্যাদি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অনেক বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান বিভিন্ন রোগে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা বা ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে জানার জন্য টেলিফোন করে থাকেন।

তিব্বুন নববী বা বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা বিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, অসুস্থ ব্যক্তিরা প্রায়ই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করতেন এবং তিনি তাদের আরোগ্যের জন্য ব্যবস্থাপত্র দিতেন ও আল্লাহর নিকট আরোগ্য লাভের জন্য দু'আ করতেন। তাঁর এসব বাণীর উপর ভিত্তি করে তদানিন্তন আরব সমাজে **তিব্বুন নববী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** নামে একটি বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে উত্তীর্ণ একটি যৌক্তিক ও কার্যকরী ব্যবস্থা। অজ্ঞাত কারণে এটি মুসলিম সমাজে দীর্ঘদিন লুকায়িত থাকলেও বর্তমানে এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটেছে এবং মানুষ ক্রমশ তিব্বুন নববী বা **Prophetic medicine**-এর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

অনুষ্ঠানটির আলোচক ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার সাবেক অধ্যক্ষ। কুরআন-সুন্নাহর প্রতি তার ভালোবাসা তীব্র। তার আলোচনা অত্যন্ত চমৎকার ও তথ্যসমৃদ্ধ যা সাধারণ দর্শক-শ্রোতার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ও ভেষজ বিজ্ঞানী হিসেবে সারাদেশে তিনি সুপরিচিত। **Prophetic medicine** এর ওপর তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ। আমি আনন্দিত, তিনি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করে সহজ ও সুন্দরভাবে সাধারণ দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করেন। তাঁর আলোচনা আমি নিজেও উপভোগ করি। দেশ-বিদেশের অগণিত দর্শকবৃন্দও এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন এবং রোগ থেকে নিরাময় লাভ করছেন। অগণিত উৎসাহী দর্শক-শ্রোতার অনুরোধে আমরা একাধিক পর্বের আলোচনা পুনঃপ্রচার করে আসছি।

আমি জেনে আরো আনন্দিত, শতাধিক পর্বে সাজানো এ অনুষ্ঠানসমূহে আলোচিত বিষয়বস্তুর লিখিতরূপ নিয়ে **ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান** অনুষ্ঠানটি আজ আপনাদের সামনে গ্রন্থকারে এসেছে। আমি তাই প্রকাশককে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই বইটি প্রকাশের সঠিক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। আমি বইটির সর্বাঙ্গীণ প্রচার ও প্রসার কামনা করি। আর সেই সাথে লেখক **ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইনের** সুস্থতা ও দীর্ঘায়ুর জন্য দু'য়া করি। আল্লাহ তাঁকে আরো বেশি বেশি করে দীনের খিদমত কারার সুযোগ দিন ও তাঁর এ মহান প্রচেষ্টাকে কবূল করুন।

আমার একান্ত বিশ্বাস, বইটি যুগ যুগ ধরে অগণিত পাঠকের চাহিদা পূরণ করবে ও রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ করবে। যারা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসকে নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে বদ্ধপরিকর, তাদের জন্য এটি একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।

মেজর (অব.) সাঈদ ইস্কান্দার
চেয়ারম্যান
ইসলামিক টিভি, ঢাকা।

তারিখ : সেপ্টেম্বর ০১, ২০১২

বইটির সমীক্ষক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুফতী মা'সূম বিল্লাহর অভিমত ও দু'য়া

সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন করছি মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যিনি সৃষ্টি করেছেন দেহ ও আত্মা, রোগ ও ব্যাধি, ওষুধ ও নিরাময়। অসংখ্য শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের ওপর, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন আত্মিক-দৈহিক চিকিৎসা ও মানবতা; এবং তাঁর সকল সাহাবাকুলের উপর, যাঁরা ছিলেন নববী আদর্শের বাস্তব ফলিতরূপ; আর তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা, উলামা ও নেককার ব্যক্তিদের উপর, যাঁদের জীবন হয়েছে তাঁদের রূপে রূপায়িত।

কুরআনে কারীম ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের সুন্নাহ তথা ইসলাম হচ্ছে আত্মিক ও দৈহিক ব্যাধিসমূহ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাধিসমূহের প্রতিকার ও নিরাময় বিশেষ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "এদেরকে বলো, এ কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়াত (পথ নির্দেশ) ও রোগমুক্তি (ব্যাধির প্রতিকার) বটে।" (হামীম আস-সাজ্‌দাহ্ ৪১:৪৪)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রোগ-ব্যাধি ও ওষুধ সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তোমরা চিকিৎসা করো, তবে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করো না।" (তাবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ২৪/২৫৪, হাদীস নং ৬৪৯)

সুতরাং ইসলাম আত্মিক চিকিৎসার পাশাপাশি দৈহিক চিকিৎসার গুরুত্ব কোনো অংশে কম দেয়নি। এমনকি আত্মিক উৎকর্ষতা ও নিরাময় ব্যবস্থার ন্যায় দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও প্রতিকারের ব্যবস্থাও অত্যন্ত ব্যাপক ও অনেক গভীর। ইসলাম শুধু দৈহিক রোগ-ব্যাধি দূর করার বিধান দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং দৈহিক-মানসিক সর্ব প্রকার রোগ-ব্যাধি এবং শয়তান ও জিনের আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ সর্ব প্রকার দেখা-অদেখা বিপদ-আপদ ও বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থাও দিয়েছে। আধুনিক যুগের ডাক্তার, হেকিম, কবিরাজগণ শুধুমাত্র মানবদেহটির সুস্থতা ও নিরাময় সম্পর্কেই চিন্তা-গবেষণা করেন। পক্ষান্তরে, ইসলাম দেহ ও আত্মাসহ মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিকেরই সুস্থতা লাভের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে। শুধু তাই নয়; ডাক্তার, কবিরাজ, হেকিম ও আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি যে ক্ষেত্রে অপারগ ও নিরুপায়, ইসলাম সেখানে তার প্রতিকার ও পথ্যের তালিকা তুলে ধরেছে। বিশ্বের সকল ক্ষমতা যেখানে অচল, ইসলাম সে ক্ষেত্রে পূর্ণোদ্যমে সচল। আপদ-বিপদ ও শত্রুর আক্রমণ প্রতিহতকরণের ক্ষেত্রে কারো কোনো পথ্য থাকেনা। কিন্তু ইসলাম সে ক্ষেত্রেও দিয়েছে প্রতিরক্ষামূলক পথ্য ও ব্যবস্থা।

ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান নামক বক্ষ্যমাণ বইটি উপর্যুক্ত বক্তব্যেরই প্রতিফলিত রূপ। বইটি যেনো কুরআনে কারীম ও মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা বিধান এবং সাহাবায়ে কিরামের চিকিৎসা ব্যবস্থার এক হুবহু প্রতিচ্ছবি। একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হিসেবে সম্মানিত লেখক প্রখ্যাত ভেষজ বিজ্ঞানী, বিশিষ্ট তিব্বুন নববী গবেষক ডক্টর মুহাম্মাদ মুশাররফ হুসাইনের মত সত্য অনুসন্ধিৎসু মানুষ আমার ক্ষুদ্র নজরে পড়েনি। তাঁর নিরলস পরিশ্রম, গবেষণা আমাকে অভিভূত করেছে। জীবনের শেষ বেলায় যখন মানুষ আরাম-কেদারায় বিমোহিত থাকে, ঠিক তখন তিনি ছুটে চলেছেন বিভিন্ন ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার ও বিশেষজ্ঞ ইসলামিক স্কলারদের কাছে কুরআন-সুন্নাহর অমৃত সুধাপানের লক্ষ্যে, যা সত্যিই অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর। যাক, আমার সুনিশ্চিত জানামতে তিনি বাংলাদেশের বিদগ্ধ গবেষক আলিমগণের সহযোগিতায় বক্ষ্যমাণ বইটির হাদীসগুলোর সনদ-মতন, ভাষ্য-সূত্রের গুণগতমান যাচাই-বাছাই করেছেন। আমার নিজেরও এ মহান খেদমতে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে। আলহাম্‌দুলিল্লাহ!

এ ছাড়াও আমি নিজে বইটি অতি সতর্কতার সাথে নিবিড়ভাবে আদ্যোপান্ত পড়েছি এবং প্রয়োজনবোধে সম্পাদনা করেছি। সম্মানিত লেখক ডক্টর মুহাম্মাদ মুশাররফ হুসাইন এ বইটি রচনা করে বাংলা ভাষাভাষীদের একটি বড় অভাব পূরণ করেছেন, এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইসলামের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের মুসলমানরা সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-উপাত্ত ও দিক-নির্দেশনা পাবেন এবং যুগ চাহিদা পূরণে বইটি যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী। দু'য়া করি আল্লাহ তা'য়ালা বইখানা কবূল করে লেখক, সমীক্ষক (reviewer), প্রকাশক ও সকল সহযোগিতাকারীর নাজাতের অসীলা করে দিন এবং বিশেষ করে আমাদেরকে নববী আদর্শে জীবন গড়ার তাওফীক দান করেন। আমীন!!

মা'সূম বিল্লাহ

(মুফতী মা'সূম বিল্লাহ)
উস্তাযুল হাদীস ওয়াল ফিক্‌হ, জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা
(মসজিদুল আকবার কমপ্লেক্স) মিরপুর-১, ঢাকা
উস্তাযুত্ তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা
মারকাযুল বুহূস আল ইসলামিয়া ঢাকা, মিরপুর-১২, ঢাকা ও
খতীব, আল-মদীনা জামে মসজিদ ইস্টার্ণ হাউজিং, মিরপুর, ঢাকা।

তারিখ : ০৪ জিলহাজ্ব ১৪৩৪ হিজরী
১০ অক্টোবর ২০১৩ ঈসায়ী
২৫ আশ্বিন ১৪২০ বাংলা

বিশিষ্ট আলেমে দীন মাওলানা মোঃ সাইদুল ইসলাম আল-আযহারীর দু'য়া ও অভিমত

নাহ্মাদুহু ওয়ানুছল্লী 'আলা রসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ।

ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন প্রণীত ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান বইটি আমি পড়েছি এবং এর হাদীসসমূহের যাচাই-বাছাই ও সুনির্দিষ্ট উৎস নির্ণয়ে অংশগ্রহণ করেছি। বইটি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা পদ্ধতির যেনো এক বাস্তব দর্পণ। অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষা ও উপমায় লেখক বইখানাকে পাঠক মহলে উপস্থাপন করেছেন এবং নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক হাদীসসমূহকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। উল্লেখ্য, উদ্ধৃত হাদীসসমূহের মধ্যে কোনো একটি হাদীসও খুঁজে পাওয়া যায়নি যা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা অমূল্য রত্নে ভরপুর। ইসলামের চিকিৎসা যে চির আধুনিক ও যুগোপযোগী এবং বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণকর, তারই প্রমাণ বহন করে বইটি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বইটি যে কোনো পাঠকহৃদয় অতি সহজেই জয় করবে। কারণ বইটিতে রয়েছে সাহিত্যিক রস, সাবলীল ভাষা, অজানাকে জানা, সঠিক তথ্যের সমাহার, লেখকের চিন্তা-ভাবনার ফসল ও সর্বোপরি তার অকৃত্রিম দীনি মুহাব্বত।

বইটির একটি ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য হলো যে বইটি বর্ণাঢ্য চার রংয়ে ছাপা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালার বাণীসমূহ বেগুনী, হাদীসসমূহ লাল, প্রশ্নসমূহ নীল, বিষয়সমূহ ও রেফারেন্স কিতাবসমূহের নাম সবুজ, অধ্যায়সমূহ লাল, আর সবশেষে লেখকের কথা কালো কালিতে ছাপানো হয়েছে। এর ফলে যেকোনো সহৃদয়, বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল পাঠক সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে তিনি কার বাণী পড়ছেন, এবং তার পাঠ ও মনোনিবেশ তদ্রূপ গুরুত্ব পাবে। রেফারেন্স পৃষ্ঠাসমূহও তদ্রূপ চার রংয়ে ছাপানো হয়েছে।

বইটি গৃহীত হোক মহান রবের দরবারে, জয় করুক পাঠক হৃদয়, দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কল্যাণ উন্মুক্ত হোক এর লেখক ও সংশ্লিষ্টদের জন্য। আমিন।

(মাওলানা মো. সাইদুল ইসলাম আল-আযহারী)
বি.এ. (অনার্স) আল-হাদীস, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় (মিসর)
এম. এ. (ইসলামিক স্টাডিজ), বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
প্রভাষক (আরবি), মুহাম্মদাবাদ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬।

তারিখ : ২৭ রমাদান ১৪৩৪
০৬ আগস্ট ২০১৩

ইসলামিক টিভি'র 'ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান' অনুষ্ঠানের উপস্থাপকের বাণী

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একমাত্র জিন ও ইনসানকে তাঁর ইবাদত ও বন্দেগীর জন্যে সৃষ্টি করেছেন। ইবাদত-বন্দেগীর জন্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা প্রয়োজন। তাই সে লক্ষ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা তাঁর প্রেরিত আখেরি কালামুল্লাহ শরীফে নবী-রসূল আলাইহিমুস সালামের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে রোগ ও সুস্থতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। অপরদিকে সৃষ্টির সেরা ইমামুল আম্বিয়া রসূলে আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক যবানীর মাধ্যমে সে ধারা আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধশালী হয়েছে।

ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান ইসলামিক টিভির একটি বহুল আলোচিত ও দর্শকনন্দিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটির আলোচক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, খ্যাতনামা ভেষজ বিজ্ঞানী ও তিব্বুন নববীর গবেষক মুহতারাম ড. মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন। ড. মুশাররফ সুদীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ নাইজেরিয়ার আহমাদু বেল্লো বিশ্ববিদ্যালয় ও জস বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদে অধ্যাপনা করেছেন। সে সময়ে তিনি অধ্যাপনার পাশাপাশি তিব্বুন নববী বা বিশ্বনবীর চিকিৎসা বিধান নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করার সুযোগ পান। বিশ্বনন্দিত ইসলামিক দার্শনিক ও তর্ক-বাহাসবিদ মান্যবর আহমদ দীদাতের সংস্পর্শে আসার ফলে এ সুমহান কর্মে তাঁর গবেষণার দ্বার আরো বেশি উন্মোচিত হয়। দীর্ঘদিনের অধ্যাপনা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে ১৯৯০ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। এর পরপরই শুরু হয় ইসলামিক টিভির মাধ্যমে তাঁর নতুন পথযাত্রা। সুদীর্ঘ সাত বছর ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি রসূলে আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের অগণিত দর্শক-শ্রোতার নিকট নিরলসভাবে প্রচার ও প্রসারের কাজ করে যাচ্ছেন।

রসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি বাণীই ছিলো অসাধারণ হিকমত ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার প্রেরণা না পেয়ে তিনি কখনো কিছু করতেননা, এমনকি কোনো কিছু বলতেনও না। রসূলে আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে অসংখ্য বক্তব্য রেখেছেন। আর তাঁর সেই বক্তব্যসমূহই পরবর্তীতে তিব্বুন নববী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামে বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। আলোচ্য বইটিতে তিব্বুন নববী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা বিশ্বনবীর চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনায় তিনি যে সমস্ত হাদীস বিশারদ, মনীষী, ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিশ্বখ্যাত লেখকগণের গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার বিবরণ তথা হাদীস গ্রন্থসমূহের নাম, তাদের লেখক, প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশের স্থান ও কাল ইত্যাদি বইয়ের শেষে Reference List এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তাছাড়া মূল আরবি কিতাবের হাদীস নম্বরের সাথে অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সংশ্লিষ্ট হাদীস নম্বরের মিল না থাকায় সাধারণ পাঠকের হাদীস খুঁজে বের করতে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে যাতে না হয় সে জন্য লেখক প্রতিটি হাদীসের উৎস তথা কিতাবের নাম, অধ্যায়/অনুচ্ছেদ ও হাদীস নম্বর উদ্ধৃত করেছেন। এ কাজটি অত্যন্ত দুরূহ, কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। তবে এর মাধ্যমে লেখক তিব্বুন নববী গবেষকদের দীর্ঘদিনের অপূরণীয় চাহিদা পূরণ করলেন।

ইসলামিক টিভির হানিফ আকন দুলাল, মো. ইকবাল ও ফারুকসহ যেসব কর্মকর্তা, প্রযোজক ও কলা-কুশলি বিভিন্ন পর্বের অনুষ্ঠান চিত্রায়িত করতে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে লেখকের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমার একান্ত কামনা, এই মহান কর্মবীরের নিরলস কর্মতৎপরতায় আরো বেশি গতি সঞ্চার হোক। তার এ সুমহান কর্ম মানবকল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখুক এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা তাঁর এ মহান প্রচেষ্টাকে কবূল করুন। (আমিন)

ডা. এ এইচ এম আজহারুল ইসলাম
উপস্থাপক
ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষ্ঠান
ইসলামিক টিভি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

তারিখ : ২৫ জিলক্বদ ১৪৩৪
০১ অক্টোবর, ২০১৩

উদ্ধৃত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা ও নির্ভযোগ্যতা সম্পর্কে প্রকাশকের ভাষ্য

এ বই-এ উদ্ধৃত প্রায় আটশতাধিক বিষয়ের ওপর প্রায় বারো শতাধিক হাদীসের মধ্যে (*) চিহ্নিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তিদের বক্তব্য হলো, এসবের অধিকাংশই যয়ীফ (দুর্বল) এবং কতগুলো শাদীদ যয়ীফ (অতিশয় দুর্বল)। কতিপয় হাদীস অগ্রহণযোগ্য বলে হাদীসের মান নির্ণয়কারীগণের নিকট বিবেচিত। কতগুলো হাদীস সম্পর্কে মান নির্ণয়কারীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কতগুলো হাদীসের রিওয়ায়াত নির্ভরযোগ্য কিন্তু রাবী (বর্ণনাকারী) বিশ্বস্ত নন বলে জানা যায়। যাহোক, লেখক সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন, যে সমস্ত হাদীস এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোর সনদসমূহ যেনো সহীহ ও মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত) হয়। তবে যে শর্তাবলীর কারণে কোনো হাদীসকে যয়ীফ (দুর্বল) এবং কতগুলো শাদীদ যয়ীফ (অতিশয় দুর্বল) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা মূলত দুর্বল বা সমালোচিত রাবীদের কারণে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাবীর বিশ্বস্ততা ও তাঁর উপর নির্ভরশীলতার স্তরের ওপর গুরুত্ব বা প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যেহেতু হাদীস আমরা পেয়েছি রাবী বা বর্ণনাকারীগণের মাধ্যমে, তাই তাদের বিশ্বস্ততা, সদাচার, ইল্‌ম-আমল ইত্যাদি দিকগুলো বিবেচনায় রাখা হয় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। কেননা যিনি মিথ্যা কিংবা অবিশ্বাস ও বদ-আমলে অভ্যস্ত, তিনি হাদীসে যে মিথ্যার আশ্রয় নেননি তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এছাড়াও বর্ণনাকারীদের পরস্পরের সম্পর্ক, দেখা-সাক্ষাত, সমসাময়িকতা ও উস্তাদের সাথে কত সময়ের সাহচর্যে বর্ণনাকারী থাকতেন, তার স্মরণশক্তি এবং বিষয়বস্তুর ওপর সতর্কতার পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়েছে।

একটি রিওয়ায়াতের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের সম্ভাব্য যতো পন্থা হতে পারে হাদীস বিশারদগণ হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তার সবগুলোই সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রয়োগ করেছেন। অতঃপর যেগুলোকে তাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন সেগুলোকেই হাদীস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এরপরও এমনটি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে যা হাদীস ছিল এবং যথার্থই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি বা কর্ম ছিলো, তা হাদীসের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে কিংবা শর্ত অপূর্ণতায় সূত্রগত যয়ীফ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তাই হাদীসের মান নির্ণয় করার লক্ষ্যে প্রণীত শর্তাবলী অনুযায়ী কোনো হাদীস শাদীদ যয়ীফ বলে চিহ্নিত হলেও সে হাদীসটি যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হয়নি, তাও নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। কারণ একজন অসত্যবাদী ব্যক্তিও অনেক সময় সত্য কথা বলে থাকেন। তবে প্রকৃত সত্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ভাল জানেন।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে শুধুমাত্র গবেষণার লক্ষ্যে রেফারেন্স হিসেবে লেখক হাদীসসমূহকে চিহ্নিত করে রেখে দিয়েছেন। এসব প্রকাশিত হাদীসের বক্তব্যের সাথে ইসলামের মূলনীতি তথা ঈমান, আরকান-আহকাম ও হালাল-হারামের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। হাদীসগুলোর অধিকাংশের ভাষ্য সরাসরি বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। তদুপরি হাদীসগুলো বেশকিছু সহীহ হাদীস গ্রন্থে ও বিশ্বে বহুল প্রচারিত তিনটি তিব্বুন নববী কিতাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাই তার যথাযথ রেফারেন্সসহ উদ্ধৃত করার বৈধতা সর্বজন স্বীকৃত। যাহোক, হাদীসসমূহের ভাষ্য গ্রহণ করা না করা বিদগ্ধ আলেমে দীন, হাদীস বিশারদ, চিন্তাশীল পাঠক ও গবেষকদের ওপর ছেড়ে দেয়া হলো। হয়তো ভবিষ্যতে গবেষণার ফলে রোগ নিরাময়ে কোনো গুরত্বপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যেতে পারে, যা আর্ত-মানবতার কল্যাণে কাজে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(এস এম রইসউদ্দিন)
পরিচালক প্রশাসন ঢাকা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

তারিখ : ১লা রমাদান ১৪৩৪ হিজরী
১১ জুলাই ২০১৩ ঈসায়ী

লেখকের কথা

ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান শীর্ষক ইসলামিক টিভির অনুষ্ঠানমালা শতাধিক পর্বে সাজানো। অনুষ্ঠানটি ইসলামিক টিভিতে প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৪.৩০ মিঃ নিয়মিতভাবে এবং শুক্রবার ও রোববার যথাক্রমে সকাল ৮.৩০ মিঃ ও বিকেল ৪.৩০ মিঃ অনিয়মিতভাবে সুদীর্ঘ সাত বছর যাবত সম্প্রচারিত হয়ে আসছে। বিশ্বে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলোতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে এ ধরনের ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান এটিই প্রথম। আর এই অনুষ্ঠানসমূহের পূর্ণ বিষয়বস্তুর লিখিত রূপই হচ্ছে ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান নামক গ্রন্থটি।

বিশ্বের প্রায় ২৫ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের নিকট রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক বাণীসমূহ আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে যৌক্তিকভাবে, সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করাই এ টিভি অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। আলোচিত বিষয়সমূহকে সকল শ্রেণী ও পেশার দর্শক-শ্রোতা ও পাঠকের নিকট সহজ ও বোধগম্য করার লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হাদীস গ্রন্থসমূহে যেসব সহজ-সরল অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে। তবে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হাদীস গ্রন্থসমূহে হাদীসের যে অনুবাদ উদ্ধৃত করা আছে, অনেক ক্ষেত্রে তা পুনরায় বাংলায় ভাষান্তর করা হয়েছে।

বইটিতে আট শতাধিক বিষয়ের ওপর সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফের প্রায় চারশত রিওয়ায়াতসহ প্রায় বারো শতাধিক রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে। বইটিতে যেসব ছবি সংযোজন করা হয়েছে, তার অধিকাংশই Google ও অন্যান্য জনপ্রিয় ওয়েবসাইট থেকে নেয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ও বেশ কিছু ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই আর্ত-মানবতার সেবায় ও কল্যাণে এবং জনস্বাস্থ্যের খাতিরে ছবিগুলো সন্নিবেশিত করার সুযোগ লাভ করায় উল্লিখিত ওয়েবসাইটের স্বত্ত্বাধিকারি ও সংশ্লিষ্ট ফটোগ্রাফারদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহের সম্মানিত লেখকদের প্রতি এই গ্রন্থপ্রণেতার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রইলো। বইটির মুদ্রণ নির্ভুল করার জন্য আমরা সাধ্যমত ঐকান্তিক চেষ্টা করেছি। হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিত ও বিদগ্ধ গবেষকদের নিকট যদি কোনো হাদীসের উদ্ধৃতি বা ব্যাখ্যা-বিবরণী সঠিক হয়নি বলে মনে হয় কিংবা কোনো ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে তাহলে অনুগ্রহপূর্বক লেখক বা বুক সোসাইটিকে তা অবহিত করুন। পরবর্তী সংস্করণে এসব পরামর্শ, উপদেশ ও অভিমত সাদরে গৃহীত হবে এবং ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করা হবে ইনশা'আল্লাহ্।

বইটি ছাপানোর জন্য সর্বাত্মক সাহায্য করেছেন আমার সুপ্রিয় ছেলে-মেয়েরা যাদের নাম প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার ছেলে ডক্টর মাহমুদ মুস্তাকীম হুসাইন আমেরিকা থেকে Prophetic medicine এর উপর আরবি ও ইংরেজী ভাষায় বেশ কয়েকটি দুস্প্রাপ্য ও মূল্যবান বই পাঠিয়েছিল যা আমার এ বই লেখার কাজে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। Prophetic Medical Science's natural medicine বিষয়ের ওপর গবেষণার প্রতি তার প্রবল আগ্রহই আমাকে এ কাজে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই ছেলে মাহমুদ ও মেয়ে নুসরাহ হুসাইনকে ধন্যবাদ জানাই বইটি প্রকাশে আর্থিক সহায়তার জন্য। মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া এর ঢাকার বিশাল ইসলামী লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ দেয়ায় প্রতিষ্ঠানের আমীনুত্ তালীম মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। মারকাযুদ দাওয়াহর অন্যান্যদের মধ্যে যারা সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে নেয়ামতুল্লাহ, ওসমান, আশেকে ঈলাহী, আশরাফ ও আলী আকবরের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মাওলানা তোফাজ্জল হোসেন, মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, মোজাম্মেল হক ও মোঃ নাছির উদ্দিনকে ধন্যবাদ জানাই তাদের ব্যক্তিগত হাদীস গ্রন্থসমূহ ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার জন্য। পাণ্ডুলিপি নির্ভুল করতে মুফতী মা'সূম বিল্লাহ ও মুফতী রিদওয়ানুল কারীম বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন, যার জন্য তাঁদের উভয়কে জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা। বস্তুত তাদের অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে বইটি অল্প সময়ের মধ্যে ছাপার উপযোগী হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে আমার প্রিয় সহধর্মিণী ও মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, গুলশান, ঢাকার সাবেক সিনিয়র লেকচারার বেগম মাহমুদা মুশাররফকে জানাই আন্তরিক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা, পাণ্ডুলিপি তৈরির সুদীর্ঘ সময়ে আমার অনুপস্থিতিতে ও অভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন অসুবিধা ও দুর্ভোগে ধৈর্যধারণের জন্য। তার সহনশীলতা, ভালোবাসা ও সমর্থন না পেলে এ দুরূহ ও বিশাল গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ আমার পক্ষে সম্পন্ন করা কিছুতেই সম্ভব হতোনা।

সর্বশেষে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করার জন্য এবং সর্বদা সুস্থ রাখার জন্য।

(ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন)
৪৪/৬, মধ্য পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ।

তারিখ : ০৫ জিলহাজ্ব ১৪৩৪
১১ অক্টোবর, ২০১৩
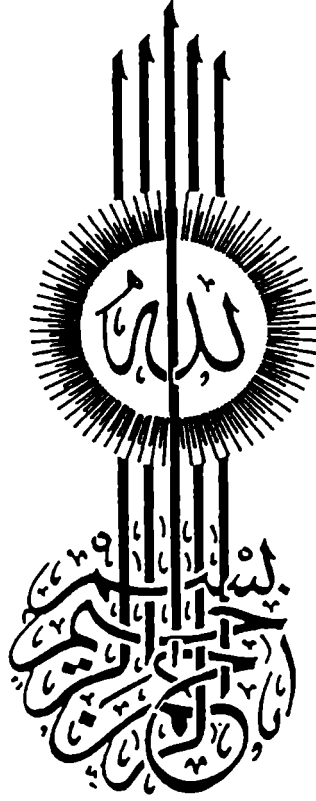
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

অধ্যায়-১

রোগ দর্শন, চিকিৎসার গুরুত্ব, রোগীর মর্যাদা ও দু'য়া এবং রোগীর জন্য সুস্থদের করণীয়

প্রশ্ন-০১ : রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে দুনিয়ায় বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকেরা কী কী ধারণা পোষণ করে থাকে? রোগ, ওষুধপত্র ও চিকিৎসা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি? বিস্তারিত বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর : রোগ সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল ও ধর্মে নানা প্রকার অদ্ভুত ধারণা বিদ্যমান। অধিকাংশ লোক রোগকে একটি মুসীবত এবং আল্লাহ্‌র গযব মনে করে। আবার কোনো কোনো দেশে রোগকে জ্বিন, ভূত ও প্রেতাত্মার আছর বলা হয়। কোনো কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী রোগকে ঘৃণা করে এবং চিকিৎসার নামে তারা রোগীর সাথে খুবই অত্যাচার-অবিচার, নির্যাতন ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। তবে এ ধরনের লোকের সংখ্যা নগণ্য হলেও এরূপ ধারণা আধুনিক যুগেও বিদ্যমান। কিন্তু এসব কোনো কিছুই ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইসলামে রোগ বা অসুস্থতা পাপাচারের ফলাফল বা আল্লাহ্‌র শাস্তিস্বরূপ নয়। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে রোগ-ব্যাধি গুনাহের ক্ষতিপূরণ বা কাফ্‌ফারাস্বরূপ। এটি মঙ্গল ও সফলতার সোপান এবং সাফল্যের কষ্টিপাথর। রোগে ধৈর্যধারণ জান্নাত লাভের অসীলা। ইসলামে রোগীর মর্যাদা অপরিসীম। রোগীর দু'য়া ফেরেশতাদের দু'য়ার সমতুল্য। রোগকে গালমন্দ করা ইসলামে নিষেধ। পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানগণ রোগ সম্পর্কে এ ধারণাই পোষণ করেন।

প্রশ্ন-০২ : রোগ ও রোগী সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি জানলাম। এবার বলুন ওষুধপত্র আর চিকিৎসকের ভূমিকা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর : চিকিৎসা সম্পর্কেও মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বিপরীতমুখী ধারণা দেখা যায়। কিছু সংখ্যক লোক রোগ নিরাময়কে শুধুমাত্র ওষুধপত্র ও চিকিৎসকের অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। বস্তুবাদী জগতে তারা এর বাইরে অন্য কিছু চিন্তা করতে চায় না। আবার কিছু কিছু লোক আছে যারা কোনো কোনো সময় কতিপয় রোগের ক্ষেত্রে আধুনিক এ্যালোপ্যাথিক ওষুধপত্রকে অনর্থক মনে করে থাকে এবং সেসব ক্ষেত্রে তারা ঝাড়-ফুঁক ও অন্যান্য সনাতন (traditional) ও বিকল্প পদ্ধতি (alternative medicine) যথা কবিরাজি, হেকিমি, হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগের নিরাময় পছন্দ করে। আবার কিছু লোক আছে যারা ওষুধপত্রকে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি বলে মনে করে। অবশ্য এ ধরনের লোকের সংখ্যা নগণ্য। ওষুধপত্র ও চিকিৎসা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে রোগ আল্লাহ্‌ থেকে আসে আর চিকিৎসাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই। চিকিৎসা খোদায়ী বিধান। অসুস্থতায় চিকিৎসা গ্রহণ করা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾

"ওয়াইযা মারিদ্‌তু ফাহুয়া ইয়াশফিন।" (আশ্‌ শুয়ারা ২৬:৮০)

(ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেন), "আমি যখন অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই (আল্লাহ্) আমাকে রোগমুক্ত করেন বা নিরাময় দান করেন।"

"And when I am ill, it is He (Allah) Who heals me." (Ash-Shu'ara 26:80)

এ আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ্ মানুষকে কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি; বরং সৃষ্টি করার সাথে সাথে পথ-নির্দেশনা, প্রতিপালন, দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্বও নিয়েছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি মুহূর্তে যে ধরনের পথনির্দেশ প্রয়োজন হয় তা দেয়ার পূর্ণ ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন। তাছাড়া তিনি মানুষের মৌলিক প্রয়োজনে তাকে বিপদ-আপদ, রোগ-শোক, ধ্বংসকারী জীবাণু ইত্যাদি থেকে রক্ষা করার জন্য কার্যকরী ও ভারসাম্যপূর্ণ এক চিরন্তন ব্যবস্থা দান করেছেন, মানুষের জ্ঞান এখনো যার পুরোপুরি সন্ধান দিতে পারেনি। এই আয়াতের সমর্থনে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যা হযরত যায়িদ ইবনে আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ''রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় জনৈক ব্যক্তি আঘাত পেলে ক্ষতস্থানে তাঁর রক্ত জমাটবদ্ধ হয়ে যায়। উপস্থিতদের একজন বনী আনবার গোত্রের দুই ব্যক্তিকে ডেকে আনলে উভয়েই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখেন। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমাদের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কে ভালো জানে?" এ কথা শুনে উভয়েই বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! চিকিৎসাতেও কি কল্যাণ আছে?" বর্ণনাকারী যায়িদ ইবনে আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ধারণা করেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "যিনি রোগ দিয়েছেন চিকিৎসাও তিনি দিয়েছেন।" (যাদুল মা'আদ ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক) [১]

আল্লামা হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত পেশ করেন যা ইয়াহূদীদের বর্ণনা হিসেবে জানা যায়। "একদা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট প্রশ্ন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! রোগ কার পক্ষ থেকে? মহান আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন বললেন, আমার পক্ষ থেকে। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, ওষুধ কার পক্ষ থেকে? মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বললেন, ওষুধও আমার পক্ষ থেকে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে চিকিৎসকের প্রয়োজন কী? আল্লাহ্ তা'য়ালা উত্তরে বললেন, চিকিৎসকের মাধ্যমে ওষুধ পাঠানো হয়।" (ইবনুল কাইয়িম) [২]

উপরোক্ত তিনটি প্রশ্ন ও জবাবের মধ্যেও রোগ, নিরাময়, চিকিৎসা ও ওষুধপত্র ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামী দর্শনের আভাস পাওয়া যায়। বস্তুত রোগ যেমন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, তেমনি নিরাময়ের ওষুধও মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই। তিনিই সৃষ্টি করেছেন ওষুধ বা নিরাময়ের উপকরণাদি। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে চিকিৎসক। আল্লাহ্ই চিকিৎসককে চিনিয়ে দেন। ফলে রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা ও সঠিক ওষুধ নির্বাচনে তিনি কৃতকার্য হন। ডাক্তার আর ওষুধ রোগ নিরাময়ের অসীলা মাত্র। সত্যিকার অর্থে একজন চিকিৎসক কোনো রোগীকে আরোগ্য দান করাতে পারেন না যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, ধরুন পাঁচটি শিশু ডায়রিয়ায় ভুগছে। তাদের সবার ডায়রিয়ার কারণ একই। তাদের রোগের উপসর্গও একই ধরনের। আর তাই রোগ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপত্রও একই ধরনের হয়েছে। কয়েকদিন পর দেখা গেলো তিনটি শিশু আরোগ্য লাভ করেছে আর দু'জন মৃত্যুবরণ করেছে। কেনো

পাঁচজনের সবাই মৃত্যুবরণ করলো না অথবা কেনো পাঁচজনই সুস্থ হলো না। এর পেছনে কী রহস্য থাকতে পারে? কারণ আল্লাহ্ যাকে চেয়েছেন সে আরোগ্য লাভ করেছে; আর যাকে তিনি চাননি সে মৃত্যুবরণ করেছে। বস্তুত এটিই প্রকৃত সত্য। এটিই অহরহ ঘটছে।

আরো একটি উদাহরণ দিচ্ছি, মনে করুন, ছয় জন ব্যক্তি ব্লাড ক্যান্সারে ভুগছেন। তাদের সবারই রোগের কারণ ও উপসর্গ প্রায় একই ধরনের। আর তাই ব্যবস্থাপত্রও একই ধরনের। সবার জন্যই রেডিওথিরাপি এবং কেমোথিরাপি নিয়মিতভাবে দেয়ার পরামর্শ Oncologist-গণ দিয়েছেন। সঠিকভাবে ও নিয়মিতভাবে তাদের চিকিৎসা চলছে। বছর দুই পর দেখা গেলো, তাদের মধ্যে চার জন মৃত্যুবরণ করেছেন আর এ দু'জন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করছেন। আমার প্রশ্ন, কেনো ছয়জনই মৃত্যুবরণ করলেন না অথবা কেনো তারা সবাই সুস্থ হয়ে উঠলেননা। উত্তর একই। আল্লাহ্ তা'য়ালা যাকে চেয়েছেন নিরাময় দান করেছেন, যাকে চাননি তার মৃত্যু হয়েছে। কারণ মৃত্যুর সময় তো জন্মের আগে থেকেই নির্ধারিত, অথচ মানুষ তা জানে না।

চিকিৎসকের নিকট গমন, তার ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ এবং ওষুধ সেবন সবই রোগীর বা তার আত্মীয়-স্বজনদের ইখতিয়ারাধীন। কিন্তু আরোগ্যদান আল্লাহ্র ইখতিয়ারধীন, মানুষের নয়। তাই মানুষ আরোগ্যলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে পারে। বিশ্ববিখ্যাত হাসপাতালে বড় বড় ডাক্তারের কাছে যেতে পারে কিন্তু আরোগ্যলাভের জন্য বলপ্রয়োগ করতে পারেনা। সে যে আরোগ্যলাভ করবেই, এ গ্যারান্টি তাকে কেউ দিতে পারবেনা।

প্রশ্ন-০৩ : রোগ কি কষ্টিপাথর? এ বিষয়ে কুরআন মজীদ বা হাদীস শরীফে কী কী সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে?

উত্তর : সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা-পাঠক! আপনারা সবাই জানেন যে এই নশ্বর জীবনে মানুষকে প্রতিনিয়তই কোনো না কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। কোনো সফলতাই পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই ব্যতীত অর্জিত হয়না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজীদে কতিপয় আয়াত রয়েছে। যার সারমর্ম হচ্ছে, "তোমরা কি কোনো সময় চিন্তা করে দেখেছো যে কোনো প্রকার পরীক্ষা, জিজ্ঞাসাবাদ ও যাচাই-বাছাই ছাড়াই বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত তোমরা অর্জন করে ফেলবে?" এ সম্পর্কে সূরা বাকারাহর ২১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল, তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল এখনো তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি। তাদের ওপর নেমে এসেছিল অত্যাচার-নির্যাতন, কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-মুসীবত। আঘাতে আঘাতে তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমনকি সমকালীন রসূল ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল, আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে? তখন তাদেরকে এই বলে

সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটে ।" (আল বাকারাহ ২:২১৪)

এ ধরনের সতর্কবাণী মহান আল্লাহ্‌ সূরা আলে ইমরানের ১৪২ আয়াতে, সূরা আম্বিয়ার ৩৫ আয়াতে, সূরা আনকাবূতের ২ ও ৩ আয়াতে এবং সূরা মুহাম্মদের ৩১ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পরীক্ষা ও যাচাই কীভাবে হবে? এর উত্তরে সূরা বাকারাহর ১৫৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ﴾

"নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে অর্থাৎ উপার্জন ও আমদানিহ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো।" (আল বাকারাহ ২:১৫৫)

এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি, পরীক্ষার বিভিন্ন ধরনের ভেতর প্রাণের ক্ষতিও রয়েছে। আর স্বাস্থ্যের ক্ষতি তো প্রাণের ক্ষতিরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ স্বাস্থ্যের অবনতিই তো প্রাণের ক্ষতি। বর্তমান বিশ্বে অসুস্থতার কারণে মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যাই বেশি। তাই প্রাণের ক্ষতি মৃত্যুর আকারেও হতে পারে আবার রোগের আকারেও হতে পারে। আর এসব কারণে বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ ও সূফীগণ রোগকে আল্লাহ্‌র রহমত লাভের অসীলা বা পদোন্নতির সোপান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তারা যে ব্যক্তির রোগ হয় না, তাকে দুর্ভাগা মনে করেছেন। সূফীবাদের পুস্তকাদিতে এ ধরনের অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যে মুরিদ যদি কখনো রোগগ্রস্ত না হয়েছে, তবে মুর্শিদ তার কামালিয়তের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দুঃখ-কষ্ট সৎকর্মশীলদের জীবনে বেশি আসে। যখনই কোনো মু'মিন বালা-মুসীবত বা দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়, সেটা কাঁটা বিধুক অথবা তার চেয়ে বড় কিছু হোক না কেনো, এর ফলে তার একটি পাপ মার্জনা করা হয় এবং জান্নাতে তার মর্যাদা একধাপ বেড়ে যায়।" (মুসনাদে আহ্‌মাদ ও আত-তিরমিযী) [৩]

এ বিষয়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসটি তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত আছে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে তিনি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, "আমি দুনিয়ায় যখন আমার কোনো বান্দাকে দু'টি প্রিয় জিনিস দ্বারা কষ্ট দিই এবং সে যদি ধৈর্যধারণ করে, তবে এর বদলায় আমি তাকে জান্নাত দিয়ে থাকি। আর 'উত্তম ও প্রিয় জিনিস দ্বারা' কথার অর্থ হলো তার দুচোখ।" (সহীহ্‌ আল বুখারী) [৪]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মাহমূদ ইবনে লাবিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'য়ালা যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাদেরকে (বিপদ-আপদ দ্বারা) পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে সে ধৈর্যের প্রতিদান

পায়। আর যে অধৈর্য হয়ে যায় সে অধৈর্যের ফল পায়।" (মুসনাদে আহ্মাদ) ৫

আত-তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত হাদীসটি বর্ণনা করেন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন তখন তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে তাকে বিপদে নিক্ষেপ করেন। আর যখন তিনি তাঁর কোনো বান্দার অকল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন তখন তাকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তাকে পুরাপুরি শাস্তি দেন।" তিনি আরো বলেন, "বিপদ যত মারাত্মক হবে প্রতিদানও ততো মহান হবে। আল্লাহ্ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যদি তারা তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবেন। আর যারা এতে অসন্তুষ্ট হয় তারা আল্লাহর রোষ ছাড়া কিছুই পাবে না।" (আত-তিরমিযী) ৬

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "আমি আল্লাহ্র নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে আর কাউকে অসুস্থতায় এতো কষ্ট পেতে দেখিনি।" (সহীহ আল-বুখারী) ৭

স'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "এই পৃথিবীতে আল্লাহ্র নবী-রসূল আলাইহিমুস সালামই বেশি দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার ভোগ করে থাকেন, তারপর আল্লাহ্র অলিগণ, তারপর সৎকর্মশীল বান্দাগণ। একজন মানুষের দুঃখ-কষ্ট পাওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে দ্বীনের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসার গভীরতার ওপর। এ পৃথিবীর বুকে অলিগণের জীবন থেকে দুঃখ-কষ্ট কখনো দূর হয়না যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্র রাস্তায় চলেন এবং তাদের কৃতকর্মকে বিশুদ্ধ রাখেন।" (মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ) ৮

প্রশ্ন-০৪ : রোগ কি মঙ্গল ও সফলতার সোপান? আমরা কীভাবে তা জানতে পারব?

উত্তর : ইসলামের সমস্ত বিধিবিধান ও মৌলিক বিষয়াদি সম্পূর্ণ স্বভাবগত ও যুক্তিযুক্ত। Islam is the natural way of life, the very religion of man. In every country among every people all God- knowing and truth-loving men believed and lived in this very religion. তাই ইসলামের বিধিবিধান অনুযায়ী অসুস্থতা বা রোগ আযাব নয়, পাপের প্রায়শ্চিত্তও নয়; বরং এটা আল্লাহ্র রহমত লাভের একটি অসীলা মাত্র। অপরদিকে বালা-মুসীবত ও রোগের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের পরীক্ষা করে থাকেন। যেমন হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালাম দীর্ঘ দিন রোগে ভুগেছেন। তাই রোগ আমাদের জন্য রহমত, বরকত ও সফলতার সোপান হয়ে থাকে। Disease is a means of mercy, blessing and eternal salvation. উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীস এখানে বর্ণনা করছি। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'য়ালা যাকে কল্যাণ দান করতে চান বা ভালোবাসেন, তাকে কষ্টে বা মুসীবতে ফেলেন।" (সহীহ আল্ বুখারী) ৯

অপরদিকে হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নিকট দু'জন ফেরেশতা পাঠিয়ে বলেন, "দেখো, হে ফেরেশতা! সে তার শুশ্রূষাকারীর সাথে কী কথাবার্তা বলছে।" যদি সে অসুস্থ হবার কারণে মহান আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের গুণকীর্তন করতে থাকে, তবে সে খবর ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র নিকট নিয়ে যান। যদিও আল্লাহ্ স্বয়ং সবকিছু জানেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষণা করেন : "আমি যদি তাকে মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করাই তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যদি তাকে রোগ থেকে মুক্তি দিই তবে তার খারাপ গোশ্‌তকে উত্তম গোশ্‌ত দ্বারা আর দূষিত রক্তকে উত্তম রক্ত দ্বারা পরিবর্তন করে দেবো এবং তার পাপরাশিকেও দূর করে দেবো।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক) [১০]

প্রশ্ন-০৫ : রোগে ধৈর্যধারণ করা কি জান্নাত লাভের অসীলা হতে পারে? এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

উত্তর : আমাদের সমাজে অনেক লোক আছে যারা রোগকে এক ধরনের অভিশাপ মনে করে থাকে। অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা যদি নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্যবিষয়ক পবিত্র হাদীস নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে আমাদের এ ধারণা যে সঠিক নয় তা প্রমাণিত হবে। বস্তুত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় রোগ জান্নাত লাভের অসীলাস্বরূপ। তাই রোগে ধৈর্যধারণ করা জান্নাত লাভের প্রধান শর্ত। কাজেই যারা রোগে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও ধৈর্যধারণ করেন তারাই জান্নাত লাভের আশা করতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে আমি আরো একটি হাদীস আলোচনায় আনবো যা থেকে আমরা জানতে পারবো, শুধুমাত্র রোগে ধৈর্যধারণের জন্য আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাত দান করেছেন। আতা ইবনে আবী রাবাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ মর্মে বর্ণনা করেন, একদা আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি কি আপনাকে একজন জান্নাতি মহিলা দেখিয়ে দেবো না?" আমি বললাম, "কেনো দেখাবেন না? অবশ্যই দেখান।" তিনি বললেন, "ঐ কালো মহিলাকে দেখুন।" এই মহিলা একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! যখন আমার মৃগীরোগের চাপ শুরু হয় তখন আমার সতর খুলে যায় অর্থাৎ পরনের কাপড় খুলে যায়। তাই আল্লাহ্‌র দরবারে আমার সুস্থতার জন্য দু'য়া করুন।" জবাবে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি পারলে ধৈর্যধারণ করো, তাহলে তুমি জান্নাত পাবে। আর যদি চাও তবে আমি তোমার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'য়া করি।" উক্ত মহিলা বলল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি ধৈর্যধারণ করবো।" অতঃপর সে বলল, "তবে আপনি আল্লাহ্‌র নিকট এই দু'য়া করুন যেনো আমার সতর খুলে না যায়।" নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার জন্য দু'য়া করলেন। (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [১১]

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, কেউ যদি মৃগী রোগ, ক্যান্সার অথবা তদ্রূপ কোনো জটিল রোগে ভোগে ধৈর্যধারণ করে, তাহলে আল্লাহ্ সুব্‌হানাহু ওয়াতা'য়ালা তাকে ধৈর্যধারণের বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "আমি ঐ মু'মিনের প্রতি আশ্চর্য হই; যে মু'মিন হয়েও রোগের কারণে অধৈর্য হয়। যদি সে জানতো যে রোগের মধ্যে তার কী উপকার রয়েছে, তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'য়ালার সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত রোগাক্রান্ত থাকতে

চাইতো।" **(মুসনাদে আল-বায্যার)** [১২]

হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, "হে আল্লাহ্‌র নবী! যদি আমার স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং আমি সুস্থ থাকি, তখন আমি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করি। এই অবস্থাটি আমার নিকট সেই অবস্থার চেয়ে অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় যে আমি অসুস্থতা দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হই এবং ধৈর্য্য ধারণ করি।" **আমার এই কথা শুনে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,** "আল্লাহ্‌র রসূলও তোমার সাথে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা পছন্দ করেন।" **(মু'জামুল আওসাত ও মু'জামুস্ সগীর)** [১৩]

প্রশ্ন-০৬ : রোগ ও গুনাহ্ এ দুটো বিষয় কীভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত?

উত্তর : আমাদের সমাজে অনেক ব্যক্তি রোগকে **খারাপ বা গুনাহের কাজের ফলাফল বা কারণ মনে করে। অনেকে এমন ধারণা পোষণ করে থাকেন যে রোগ হলো পূর্বের কোনো খারাপ বা পাপকার্যের ফলাফলস্বরূপ। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রোগ গুনাহের কারণ নাও হতে পারে, বরং এটা গুনাহের ক্ষতিপূরণ বা কাফ্ফারা। এ সম্পর্কে আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি মূল্যবান হাদীস পেশ করছি।**

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে জ্বর নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তখন এক ব্যক্তি উঠে জ্বরকে গালমন্দ করলো। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "জ্বরকে গালি দিওনা, কেননা এটি পাপসমূহকে এমনভাবে দূর করে যেমনিভাবে আগুন লোহার মরিচা (জং) বা ময়লা পরিষ্কার করে দেয়।" **(ইবনে মাজাহ)** [১৪]

হযরত উম্মুল আ'লা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "আমি অসুস্থ ছিলাম, এমন সময় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এসে বললেন, উম্মুল আ'লা! তোমার জন্য সুসংবাদ! মুসলমানদের রোগ তাদের গুনাহকে দূর করে দেয় যেমনি অগ্নি সোনা-রূপার মরিচা দূর করে থাকে।" **(আবূ দাউদ)** [১৫]

আল-হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি **বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,** "নিশ্চয়ই মু'মিনের এক রাত্রির জ্বর তার সকল গুনাহ দূর করে দেয়।" **(শু'আবুল ঈমান)** [১৬]

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "এক রাত্রিতে জ্বরে ভুগে কষ্ট পাওয়া এক বছর রোযা রাখার সমান।" **(আস-সুয়ূতী ও কাশফুল খফা)** [১৭]

আল-হাসান রহমাতুল্লাহি **আলাইহি বর্ণনা করেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,** "জ্বর প্রত্যেক মুমিনের জন্য জাহান্নামের শাস্তি একটা অংশ। এক রাতের জ্বর একজন ইবাদতকারী এক বৎসরের সকল গুনাহ দূর করে দেয়।" (জামে সগীর) [১৮]

অবশ্য এসব হাদীসে 'সব গুনাহ' বলে সগীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। যেহেতু কাবীরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয়না।

প্রশ্ন-০৭ : রোগ বা অসুস্থতা কি পাপের ক্ষতিপূরণ হতে পারে?

উত্তর : আগেই বলেছি কোনো কোনো ব্যক্তি রোগ-ব্যাধিকে এক ধরনের আযাব মনে করে থাকে। অথচ সকল প্রকার কষ্ট সত্ত্বেও অধিকাংশ মুসলমানের জন্য রোগ-ব্যাধি রহমতের অসীলা হিসেবে বিবেচিত।

যা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় হাদীস থেকে জানা যায়। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মুসলমানদের উপর যে কোনো বিপদ-মুসীবতই আসে, আল্লাহ্ এর বদলে তার গুনাহ মোচন করে দেন, এমনকি তার শরীরে কাঁটা বিদ্ধ হলে তার দ্বারাও।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক) [১৯]

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মুসলমান কোনো যাতনা, রোগ-কষ্ট, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, নির্যাতন ও শোকগ্রস্থ হলে, এমনকি তার দেহে কাঁটা বিদ্ধ হলেও এর বদলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।" (সহীহ আল বুখারী) [২০]

কাজেই আমাদের গায়ে বা পায়ে কোনো কাঁটাও যদি বিঁধে যায়, তবে তা আমাদের গুনাহের কাফ্ফারা বা পাপ মোচনের একটি উত্তম উপায় হয়ে যায়। হযরত ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হলে কোনো একজন লোক উক্ত মাইয়্যেত বা মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলল, "কতই না সুন্দর মৃত্যু হয়েছে। কোনো রোগে ভুগলো না আর মৃত্যু হয়ে গেলো!" একথা শুনে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার জন্য আফ্সোস! তুমি কি জানো না, আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তিকে কোনো রোগে ফেললে, এর কারণে তিনি তার পাপরাশি মার্জনা করে দেন?" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক) [২১]

এ বিষয়ে আরো রিওয়ায়াত হাদীস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়, যা থেকে আমরা জানতে পারি যে রোগের কারণে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰٓئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾

"অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবূল করবেন যারা ভুলবশতঃ মন্দকাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হলো সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ মাফ করে দেন।" (আন-নিসা ৪:১৭)

আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا﴾

"অতঃপর তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তিরা। তারা নামায নষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি পথভ্রষ্টতা তথা জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে।" (মরিয়াম ১৯:৫৯-৬০)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴾

"যে গুনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল করুণাময় হিসেবে পায়।" (নিসা ৪:১১০)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে প্রণিধানযোগ্য যে গুনাহ মাফের জন্য তওবা শর্ত। তওবা ব্যতীত গুনাহ মাফ হবেনা, যদিও তা মৃত্যুর শেষ মুহূর্তের পূর্বক্ষণে হয়। হাদীস শরীফে এসেছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহা মহিম আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার তওবা তখন পর্যন্ত কবূল করেন যে পর্যন্ত তার উপর মৃত্যু যন্ত্রণার গরগরা প্রকাশ না পায় (অর্থাৎ রূহ্ কণ্ঠাগত না হয়)।" (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [২২]

এই হাদীসটি হাসান। হাদীসটিতে স্পষ্ট যে মৃত্যু রোগে পতিত থাকলেও তওবা করতে হবে। সুতরাং কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদীস শরীফের আলোকে প্রমাণিত হয় যে নামায, রোযা, হজ্ব- উমরা, রোগ, মুসীবত ইত্যাদির দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হয়, কাবীরা গুনাহ মাফ হয়না। এজন্য নামায-রোযার পাশাপাশি রোগ-মুসীবতের সময় তওবা-ইস্তিগফার খুব গুরুত্ব সহকারে করা উচিত। উল্লেখ্য যে সংক্রামক গুনাহ ও অসংক্রামক গুনাহ অর্থাৎ বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহর হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গুনাহই তওবা ও ইস্তিগফার দ্বারা মাফ হতে পারে। তবে তওবা-ইস্তিগফারের স্বরূপ জানা জরুরী। শুধু মুখে 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলার নাম তওবা ও ইস্তিগফার নয়। তাই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি সেজন্য অনুতপ্ত হয়ে এবং অবিলম্বে তা পরিত্যাগ করে ও ভবিষ্যতে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে তওবা করবে। তবেই তা গ্রহণযোগ্য হবে।

অবশ্য যে গুনাহের ক্ষমা চাওয়া হয় কোনোভাবে যদি তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ করাও তওবার অন্যতম শর্ত। যেমন, কেউ কারো টাকা আত্মসাৎ করেছে, এখন সে বসে বসে তওবা করেছে যে "হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিন"-এ তওবা কবূল হবেনা। এ কারণে যে, যে ব্যক্তির টাকা আত্মসাৎ করেছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার টাকা ফেরত না দিবে বা তার থেকে মাফ না নিবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তওবা কবূল হবে না। কারণ, এ অবস্থায় ক্ষতিপূরণ সম্ভব। কিংবা কারো অন্তরে ব্যথা দিয়েছে বা কাউকে কষ্ট দিয়েছে। তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব। তা হলো, তার থেকে মাফ নিয়ে নিবে। তদ্রূপ আল্লাহর হকের বিষয়ে তওবা করার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। যেমন, বালেগ হওয়ার পর যে নামাযগুলো পড়েনি, তওবা করার সাথে সাথে তার ক্ষতিপূরণও করতে হবে। নামায ছুটে গিয়ে থাকলে বা রোযা বাদ পড়ে থাকলে, যাকাত অনাদায়ী থাকলে আগে সেগুলোর ক্ষতিপূরণ করা তওবা কবূলের পূর্বশর্ত।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে যদি তাই হয় যেমনটি বললাম, তাহলে হাদীস শরীফে 'সকল মরিচা দূর করার ন্যায়' শব্দগুলো বলা হলো কেন? একজন প্রকৃত মুসলমান কবীরা গুনাহ করবে এটা দুরূহ ব্যাপার। তারপরও করে ফেললে তওবা করতে দেরি করেনা। তাছাড়া শহীদের ফযীলতের ব্যাপারেও তো এমন মাফের কথা এসেছে। কিন্তু তাই বলে তো তার ঋণ ইত্যাদি মাফ হবেনা। সুতরাং হাদীসে ব্যাপক ক্ষমা

উদ্দেশ্য নয়। বস্তুত রোগ বা বালা-মুসীবত, মানুষের মধ্যে অনুতাপ, কোমলতা, বিনয়, বশ্যতা, নম্রতা, আল্লাহ্‌ভীতি ও পরকালের স্মরণ সৃষ্টি করে এবং ধৈর্য ও শুকরিয়া আদায়ের মানসিকতা পয়দা করে। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা চাইলে নিজ বিশেষ অনুগ্রহে কারো কাবীরা গুনাহ্ মাফ করে দিতে পারেন। সেটা ভিন্ন কথা। তাই রোগাক্রান্ত সময় উপর্যুক্ত নিয়মে তওবা-ইস্তিগফার করার মোক্ষম সুযোগ। এই সুযোগকে কেউ যদি যথার্থ কাজে লাগাতে পারে, তখন আমরা আশা করতে পারি, সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যিনি এ নশ্বর পৃথিবীতে রোগের মাধ্যমে তার সকল পাপরাশি মার্জনা করাতে সক্ষম হয়েছেন এবং স্বীয় যিন্দেগিকে নেকি দ্বারা পরিপূর্ণ করে নিয়েছেন।

প্রশ্ন-০৮ : মুহ্তারাম, একটু আগে আলোচনা করলেন যে রোগ পাপের ক্ষতিপূরণ হতে পারে কি না। এ বিষয়ে আরো কোনো হাদীস আছে কী, যা জেনে আমাদের সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা বিষয়টি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে পারবেন যে দুঃখ-কষ্ট ও রোগ-ব্যাধি গুনাহের কাফ্ফারাস্বরূপ। যে কখনও অসুস্থ হয়নি তার ব্যাপারে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বক্তব্য রেখেছেন ?

উত্তর : রোগ্য-ব্যাধি নিঃসন্দেহে কষ্টদায়ক। তাই এটি গুনাহের কাফ্ফারাস্বরূপ হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো কতিপয় বাণী এখানে আলোচনা করছি :

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "কোনো মুমিন ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ ব্যথা-বেদনা, রোগ-ব্যধি বা দু:খ-কষ্ট আসেনা, এমনকি চিন্তা-ভাবনা, পেরেশানী পর্যন্ত, যার বিনিময়ে তার কোনো পাপ মার্জনা হয়না।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [২৩]

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "মুমিন পুরুষ অথবা মহিলা যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে আল্লাহ্ উক্ত রোগীকে তার পূর্বের গুনাহ্ মাফের একটা অসীলা করে দেন।" (আত তিরমিযী ও মুসনাদে বাযযার) [২৪]

হযরত আবূ নুয়াইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়, রোগ তার কাফ্ফারা স্বরূপ।" (শু'আবুল ঈমান) [২৫]

বস্তুত, কারো যদি এ চিন্তা ও সন্দেহ হয় যে রোগ কী করে গুনাহের কাফফারা হয় তখন তার স্মরণ রাখা উচিত যে আগুনের ভাট্টি যেমন লোহার মরিচা দূর করে, স্বর্ণকারের ভাট্টি যেমন স্বর্ণের ময়লা পরিষ্কার করে ফেলে, তেমনি রোগ-শয্যায় মানুষ মনের অজান্তেই আল্লাহ্কে স্মরণ করতে থাকে। তার মুখে অকৃত্রিমভাবে আল্লাহ্ আল্লাহ্ শব্দটি এসে পড়ে। সে তার স্বীয় অপরাধের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য গুনাহ্ না করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রোগ-শয্যা ত্যাগ করে। আর রোগীর এ অসহায় ভঙ্গি ও আকুতি করুণাময় আল্লাহ্র নিকট খুবই পছন্দনীয়।

যে কখনো অসুস্থ হয়না তার ব্যাপারে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো সহীহ রিওয়ায়াত পাওয়া যায়না। তবে সুনানে আবূ দাউদে একটি যয়ীফ বা দুর্বল সূত্রে রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। কিন্তু তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়না। রিওয়ায়াতটি হলো, হযরত আমর ইবনে 'আস

রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, "নিশ্চয়ই কোনো মুমিনের যদি রোগ হয়, অতঃপর আল্লাহ্ তাকে আরোগ্য দান করেন, তবে এটা তার পেছনের গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। একথা শুনে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেপাশে যেসকল সাহাবী বসা ছিলেন তাদের একজন বলে উঠলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! অসুস্থতার অর্থ কী? আল্লাহ্র ফযলে আমার তো কখনো অসুখ-বিসুখ হয়নি।" নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন লোকটিকে বললেন : "তুমি এখান থেকে উঠে যাও, তুমি আমার দলভুক্ত নও। অর্থাৎ আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নও।" (আবূ দাউদ) [২৬]

এ হাদীসটি দুর্বল হলেও তা থেকে আমরা জানতে পারি যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগকে কামেল মুমিনের একটি শান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত কোনো ব্যক্তি যখন রোগে পতিত হয় আল্লাহ তা'য়ালা এর মাধ্যমে দুনিয়াতেই তাকে পাপ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে নেন। বিভিন্ন হাদীসে সুস্থতাকে নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি রোগ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন সময়ে তিনি উৎসাহিত করেছেন। যেমন সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা পাত্রকে ঢেকে রাখো, পানপাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখো, কেননা বছরে এমন একটি রাত থাকে যখন মহারোগ আপতিত হয়, তখন কোনো খোলা পাত্রকে আক্রান্ত করতে ছাড়ে না।" (সহীহ মুসলিম) [২৭]

প্রশ্ন-০৯ : রোগকে গালমন্দ করা কি উচিত? এ বিষয়ে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী কী বাণী আছে?

উত্তর : রোগ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে রোগ গুনাহের কাফ্ফারা ও নেকির কারণ। আর এ জন্যই তিনি সুস্থ থাকার জন্য এভাবে দু'য়া করতেন, "হে রহমানুর রাহীম। রোগের নিয়ামতগুলোকে সুস্থতার নিয়ামত দ্বারা বদলিয়ে দিন।"

কারণ রোগ এক প্রকার নিয়ামত, আর সুস্থতাও আরেক নিয়ামত। কাজেই কোনো মুসলমানের পক্ষে রোগকে গালমন্দ করা উচিত নয়। এ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশার একটি ঘটনা লক্ষ্য করুন। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সায়ের অথবা উম্মে মুসাইয়্যেব রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী হয়েছে যার কারণে তুমি কাঁপছো?" "What happned to you for which you are shievering?" তিনি উত্তর দিলেন, "জ্বরে আক্রান্ত হয়েছি। আল্লাহ্ এ জ্বরের কোনো কল্যাণ না করুন।" তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "জ্বরকে গালি দিওনা। কারণ এটা আদম সন্তানের গুনাহসমূহ এমনভাবে দূর করে দেয় যেমনভাবে কামারের হাঁপর লোহার মরিচা ও ময়লা পরিষ্কার করে ফেলে।" (সহীহ মুসলিম) [২৮]

অপরদিকে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে জ্বরের বিষয়ে আলোচনা হলে এক ব্যক্তি জ্বরকে গালি দেয়।" নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তখন বলেন, "জ্বরকে গালি দিওনা। কেননা তা পাপসমূহকে দূর করে, যেমন আগুন লোহার ময়লা দূর করে।" (ইবনে মাজাহ) [২৯]

যা হোক, এখানে আমি আরো একটি হাদীস বর্ণনা করছি, যা আগের পর্বেও আলোচনা করেছি। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে জনৈক ব্যক্তি বললেন, "কতোই না সুন্দর মৃত্যু হলো, কোনো রোগে না ভুগেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলো!" লোকটির একথা শুনে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "তোমার জন্য আফ্সোস্। তুমি জানো না, আল্লাহ্ যদি তাকে রোগে আক্রান্ত করতেন তাহলে ঐ রোগের কারণে তার গুনাহ দূর হয়ে যেতো।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক) [৩০]

কাজেই কোনো সময় আমরা যেনো রোগকে গালি না দিই। কারণ রোগকে গালি দেয়া মানে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্কে গালি দেয়া। কেননা, রোগ তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে। তবে হ্যাঁ, কিছু রোগ আছে যা মানুষের নিজেদের কারণে হয়। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহার বিষয়ক যেসব উপদেশ দিয়েছেন তা মেনে চললে আমরা অনেক অসুখ-বিসুখ থেকে দূরে থাকতে পারবো। যেসব খাবার তিনি খেতে নিষেধ করেছেন তা যদি আমরা মেনে না চলি তখন অসুখ-বিসুখ হতেই পারে। এর জন্য আমরা আল্লাহ্কে দায়ী করতে পারিনা। মোটকথা আল্লাহ্ যদি রোগের মাধ্যমে আমাদেরকে কষ্টে ফেলেন সেটা আমাদের কল্যাণের জন্যই, শাস্তি প্রদানের জন্য নয়।

প্রশ্ন-১০ : ইসলামের দৃষ্টিতে রোগীর মর্যাদা কি? রোগীর দু'য়ার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : এতোক্ষণ যে আলোচনা করলাম তার সারমর্ম হলো, রোগ একটা কষ্টিপাথর যা বান্দার পরীক্ষার জন্য আসে। আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, রোগ মঙ্গল ও সফলতার সোপান। হাদীস থেকে আমরা জানি যে "আল্লাহ্ যাকে কল্যাণ দান করতে চান তাকে কষ্টে ফেলেন।" তাই রোগ জান্নাত লাভের অসীলাস্বরূপ। রোগ মানুষের গুনাহ্কে দূর করে। এটি পাপের ক্ষতিপূরণস্বরূপ এবং গুনাহের কাফ্ফারা; গুনাহ্ মাফের অসীলা। তাই রোগীর মর্যাদা অনেক বেশি। রোগীর দু'য়া ফেরেশতাদের দু'য়ার সমতুল্য।

একজন রোগী যদি ধৈর্যশীল, শোকরগুযার ও আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল হয়ে যায়, তখন তার প্রতি আল্লাহ্র রহমত বাড়তে থাকে। ফলে রোগ তার জন্য রহমতস্বরূপ হয়ে যায়। আর রোগের কারণে সে আল্লাহ্র প্রতি আরো নিবিষ্ট হয়। সুতরাং এ অবস্থায় সে কোনো দু'য়া করলে তা কবূল হয়ে যায়। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "তুমি কোনো রোগীকে দেখতে গেলে তখন তাকে তোমার জন্য দু'য়া করতে বলবে। নিশ্চয়ই তার (রোগীর) দু'য়া ফেরেশ্তাদের দু'য়ার মতো।" (ইবনে মাজাহ) [৩১]

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, রোগীর নিকট দু'য়ার জন্য অনুরোধ করাও সুন্নত। এর মধ্যে নেকি নিহিত রয়েছে। রোগীর দু'য়া কবূল হবার কারণ হচ্ছে, যেহেতু সে সর্বদা কষ্ট ভোগ করতে থাকে তাই আল্লাহ্র প্রতি তার মনোযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি এবং সে সর্বদা আল্লাহ্র করুণাপ্রার্থী হয়ে থাকে। সে নিজেকে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণকারী মনে করে। রোগ যন্ত্রণায় সে সর্বদা আল্লাহ্কে ডাকতে থাকে। ইমাম গাযালি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, **রোগ বা অসুস্থতা ঈমান বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ্র নৈকট্যলাভে সহায়তা করে।**

প্রশ্ন-১১ : রোগে মৃত্যুবরণ করা কি শাহাদাতের সাথে তুলনীয়?

উত্তর : হ্যাঁ। রোগে কষ্ট ভোগ করে মৃত্যুবরণ করাকে শাহাদাতের সাথে তুলনা করা যায়। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "অসুস্থতায় বিছানায় মৃত্যুবরণ করা শাহাদাতের মৃত্যু। তাকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবেনা। তার নিকট যেসব খাদ্য সামগ্রী আসে তা জান্নাত থেকে পাঠানো হয়।" (ইবনে মাজাহ্) [৩২]

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "আমার উম্মতের শহীদগণের ভেতর অধিকাংশই হচ্ছে তারা, যারা রোগাক্রান্ত থেকে রোগ-বিছানায় মৃত্যুবরণ করে থাকে।" (মুসনাদে আহমাদ ও আস-সুয়ূতী) [৩৩]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সফররত অবস্থায় মৃত্যু হলো শহীদী মৃত্যু।" (ইবনে মাজাহ) [৩৪]

প্রশ্ন-১২ : এ আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে রোগে মৃত্যুবরণকারীরা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারে। এ বিষয়ে আরো কোনো সুনির্দিষ্ট হাদীস থাকলে তা আলোচনা করুন।

উত্তর : হযরত জাবির ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন প্রখ্যাত সাহাবী। তিনি বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া ছাড়াও সাত ধরনের লোক শহীদ বা শহীদের মর্যাদাপ্রাপ্ত। তন্মধ্যে যিনি প্লেগে বা মহামারীতে মৃত্যুবরণ করেন, যিনি আগুনে পুড়ে মারা যান, যিনি ঝিল্লির প্রদাহজনিত রোগে (pleurisy) ভুগে মৃত্যুবরণ করেন, যিনি পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন, যিনি পেটের পীড়ার কষ্টে (কলেরা, ডায়রিয়া ইত্যাদি) মৃত্যুবরণ করেন, যিনি কোনো কিছুর নিচে চাপা পড়ে মারা যান এবং যে মহিলা সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করেন।" (আবূ দাউদ ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক) [৩৫]

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু যে হাদীসটি বর্ণনা করেন তার ভাষাও অনুরূপ। সেখানে উদ্ধৃত আছে যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো মুসলমান যদি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং কেউ যদি প্লেগ রোগে মারা যায় তারা শহীদ।" (সহীহ আল-বুখারী) [৩৬]

আর যারা শহীদি মৃত্যু লাভ করেন তারা কবরে কঠিন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবেননা। তাই রোগ বা রোগীকে ঘৃণা করা উচিত নয়। আর রোগীকে দেখতে যাওয়া, তিনি যা খেতে চান বা খেতে পারেন, সম্ভব হলে তা নিয়ে যাওয়া আরো উত্তম ও নেকির কাজ। কারণ তাকে শুশ্রূষা করলে আল্লাহ্‌কে সেবা করা হয়। তাছাড়া রোগীও আল্লাহ্‌র নিকট দু'য়া করবে আপনার কল্যাণের জন্য। তার দু'য়া ফেরেশতাদের দু'য়ার সমতুল্য। তবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে যারা শহীদ হয় তারা আর যারা উপর্যুক্ত কোনো কারণে মারা যায়, তাদের উভয়ের মর্যাদা ও বিধান সর্বদিক দিয়ে এক নয়। যেমন, কুরআনে কারীমে জিহাদের শহীদদেরকে জীবিত বলার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং মৃত বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত জিহাদের শহীদদের গোসল দিতে হয়না, পক্ষান্তরে অন্য শহীদদের গোসল দিতে হয় ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৩ : রোগীর বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে জানলাম। এবার বলুন, রোগীর জন্য আমরা কী করতে পারি? অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য সুস্থদের করণীয় কি?

উত্তর : রোগীর জন্য সুস্থদের করণীয় হচ্ছে, তাকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাওয়া এবং ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র, পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী ঔষধপত্র ও পথ্যাদি সরবরাহ করা। নিয়মিতভাবে তার কুশলাদির খবর রাখা এবং তিনি যে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করবেন, এ বিষয়ে তাকে আশ্বস্ত করা ও তার মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। সর্বোপরি আল্লাহ্‌র কাছে কায়মনোবাক্যে তার রোগমুক্তির জন্য দু'য়া করা। আমাদের দেশ তথা মুসলিম বিশ্বে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, সকল রোগীই তার রোগমুক্তির জন্য সুস্থদের দু'য়া কামনা করে থাকে। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রীগণ যখন চিকিৎসার জন্য বিদেশ যান তখন তারা দেশবাসীর দু'য়া কামনা করেন। সত্যিই এটা সুন্দর নিয়ম। তাই আমরা যখন কোনো রোগী দেখতে যাবো, তখন তার রোগমুক্তির দু'য়া করবো। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি রীতি ছিলো, যখনই তিনি পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন তখন তার জন্য এভাবে দু'য়া করতেন, "আল্লাহুম্মা রব্বান নাস, আযহিবিল্ বা'সা ইশফি ওয়া আনতাশ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফায়ুকা শিফাআন লা য়ুগাদিরু সাকামা।"

"হে আল্লাহ্! আপনি অসুস্থতা দূর করে দিন। আরোগ্য দান করুন। আর মানব জাতির প্রতিপালক! আপনিই আরোগ্যদানকারী। আপনার নিরাময় ছাড়া আর কোনো নিরাময় নেই। আপনি এমন নিরাময় দান করুন যাতে অসুস্থতার কোনো চিহ্ন না থাকে।" **(সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)** [৩৭]

জামে আত-তিরমিযী শরীফে যে হাদীসটি উদ্ধৃত আছে তা বর্ণনা করেছেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু [৩৮]। উভয় হাদীসের ভাষা একই।

রোগীকে দেখতে যাওয়া ও তার অবস্থার খোঁজ-খবর নেয়া নেকীর কাজ। এটা সুন্নাত। রোগীকে দেখতে গিয়ে তার অবস্থা জেনে, "তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করবেন, বা শীঘ্রই সুস্থ হবেন বলে ডাক্তার জানিয়েছেন" ইত্যাদি আশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বলতে হবে। এতে রোগীর মনে সুস্থ হবার আশা জাগবে। ফলে সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। আর এ ধরনের আশাব্যাঞ্জক কথাবার্তা বলাও সুন্নাহ। এ বিষয়ে আরো আলোচনা পরে করবো, ইনশাআল্লাহ্।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো ব্যাধিগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে বলে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জিনি তোমাকে এ ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছেন, তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তাঁর বহু সংখ্যক সৃষ্টির ওপর আমাকে মর্যাদা দান করেছেন, সে কখনো উক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হবেনা (অর্থাৎ সে তার জীবনকাল পর্যন্ত উক্ত ব্যাধি/বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে)।" **(আত-তিরমিযী)** [৩৯]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের ভাষাও একই। (আত-তিরমিযী) [৪০]

আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, "কেউ যখন কোন বিপদগ্রস্ত লোক দেখবে তখন সে মনে মনে তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তবে বিপদগ্রস্ত লোকটি যেনো তা শুনতে না পায়।" **(আত-তিরমিযী)** [৪১]

প্রশ্ন-১৪ : দূরারোগ্য ব্যাধি বলে কোনো ব্যাধি আছে কী? বিষয়টি সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করুন। চিকিৎসা গ্রহণ করা কি তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী?

উত্তর : **দূরারোগ্য ব্যাধি বলতে কোনো ব্যাধি নেই। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,** "সকল রোগেরই ওষুধ রয়েছে। সুতরাং যখন রোগ অনুযায়ী সঠিক ওষুধ দেয়া হয় তখন রোগ আল্লাহ্র ইচ্ছায় ভালো হয়ে যায় (আল্লাহর রহমতে রোগ নিরাময় হয়)।" **(সহীহ মুসলিম)** [৪২]

অপরদিকে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা এমন কোনো রোগ বা ব্যাধি সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক তিনি পাঠাননি কিংবা ওষুধ সৃষ্টি করেননি।" **(সহীহ আল-বুখারী)** [৪৩]

চিকিৎসা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয় বরং এটি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। আমি একটি হাদীস আলোচনা করে এ প্রশ্নের উত্তর দেবো। এ হাদীসটি এর আগের পর্বেও আলোচনা করেছি। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় জনৈক ব্যক্তি আঘাত পেলে ক্ষতস্থানে তাঁর রক্ত জমাটবদ্ধ হয়ে যায়। উপস্থিতদের একজন বনী আনবার গোত্রের দুই ব্যক্তিকে ডেকে আনলে উভয়েই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখেন। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমাদের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কে ভালো জানে?" এ কথা শুনে উভয়েই বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! চিকিৎসাতেও কি কল্যাণ আছে?" বর্ণনাকারী যায়িদ ইবনে আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ধারণা করেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "যিনি রোগ দিয়েছেন চিকিৎসাও তিনি দিয়েছেন।" **(যাদুল মা'আদ ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক)** [৪৪]

স্বয়ং রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকেও চিকিৎসা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শিঙ্গা প্রদানকারীর শিঙ্গার বিনিময় উপার্জন হালাল কি না জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙ্গা গ্রহণ করেছেন। "আবূ তায়বাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দুই সা' (৬ কেজি ৩৬৮ গ্রাম সমপরিমাণ) খাদ্যদ্রব্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার মালিক পক্ষের সাথে তার ট্যাক্স কমানোর জন্য কথা বলেছেন। ফলে তারা তার দৈনন্দিন প্রদেয় ট্যাক্সের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছিলো। তিনি আরও বলেছেন, যা কিছু দ্বারা তোমরা চিকিৎসা করো তার মধ্যে উত্তম হলো শিঙ্গা লাগানো।" **(সহীহ মুসলিম)** [৪৫]

হযরত সা'দ ইবনে আবি রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমার শুশ্রূষার জন্য এসে আমার বুকের ওপর হাত রাখেন। আমি অন্তরে এর শীতলতা অনুভব করি। অতঃপর তিনি বলেন তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছো। কাজেই তুমি সাকীফ গোত্রের অধিবাসী হারিস ইবনে কালাদার কাছে যাও। সে একজন চিকিৎসক। সে যেন মদিনার পাঁচটি আজওয়া খেজুর আঁটি বের করে তৎদ্বারা সে ব্যথার স্থানকে ঘষে নেয়।" **(আবূ দাউদ ও মাজমাউয্ যাওয়াইদ)** [৪৬]

এ হাদীসসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি :

১. রোগ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে; তাই এর নিন্দা করা উচিত নয়। রোগ আমাদের ঈমানের পরীক্ষা। ঈমানের যাচাই-বাছাই পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্যও অনেক সময় মু'মিন বান্দা রোগাক্রান্ত হয়।

২. কোনো রোগই দুরারোগ্য নয়, একমাত্র মৃত্যুব্যাধি ব্যতীত। শিফাদানকারী মহান আল্লাহ্ প্রতিটি রোগের সঙ্গে তার প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন। তাই কোনো অবস্থাতেই চিকিৎসা ও ওষুধ বর্জন করা উচিত নয়।

৩. প্রতিটি রোগের ওষুধ নির্দিষ্ট। তাই কোনো ওষুধে কাজ না হতে থাকলে মনে করতে হবে যে রোগের সঠিক ওষুধ ব্যবহার হচ্ছেনা। তখন একচ্ছত্র শিফাদানকারী আল্লাহ্র নিকট সঠিক ওষুধের জন্য সাহায্য চাইতে হবে এবং শিফার জন্য দু'য়া করতে হবে।

৪. ইসলামে চিকিৎসা শুধু বৈধই নয় বরং তা গ্রহণ করাও কাম্য। এমনকি মৃত্যুর আশংকা দেখা গেলে এবং চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য সুনিশ্চিত না হলেও চিকিৎসা ত্যাগ করা হারাম।

৫. চিকিৎসা গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। বরং চিকিৎসার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা না করানো তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি। তবে যার চিকিৎসা সামর্থ্য নেই তার বিষয়টি আলাদা। সে চিকিৎসা ছাড়া আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে পারে। তবে চিকিৎসা না করে ধৈর্য ধারণ করা তওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর।

প্রশ্ন-১৬ : অসুস্থ হলে নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা কি সুন্নাত? হাদীসের মাধ্যমে আলোচনা করুন যে এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : আমি একটি হাদীস আলোচনা করে এ প্রশ্নের উত্তর দিবো। এ হাদীসটি এর আগের পর্বেও আলোচনা করেছি। হযরত যায়িদ ইবনে আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ''রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় জনৈক ব্যক্তি আঘাত পেলে ক্ষতস্থানে তাঁর রক্ত জমাটবদ্ধ হয়ে যায়। উপস্থিতদের একজন বনী আনবার গোত্রের দুই ব্যক্তিকে ডেকে আনলে উভয়েই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখেন। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমাদের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কে ভালো জানে?" এ কথা শুনে উভয়েই বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! চিকিৎসাতেও কি কল্যাণ আছে?" বর্ণনাকারী যায়িদ ইবনে আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ধারণা করেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "যিনি রোগ দিয়েছেন চিকিৎসাও তিনি দিয়েছেন।" (যাদুল মা'আদ ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক) [৪৭]

এ হাদীসটি আমি পূর্বেও আলোচনা করেছি। এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ হলে নিজেও চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকেও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তাই স্বাভাবিক পর্যায়ের অসুস্থতার জন্য চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করা সুন্নাত। তবে নিজের চিকিৎসা নিজে করাকে তিনি পছন্দ করতেননা। তিনি ওষুধপত্র ব্যবহারের জন্য সুস্পষ্টভাবে উপদেশ দিয়েছেন।

রোগমুক্তি ওষুধের নিজস্ব গুণাগুণ বা ক্ষমতা নয়; বরং আল্লাহ্ তা'য়ালাই এতে রোগমুক্তির বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দেয়াতে রোগমুক্তি হয়। ওষুধ রোগমুক্তির কারণ বা অসীলা তখনই হয় যখন আল্লাহ্ তা ইচ্ছা করেন। তিনি যদি ইচ্ছা না করেন তাহলে কোনো ওষুধই কার্যকরী হয়না। কারণ চিকিৎসা খোদায়ী

বিধানের অন্তর্ভুক্ত। দিনের পর দিন third generation antibiotics সেবন করলেও রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হয়না এবং চিকিৎসকও সঠিক ওষুধ নির্বাচনে ব্যর্থ হন। জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেন, **যখন মানুষের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন অভিজ্ঞ ডাক্তার পর্যন্ত বোকা বনে যায়।**

যাদের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তারা বড় বড় হাসপাতালে বড় বড় ডাক্তারের চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করে। এমনকি ডাক্তার নিজেও তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ে মরে যায়। কেউ কখনো মৃত্যুর সময় জানতে পারেনি, ঘনিয়ে আসা মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারেনি, কার মৃত্যু কিসের মাধ্যমে, কখন এবং কোথায় সংঘটিত হবে তাও কেউ জানেনা। যে মহান ডাক্তার সারাটি জীবন রোগাক্রান্ত মরণোন্মুখ লোকদের সেবা করে তাদের সুস্থ করে তুলেছেন, সেই ডাক্তারও নিরুপায় হয়ে যান, যখন তার নিজের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। এই তো নিয়ম। আর এ বিষয়টির দিকেই আল্লাহ্ পাক ইঙ্গিত দিয়েছেন সূরা ওয়াকিয়াহর ৮৩-৮৫ নম্বর আয়াতসমূহে। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿فَلَوْ لَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۝ وَ اَنْتُمْ حِيْنَىِٕذٍ تَنْظُرُوْنَ ۝ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ﴾

"ফালাওলা ইযা বালাগাতিল হুল্কুম। ওয়া আনতুম হীনায়িযিন তানজুরূন। ওয়া নাহ্নু আক্রবু ইলাইহি মিনকুম অলাকিল্লা তুবছিরূন।"

"অধিকন্তু কেনো নয়- মৃত্যুপথযাত্রীর প্রাণ যখন কণ্ঠনালীতে উপনীত হয় এবং তোমরা যখন তাকিয়ে দেখতে থাকো (যে সে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, সে সময় তোমরা বিদায়ী প্রাণবায়ুকে ফিরিয়ে আনো না কেন?) সে সময় আমি তোমাদের চেয়ে তার অধিকতর নিকটে থাকি। কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা।" (ওয়াকিয়াহ ৫৬:৮৩-৮৫)

আমাদের মধ্যে অনেক ধনী ব্যক্তি আছেন যারা সুচিকিৎসার জন্য বিদেশ যান। সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক ইত্যাদি দেশে ছুটে যান। এটা ভালো কথা। টাকা-পয়সা থাকলে ভালো চিকিৎসা অবশ্যই করাবেন। তবে উন্নত বিশ্বের নামকরা হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করলেই যে আপনি ভালো হয়ে যাবেন, তার নিশ্চয়তা কোথায়? সিঙ্গাপুর, মাদ্রাজ ও আমেরিকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন লোকেরা কি অসুস্থতায় মারা যায়না? আমাদের দেশ থেকে যারা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিদেশে যান, তাদের সবাই কি সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন? তাই আপনাকে প্রত্যয় রাখতেই হবে যে একমাত্র আল্লাহ্ই উত্তম শিফাদানকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা শিফাদান করেন, এতে কারো হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই।

প্রশ্ন-১৭ : চিকিৎসা গ্রহণ না করে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করলে কি গুনাহ হবে?

উত্তর : একটু আগেই বলেছি যে, চিকিৎসা খোদায়ী বিধান। আর চিকিৎসা গ্রহণ করে আরোগ্য লাভ করা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। তাই ধরে নেয়া যায় যে চিকিৎসা গ্রহণ না করা সুন্নতের খেলাফ। তবে যেকোনো ধরনের চিকিৎসা করা যেতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বাস্থ্যের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, Health is defined as the physical, mental, social

and spiritual welbeing and not merely the absence of disease or infirmity. তাই সকল ধরনের রোগের চিকিৎসার ইঙ্গিত এ সংজ্ঞার মাঝে রয়েছে। তবে যদি কেউ physical medicine গ্রহণ না করেন তাহলে তিনি দু'য়ার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন, যাকে আমরা ইংরেজিতে বলে থাকি spiritual medicine বা রূহানি ওষুধ। মুঘল সম্রাট বাবর দু'য়ার মাধ্যমে তার ছেলে হুমায়ুনের রোগ নিরাময় করিয়েছিলেন। দু'য়ার মাধ্যমে রোগ থেকে আরোগ্যলাভের অসংখ্য উদাহরণ আমাদের সমাজে রয়েছে। কারণ যেহেতু রোগ আল্লাহ্ থেকে আসে, তাই আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে যাকে ইচ্ছা তাকে এবং যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আরোগ্য দান করতে পারেন। পরিপূর্ণ আরোগ্য দানকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা। He is the Healer, and doctors and medicines are the means of healing. তাই চিকিৎসা গ্রহণ না করে রোগের নিরাময় ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে মাজাহ শরীফের একটি হাদীস লক্ষ্য করুন : "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অহী নাযিলের পর যখন মাথাব্যথা দেখা দিতো তখন তিনি মেহেদির প্রলেপ লাগাতেন।" (মুসনাদে আল বায্যার) [৪৮]

প্রশ্ন-১৮ : দুরারোগ্য ব্যাধি বলতে কোনো ব্যাধি আছে কি? এ বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো বাণী থাকলে আলোচনা করুন।

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর একটি হাদীস থেকে দেবার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্। হযরত উসামা ইবনে শারিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হযরত যিয়াদ ইবনে আলাকা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন কয়েকজন বেদুঈন আসে এবং নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করে, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা চিকিৎসা গ্রহণ না করলে কি আমাদের গুনাহ হবে?" নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা একটিমাত্র ব্যাধি ব্যতীত আর কোনো ব্যাধি সৃষ্টি করেননি যা দূরারোগ্য।" তারা জিজ্ঞেসা করলো, "হে আল্লাহ্র রসূল! সেটি কোন্ ব্যাধি?" তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সেটি হলো বার্ধক্য বা old age." [৪৯]

হাদীসটি সুনানে আবূ দাঊদ, আত-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসতাদরাক হাদীস গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে। এ হাদীস থেকে আমরা তিনটি বিষয় জানতে পারি :

এক. বার্ধক্য ব্যতীত সকল রোগের চিকিৎসা রয়েছে। কোনো রোগের ক্ষেত্রেই নিরাশ হওয়া যাবেনা! তবে শর্ত হলো সঠিকভাবে রোগ নিরূপণ করা চাই।

দুই. ওষুধপত্রের ব্যবহার ও চিকিৎসা গ্রহণ নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। আর তা বর্জন সুন্নাতের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। Seeking cure is a part of the divine system. Ignoring medical care is not a Prophetic culture.

তিন. বৃদ্ধাবস্থায় যৌবন প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখা ও তা লাভে পেরেশান হওয়া নিরর্থক। এটি এমন জিনিস নয় যে তা চাইলেই পাওয়া যাবে। তাই প্রশান্ত মনে বার্ধক্য গ্রহণ করে নেয়ার মানসিকতা সকলেরই থাকা উচিত।

আজকাল anti-aging drug আবিষ্কৃত হচ্ছে। আমার অভিমত হলো, এসব ওষুধ বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করতে পারে না। এসব আপাতত বার্ধক্যে উপনীত হবার প্রকাশ পদ্ধতিকে ধীর গতিসম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু এটা বার্ধক্য উপনীত হওয়া কিছুতেই দূর করতে পারেনা। ওষুধ শুধুমাত্র aging process গুলোর উপসর্গকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কেউ ইচ্ছে করলে তার সাদা চুল কালো করতে পারে। কিন্তু যৌবন অবস্থায় তার যে শক্তি-সাহস ও উদ্দ্যম ছিলো তা ফিরে পেতে পারে না। "These anti-aging drugs can't stop aging. It may delay or retard the aging process apparently, but it cannot eliminate aging. Medicine can only slow down the symptoms of aging. One can turn his grey colour black through dyeing, but he cannot recover the strength he had while he was young".

মেডিসিনের কাজ হচ্ছে যতোদিন আপনি বেঁচে থাকবেন ততোদিন যেনো আপনি সুস্থ অবস্থায় থাকেন এবং সুস্থ অবস্থায় থেকেই মৃত্যুবরণ করতে পারেন। তবে মেডিসিনের মাধ্যমে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব।

প্রশ্ন-১৯ : রোগ, ওষুধ, ভাগ্য এই বিষয়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী? ওষুধ কি খোদায়ী বিধান হতে পারে?

উত্তর : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাকদীরের মোকাবেলায় ওষুধ কি কোনো কাজে আসতে পারে?" এ প্রশ্নের জবাবে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ওষুধপত্র খোদায়ী তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে চিকিৎসায় উপকার হয়" (আল মু'জামুল কাবীর ও জামে সগীর) [৫০]

হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে যয়ীফ কিন্তু অর্থগত দিক থেকে হাসান।

ঠিক একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ খিযামা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পিতার সূত্রে। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, আমরা যে ঝাড়-ফুঁক করাই বা ওষুধ প্রয়োগে চিকিৎসা গ্রহণ করি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করি, এগুলো কি আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীরের কিছু রদ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন? তিনি উত্তরে বলেন, তোমাদের এসব চেষ্টা-তদবীরও আল্লাহ্ নির্ধারিত তাকদীরের অন্তর্গত।" (আত-তিরমিযী) [৫১]

সম্মানিত পাঠক-শ্রোতা-পাঠক! প্রশ্নটি সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ জবাবটি কতো সুনির্দিষ্ট। আমরা তাকদীরের অর্থকে ভুল বুঝে থাকি। বাস্তবিকপক্ষে রোগ যদি খোদায়ী বিধান হয়ে থাকে, তবে চিকিৎসাও খোদায়ী বিধান। আর যদি রোগের মাধ্যমে কষ্টভোগ ভাগ্যের লিখন হয়ে থাকে, তাহলে রোগ নিরাময়ও ভাগ্যের লিখনের অংশবিশেষ। সুতরাং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কোনো অবস্থাতেই নিরাশ হওয়া যাবেনা। যেহেতু কোনো ব্যক্তিরই তাকদীরের ইল্‌ম বা জ্ঞান নেই, তাই আমাদের ভালো হওয়া বা ভালো থাকার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন-২০ : মানুষ অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থতা লাভ করা কি ঐচ্ছিক কোনো বিষয়, নাকি আল্লাহ্র হুকুম বা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত? অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণ না করা কি পাপ?

উত্তর : হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস দিয়েই এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আল্লাহ্র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "প্রত্যেক রোগের ওষুধ রয়েছে। সুতরাং রোগ অনুযায়ী যখন ওষুধ গ্রহণ করা হয় তখন আলাহ্র হুকুমে রোগী আরোগ্য লাভ করে।" (সহীহ মুসলিম ও যাদুল মা'আদ) [৫২]

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে কোনো রোগই দুরারোগ্য নয়। প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ রয়েছে। আর চিকিৎসা হচ্ছে আল্লাহ্র হুকুম এবং রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত্। তাই অসুস্থ হলে আপনাকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো সঠিক রোগ নিরূপণ। অনেক ডাক্তার সঠিক রোগ নির্ণয়ে ব্যর্থ হন। ফলে তারা যে ব্যবস্থাপত্র দেন তা অন্য ধরনের হয়, সঠিক ব্যবস্থাপত্র হয়না। ফলে রোগী কষ্ট পায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগীও সঠিকভাবে তার রোগের বর্ণনা দিতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ রোগী তার রোগের সঠিক বর্ণনা দিতে ব্যর্থ হয় অথবা তার ব্যথার স্থানটি চিহ্নিত করতে অক্ষম হয়, কোনো কোনো সময় ব্যথা অনুভূত হয় বা কতোক্ষণ থাকে তা সঠিকভাবে বলতে না পারা ইত্যাদি। ফলে চিকিৎসক সঠিক চিকিৎসা দিতে ব্যর্থ হন।

এখানে আমি আরো একটি বিষয় আলোচনায় আনবো যা উপর্যুক্ত অভিমতের বিপরীত। বর্তমান সময়েও পৃথিবীর অনেক দেশে মানুষ অসুস্থ হলে তার নিরাময়ের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে প্রাকৃতিক নিরাময় বিধানের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। অনেক গোষ্ঠী আছে যারা শিশুদেরকে হাসপাতালে পাঠাতে চায় না। তারা পশুপাখি ও বন্য জীবজন্তুর মতো প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই রোগ থেকে আরোগ্যলাভে বিশ্বাসী। এটা একটি বস্তুবাদী বিশ্বাস। আমেরিকায় কয়েকটি খ্রিস্টান গোষ্ঠী আছে, যারা এ concept-এ বিশ্বাসী। কিন্তু ইসলাম তা সমর্থন করেনা। ইসলামে অসুস্থতায় চিকিৎসা গ্রহণ করা সুন্নাহ। এটি খোদায়ী বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি তাওহীদী বিশ্বাসে তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তরে থেকে চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে ইসলামে তারও সুযোগ রয়েছে।

প্রশ্ন-২১ : এবার অসুস্থ ব্যক্তির ইবাদত নিয়ে আলোচনা করুন। আমরা জানি, অসুস্থ ব্যক্তি রোগের তীব্রতার কারণে ইবাদতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ঠিকমত সম্পন্ন করতে পারেননা। যেমন উযূ করতে না পারা, দাঁড়িয়ে থাকতে না পারা, তীব্র ব্যথা-যন্ত্রণায় ছটফট করা ইত্যাদি কারণে ইবাদতের অনেক অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বাদ পড়ে যায়। ফলে স্বভাবতই সে অনেক নেকি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এসব বিষয়ে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুনির্দিষ্ট বাণী আছে কী?

উত্তর : আপনি ঠিকই বলেছেন। রোগের কারণে মানুষের বাহ্যিক অনেক সমস্যা দেখা দেয়। তাই স্বাভাবিকভাবে রোগী অনেক ইবাদত করা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ্ তাই তার প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে বলে দিয়েছেন যা আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ্র কোনো বান্দা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা ভ্রমণরত অবস্থায় থাকে, তখন তার আমলনামায় সেই পরিমাণ নেকিই লেখা হয়, যে পরিমাণ আমল সে সুস্থ থাকাকালে করতো।" (সহীহ আল বুখারী ও আবূ দাঊদ) [৫৩]

সত্যি! আল্লাহ্ যে অত্যন্ত মহান ও দয়াময়, এ হাদীস তারই দিকে ইঙ্গিত করে। এই হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, যদি অসুস্থতায় অক্ষমতার কারণে কোনো নেক আমল বাদ যায়, তবে তার সওয়াব সে যথারীতি পেয়েই যাবে। আর রোগের সওয়াব ও অন্যান্য পাপমুক্তির সুযোগ তো আলাদাভাবে সে পাবেই। আলহামদু লিল্লাহ্। তবে সুস্থ হলে ছুটে যাওয়া ফরয-ওয়াজিব আমলের কাযা আদায় করতে হবে। যেহেতু হাদীসে নফল আমলই উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে, ফরয-ওয়াজিব আমল কোনো অবস্থাতেই ছেড়ে দেয়ার সুযোগ নেই। হ্যাঁ, যদি রোগের ধরন এমন হয় যার ফলে ধাবাবাহিকভাবে ছয় ওয়াক্ত পরিমাণ সময় অজ্ঞান থাকে কিংবা জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি ও বিচার করার শক্তি না থাকে, সে অবস্থায় নামায-রোযার কাযা করতে হবেনা।

অসুস্থ ব্যক্তি নিজেই নিজের জন্য দু'য়া করবেন, এটাই উত্তম। তিনি নিজের অসুস্থতার নিরাময়ের জন্য এভাবে দু'য়া করতে পারেন, "হে আল্লাহ্! অসুস্থতার নিয়ামতকে সুস্থতার নিয়ামত দ্বারা বদলে দিন।" এ ধরনের দু'য়া আমাদের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ করে থাকেন।

আমাদের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ অসুস্থতা ও সুস্থতা উভয়কেই নিয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। অসুস্থতায় কাতর হয়ে কারো আবোল-তাবোল কথাবার্তা বলা বা অসুস্থতার জন্য কারো প্রতি অভিযোগ করা মোটেও ঠিক নয়। আমাদের মধ্যেও কিছু কিছু লোক আছে. যারা বিভিন্ন সময় আল্লাহ্র প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আর বলে থাকে যে আল্লাহ্ আর কাউকে পেলোনা, আমাকে এতো কষ্টে ফেললো? এসব কথাবার্তা মোটেই কাম্য নয়। এটি সত্য যে অসুস্থতা মানুষকে দুঃখ-কষ্টে ফেলে থাকে। তবে তাই বলে ধৈর্যধারণ না করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা কিছুতেই কাম্য নয়। কারণ সুস্থতা লাভ করার জন্য ডাক্তারের নিকট যাওয়া ও তার ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করা এবং চিকিৎসা নেয়া সবই রোগী বা তার আত্মীয়দের ইখতিয়ারাধীন। কিন্তু সুস্থতা লাভ করা রোগীর ইখতিয়ারাধীন নয়। বড় জোর রোগী বলতে পারে, আমার কষ্ট-যন্ত্রণা ভয়ানক। আমি আর সহ্য করতে পারছিনা। হে আল্লাহ্! আমার কষ্ট দূর করে দিন। কারণ সেখানে আল্লাহ্র দু'জন ফেরেশ্তা সর্বদা নিয়োজিত থাকেন, যারা অসুস্থ ব্যক্তির কথাবার্তা আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে দেন। কাসেম ইবনে মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তে তীব্র মাথাব্যথার সময় বলেছিলেন, "ব্যথায় মাথা গেলো! হায় মাথা।" (সহীহ আল বুখারী) [৫৪]

এর বাইরে আর কিছু বলেননি। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি অভ্যাস ছিলো, যখন তিনি কোনো পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন অথবা কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে যদি তাঁর নিকট আনা হতো, তখন তিনি এভাবে দু'য়া করতেন, "হে আল্লাহ্! হে সকল মানুষের রব! তার কষ্ট দূর করে দিন। আপনি তাকে আরোগ্য দান করুন। আপনিই আরোগ্য দানকারী। আপনার নিরাময়ই আসল নিরাময়। আপনি এমন নিরাময় দান করুন, যার পর আর যেনো কোনো কষ্ট বা রোগ অবশিষ্ট না থাকে।" (সহীহ আল বুখারী) [৫৫]

প্রশ্ন-২২ : মুমূর্ষু রোগীর করণীয় কী হতে পারে? তিনি কী ধরনের দু'য়া করবেন?

উত্তর : মানুষসহ প্রত্যেক জীবিত প্রাণীকে অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। তাই যিন্দেগির এ

শেষ মুহূর্তটি সবার জন্যই বড় কঠিন পরীক্ষা। আমাদের প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরজগতের সফরের জন্য কিভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাই ভালো জানতেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর অন্তিম মুহূর্তে এ কথা বলতে শুনেছি, "আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াল হিক্বনী বির্ রফীক্বিল আ'লা।"

"হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার ওপর রহমত দান করুন, আর আমাকে (আমার) সর্বশ্রেষ্ঠ (উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন) বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দিন।" **(সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)** [৫৬]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরো বলেন, আমার নিকট পানি ভর্তি একটি পেয়ালা ছিলো। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত মুবারক পেয়ালার মধ্যে ডুবাচ্ছিলেন এবং স্বীয় মুখমণ্ডলের ওপর সে পানি লাগাচ্ছিলেন আর মুখে উচ্চারণ করছিলেন, "হে আল্লাহ্! আমাকে মৃত্যুর কঠোরতা থেকে (মৃত্যু কষ্ট ও মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘবে) সাহায্য করুন।" (আত-তিরমিযী) [৫৭]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে আরো জানা যায়, মুমূর্ষু ব্যক্তি অথবা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি এভাবে দু'য়া করতে পারেন, ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল 'আযীমুল 'আলীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়ারব্বুল 'আরশিল 'আযীম।"

"আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, যিনি মহান ও মহাজ্ঞানী। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, যিনি এই পৃথিবী ও আকাশসমূহের মালিক এবং মহা সিংহাসনের মালিক।" **(সহীহ আল বুখারী)** [৫৮]

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা-পাঠক! এ দুটো রিওয়ায়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে অন্তিম মুহূর্তে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা কি ছিলো। আর আমরা কী করি? অনেকেই মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট থেকে জমি লিখে নেয়ার জন্য জমির দলিল নিয়ে হাযির হই। আবার অনেকেই মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাই; সেও মাফ চায়। বস্তুত আমার আপনার মাফ করা না করাতে তেমন কী-ই বা আসে যায়। আল্লাহ্ যেনো তাকে মাফ করেন এটাই বড় কথা। তবে ঋণ থাকলে তার জন্য ঋণ প্রদানকারী ব্যক্তির নিকট মাফ চাওয়া উত্তম। কারণ ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তিকে ঋণদাতা ক্ষমা না করলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা নাও করতে পারেন কিংবা ক্ষমা করতেও পারেন। তবে সেটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন-২৩ : মুমূর্ষু ব্যক্তির আরো কোনো করণীয় আছে কী?

উত্তর : **আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশে বলেছেন,** "মুমূর্ষু ব্যক্তিদের শিক্ষা দাও, সে যেনো বলে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বূদ বা উপাস্য নেই।" **(সহীহ মুসলিম)** [৫৯]

কাজেই যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তির অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসবে, তাকে বার বার এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করা উচিত এবং মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট যারা অবস্থান করবে, তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যে "আমি এ কালেমা বলতে ভুলে গেলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে, যাতে তিনি পুনঃ পুনঃ সে কালেমা উচ্চারণ করতে পারি।" **হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম**

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যার এ জীবনের শেষ বাক্য এই হবে যে "আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সে নিশ্চয়ই বেহেশতে প্রবেশ করবে।" (আবূ দাঊদ, আত তিরমিযী ও মুসতাদরাক) ৬০

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মরণোম্মুখ ব্যক্তিদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তালকীন করো যাতে সে তা শুনে আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে।" (সহীহ মুসলিম) ৬১

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মুমূর্ষু ব্যক্তির ওপর সূরা ইয়াসিন পড়তে থাকো।" (আবূ দাঊদ) ৬২

প্রশ্ন-২৪ : অসুস্থ ব্যক্তি রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তা সহ্য করতে না পেরে কি মৃত্যু কামনা করতে পারে?

উত্তর: **হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,** "তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো কষ্টের কারণে মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা না করে।" (আবূ দাঊদ) ৬৩

এই সাহাবী পরে নিম্নের কতিপয় শব্দসমূহের মাধ্যমে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এভাবে বর্ণনা করেন, "তোমাদের কেউ কষ্টের কারণে মৃত্যুর জন্য দু'য়া করোনা, বরং একথা বলো, হে আল্লাহ্! যতোদিন আমার জীবিত থাকা কল্যাণকর হয় ততোদিন আমাকে জীবিত রাখুন এবং যখন আমার মৃত্যুবরণ করা উত্তম হবে তখন আমাকে মৃত্যু দিন।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ ও আত-তিরমিযী) ৬৪

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই স্পষ্ট ভাষায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আত্মহত্যাকে 'হারাম মৃত্যু' বলে ঘোষণা করেছেন। বস্তুত যারা দীর্ঘমেয়াদি অসুখে আক্রান্ত, রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করে, সুস্থতার কোনো লক্ষণ দেখতে পায়না, তারাই সাধারণত অধৈর্য হয়ে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে থাকে। পক্ষান্তরে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ওপর যারা দৃঢ় ঈমান রাখে, তাদের নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেবল অবিশ্বাসীরাই আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ﴾

"তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। কেবল কাফির সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কেউই নিরাশ হয়না।" (ইউসুফ ১২:৮৭)

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "দীর্ঘায়ু লাভ করার আকাঙ্ক্ষা দুটো কারণে হয়ে থাকে। যদি সে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে থাকে তাহলে তার দীর্ঘ জীবন তাকে আরো অধিক পরিমাণ সৎকর্ম করার সুযোগ এনে দিবে। দুই, আর সে যদি দুষ্কর্মশীল হয়ে থাকে তাহলে সে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুশোচনা করার সুযোগ পাবে।" (সহীহ আল বুখারী) ৬৫

প্রশ্ন-২৫ : আর্তমানবতার সেবা অর্থাৎ রোগীর সেবার ক্ষেত্রে ইসলামের মহান নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও নির্দেশনা কী ছিলো? এ বিষয়ে যেসব সহীহ হাদীস বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে, তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা! মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন গোটা পৃথিবীর সকল সৃষ্টজীবের প্রতি রহমতস্বরূপ। বিশেষ করে রোগীর প্রতি তাঁর আচার-আচরণ, মমত্ববোধ, ভালোবাসাও অফুরন্ত রহমতের অনন্য ধারায় সিঞ্চিত ছিলো। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য যে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন, তার প্রতিটি পরতে পরতে প্রবাহিত হয়েছে অনন্ত রহমতের ফল্গুধারা। তাই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য জীবনের পাশাপাশি আর্ত-মানবতার সেবার ক্ষেত্রেও তিনি অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন যা পৃথিবীতে নজিরবিহীন, অতুলনীয় ও অনুসরণীয়। মানব ইতিহাসে এমন ব্যক্তি বা নেতা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা যিনি আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে পুরোপরি বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজে রোগীর সেবায় নিঃস্বার্থভাবে অত্যন্ত দরদ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকেও রোগী-সেবার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বলেছেন। আর্ত-পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষার কাজ যে কতো মহৎ এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক বেশ কিছু বক্তব্য তিনি রেখেছেন। তিনি রোগী-সেবার অসংখ্য ফযীলতের কথাও বলেছেন এবং প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়েও তিনি বিশেষ নজর রাখতেন। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক্ব রয়েছে। (সেগুলো হলো) সালামের জবাব দেয়া, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবূল করা ও হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দেয়া অর্থাৎ হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।" (সহীহ আল বুখারী ও ইবনে মাজাহ্)[৬৬]

অন্যদিকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদীসে ছয়টি হক বা সদ্ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। শেষোক্ত হকটি হচ্ছে, "নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্যের জন্যও তাই পছন্দ করবে।" (আত তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্)[৬৭]

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা ক্ষুধার্তকে আহার করাও, রোগীর সেবা করো এবং বন্দিকে মুক্ত করো।" (সহীহ আল বুখারী)[৬৮]

হযরত বারা ইবনে 'আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাতটি বিষয়ে আদেশ করেছেন আর সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের রুগ্ন ব্যক্তির দেখাশুনা করা, জানাযার সাথে গমন করা, হাঁচিদাতার বক্তব্যের জবাব দেয়া, শপথ পূর্ণ করা বা কসমকারীর কসম পূর্ণ করা, অত্যাচারিত ব্যক্তিকে সাহায্য করা, দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল করা এবং সালাম কালামের প্রসার করার আদেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে সোনার আংটি ব্যবহার করা, রূপার পাত্রে পান করা, মায়সির (এক প্রকার রেশমী কাপড়) ও কাস্সী (রেশম মিশানো এক প্রকার মিসরী কাপড়) পরিধান করা এবং মিহি, মোটা ও কারুকার্যখচিত রেশমি কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)[৬৯]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পর রোগীকে দেখতে যেতেন।" (ইবনে মাজাহ) [৭০]

কেউ অসুস্থ হলে তার আপনজনদের সর্বপ্রথম কাজ হলো তাকে চিকিৎসকের নিকট নিয়ে যাওয়া। আর চিকিৎসকের প্রথম কর্তব্য হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জরুরী ভিত্তিতে ওষুধপত্র দিয়ে রোগ প্রশমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা, যাতে রোগী সংকটমুক্ত থাকে। এসময়ে চিকিৎসক বা নার্স ব্যতীত অন্য কারো উপস্থিতি সাধারণত কাম্য নয়। কারণ অসুস্থ ব্যক্তির নিকট চিকিৎসক বা সেবা শুশ্রূষাকারী ছাড়া আর কারো উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ নয়। সম্ববত এ কারণেই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পর রোগী দেখতে যেতেন যখন রোগীর অবস্থা উন্নতি ঘটে বা স্থিতিশীল থাকে এবং দর্শনকারীদের সাক্ষাৎ রোগীর জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়।

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম-অমুসলিম, ধনী-দরিদ্র, বন্ধু-শত্রু, আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সর্বশ্রেণীর আর্তের সেবায় আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর শত্রুর অসুস্থতাতেও তিনি তার শুশ্রূষা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। আর এজন্যই তিনি 'রহমাতুল্লিল আলামীন' খেতাবের সার্থকতায় উদ্ভাসিত হতে পেরেছেন তৎকালীন সমাজে।

প্রশ্ন-২৬ : রোগীর সেবায় কী কী ফযীলত বা পুণ্যের কথা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন? অনুগ্রহপূর্বক হাদীসসমূহ বর্ণনা করে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর : রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হাদীসে রোগী-সেবার ফযীলত বর্ণনা করেছেন। হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো মুসলিম তার কোনো রুগ্ন মুসলিম ভাইকে সেবা-শুশ্রূষা করতে গেলে সে ততোক্ষণ যেনো জান্নাতের ফলমূলের বাগানে অবস্থান করে।" (সহীহ মুসলিম ও আত-তিরমিযী) [৭১]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "কোনো মুসলিম যদি কোনো মুসলিম রোগীকে ভোরে দেখতে যায়, তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দু'য়া করতে থাকে। আর যদি সন্ধ্যার সময় কোনো মুসলিম রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে যায়, তবে তার জন্য ভোর পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা দু'য়া করতে থাকে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান নির্ধারিত করে দেয়া হবে।" (আত-তিরমিযী) [৭২]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি খুব ভালোভাবে উযূ করলো, অতঃপর সওয়াবের নিয়তে কোনো মুসলমান রোগী ভাইয়ের সেবা-শুশ্রূষা করলো, তার ও জাহান্নামের মধ্যে সত্তর বছরের দূরত্ব সৃষ্টি করে দেয়া হবে।" (আবূ দাঊদ) [৭৩]

এসব মূল্যবান হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে এক মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণের লক্ষ্যে তার অসুস্থতায়, সেবা-শুশ্রূষা করার চেয়ে আর কোনো বড় নেককাজ নেই। তাই আমরা সবাই নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস মেনে আর্তমানবতার সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখে দু'জাহানের কল্যাণ লাভে সমর্থ হবো, এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

প্রশ্ন-২৭ : রোগীর সেবায় আমাদের মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়েছেন এবং রোগীর সেবা-শুশ্রূষার যেসব ফযীলত বর্ণনা করেছেন তা জানলাম। এবার বলুন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রোগীর সেবা না করার জন্য কোনো অশুভ পরিণতি আছে কি? অর্থাৎ পারলৌকিক কোনো অকল্যাণ বা ফলাফল থাকলে তা আলোচনা করুন।

উত্তর : **বস্তুত রোগীর সেবা না করার পরিণতি যে শুভ নয়, তা আমরা নিম্নে বর্ণিত হাদীস থেকে জানতে পারি। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,** "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা (কোনো কোনো বান্দাকে) বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা করোনি। তখন বান্দা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তো সমগ্র জাহানের মালিক! আমি কি করে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করতে পারি? তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল? কিন্তু তুমি তার সেবা করোনি। যদি তুমি তার সেবা করতে, তাহলে তুমি আমারই সেবা-শুশ্রূষা করতে, অর্থাৎ আমাকেই পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খানা চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে তা দাওনি। তখন বান্দা বলবে, হে প্রতিপালক! আপনি সারা জাহানের মালিক। আমি কি করে আপনাকে খানা দিতে পারি? আল্লাহ পাক তখন বলবেন, তুমি কি জানতেনা যে আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খানা চেয়েছিলো? কিন্তু তুমি তাকে খানা দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে খানা দিতে তবে অবশ্যই তার নিকট আমাকে পেয়ে যেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানীয় চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে তা দাওনি। সে বলবে, হে প্রতিপালক! আপনি সমগ্র জগতের প্রভু। আমি কি করে আপনাকে পানীয় দিতে পারি? আল্লাহ পাক বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানীয় চেয়েছিলো; কিন্তু তুমি তাকে তা দাওনি। তুমি যদি তাকে তা দিতে তবে অবশ্যই তুমি তা আমার নিকট পেতে।" **(সহীহ মুসলিম)** [৭৪]

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা-পাঠক! এতোক্ষণ যে আলোচনা করলাম তার সারমর্ম হচ্ছে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগী-সেবার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি রোগী-সেবার অফুরন্ত ফযীলত বর্ণনা করেছেন এবং রোগীর সেবা না করার পারলৌকিক অকল্যাণের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন-২৮ : এবার রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগী-সেবা নিয়ে আলোচনা করুন। রোগীর মনকে আশ্বস্ত করার জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করতেন? রোগীর প্রতি সুস্থদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : **আধুনিক চিকিৎসার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো রোগীকে মানসিকভাবে স্থিতিশীল করা। আর এ কাজটি কীভাবে করতে হয় তাও ইসলামের মহান নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন। এ কাজটি হচ্ছে নানাবিধ কাজের সমষ্টি। রোগীর প্রতি আচরণ, রোগী দেখার বিশেষ পদ্ধতি, রোগীর কাছে অবস্থান, রোগীকে সান্ত্বনা দান ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।**

রোগীর সাথে বা তার সামনে তার রোগের জটিলতা বা মারাত্মক অবস্থার ব্যাপারে আলোচনা করলে তাতে

সে চিন্তান্বিত হবে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়বে। মানসিক বিপর্যস্ততার কারণে সে আরো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তাই কোনো রোগীর সামনে এসব বিষয়ে আলোচনা করা অনুচিত, বরং তাকে অভয় দেয়া উচিত। তার মনে সাহস জোগানো বাঞ্ছনীয়। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীকে অভয় ও সাহস দিতেন। তাঁর সামনে তার রোগকে সাধারণ, হালকা বা সহজেই আরোগ্য হবে বলে আলোচনা করতেন। তাঁর উম্মতকে তিনি এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে রোগীর সামনে ভালো কথা বলবে, তার দীর্ঘায়ুর জন্য আশ্বাস দেবে এবং তার মনে সাহস জোগাবে। এসব করা হলে রোগী মানসিকভাবে সুস্থ এবং চিন্তামুক্ত থাকবে।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তুমি যখন কোনো রুগ্ন ব্যক্তির কাছে তার সেবা করতে যাবে, তখন তার জীবনের ব্যাপারে শঙ্কামুক্ত করো। অর্থাৎ তার দীর্ঘ জীবন (হায়াত) সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করবে। এটা অবশ্য তাকদীরকে রদ করতে পারবেনা। তবে এতে রোগীর মন অবশ্যই খুশি হবে।" (আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [৭৫]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আল্লাইহি তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন, "রোগীকে তার জীবনের ব্যাপারে শঙ্কামুক্ত ও চিন্তামুক্ত করো' এ কথার মর্ম হলো, তোমরা তার দীর্ঘায়ুর জন্য দু'য়া করো, তাকে অভয় দাও, আনন্দিত করো। তাঁকে বলো, চিন্তা করবেননা। আপনার রোগ কোনো জটিল রোগ নয়। চিকিৎসায় এসব রোগ ভালো হয়। ইনশাআল্লাহ্! আপনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন।" এসব কথায় রোগী খুশি হবে। তার চিন্তা ও পেরেশানি দূর হবে। ফলে তার অসুস্থতা তার কাছে অতি সাধারণ ও হালকা মনে হবে। ফলে সে মানসিকভাবে সুস্থ থাকবে।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলো, তিনি যখন রোগী দেখতে যেতেন তখন তাকে বলতেন, "চিন্তার কোনো কারণ নেই, সবকিছু ভালো ও ঠিক আছে ইনশা আল্লাহ্। আপনি সমস্ত গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র হয়ে সুস্থ হয়ে উঠবেন।" (সহীহ আল বুখারী) [৭৬]

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যখন কোনো রুগ্ন ব্যক্তির নিকট যাবে, তখন তার সাথে ভালো ভালো কথা বলবে। কারণ তোমরা যাকিছু বলো ফেরেশতারা তা শুনে 'আমীন' বলে থাকে।" (সহীহ মুসলিম) [৭৭]

প্রশ্ন-২৯ : রোগী দেখার পদ্ধতি সম্পর্কে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো নির্দেশনা আছে কি? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে রোগীর সেবা করতেন?

উত্তর : **হযরত আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,** "রোগীকে শুশ্রূষা করার উত্তম নিয়ম হলো তুমি যখন রোগীর কপাল বা তার হাতে হাত রাখবে, তখন তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কেমন আছেন?" (আত-তিরমিযী) [৭৮]

অনুরূপ উপদেশ হযরত ইউনুস রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত এক রিওয়ায়াতে উল্লেখ আছে। তিনি বলেন, রোগী দেখার নিয়ম হলো, 'তুমি রোগীর শরীরে তোমার হাত রাখবে এবং জিজ্ঞেস করবে, আপনার সকালটা কেমন কাটল? আপনার সন্ধ্যা কেমন কাটল?' অর্থাৎ তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করা। 'আপনি সকালে কেমন ছিলেন, এখন বা আজ কেমন আছেন' ইত্যাদি। (আস-সুয়ূতী) [৭৯]

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো রোগীকে দেখতে গেলে বা তাঁর কাছে কোনো রোগীকে আনা হলে তিনি তার মাথায় ও আক্রান্ত স্থানে হাত বুলানো ছাড়াও তার সুস্থতা কামনা করে দু'য়া করতেন। কোনো কোনো সময় চিকিৎসাস্বরূপ উযূ করে উযূর অবশিষ্ট পানি অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে ছিঁটিয়ে দিতেন এবং তাকে পান করতে দিতেন। আর তিনি তাঁর উম্মতকে অসুস্থের সেবা করার জন্য এসব কাজের পাশাপাশি দু'য়া করতে উপদেশ দিয়েছেন। (সহীহ আল বুখারী) [৮০]

এ হাদীস দুটো থেকে জানা যায় যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশা করতেন যে, চিকিৎসকগণ এ ধরনের কথাবার্তার মাধ্যমে রোগীর প্রতি মমতা দেখাবেন এবং সমব্যথী হয়ে রোগীকে উৎফুল্ল রাখার চেষ্টা করবেন ও রোগ-ব্যাধি হালকা করার ব্যাপারে মনোযোগী হবেন। এছাড়াও চিকিৎসক বা দর্শনার্থীগণ সহমর্মিতার জন্য হাত বাড়াবেন। মাথায় ও হাতে হাত রাখার মাধ্যমে রোগীর শরীরের তাপমাত্রার খবর নিয়ে ডাক্তারকে অবহিত করতে পারেন এবং ডাক্তারকে রোগীর নিকট ডেকে আনতে পারেন। বস্তুত আমাদের দেশেও চিকিৎসকগণ বা দর্শনার্থীবৃন্দ রোগীর সাথে সাক্ষাতের সময় উপরোক্ত পদ্ধতিই দীর্ঘদিন যাবত অনুসরণ করে আসছেন। আর তা জেনে হোক আর না জেনে হোক, তারা নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতই অনুসরণ করে আসছেন। তাই আমি সম্মানিত চিকিৎসকগণকে ধন্যবাদ জানাই চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়েও নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করার জন্য। তবে রোগী দেখতে গিয়ে যাতে পর্দার বিধান লঙ্ঘন না হয় সেদিকে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তদ্রূপ শরীরে হাত দেয়ার ক্ষেত্রেও পুরুষ-মহিলার মাহরামের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। অন্যথায় সওয়াব অর্জনের পরিবর্তে গুনাহ অর্জনের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন-৩০ : রোগীর সেবা করার বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত জীবনের আরো কোনো ঘটনা আছে কী যা জেনে আমরা বুঝতে পারবো যে, তিনি কোন্ অবস্থায় আর কীভাবে সাহায্য সেবা প্রদান করতেন?

উত্তর : **হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করতেন। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,** "একবার আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পায়ে হেঁটে আমার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য আমার নিকট এলেন। তাঁরা আমাকে সংজ্ঞাহারা অবস্থায় পেলেন। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করলেন। তারপর তিনি উযূর অবশিষ্ট পানি আমার গায়ে ছিঁটিয়ে দিলেন। ফলে আমি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখলাম নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে উপস্থিত। আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের সম্পদের ব্যাপারে কী করবো? তখন তিনি আমাকে কোনো উত্তর দেননি। অবশেষে মী'রাসের আয়াত নাযিল হলো।" (সহীহ আল বুখারী) [৮১]

হযরত আয়েশা বিনতে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তার পিতা সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি মক্কায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সেবা-শুশ্রূষার জন্য আমার কাছে এলেন। তিনি তাঁর পবিত্র হাত আমার কপালের ওপর রাখেন। এরপর

তিনি দু'য়া করেন, "হে আল্লাহ! আপনি সা'দকে রোগমুক্ত করুন এবং তার হিজরত পূর্ণ করুন।" (সহীহ আল বুখারী ও আবূ দাউদ) [৮২]

হযরত যায়িদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমার চোখের পীড়ার জন্য (দু'চোখ উঠে বেদনা হলে) রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এসেছিলেন।" (আবূ দাউদ) [৮৩]

হযরত উসামা ইবনে যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী তনয়া হযরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে সংবাদ পাঠালেন, আমার শিশুকন্যার মৃত্যু আসন্ন। এ জন্য আপনি আমাদের এখানে একবার আসুন। উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু, সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট সালাম পাঠালেন এবং বলে দিলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালার মর্জি, তিনি যা চান নিয়ে নেন এবং যা চান দিয়ে যান। তাঁর কাছে সব কিছুরই একটা সুনির্দিষ্ট সময়সূচি আছে। সুতরাং সওয়াবের প্রত্যাশা ও সবর করা উচিত। এরপর আবারও তিনি কসম দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন লোক পাঠালেন। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠলেন, আমরাও উঠলাম এবং যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে গেলাম। (সেই মরণাপন্ন) শিশুটিকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে তুলে দেয়া হলো। তখন তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হচ্ছিল। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এলো। হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরয করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! এটা কী?" রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, "এটা রহমত। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে করেন তার অন্তরে এই দয়া, রহমত স্থাপন করেন।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৮৪]

প্রশ্ন-৩১ : রোগীকে দেখতে গিয়ে কতো সময় ব্যয় করা উচিত? এ বিষয়ে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো বাণী আছে কি?

উত্তর: **বস্তুত ইসলাম এমনই সুন্দর এক জীবন বিধান যে রোগী দেখতে গিয়ে কতো সময় তার নিকট সে ব্যয় করবে, এতে তারও নির্দেশনা রয়েছে। আর এজন্যই আমরা বলে থাকি, Islam is a complete way of life. অর্থাৎ 'ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান'। মানুষের চলার পথে যা যা প্রয়োজন তার সবকিছু এতে বলে দেয়া আছে। যা হোক, স্বল্প সময়ে রোগী দেখা সুন্নাত। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,** "সওয়াব ও প্রতিদানের দিক থেকে সর্বোত্তম শুশ্রূষা হলো রোগীর নিকট স্বল্পসময় অবস্থান করা এবং তাকে সান্ত্বনা প্রদান করা।" (শু'আবুল ঈমান) [৮৫]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "উত্তম রোগী সেবা হলো, দু'বার উটনী দোহনের মধ্যবর্তী বিরতি পরিমাণ সময় (তার কাছে বসা)।" (শু'আবুল ঈমান) [৮৬]

হাদীসের মর্মকথা হলো, উটনীকে একবার দুধ দোহনের পর কিছু সময় বিরতি দেয়া হয়, যেনো তার বাচ্চা দুধপান করতে পারে এবং তার স্তনে দুধ নামে। অতঃপর আবার দোহানো হয়। এই দু'বার দোহনের মধ্যবর্তী বিরতি অতি সামান্য। প্রায় দশ থেকে পনের মিনিট। সুতরাং হাদীসের শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে, উত্তম রোগী সেবা হলো রোগীর নিকট অল্প সময় বসা। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রাদিয়াল্লাহু আনহুও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সর্বোত্তম রোগীসেবা হলো খুব তাড়াতাড়ি তার কাছ থেকে উঠে যাওয়া।" (শু'আবুল ঈমান) [৮৭]

এ দু'টি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, রোগীর নিকট দর্শনার্থীরা অধিক সময় অবস্থান করলে রোগীর পরিজন ও চিকিৎসা কাজে সহায়ক ব্যক্তিবর্গ তথা ডাক্তার ও নার্সদের অসুবিধে হয়। তারা এ কাজ পছন্দ করেননা। অনেকে রোগীর সাথে ক্রিকেট খেলা দেখার বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। আবার অনেক দর্শনার্থী রোগীর সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকেন। এসব করা অনুচিত। কারণ নার্সগণ রোগীকে ওষুধ খাওয়াতে এসে এসব ভিড় দেখে বিরক্তিবোধ করেন। রোগী যেনো মনোনিবেশ সহকারে আল্লাহ্‌কে ডাকতে পারে তার সুযোগ করে দেয়া উচিত। এ ছাড়া দর্শনার্থীদের যারা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত, তারা ইতিমধ্যেই অসুস্থ ব্যক্তিটিকে আরো একটি রোগে আক্রান্ত করে ফেলতে পারে।

অপরদিকে দর্শনার্থীর অসাবধান কথাবার্তায় রোগী কোনো না কোনোভাবে মনে আঘাতও পেতে পারে এবং তা রোগীর মনোপীড়ার কারণ হতে পারে। ফলে তার রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তার কষ্ট দীর্ঘায়িত হতে পারে। রোগীর কাছে শোরগোল করলে তার কষ্ট হয়। তাছাড়া কোনো দর্শনার্থী যদি বেশি সময় ধরে রোগীর নিকট বসে থাকে, তাতেও সে বিরক্তিবোধ করে। এসব কারণেই রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীর কাছে শোরগোল করাকে অপছন্দ করতেন এবং নিস্প্রয়োজনে তার কাছে বেশি সময় বসতেও নিষেধ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রোগীর নিকট কম সময় বসা এবং শোরগোল কম করা সুন্নাত।"

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও কোনো কোনো সময় রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করতেন এবং অন্যদেরকেও রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করতে উৎসাহিত করেছেন। তবে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাড়-ফুঁক-এর কথাগুলো প্রচলিত ঝাড়-ফুঁকের মতো নয়। তিনি দু'য়ার মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করতেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নিয়ম ছিলো এই যে "কেউ তার দেহের কোনো অঙ্গে অসুস্থতাবোধ করলে কিংবা তাতে কোনো ফোঁড়া বা জখম হলে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আঙুল দিয়ে এভাবে করতেন। একথা বলে, এভাবে করার রূপ বোঝানোর নিমিত্তে হাদীস বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল মাটিতে রাখলেন, এরপর তা তুলে নিলেন এবং তখন এ দু'য়া পড়লেন, "বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদ্বিনা, বিরীকাতে বা'দিনা, য়ুশ্‌ফা সাকীমুনা বিইযনি রব্বিনা।"

"আল্লাহ্‌র নামে আমাদের এ যমীনের ধূলাবালি কারো মুখ নিঃসৃত লালার সাথে মিশিয়ে প্রতিপালকের নির্দেশে তা দিয়ে আমাদের রোগীর আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে মালিশ করছি।" (সহীহ মুসলিম) [৮৮]

প্রশ্ন-৩২ : মুহতারাম, এবার আলোচনা করুন রোগীর সেবা-শুশ্রূষার পাশাপাশি একজন মুসলমান তার ভাইয়ের জন্য আর কী করতে পারে? অর্থাৎ পথ্যাদি বা রোগীর খাবার বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো উপদেশমূলক বাণী আছে কি? দর্শনার্থীগণ কি রোগীর জন্য পথ্যাদি বা খাবার নিয়ে যেতে পারে?

উত্তর : **অসুস্থ ব্যক্তি যদি বিশেষ কোনো কিছু খেতে চায়, তাহলে শুশ্রূষাকারীদের উচিত সে খাবারের বা পথ্যের ব্যবস্থা করা এবং তাকে খাওয়ানো। যেমন মিষ্টি বা ফলমূল। এমনকি কেউ যদি পোলাও-কোর্মাও খেতে চায়, তাকে তা দেয়া উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করা। নতুবা না খেয়ে রোগী আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, তুমি কি কোনো কিছু খেতে চাও? যদি রোগী কোনো কিছু খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতো, তাহলে তার জন্য তিনি সে খাবারের ব্যবস্থা করতেন। আমাদেরও তাই করা উচিত। আমি একটি হাদীস এ প্রসঙ্গে আলোচনা করবো যার মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।**

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক রোগীকে দেখতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কিছু খেতে চাও?' রোগী উত্তর দিলো, যবের রুটি। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যার কাছে যবের রুটি আছে সে যেনো তার এই (মুসলমান) ভাইয়ের কাছে তা পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর বললেন, যদি তোমার কাছে রোগী কোনো কিছু খেতে চায়, তাহলে (তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেনো) তাকে তা আহার করায়।" **(ইবনে মাজাহ)** [৮৯]

তবে রোগীকে বলপূর্বক বা জোরাজুরি করে খাওয়ানো উচিত নয়। জোর করে খাওয়ালে রোগী অসুস্থবোধ করতে পারে। এতে রোগী বমি করে ফেলে দিতে পারে। তাছাড়া শক্তি প্রয়োগ করে রোগীকে খাওয়ানোর প্রয়োজন আছে কিনা তা আল্লাহই ভালো জানেন। হযরত উকবা ইবনে আমের আল জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের রোগীকে পানাহার করতে পীড়াপীড়ি করবেনা। কেননা আল্লাহ্ তাদের পানাহার করান।" **(ইবনে মাজাহ)** [৯০]

এ প্রসঙ্গে আমি আরো একটি হাদীস আলোচনায় আনবো। আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি তোমাদের কারো মতো নই। আমি আল্লাহ্র সান্নিধ্যে বাস করি। তিনি আমাদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করে থাকেন।" **(আত-তিরমিযী)** [৯১]

প্রশ্ন-৩৩ : অমুসলিম পীড়িত ব্যক্তির সেবার বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো বাণী আছে কি?

উত্তর : **আগেই বলেছি, অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ধর্মের লোকদের প্রতি একই আচরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমি অমুসলিম পীড়িত ব্যক্তির সেবার দু'টি ঘটনা আলোচনা করছি।**

১. **হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে**

উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানে আবূ জাহল, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই, উমায়্যা ইবনে মুগীরা প্রমুখকে দেখতে পেলেন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে চাচা! আপনি কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলুন। আল্লাহ্‌র নিকট আপনার জন্য এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবো। **(সহীহ আল বুখারী)** [৯২]

২. **হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহূদী ছেলে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করতো। ছেলেটি অসুস্থ হলো। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। এরপর বললেন,** "তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।" সে ইসলাম গ্রহণ করলো। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" **এরপর তিনি বের হয়ে আসেন। (সহীহ আল বুখারী ও আবূ দাউদ)** [৯৩]

৩. **হযরত ইবনুল মুসাইয়্যাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা থেকে জেনে বর্ণনা করেন,** "আবূ তালিব মৃত্যুমুখে পতিত হলে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে যান।" **(সহীহ আল বুখারী)** [৯৪]

আবূ মালিক আশজাঈ রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করতো তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামায শিক্ষা দিতেন। তারপর তিনি তাকে এ কালেমাসমূহ পাঠ করার নির্দেশ দিতেন, "হে মাবূদ! আমাকে মাফ করুন। আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমাকে হিদায়েত নসীব করুন। আমার রোগ আরোগ্য করুন। আর আমার রিযিক প্রসারিত করে দিন।" **(সহীহ মুসলিম)** [৯৫]

অধ্যায়-২

বিশ্বনবীর চিকিৎসা বিধান ও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য

প্রশ্ন-৩৪ : তিব্বুন নববী বলতে কি বুঝায়? প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে এর মৌলিক পার্থক্য কী?

উত্তর : 'তিব্ব' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ: ১. দেহ ও মনের চিকিৎসা, ২. নম্রতা ও সুকৌশল অবলম্বন, ৩. জাদু, ৪. অভ্যাস, ৫. কোনো বিষয়ে পাণ্ডিত্ব অর্জনে দক্ষতা। বর্তমানে এর দ্বারা ওষুধ, ওষুধ ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা পদ্ধতিকে বোঝানো হয়। পরিভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান (ইলমুত তিব্ব) ঐ শাস্ত্রকে বলা হয়, যা শিক্ষা করলে কোনো প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের সুস্থতা ও অসুস্থতার দিক দিয়ে শারীরিক অবস্থাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। (আল-কানূন ফিত তিব্ব, ইবনে সীনা, ১/৩, ১৩)

তিব্বুন নববী বা Prophetic Medicine বলতে আমরা রোগ, ওষুধ ও চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য, সুস্থতা, স্বাস্থ্যের হিফাযত ইত্যাদি সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও নির্দেশনাকে বুঝে থাকি। স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল বিধি-বিধান সম্পর্কে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমূল্য উপদেশাবলীও এর সাথে সম্পর্কিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলে চিকিৎসক তাঁর জন্য কী ব্যবস্থাপত্র দিতেন, কোনো সাহাবী অসুস্থ হলে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উপদেশ দিতেন এবং তিনি নিজে অসুস্থ হলে আরোগ্যলাভের জন্য কী করতেন কিংবা রসূলের উপস্থিতিতে কোনো চিকিৎসক কোনো সাহাবীকে যে ব্যবস্থাপত্র দিতেন, যাতে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপত্তি করেননি, এ সবই তিব্বুন নববীর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ডাক্তার বা চিকিৎসক হিসেবে ছিলোনা। তথাপিও বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, অসুস্থ ব্যক্তি তাঁর নিকট প্রায়ই আগমন করতো এবং তিনি তাদের আরোগ্যের জন্য ব্যবস্থাপত্র দিতেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাদের আরোগ্যলাভের জন্য দু'য়া করতেন। তাঁর এসব বাণীর উপর ভিত্তি করে তদানীন্তন আরব সমাজে তিব্বুন নববী নামে একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা বিজ্ঞানের আলোকে উত্তীর্ণ একটি যথার্থ যুক্তিসঙ্গত ও কার্যকরী ব্যবস্থা। অজ্ঞাত কারণে মুসলমান সমাজে এটা দীর্ঘদিন লুকায়িত ছিলো।

বিশ্বনবীর চিকিৎসা বিধান তথা তিব্বুন নববীর সাথে অন্যান্য আধুনিক ও সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য সাধারণ ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসকের সাথে অর্ধশিক্ষিত হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসার পার্থক্যের চেয়েও বেশি। বস্তুত তিব্বুন নববীর উৎসই হচ্ছে কিছু অহী বা প্রত্যাদেশ, কিছু ইলহামভিত্তিক অনুপ্রেরণা বা প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান। তবে এর সিংহভাগই সমাজে প্রচলিত পদ্ধতি এবং শ্রুত-অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উৎকর্ষতার ওপর নির্ভরশীল। আর সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে তার সবই অনুমান, অভিজ্ঞতা, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা গবেষণার ফলাফল।

Modern medicine is based on conjecture, suppositions and experimentations.

অপরদিকে তিব্বুন নববী এসবের উপর নির্ভরশীল নয়। Medicine of the Prophet (SAWS) are not based on speculations or results of laboratory investigations. They are based on niche of the Prophecy and perfection of human intellect.

প্রশ্ন-৩৫ : আচ্ছা মুহতারাম, আপনি প্রায়ই স্বাস্থ্য, রোগব্যাধি ও চিকিৎসা নিয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করে রোগ নিরাময়ের উপায় নিয়ে আলোচনা করে থাকেন, আর বলেন যে পবিত্র কুরআনই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট ওষুধ এবং নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমোদিত চিকিৎসা পদ্ধতিই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট। এ পর্যায়ে আমার প্রশ্ন, প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে তিব্বে নববী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা Prophetic medicine-এর তুলনামূলক আলোচনা করুন এবং বিষয়টি বিস্তারিত বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর : আমি Prophetic medicine তথা তিব্বুন নববীর একজন ছাত্র। Prophetic medicine কেন উত্তম তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যায়। আমার যুক্তি হচ্ছে, আর আমার যুক্তির সাথে আপনারা সবাই একমত হবেন যে,

১. The divine knowledge is the ever best knowledge, beyond shadow of any doubt. আসমানী প্রত্যাদেশ বা অহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাই সর্বোত্তম এবং সন্দেহের লেশমুক্ত জ্ঞান।

২. All Prophets (AS) are men of purity, piety, nobility and high morality. সকল নবী আলাইহিমুস সালাম পবিত্র, ধার্মিক, মহৎ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন।

৩. They were men of profound wisdom and knowledge. তাঁরা গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী।

৪. All Prophets (AS) possess the best minds and the best characters.
সকল নবী আলাইহিমুস সালামই সবচেয়ে উন্নত ও সর্বোত্তম চরিত্র ও মনের অধিকারী।

৫. They were sound in intellect and were mature. তাঁরা যুক্তি, বুদ্ধি ও মেধায় যার যার সময়ে ছিলেন অদ্বিতীয় ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

৬. They were the most learned and nearest to the Truth among the Creations. তাঁরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের ভেতর সবচেয়ে জ্ঞানী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও সত্যের ধারক-বাহক।

So, the practices practised by such people shall be the best practices, and therefore, the remedies prescribed by such people shall be the best remedies.

সুতরাং এঁরা যে অভ্যাস মেনে চলেন বা চলতে উপদেশ দেন, তা সর্বোত্তম এবং রোগ নিরাময়ের যেসব উপায়-উপকরণ বর্ণনা করেন, তা সর্বোৎকৃষ্ট।

অপরদিকে রোগ নিরাময়ে নবীগণের অনুসারী বা সাহাবীগণ যেসব উপায়-উপকরণ নির্ধারণ করেন ও ব্যবস্থাপত্র দেন, তাও নিঃসন্দেহে সাধারণ ডাক্তার বা চিকিৎসকের চেয়ে অনেক উত্তম ও কার্যকরী।

That is to say, the remedies prescribed by the Companions or followers of the Prophets (AS) are better and effective than the remedies of others, who are the ordinary physicians.

এবার চলুন Prophetic medicine and ordinary medicine-এর মৌলিক পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করি।

১. Prophetic medicine বা বিশ্বনবীর চিকিৎসা বিধানের ভিত্তি হচ্ছে কিছু আসমানী অহী বা প্রত্যাদেশ, কিছু শ্রুতি ও সামাজিক প্রথার অভিজ্ঞতা এবং তাওহীদ ও আখিরাতের চেতনা। That is, Divine inspiration। অপরদিকে সাধারণ চিকিৎসকের দেয়া ঔষধের ভিত্তি হচ্ছে বস্তুবাদী গবেষণা ও অনুমানপ্রসূত মতামত।

২. সাধারণ ডাক্তারের ওষুধ নির্ভর করে ধারণা, কল্পনা, অনুমান আর গবেষণার ফলাফলের ওপর। অপরদিকে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেডিসিন নির্ভর করে নুবূয়্যাতের বিশেষ মর্যাদা, বুদ্ধির পূর্ণতা ও জ্ঞানের উৎকর্ষতার ওপর।

৩. সাধারণ ডাক্তারের বক্তব্য বা ব্যবস্থাপত্র নির্ভর করে মেজাজ, সমসাময়িক স্থান-কাল ও প্রথাসমূহের উপর, অন্যদিকে নবী আলাইহিমুস সালামের মেডিসিন সকল কালের সকল এলাকার সকল লোকের স্বাস্থ্যের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

প্রশ্ন-৩৬ : রোগ, ওষুধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? অনুগ্রহপূর্বক কুরআন ও হাদীসের আলোকে বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর : রোগ, ওষুধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী তা আমরা হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ হাদীস থেকে জানতে পারি। আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ আছে। সুতরাং যখন রোগ অনুযায়ী ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে রোগী আরোগ্য লাভ করে থাকে।" (সহীহ মুসলিম) [৯৬]

"Every sickness or ailment has a cure. So when right medicines are given as per diagnosis, the disease gets healed by the will of Allah." (Sahih Muslim) [96]

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীসটি হচ্ছে, "আল্লাহ্ পাক এমন কোনো রোগ বা ব্যাধি সৃষ্টি করেননি, যার ওষুধ বা প্রতিষেধক তিনি পাঠাননি বা সৃষ্টি করেননি।" (সহীহ আল বুখারী)[৯৭]

"Allah (SWT) has not sent down a disease except that He has also sent down its cure." (Sahih Al Bukhari) [97]

তিব্বুন নববীর মূল কথা হচ্ছে, "মা আনযালাল্লাহু দা'আন ইল্লা আনযালা লাহু শিফা'য়া।" "Every sickness has a cure." চিকিৎসার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ওষুধ ও ডাক্তারই রোগ নিরাময়ের একমাত্র অবলম্বন; অন্য কিছু নয়। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক ও ইসলামী বিধিসম্মত নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি ছয়জন শিশুর ডায়রিয়া হয়েছে। একই ধরনের উপসর্গ, একই কারণ, একই চিকিৎসা, তবে

এদের মধ্যে চারজন ওষুধ সেবনে ভালো হয় আর দুইজন ওষুধ সেবনের পরও মৃত্যুবরণ করে। কেন? দশজন ক্যান্সার রোগীরও (cancer patients) একই ধরনের উপসর্গ ও রোগ নিরূপণ একই। পাঁচজন কেমোথেরাপি ও রেডিওথিরাপীর সাহায্যে চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করে আর পাঁচজন করে না, কেন? কেন সবাই মৃত্যুবরণ করলো না অথবা কেন সবাই আরোগ্য লাভ করলো না?

বস্তুত ওষুধ তখনই রোগ মুক্তির কারণ বা অসীলা হয় যখন আল্লাহ্ তা ইচ্ছা করেন। তিনি যদি ইচ্ছা না করেন তা হলে কোনো ওষুধই কার্যকরী হয়না। এমনকি চিকিৎসকও সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে পারেননা বা সঠিক ওষুধ নির্বাচনে ব্যর্থ হন। জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেন, 'মানুষের মৃত্যু যখন উপস্থিত হয় তখন অভিজ্ঞ ডাক্তার পর্যন্ত বোকা বনে যায়।' সূরা আন'আম-এর ১৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন,

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"আল্লাহ্ যদি তোমাকে দুঃখ-কষ্টে ফেলেন তবে তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারে না।" (আন'আম ৬:১৭)

ইংরেজীতে আয়াতটির অনুবাদ হচ্ছে, "And if Allah touches thee with an affliction no one can remove it but He." (An'aam 6.17)

যে নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক সারাটা জীবন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অবস্থানকারী অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করে আসছেন, সেই ডাক্তারও বিভিন্ন রোগে ভুগে যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হন, তখন অন্য কোনো ডাক্তার তাকে বাঁচাতে পারে না। এ বক্তব্যের সমর্থনে কুরআনের আরেকটি আয়াত বর্ণনা করছি। সূরা শু'আরার ৮০ নং আয়াতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম-এর যবানীতে আল্লাহ্ পাক বলেন,

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾

"ওয়া ইযা মারিদ্তু ফাহুয়া ইয়াশফীন।"

"এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।" (আশ্ শু'আরা ২৬:৮০)

"And when I am ill, it is He who heals me." (Ash-Shuara 26:80)

স্বাস্থ্য, সুস্থতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ

প্রশ্ন-৩৭ : স্বাস্থ্য, সুস্থতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা তথা রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী বক্তব্য রেখেছেন তা সংক্ষেপে আমাদের অসংখ্য দর্শকবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলুন।

উত্তর : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ প্রতিরোধকল্পে যেসব বক্তব্য রেখেছেন ও ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন, তা আলোচনা করার পূর্বে আমি সম্মানিত দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট বা ডায়াটেসিয়ান হিসেবে ছিলোনা। তথাপিও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্বাস্থ্য, সুস্থতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রোগ নিরাময় ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি বিষয়েই তিনি অনেক বক্তব্য রেখেছেন এবং দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যা পুরোপুরি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত। তিনি তাঁর

বক্তব্য এমন এক সময় পেশ করেছেন যখন বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানতোনা। He spoke on every aspect of health and wellness, sickness and cure, be it material, physical or spiritual. He was in fact a physician of the body and the soul.

যাহোক, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে আমি আমার আলোচনা শুরু করবো ইনশা'আল্লাহ। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বছর পূর্বে আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেছেন, "নিশ্চয়ই মানুষকে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো নিয়ামত প্রদান করা হয়নি।" (আন- নাসাঈ) [৯৮]

সহীহ আল বুখারীতে যে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে তার ভাষা হচ্ছে, "আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের মধ্যে দুটো নিয়ামত রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোক ধোঁকায় পড়ে আছে। একটি স্বাস্থ্য আর অপরটি অবসর বা বিশ্রাম।" (সহীহ আল বুখারী) [৯৯]

হাদীসটির ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে, "There have been two blessings or bounties about which most people remained in darkness, illusion or hoax : one is health and the other one is comfort and affluence, i.e. solvency or free time." (Sahih Al Bukhari) [99]

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে কিছু শব্দের পরিবর্তন বা অগ্রপশ্চাৎ হয়ে হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে উল্লেখ আছে, "স্বাস্থ্য ও অবসর মহান আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের মধ্যে দুটি বিশেষ নিয়ামত। অধিকাংশ লোক এ দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে ক্ষতি ও ধোঁকায় পতিত রয়েছে।" (মুসনাদে আহমদ) [১০০]

একদা হিপ্পোক্রেটস্‌কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "Which life is the best? He said, "Poverty with safety is better than wealth with fear." (As-Suyuti) [101]

অর্থাৎ কেমন জীবন সর্বোত্তম? তিনি উত্তর দেন, 'নিরাপত্তার সাথে দরিদ্রতা, 'ভয়-ভীতির সাথে ধন-সম্পদশালী থাকা' থেকে উত্তম। (আস-সূয়ুতী) [১০১]

অপরদিকে হযরত সালামা ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে মিহসান আল-খাতামী তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যুষে সুস্থতা নিয়ে ঘুম থেকে ওঠে, বাসায় নিরাপদে থাকে, সারা দিনের খাদ্য সামগ্রী তার নিকট মজুদ থাকে, তা'হলে তাকে এ পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ দেয়া হয়েছে।" (আত তিরমিযী) [১০২]

অর্থাৎ "মানুষের সুস্থ দেহ থাকা মানে সমগ্র পৃথিবী থাকার সমান। উদাহরণস্বরূপ একজনের নিকট ১০০ কোটি টাকা আছে, তবে তিনি সর্বদাই অসুস্থ। অপরদিকে একজনের নিকট মাত্র ১০০০ টাকা আছে। কিন্তু তিনি সর্বদা সুস্থ। এ দুজনের মধ্যে কে বেশি সুখী? নিশ্চয়ই যার কাছে ১০০০ টাকা আছে তিনিই সুখী।

প্রশ্ন-৩৮ : সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সুন্দর অভ্যাস বজায় রাখা এবং preventive measures নেওয়া, প্রয়োজনে চিকিৎসা গ্রহণের পাশাপাশি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কি

করতেন, স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'য়া করার বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো বাণী আছে কি?

উত্তর : আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা দিয়ে আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে পারি। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বলেন, "হে আব্বাস! হে আল্লাহ্র রসূলের চাচা! আপনি আল্লাহ্র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দু'য়া করুন।" (আত-তিরমিযী) [১০৩]

আর দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকা মানেই সর্বদা সুস্থ থাকা। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক সাহাবী রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! কোন দু'য়া সর্বোত্তম? রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার প্রতিপালকের নিকট সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কামনা করো। লোকটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন এসে একই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ জবাব দিলেন এবং বললেন, "তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করলেই সফলকাম হবে।" (আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [১০৪]

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার দু'য়াই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়।" (আত-তিরমিযী) [১০৫]

No other supplication is more pleasing, more rewarding, more important more favourite than a request for good health and safety. (At-Tirmizi) [105]

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা ভাইবোনেরা! এসব সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে সুস্বাস্থ্যের প্রতি আল্লাহ্র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতো গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বাস্থ্যই সম্পদ, আর 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল (Health is wealth. Health is the root of all happiness)' এ উক্তি দুটি মূলত তাঁর বক্তব্যগুলোর উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। বস্তুত প্রায় ১৪৫০ বছর আগে স্বাস্থ্য সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা যা বলেছেন, আধুনিক বিশ্ব আজ তারই প্রতিধ্বনি করছে মাত্র। এতে নতুন কিছুই নেই। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথাই ঊনবিংশ, বিংশ আর একবিংশ শতাব্দীতে অমুসলিম বিশ্ব একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রচার করে আসছে।

সম্মানিত দর্শক-পাঠক, আমি এখানে আরো একটি হাদীস আলোচনা করবো যা হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন এবং যা আস-সুয়ূতী উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদীসটি আমি পূর্বেও একবার আলোচনা করেছি। হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, "হে আল্লাহ্র নবী! যদি আমার স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং আমি সুস্থ থাকি তখন আমি আল্লাহ্র শোকর আদায় করি। এই অবস্থাটি আমার নিকট সেই অবস্থার চেয়ে অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় যে আমি অসুস্থতা দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হই এবং ধৈর্য ধারণ করি। তার একথা শুনে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্র রসূলও তোমার সাথে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা পছন্দ করেন।" (আল-মু'জামুল আওসাত ও আস-সুয়ূতী) [১০৬]

সম্মানিত পাঠক, স্বাস্থ্য আল্লাহ্র কতো বড় নিয়ামত যে আল্লাহ্র নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে পছন্দ করতেন ও ভালোবাসতেন। তিনি আল্লাহ্র নিকট এ নিয়ামত বেশি বেশি চাইতেন। আর এজন্যই আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ সর্ব অবস্থায়ই ধৈর্যধারণ করতেন এবং শোকর আদায় করতেন। তারা কোনো সময় অসুস্থ হলে ধৈর্যধারণ করতেন, দু'য়া করতেন এবং একে দরজা বুলন্দী ও উন্নত মর্যাদার মাধ্যম মনে করতেন এবং দু'য়া করতেন, "হে করুণাময় প্রভু! আপনি অসুস্থতাকে সুস্থতার সুমহান নিয়ামত দ্বারা বদল করে দিন।" তারা এরূপ দু'য়া এজন্যই করে থাকেন যে অসুখ-বিসুখে পতিত হয়ে সবর ও ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। আর সুস্থতার সময় শোকর করাও ওয়াজিব মনে করতেন।

প্রশ্ন-৩৯ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের স্বাস্থ্যের জন্য কি দু'য়া করতেন? সে দু'য়ার ভাষা কী ছিলো?

উত্তর : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য আল্লাহ্র দরবারে স্বাস্থ্য, সুস্থতা, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য অসংখ্য দু'য়া করেছেন। তন্মধ্যে তিনটি দু'য়া এখানে উল্লেখ করছি। প্রথমটি হচ্ছে,

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকাল আফওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি।"

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করছি।"(মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাউদ ও নাসাঈ) [১০৭]

নাসাঈ শরীফে উদ্ধৃত হাদীসে 'আফওয়া' শব্দটি নেই, যার অর্থ ক্ষমা।

দ্বিতীয় দু'য়াটি হচ্ছে, "হে আল্লাহ! আমি ক্ষমা ও সুস্থতা প্রার্থনা করি। কেননা ঈমানের পর সুস্থতা থেকে উত্তম আর কোনো কিছু মানুষকে দেয়া হয়নি। " (মুসনাদে আহ্মাদ) [১০৮]

তৃতীয়টি হচ্ছে, "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে আরোগ্য দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।" (আবূ দাউদ) [১০৯]

আল্লাহ্র কাছে দু'য়ারত দুজন মুমিনার উত্তোলিত দু'খানা হাত

এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত একটি হাদীস আপনাদের সামনে আলোচনা করব। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য এভাবে দু'য়া করতেন :

"হে আল্লাহ! আমাকে শারীরিক সুস্থতা দান করুন, আমার দৃষ্টিশক্তির সুস্থতা দান করুন এবং আমার মৃত্যু পর্যন্ত তাকে (দেহকে) সুস্থ রাখুন। আল্লাহ ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই। তিনি অতি সহনশীল ও দয়ালু। মহান আরশের মালিক আল্লাহ অতি পবিত্র। জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।" (আত-তিরমিযী) [১১০]

হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে তিনি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা ক্ষমা বা সুস্থতা চাও। কারণ ঈমানের পর সুস্থতা বা ক্ষমা থেকে উত্তম কোনো কিছু কাউকে দেয়া হয়নি।" (মুসনাদে আহমাদ) [১১১]

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুও একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম আন-নাসাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা, স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য দু'য়া করো। নিশ্চয়ই ঈমান আনার পর স্বাস্থ্যের চেয়ে আর কোনো অর্জন মানুষের নিকট উত্তম নয়।" (আত-তিরমিযী ও আন-নাসাঈ) [১১২]
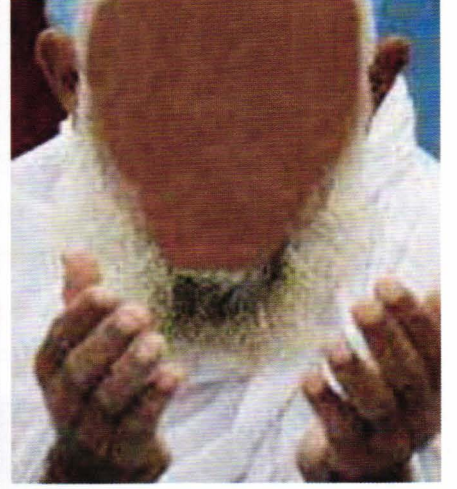
দু'জন বয়োজ্যেষ্ঠ হাজী সাহেবের দু'য়া

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য কখনো কোনোদিন দু'য়া করেননি। অথচ তাঁর সংসার তেমন সচ্ছলও ছিলোনা যা আমরা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মারফত জানতে পারি। নিয়মিত তাঁর ঘরে উনুনও জ্বলত না।

একদা হযরত আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনার রাস্তায় হাঁটছিলেন। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার নিকট যদি উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকে তাহলে তিনদিনের বেশি তা কখনো রাখবোনা, তবে সামান্য কিছু ছাড়া যা দিয়ে আমি ঋণ পরিশোধ করবো।" (সহীহ আল বুখারী) [১১৩]

অধ্যায়-৩

ব্যক্তিগত ও কমিউনিটি স্বাস্থ্য সুরক্ষা

প্রশ্ন-৪০ : ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা Personal Hygiene and Cleanliness সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা আছে কী? কমিউনিটি হেলথ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিজ্ঞতা কী?

উত্তর : অবশ্যই ছিলো। প্রথমেই বর্ণনা করছি সেই প্রসিদ্ধ হাদীসটি যা আমাদের অধিকাংশ দর্শকই জেনে থাকবেন। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ মালিক আশআরী রাদিয়াল্লাহ আনহু। হাদীসটি হচ্ছে, "পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ বা ঈমানের অর্ধেক।" (সহীহ মুসলিম) [১১৪] "Purity is part (or half) of the Faith" (Sahih Muslim) [114]

বলা বাহুল্য, পবিত্রতা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অনেক ঊর্ধ্বে। কাজেই যার কাপড়, দেহ ও স্থান পবিত্র তার কাপড়, দেহ ও স্থান পরিচ্ছন্নও বটে। কিন্তু কাপড় পরিচ্ছন্ন হয়ে অপবিত্রও হতে পারে। বাহ্যিক পবিত্রতায় দেহ, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ এবং স্থানের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেহের পবিত্রতায় মলমূত্র ত্যাগের পর শৌচকার্য সম্পন্নের পরই উযু-গোসল করতে হয়। নাপাক পানি দিয়ে কেউ কাপড় এবং স্থান পরিষ্কার করেনা। কাজেই পবিত্রতার পূর্ব শর্ত হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

দ্বিতীয় হাদীসটি হচ্ছে, "তোমরা যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থেকো। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের ভিত্তি রেখেছেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর। জান্নাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রবেশ করবেনা।" (জামে সগীর ও আত-তাদভীন ফী আখবারে কাযভীন লির রাফিয়ী) [১১৫]

এ হাদীসে ব্যক্তির স্বাস্থ্যকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত হাদীস দুটোর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কমিউনিটি হেল্থ বা Public Health তথা জনস্বাস্থ্য অটুট রাখার ওপর যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি অপবিত্রতা, অপরিচ্ছন্নতা, নোংরামী, পছন্দ করতেননা। সুতরাং আমাদের সকলকে সর্বদা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। বস্তুত পবিত্রতা অর্জন করাকে আল্লাহ্ তা'য়ালার ভালোবাসা লাভের উপায় বলে কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

"আল্লাহ্ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং যারা অতিমাত্রায় পবিত্র থাকে তাদেরকেও।" (আল বাকারাহ ২:২২২)

প্রশ্ন-৪১ : সুন্দর গৃহস্থালীর কাজ Good housekeeping বর্তমানে অফিস-আদালত, বাসা-বাড়িসহ সর্বত্র Good Hygienic Practice (GHP) হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার এটি অন্যতম উপায়। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও নবী করীম সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী কী সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে?

উত্তর : জ্বী হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। In fact দেহ ও মনের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা কুরআনের সূরা মা'য়িদার ৬ নম্বর আয়াতে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য তৈরি হও, তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত দুটি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো, মাথার ওপর হাত বুলাও এবং পা দুটি গ্রন্থি পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো। যদি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাকো, তাহলে গোসল করে পাক সাফ হয়ে যাও। যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও বা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে বা তোমরা নারীদেরকে স্পর্শ করে থাকো এবং পানি না পাও, তাহলে পাক-পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও। তার ওপর হাত রেখে নিজের চেহারা ও হাতের ওপর মাসেহ করে নাও। আল্লাহ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না; বরং তিনি চান তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করে দিতে, হয়তো তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।" (মা'য়িদাহ ৫:৬)

হাদীস শরীফেও এ বিষয়ে বর্ণনা এসেছে। রিওয়ায়াতটি মুসনাদে আল-বাযযার হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হলো, হযরত সালেহ ইবনে আবূ হাসসান রহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র, তাই তিনি পবিত্রতা ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, অতএব তিনি পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। তিনি দয়াময় ও দানশীল, তাই দানশীলতা ও বদান্যতা পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখো। কিন্তু ইয়াহূদীদের অনুসরণ করো না।" (আত-তিরমিযী) [১১৬]

"Lo! Allah is pure and good and He loves purity and goodness. He is clean and He loves cleanliness. He is bountiful and He loves bountifulness. He is kind and generous and He loves kindness and generosity. So clean your court and courtyards and do not imitate the Jews." (At-Tirmizi) [116]

যেহেতু ইয়াহূদীরা তাদের বাড়িঘর ও আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে না, তাই তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। (তুহফাতুল আহওয়াযী, ৭/২১৯)

রিওয়ায়াতটি মুসনাদে আল-বাযযার হাদীস গ্রন্থেও উদ্ধৃত রয়েছে। এই হাদীসের শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে, আমাদেরকে বাসা-বাড়ি, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাচারি, হাট-বাজার, বাড়ির উঠান এবং আঙ্গিনা ইত্যাদি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখতে হবে। তাহলে আমরা অনেক অসুখ-বিসুখ থেকে দূরে থাকতে পারবো। তাছাড়া নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ময়লা-আবর্জনা সঠিকভাবে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দিতে এবং পরিবেশ দূষণ না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন-৪২ : ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানুষের স্বভাবজাত কতিপয় কাজ আছে, যা প্রত্যেক মানুষই প্রাকৃতিক প্রয়োজনে সম্পন্ন করে থাকে। ইদানিং এসব কাজকে Community Health কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ এগুলোকে স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মূল বিধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমার প্রশ্ন, রোগ প্রতিরোধ ও মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো নির্দেশনা আছে কি?

উত্তর : ধন্যবাদ। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি কাজ বা অভ্যাসকে যথাযথ সুন্দরভাবে সমাধা করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। সেগুলোকে আমরা স্বভাবজাত কাজ বা natural acts বলতে পারি। কারণ এসব কাজ প্রত্যেক মানুষই স্বাভাবিকভাবে যার যার প্রয়োজনে এবং biological need অনুযায়ী সম্পন্ন করে থাকে। এগুলো প্রত্যেক মানুষ তথা মুসলমানদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য ও রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকার জন্যই প্রয়োজন। That is, these are preventive aspects of our health. এসব কাজের medical benefits প্রচুর।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মানুষের স্বভাব বা ফিতরাত মোট পাঁচটি। অর্থাৎ পাঁচটি মৌলিক বিষয় বা কাজ মানুষের স্বভাব জাতের অন্তর্ভূক্ত- ১. খৎনা করা, ২. নখ কাটা (বা পরিষ্কার রাখা), ৩. নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা, ৪. বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং ৫. গোঁফ ছাঁটা।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম, আত-তিরমিযী ও আন-নাসাঈ) [১১৭]

এসব কাজের প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে অনেক সময় প্রয়োজন। তাই অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করছি।

প্রথমত : খৎনার কথা বলি। এটি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামসহ সকল নবীরও সুন্নাত। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম আশি বছর বয়সে কাদুল নামক স্থানে কুঠার জাতীয় অস্ত্র দ্বারা নিজের খৎনা করিয়েছিলেন।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [১১৮]

Circumcision বা খৎনা করানোকে আমরা এ দেশে মুসলমানী করানো বলে থাকি। বর্তমানে অধিকাংশ চিকিৎসক এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে খৎনা করানো হলে প্রস্রাব সংক্রান্ত কতিপয় রোগ প্রতিরোধ সম্ভব। খৎনা দ্বারা বিভিন্ন রোগ থেকে আপনা-আপনি নিরাপদ থাকা যায়। অন্যদিকে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুন্নাতেও বহুবিধ উপকার বর্ণিত হয়েছে। যারা খৎনা করেনা, তাদের নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

Today many scientists admit that loose fold of the skin at the end of male sex organ is exposed and susceptible to infection and even to cancer.

দ্বিতীয়ত : নাভির নিম্নাংশের চুল যদিও দৃষ্টিগোচর হয়না কিন্তু এগুলো পরিষ্কার না করার কারণে মানুষের স্বভাবের মধ্যে বিষণ্নতা দেখা দেয়। অর্থাৎ এর দ্বারা মনের ভেতর মালিন্য ও অপবিত্রতা বৃদ্ধি পায় এবং চর্মরোগের সৃষ্টি হতে পারে। Peri-anal abscess, ischeo-rectal abscess and pilonidal sinus ছাড়াও cervical cancer , cancer of the penis, belanitis, UTI ইত্যাদি রোগ দেখা দিতে পারে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, সব ধরনের চুলেই ময়লা বা দূষিত পদার্থ অতি সহজেই জমা হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত : আঙ্গুলের নখ কাটা শুধু হাতের পরিচ্ছন্নতা ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের জন্যই জরুরী নয়, বরং এটি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যদি নখ নিয়মিত কাটা না হয় তাহলে ময়লা ও আবর্জনা নখের নিচে জমা হতে থাকবে। ফলে ঐসব ময়লা বা দূষিত পদার্থ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের সময় হাতের মাধ্যমে (oro-faecal route) পেটে প্রবেশ করবে যা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আপত্তিকর।

চতুর্থত : বগলের লোম যদি নিয়মিত পরিষ্কার না করা হয় তাহলে চরম দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। ফলে তা আশেপাশের লোকদের কষ্টের কারণ হয়। যাদের শরীরে দুর্গন্ধ থাকে তাদের আপনজনেরাও তাদের সাথে মিশতে চায়না।

পঞ্চমত : গোঁফ ছেঁটে ফেলা বা তা সর্বদা ছোট রাখা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উত্তম কাজ। কেননা গোঁফ যদি ছোট রাখা না হয় অথবা কামিয়ে ফেলা না হয় তাহলে গোঁফে যে ময়লা জমে থাকে, তা পানীয় বস্তুর সাথে মিশে কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে। অর্থাৎ চা, কফি, পানি বা দুধ আপনি যা-ই পান করুন না কেনো, উক্ত ময়লা ও দূষিত পদার্থ পানীয়ের সাথে মিশে পেটে প্রবেশ করবে। তা বাধা দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। কাপে যখন চুমুক দিবেন তখন লম্বা গোঁফ কোথায় যাবে? নিশ্চয়ই কাপের ভেতরে যাবে।

সুতরাং from religious, medical or hygienic points of view উপরোক্ত পাঁচটি natural acts বা স্বভাবসূলভ কাজ রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়মিত পালন করা অত্যাবশ্যক। এটি আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যই জরুরী। অধিকন্তু এসব কাজ নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলোকে 'মানব সমাজের মূল' বলা হয়েছে। আর নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসবের উপর আমল করার তাগিদ দিয়েছেন।

প্রশ্ন-৪৩ : গত একটি পর্বে আমরা স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য যে পাঁচটি কাজ সকল মানুষের করতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য এ পাঁচটি কাজ ছাড়া আরো কোনো কাজ আছে কি? যা সকল দেশের সকল এলাকার মানুষের জন্যই মেনে চলা কল্যাণকর এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা জেনে আমাদের দর্শকবৃন্দ উপকৃত হবেন?

উত্তর : হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থতা ও পবিত্রতার দশটি নীতি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এই দশটি বিষয়কে স্বভাবসুলভ

সুন্নাহ বা দ্বীনে হানীফের অংশ বলেছেন। এগুলো সকল পুরুষ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়। এসবের কতিপয় মহিলাদের জন্যও প্রযোজ্য। এসব কাজ পূর্বের নবী আলাইহিমুস সালামের উম্মতের জন্যও পালনীয় ছিলো। এই দশটি নীতির ভেতর একটি নীতি হাদীস বর্ণনাকারী মুসয়াবের মনে ছিলোনা। নীতিসমূহ হচেছ, "১. গোঁফ ছাঁটা, ২. দাড়ি লম্বা করা, ৩. মিসওয়াক করা, ৪. নাকে পানি দেয়া, ৫. নখকাটা, ৬. আঙ্গুলের জোড়াগুলো ধোয়া, ৭. বগলের পশম উঠিয়ে ফেলা, ৮. নাভির নিচের পশম মুণ্ডানো এবং ৯. ইস্তেঞ্জা (প্রস্রাব-পায়খানা হতে নিশ্চিতরূপে পবিত্রতা অর্জন) করা। হাদীসটি বর্ণনাকারী মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, দশমটি আমি ভুলে গেছি, সম্ভবত সেটা হবে কুলি করা।" (সহীহ মুসলিম ও আত-তিরমিযী) [১১৯]

এ নীতিগুলোর একটিও যদি কেউ উপেক্ষা করেন, তাহলে আমি বলবো তিনি স্বাস্থ্য সচেতন নন। এই সুন্দর অভ্যাসগত কাজগুলো আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পুরোপুরি সমর্থন করে। এসব good natural acts নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সময় বর্ণনা করেছেন যখন মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ করা তথা রোগ থেকে দূরে থাকার বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো না। তাই আমরা যদি এই কাজগুলোকে প্রাত্যহিক জীবনে নিয়মিত মেনে চলার অভ্যাস করি তাহলে আমরা অনেক রোগ-ব্যাধি থেকে দূরে থাকতে পারব।

প্রশ্ন-৪৪ : আঙ্গুলের নখ কাটার বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হচ্ছে, "আঙ্গুলের নখ কাটা এবং কর্তিত অংশ মাটিতে পুঁতে ফেলা।" তিনি বলেন, "প্রতি বৃহস্পতিবার নখের মাথা কেটে ফেলো বা ছোট রাখো, নাভির নিচের লোম কামিয়ে ফেলো এবং বগলের লোম উপড়ে ফেলো। আর প্রত্যেক শুক্রবারে গোসল করো আর পরিষ্কার ও পবিত্র পোশাক পরো ও সুগন্ধি ব্যবহার করো।" (আস-সুয়ূতী) [১২০]

শুক্রবারে গোসল করা অনেক সময় বেশ প্রয়োজন। আবার অনেক সময় তা উত্তম, তবে অত্যাবশ্যক নয়। এই শুক্রবারে গোসল করা সম্পর্কে আরেকটি হাদীস আছে, যা বর্ণনা করেন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র আব্দুর রহমান। তিনি তার পিতার বরাত দিয়ে বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উচিত শুক্রবার গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং সামর্থ্য থাকলে সুগন্ধি ব্যবহার করা।" (সহীহ মুসলিম) [১২১]
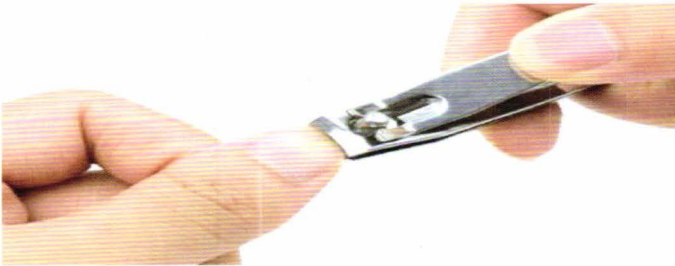
যন্ত্রের সাহায্যে আঙ্গুলের নখ কাটা (Trimming finger nails with nail cutter)

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "যে ব্যক্তি যে হাতের আঙ্গুলের নখ কাটে তার অপর দিকের চোখে কোনো অসুখ হবেনা।" (আস-সুয়ূতী) ১২২

অর্থাৎ বাম হাতের আঙ্গুলের নখ কাটলে ডান চোখে ophthalmia রোগ হবেনা। তিনি আরো বলেছেন, "আঙ্গুলের নখ কেটে তা মাটিতে পুঁতে ফেলা উত্তম।" (আন-নাসাঈ) ১২৩

প্রশ্ন-৪৫ : গোঁফ ছোট রাখার বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আঙ্গুলের নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা এবং নাভির নিম্নাংশের লোম পরিষ্কার করা মানুষের স্বভাবধর্মের কাজ।" (সহীহ আল বুখারী) ১২৪

এর আগে যে হাদীসটি নিয়ে আলোচনা করেছি, তা হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। সেখানে পাঁচটি স্বভাবজাত বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যা মানুষের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হচ্ছে- "খৎনা করা, নখ কাটা বা পরিষ্কার রাখা, নাভির নিচের পশম বা লোম পরিষ্কার করা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা ও গোঁফ ছাঁটা।" ১১৭

হযরত আবূ আব্দুল্লাহ আল-আগার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর সালাতে যাওয়ার আগে নিজের গোঁফ ছোট করতেন ও হাতের নখ কাটতেন।" (মুসনাদে আল বায্যার) ১২৫

আত-তাবারানী ও বাযযার গ্রন্থে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুক্রবার মসজিদে জুমু'আর সালাতে গমনের পূর্বে নিজের গোঁফ ও নখ কেটে নিতেন।" (মু'জামুল আওসাত ও আখলাকুন্নবী) ১২৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও একই হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত যায়দ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি গোঁফ ছোট রাখেনা, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অর্থাৎ সে আমার উম্মত নয়।" (আত-তিরমিযী ও আন-নাসাঈ) ১২৭
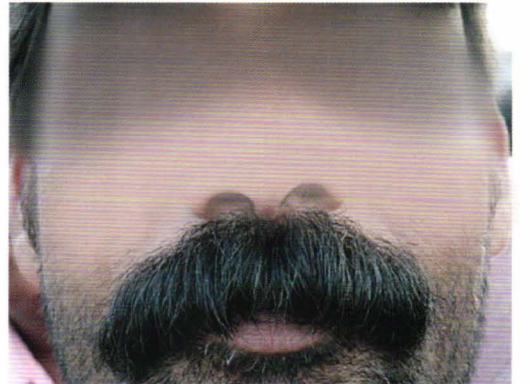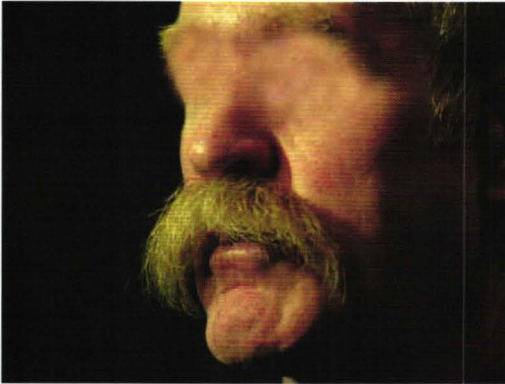
মাত্রাতিরিক্ত লম্বা গোঁফ অপ্রয়োজনীয় ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

গোঁফ সম্পর্কে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা গোঁফ কামিয়ে ফেলো, আর দাড়ি বড় হতে দাও।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও আত-তিরমিযী) [১২৮]

এই হাদীস দুটোর বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর প্রথম হাদীসটির তাৎপর্য অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এই হাদীস অনুযায়ী যারা মাত্রাতিরিক্ত বড় গোঁফ রাখেন তারা নবীর উম্মত নন। বস্তুত হাদীস দুটোতে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন বাস্তবে আমরা করছি তার উল্টো। আল্লাহ্‌র রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রাখতে আর গোঁফ ছাঁটতে নির্দেশ দিয়েছেন, আর আমরা হুবহু এর বিপরীত কাজটিই করছি। অর্থাৎ আমরা গোঁফ বড় রাখি আর দাড়ি কামিয়ে ফেলি এবং দলচ্যুত হই। এটি কাম্য নয়।

প্রশ্ন-৪৬ : আমাদের ভেতর অনেকেই লম্বা গোঁফ রাখেন। এই বড় গোঁফ রাখা যে অনুচিত তা আমরা এ হাদীস থেকে জানলাম। এবার মুহতারামের নিকট প্রশ্ন, গোঁফ রাখা স্বাস্থ্যসম্মত কি না, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিষয়টি এবার বলুন।

উত্তর : From medical, scientific and religious points of view গোঁফ মাত্রাতিরিক্ত বড় রাখা অসুন্দর ও অগ্রহণযোগ্য কাজ। গোঁফ অত্যধিক বড় রাখলে কেউ প্রশংসা করেনা; বরং অনেকেই উপহাস এবং সমালোচনা করে। তাই এটি কিছুতেই স্বাস্থ্যসম্মত কাজ হতে পারেনা। যেকোনো ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন তিনি এ কথাই বলবেন। আমি তাই বিনয়ের সাথে বলতে চাই, যারা লম্বা গোঁফ রাখেন তারা কেউই স্বাস্থ্য সচেতন নন। কারণ সারাদিন চলাফেরার সময় গোঁফে প্রচুর ধূলাবালি ও ময়লা জমে। গোঁফ ও মাথার চুল ময়লা আটকে থাকার উত্তম ও নিরাপদ জায়গা। যারা সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করেন তারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন কি পরিমাণ ময়লা প্রতিদিন চুল থেকে বের হয়। তাই চা, দুধ, কফি ও পানি পান করার সময় বা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করার সময় এসব দূষিত ময়লা যাতে খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়কে দূষিত করতে না পারে সে ব্যাপারে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।
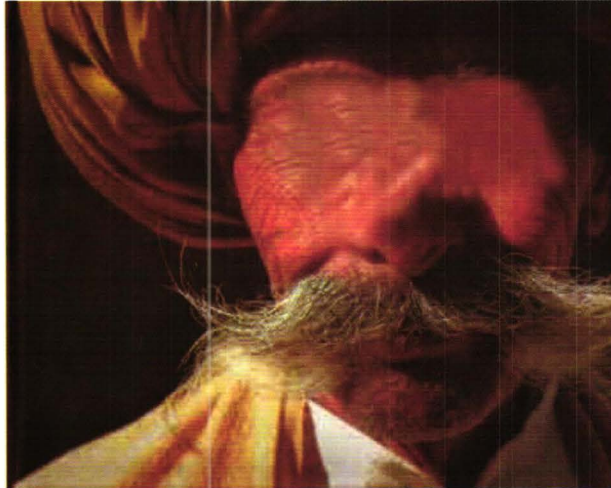
মাত্রাতিরিক্ত লম্বা গোঁফ পানীয় পান করার সময় পানীয়কে সর্বদা দূষিত করে থাকে।

আমি লক্ষ্য করেছি যে যাদের গোঁফ লম্বা থাকে, তাদের গোঁফের অর্ধেকই পানীয় পান করার সময় পানীয়তে ডুবে যায়। ফল কী হয়? আপনি গোঁফের ময়লা চা, দুধ ও পানীয়ের সাথে মিশিয়ে পান করছেন, তাই নয় কি? এটিই কি আধুনিককালের স্বাস্থ্য সচেতনতা? কম্পিউটার বিজ্ঞানের যুগে এটিই কি আমাদের good drinking practice?

সম্মানিত দর্শক-পাঠক! তাই মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বক্তব্যগুলোর প্রতিটিই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আমাদের দেশের প্রায় ৬০ হাজার চিকিৎসক আর প্রায় ২৫ হাজার ফার্মাসিস্ট রয়েছেন, যারা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একমত হবেন। আর যদি কারো Prophetic tradition নিয়ে কোনো কিছু জানার থাকে ITV তে পত্র লিখুন। আপনার আধুনিক জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

Well-trimmed trimmed moustache
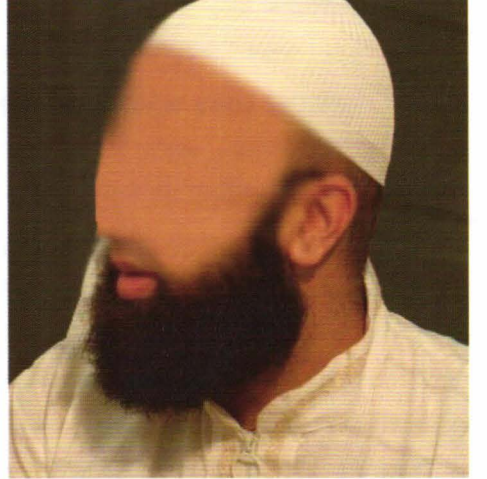
প্রশ্ন-৪৭ : দাড়ি রাখলে আর গোঁফ নিয়মিত ছোট রাখলে আর কী কী উপকার হয়। Medical science কী বলে?

উত্তর : প্রথম উপকার হচ্ছে আর্থিক সাশ্রয়। আপনি দেখুন যদি প্রতিদিন বাসায় clean shave করেন তাহলে প্রায় ১০ টাকা খরচ হয়। আর সেলুনে গেলে কমপক্ষে ২০ টাকা লাগে। অর্থাৎ মাসে প্রায় ৬০০ টাকা খরচ হয়। এই টাকা shave করার জন্য অপচয় হয়। দাড়ি রাখলে এ অপচয় হবেনা। এতে আপনার আর্থিক সাশ্রয় হবে। আশা করি আপনারা সবাই এ বিষয়ে একমত হবেন।

দ্বিতীয়ত : সময়ের সাশ্রয়, saloon-এ shave করতে আসা-যাওয়ার সময়সহ কমপক্ষে ৩০ মিনিট সময় ব্যয় হয়ে থাকে। আর যদি সেলুনে 'কিউ' থাকে তখন আরো বেশি সময় ব্যয় হয়। এই সময়টা কেউ অন্য কাজে লাগাতে পারে। বাসায় shave করলে সর্বাপেক্ষা ২০ মিনিট সময় লাগে। তাই প্রতিদিন ৩০ মিনিট হিসেবে একজন লোক সারা জীবনে কতো দিন দাড়ি shave করার পেছনে সময় ব্যয় করে থাকেন? চিন্তা করুন। ধরুন, প্রতিদিনে ৩০ মিনিট বা আধা ঘণ্টা, তাহলে ১ বছর তথা ৩৬৫ দিনে ১৮৩ ঘণ্টা অর্থাৎ প্রায় ৮ দিন। তিনি যদি ৬০ বছর এভাবে প্রত্যহ shave করেন তবে তার সময় অপচয় হবে মোট ৮x৬০= ৪৮০ দিন। এ সময় কি নগণ্য? It is a total wastage of money and time for an unnecessary activity.

তৃতীয়ত : পানীয় দূষিত না হওয়া, গোঁফ কামিয়ে ফেলা বা তা ছোট করে রাখার বিষয়ে হাদীস শরীফে বর্ণনা এসেছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী সপ্তাহে একবার গোঁফ ছাটলেই হবে। এক সপ্তাহে গোঁফ যতোটুকু বড় হবে তা পানীয়কে দূষিত করার কারণ হবেনা।

চতুর্থত : দাড়ি যতোই বড় হোক না কেনো, তা পানীয়কে দূষিত করতে পারবেনা। কারণ পান

করার সময় পানির গ্লাস বা কাপ সর্বদা দাড়ির উপরে থাকে। অর্থাৎ পানির পাত্রটির নিচেই দাড়ি থাকে। ফলে তা পানীয়তে ঢোকার সুযোগ নেই। আর গোঁফ বড় থাকলে পান করার সময় পানীয়ের স্পর্শ থেকে রক্ষা করার কোনো উপায়ই থাকেনা। কারণ গোঁফ তো ঠোঁটের উপরিভাগে থাকে। পান করার সময় তা সর্বদা কাপের বা গ্লাসের ভেতর পড়ে যায়।

পঞ্চমত : দাড়ি পুরুষের সৌন্দর্যবর্ধক। এটি পুরুষত্বের চিহ্ন। দাড়ি রাখলে চোখের উপকার হয়। দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। Medical science আমাদের বলে যে দাড়ি মানুষের মুখমণ্ডলকে গরম রাখে। এটি আমাদের মুখ ও চামড়াকে সুরক্ষা করে। দাড়ি ক্ষতিকর ও দূষিত পদার্থ থেকে মুখকে রক্ষা করে। তাছাড়া এটি ultraviolet ray-এর harmful effects থেকে মুখমণ্ডলকে রক্ষা করে। দাড়ি acne, মুখের দাগ ও ব্রণ থেকে রক্ষা করে। সুতরাং আমাদের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দাড়ি রাখা এবং গোঁফ কামিয়ে ফেলা বা ছোট রাখা উচিত।

প্রশ্ন-৪৮ : মুহতারাম, আজকাল আমরা লক্ষ্য করছি যে এক শ্রেণীর মহিলা যারা নিজেদের smart বলে দাবি করেন, তাদের অনেকে ১-১.৫ ইঞ্চি লম্বা নখ রাখেন এবং তাতে বিভিন্ন রং দেন। এ বিষয়ে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং ধর্মীয় বিজ্ঞান কি বলে? অনুগ্রহপূর্বক আলোচনা করুন যাতে আমাদের দর্শকবৃন্দ এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারেন।

উত্তর : নিয়মিত নখ কাটা ও তা পরিষ্কার রাখা সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। এটি কোনো medical scientist অস্বীকার করতে পারবেননা। তাছাড়া প্রতিটি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের worker-দের সপ্তাহান্তে নখ কাটা, চুল ছাঁটা ইত্যাদি Good Manufacturing Practice বা GMP-এর আওতাভুক্ত। প্রতি সপ্তাহে ওষুধ তৈরির কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, হাতে-পায়ে ঘা, আঙ্গুলের নখ, লম্বা চুল ইত্যাদি inspection করা হয়ে থাকে। যারা এসব GMP guidelines মেনে চলবেনা তাদেরকে ওষুধ তৈরির কাজ করতে দেয়া হয়না। এটি mandatory requirements of Drug Administration Authority for the personal hygiene of the factory staff of every pharmaceutical company.

মহিলাদের এতো বড় নখ রাখা অযৌক্তিক ও নিষেধ।
(Keeping long nails by women is absolutely unnecessary and prohibitted)

পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি নখ (Neatly trimmed finger nails)

আমার বিশ্বাস, আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে হাতের নখ না কাটলে নখের নিচে প্রচুর ময়লা বা দূষিত পদার্থ জমা হতে থাকে যা পরিষ্কার করা কঠিন। বিশেষ করে যারা লম্বা নখ রাখেন তাদের বেলায় আরো কঠিন। তাদেরকে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যেনো নখের অগ্রভাগ ভেঙে না যায়। এসব জায়গায় সহজেই ময়লা জমে এবং রোগ-জীবাণু লুকিয়ে থাকে। ফলে তা খুবই দৃষ্টিকটু লাগে। অধিকন্তু এতে যারা দু'হাত দিয়ে কাজ করে থাকেন তাদের কাজের অসুবিধা হয়। যারা লম্বা নখ রাখেন তাদেরকে অধিকতর অস্বস্তিতে কাজ করতে হয়। সর্বদা ভয়ও থাকে কখন নখটি ভেঙে বা ফেটে যায় বা কখন কার গায়ে খোঁচা লাগে। কেউ খোঁচা খেয়ে আহতও হতে পারে।

To keep sharp pointed nails is dangerous and prohibitted.

অপরদিকে লম্বা নখ বা নেইল রাখা কোনো ফ্যাশনও নয়। এটি কারো সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করেনা। এ practice একটি বিজাতীয় কালচার। এটি ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমার সুচিন্তিত মতামত হচ্ছে, যারা লম্বা নখ রাখেন তারা কেউই স্বাস্থ্য সচেতন নন। আর তারা জেনে হোক আর না জেনে হোক, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুন্নাতকে অমান্য করছেন। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় ইস্তেনজা করার সময়। এই লম্বা নখে অনেক অপবিত্র ময়লা ঢুকে যেতে পারে, যা সত্যি অনভিপ্রেত ও অস্বাস্থ্যকর এবং সহজে পরিষ্কার করা কঠিন। অনেক সময় অসতর্কতাবশতঃ অপবিত্র জিনিস নখের ভিতরাংশে লেগে থাকা স্বাভাবিক। ফলে পবিত্রতাও অর্জন হবে না আবার স্বাস্থ্যগত ক্ষতিও দেখা দিবে।

প্রাকৃতিকভাবে বন্য পশুপাখির নখ বড় থাকে আহার সংগ্রহ এবং প্রতিকূল অবস্থায় নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু আশরাফুল মাখলূক হিসেবে মানুষের জন্য সেটি প্রযোজ্য নয়। আমরা সৃষ্টি সেরা জীব

হয়ে অতো নীচে নামতে কেনো যাবো? তাই আমি এমন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়দের নিকট আবেদন জানাব আপনারা নিয়মিত নখ কাটুন। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে নখ পরিষ্কার করতে প্রতিদিন দীর্ঘ সময় লাগে। বিশেষ করে যখন পার্টিতে যান তার আগে। কারণ আপনারা কেউই চাননা যে অন্য কেউ নখের নিচের কালো ময়লা দেখুক। তাই নখ ছোট থাকলে পরিষ্কার রাখতে কোনো অতিরিক্ত সময় লাগেনা। একবার সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট। এতে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আপনাকে অস্থিরতার ভেতর কাজ করতে হবেনা।

প্রশ্ন-৪৯ : আচ্ছা মুহতারাম, বগল ও নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা সুন্নত এবং তা সুস্বাস্থ্যের জন্যই প্রয়োজন। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো বর্ণনা হাদীস শরীফে এসেছে কি? মেডিকেল সায়েন্স কী বলে?

উত্তর : নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করার বিষয়ে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাভির নিচের লোম পরিষ্কারের জন্য চুন বা লোমনাশক ব্যবহার করতেননা; বরং লোম বেড়ে উঠলে তিনি তা ক্ষুর দিয়ে পরিষ্কার করে নিতেন।" (আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী) [১২৯]

এ হাদীস থেকে বুঝতে পারা যায় যে পুরুষদের জন্য বিনা প্রয়োজনে নাভির নিচের লোম পরিষ্কারের জন্য $Ca(OH)_2$ বা CaO ব্যবহার করা কিংবা কোনো লোমনাশক সাবান ব্যবহার নিষেধ। কারণ চুন বা চুন জাতীয় কোনো রাসায়নিক পদার্থ মানুষের চামড়ার ক্ষতিসাধন করে থাকে। এটি চামড়া penetrate করে internal tissueকেও ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।

বস্তুত বগলে ও নাভির নিচের পশম বা লোম কামিয়ে ফেলা ও পরিষ্কার রাখা একটি উত্তম ও স্বাস্থ্যসম্মত কাজ। এটি মানুষকে বিভিন্ন রোগ জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে থাকে। তাছাড়া এগুলো পরিষ্কার না রাখলে দুগর্ন্ধে অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। এসব লোকের আশেপাশে যারা বসে থাকেন তারা এসব দুর্গন্ধ পেয়ে কষ্ট অনুভব করেন। আর স্বাভাবিকভাবে মানুষ এসব ব্যক্তি থেকে দূরে থাকে বা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

আবু নু'য়াইম রহমাতুল্লাহ আলাইহি একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন, যেখানে বলা হয়েছে, "নাভির নিচে লোম পরিষ্কারে ক্ষুর ব্যবহার করা হলে তা সহবাসের আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তোলে।" (আস-সুয়ূতী) [১৩০]

প্রশ্ন-৫০ : এসব স্বভাবজাত উৎকৃষ্ট কাজগুলো করার বিষয়ে কোনো সময়সীমা আছে কি?

উত্তর : হযরত আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোঁফ ছোট করতে, নখ কাটতে এবং নাভি ও বগলের নিচের লোম পরিষ্কারের জন্য সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন সময় নির্ধারণ করেছেন।" (মুসলিম, আবূ দাঊদ, আত-তিরমিযী ও আন-নাসাঈ) [১৩১]

অন্যত্র এক বর্ণনায় জানা যায়, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুল আঁচড়িয়ে পরিপাটি করে রাখার হুকুম দিতেন (যাতে আজমী লোকদের বিপরীত করা হয়)। তিনি মাসে একবার বগলের ও নাভির নিম্নাংশের চুল পরিষ্কার করতেন এবং প্রতি ১৫ দিন পর পর নখ কাটতেন। আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহ আলাইহি একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রতি বৃহস্পতিবার আঙ্গুলের নখ কর্তন করো এবং নাভির নিচের ও বগলের নিচের লোম কামিয়ে ফেলো।" (আস-সুয়ূতী ও জামে সগীর) [১৩২]

অপর আবূ আবদুল্লাহ্ আল-আগার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত শুক্রবার জুমু'আর নামাযে যাওয়ার পূর্বে গোঁফ ও নখ কাটতেন। (আখলাকুন্নবী ও আল-আনোয়ার ফী শামাইলিন নাবিয়্যিল মুখতার) [১৩৩]

"নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তিত নখ ও চুল মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দিতেন।" (জামে সগীর ও নাওয়দিরুল উসূল) [১৩৪]

অপর এক বর্ণনায় জানা যায় যে নবী করীম সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের বাড়তি নখ কেটে ফেলো, কর্তিত জিনিসগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলো এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়া স্থানগুলো ডলে মেজে পরিষ্কার করে রেখো।" (জামে সগীর ও নাওয়াদিরুল উসূল) [১৩৫]

হযরত মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, " কর্তিত নখ, রক্ত ও চুল মাটিতে পুঁতে রাখা উত্তম।" (আস-সুয়ূতী) [১৩৬]

বস্তুত যেসব লোক নিয়মিত চুল কাটেননা বা গোঁফ ছাঁটেননা এবং বগল ও নাভির নিচের অংশ পরিষ্কার রাখেননা তাদেরকে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করতেন। এমনকি তিনি খাওয়ার সময় এসব লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের উচিত নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পুরোপুরি মেনে চলা। কারণ তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসম্মত।

প্রশ্ন-৫১ : ছুৎ-ছাত, কূলক্ষণ, কুসংস্কার, সংক্রামকব্যাধি, ছোঁয়াচে রোগ ইত্যাদি বিষয়ক মেডিকেল Concept সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আছে কি?

উত্তর : রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আরবি ইবনে মাজাহ্ কিতাবের অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (২০০২) অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রোগ সংক্রমণ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই এবং সফর মাসও অশুভ নয়।" (ইবনে মাজাহ্) [১৩৭]

অপরদিকে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসেও নবীজির একই ধরনের বক্তব্য রয়েছে। "রোগ সংক্রমণ, কূলক্ষণ ও হামাহ বলতে কিছু নেই। এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! কোনো উট চর্মরোগে আক্রান্ত হলে অন্য উট তার সংস্পর্শে এসে চর্ম রোগাক্রান্ত হয়। তখন তিনি বললেন, এটা তাক্দীর! তা না হলে প্রথম উটটিকে কে চর্ম রোগাক্রান্ত করেছে?" (ইবনে মাজাহ্) [১৩৮]

সহীহ্ মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত অনেকগুলো রিওয়ায়াত রয়েছে। (সহীহ মুসলিম) [১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২]

উপরোক্ত সবগুলো রিওয়ায়াতের ভাষ্য হচ্ছে রোগ সংক্রমণের কোন বাস্তবতা, অস্তিত্ব বা সত্যতা নেই, আর উটপালের রাখাল অসুস্থ উটগুলোকে সুস্থ উটপালের নিকট আনবেনা। অপরদিকে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ছোঁয়াচে ব্যাধি, ক্ষুধা, পেট কামড়ানো কীট ও পাখির কুলক্ষণ বলে কোনো কিছু নেই। জনৈক বেদুঈন আরব জিজ্ঞেস করলো,

ইয়া রসূলাল্লাহ! তবে সেই উটপালের অবস্থা কি যা কোনো বালুকাময় প্রান্তরে অবস্থান করে এবং সুস্থ-সবল থাকে? অতঃপর তথায় কোনো খুজলী-পাঁচড়ায় আক্রান্ত উট তাদের মধ্যে এসে পড়ে এবং সবগুলোকে ঐ রোগে আক্রান্ত করে ছাড়ে? (এর জবাবে) তিনি বললেন, তাহলে প্রথম উটটিকে কে রোগাক্রান্ত করেছিলো?" (সহীহ মুসলিম) [১৪৩]

সংক্রামক রোগ সম্পর্কে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সংক্রামক রোগ, অশুভ লক্ষণ, পেট কামড়ানো কীট ও পাখির অশুভ লক্ষণ বলে কোনো কিছু নেই।" (সহীহ মুসলিম) [১৪৪]

সহীহ আল বুখারীতে শুভ-অশুভ লক্ষণ বিষয়ে পাঁচটি হাদীস উদ্ধৃত আছে। (সহীহ আল বুখারী) [১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯] **এসবের ভেতর তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু। বাকী দুটো বর্ণনা করেছেন ইবনে উমর ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম। হাদীসগুলোর সারমর্ম একত্রে করলে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য এভাবে দাঁড়ায়:**

ক. "ছোঁয়াচে রোগ, সংক্রামকতা ও অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই।"

খ. "কোনো কিছুকে অশুভ বা কুলক্ষণ বলে গণ্য করোনা।"

গ. "রোগের সংক্রামক হওয়ার কোন ভিত্তি নেই বা রোগের সংক্রামকতা বলতে কিছু নেই। কোন কিছুকে অমঙ্গলজনক মনে করার কোনো কারণ নেই। পেঁচার মধ্যে কূলক্ষণের কিছু নেই, আর সফর মাসেও অশুভ বলতে কিছু নেই।"

ঘ. "কোনো কিছুকে শুভ লক্ষণ মনে করা ভালো। (কারো সম্পর্কে) ভালো ও সুন্দর বা অর্থবোধক কথা উত্তম যা সে শুনতে পায়।"

সহীহ মুসলিমে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য একটু ভিন্ন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "সংক্রামক রোগ, অশুভ লক্ষণ এবং পথে-ঘাটে পথ ভুলিয়ে দেয়ার ভূত-প্রেত প্রভৃতির কোনো বাস্তবতা নেই।" (সহীহ মুসলিম) [১৫০]

সুপ্রিয় দর্শক-পাঠক! আমি এখানে রোগ সংক্রমণ ও ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই। জাহেলী যুগে আরবরা 'হাম্মাহ' বলতে কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসকে বুঝে থাকতো। কারো কারো মতে 'হাম্মাহ' অর্থ পেঁচা। কারো বাড়িতে রাতে পেঁচা থাকলে এটা অশুভ লক্ষণ মনে করা হোতো। 'হাম্মাহ' শব্দ দ্বারা আরো কতগুলো অশুভ লক্ষণকে বুঝানো হতো। তদানীন্তন আরবদের বিশ্বাসমতে কোনো ব্যক্তি নিহত হলে এবং তার প্রতিশোধ না নেয়া হলে তার মস্তক থেকে একটি কীটের আবির্ভাব হবে। ইসলামের আগমনের আগে তদানীন্তন আরব সমাজে এ বিশ্বাসও ছিলো যে, মৃত ব্যক্তির হাড়গোড় উড়ন্ত পাখিতে রূপান্তরিত হয়, যাকে 'হাম্মাহ' বলা হতো। যাহোক, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কুসংস্কারকে অলীক ধারণাপ্রসূত বলে অভিহিত করেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকে এসব ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এসব বিশ্বাস করা হারাম এবং তা নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফর।

পক্ষান্তরে, আমাদের এ বিশ্বাস রাখা বাঞ্ছনীয় যে জীবাণু সংক্রমিত হওয়া অনেক সময় রোগের কারণ

হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তু ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত ও তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ তিনি যদি ইচ্ছা না করেন, তাহলে রোগ জীবাণু সংক্রমিত হবে না অথবা সংক্রমিত হবে, কিন্তু রোগের কারণ হবে না। এমন বিশ্বাস শরীআতের দৃষ্টিতে যেমন অবাঞ্ছিত নয়, তেমনি সংশ্লিষ্ট হাদীসের বিপরীতও নয়। কিন্তু কিছু রোগ ছোঁয়াচে বা সংক্রমণ হওয়ার ব্যাপারে সমাজে একটি ধারণা রয়েছে। যেমন, কুষ্ঠরোগ ও মহামারী। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। কেননা এ উপদেশ গ্রহণ করা তাকদীর এবং তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়, বরং এসব আল্লাহ পাকের ইচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল। এ কারণেই রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন যে, এ ধরনের রোগ যদিও সংক্রামক কিন্তু তাঁর সংক্রমণ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এসবের নিজস্ব কোন শক্তি বা প্রভাব নেই। এ ব্যাখ্যা শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। (সূত্র : তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৪/৩৭২, চিকিৎসা অধ্যায়)

মোট কথা, হাদীসে ছোঁয়াচে রোগকে অস্বীকার করা হয়নি, বরং ভ্রান্ত আকীদা ও ধারণাকে খন্ডন করা হয়েছে মাত্র। আর দুনিয়া হলো দারুল আসবাব তথা উপকরণনির্ভর স্থান। তবে একজন মুমিনের জন্য এ বিশ্বাস রাখা জরুরী যে পার্থিব জগতের অন্যান্য উপকরণসমূহের ন্যায় রোগ সংক্রমণ ও কার্যত আল্লাহ্ তা'য়ালার ইচ্ছা ও হুকুমের ওপর নির্ভরশীল। অতএব, ছোঁয়াচে রোগী থেকে সতর্ক থাকা শরীআত পরিপন্থি নয়, বরং রোগ ছোঁয়াচে হওয়ার কারণে রোগী থেকে সতর্ক থাকায় বাঞ্ছনীয়। (সূত্র : মুফতী দেলাওয়ার হোসাইন প্রণীত ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা, পৃষ্ঠা ১১, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১)

ওপরে বর্ণিত বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে ইসলামের দৃষ্টিতে সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই এবং আবার নবীজি কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বাহ্যিক দিক থেকে এ দু'টো বক্তব্য পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে কোনো অসংগতি নেই। জাহেলী যুগে মনে করা হতো যে ছোঁয়াচে রোগীর সংস্পর্শে গেলেই রোগ হয়। এখানে তারা আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতাকে অস্বীকার করতো। ইসলাম বলে যে, রোগ-ব্যাধি আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং তিনি যাকে ইচ্ছা রোগে আক্রান্ত করেন, আর যাকে ইচ্ছা রোগ থেকে হিফাজত করেন। কিন্তু জাহেলী যুগে মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিলো যে, বাহ্যিক উপকরণ ও কার্যকারণ সূত্রই রোগ ছড়ায়। আল্লাহ্র তাতে হাত নেই। ইসলাম এ ধারণার কঠোর বিরোধী। তাই ইসলাম রোগের বাহ্যিক কার্যকারণ ও উপকরণসমূহ থেকে সাবধান ও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেয়। তবে এসব কার্যকারণ ও উপকরণও আল্লাহ্র সৃষ্টি।

যেসব বাহ্যিক কারণে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকলেও আল্লাহর হুকুম ব্যতীত রোগ হতে পারেনা। এসবের প্রতি বিশ্বাস রাখাই মুসলমানদের ঈমান। আধুনিক বিজ্ঞান ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে রোগের উপকরণ ও কার্যকারণ আবিস্কার করতে পেরেছে এবং এ দুটোই রোগ সৃষ্টির মূল কারণ বলে অভিমত দিয়েছে। তবে এখানে এসেই বিজ্ঞান থেমে গেছে। কিন্তু every cause origingates from a cause, and Islam has reached to that ultimate cause. অর্থাৎ প্রত্যেক কারণের পিছনে এক বা একাধিক মূল কারণ রয়েছে। আর ইসলাম সে সব মূল কারণের

দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করতে চায়। যাহোক, সংক্রমণ (infection) যদি রোগের উৎপত্তি ও রোগ সৃষ্টির মূল কারণ হতো, তাহলে প্রথম যে ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত হলো, তার রোগ কোথা থেকে এলো?

রোগ সংক্রমণ সম্পর্কিত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির একটি মানবিক দিকও রয়েছে। রোগ সংক্রমণ বা ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস করলে এধরনের ব্যাধির রোগীরা সবাই অস্পৃশ্যে পরিণত হবে। মানবতার হক আদায় তখন নিদারুণভাবে বাধাগ্রস্থ হবে। কেউ এধরনের রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে এগিয়ে আসবেনা। ফলে আল্লাহর অগণিত চিকিৎসা বা সেবা-শুশ্রূষা থেকে বঞ্চিত হবে। তাই ইসলামের মহান নবী করীম সল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে যেমন কুষ্ঠ, প্লেগ রোগ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন, (যা আমি আগের হাদীসগুলোতে আলোচনা করেছি), এবং তিনি যথাযথ সতর্কতা গ্রহণ করতে বলেছেন; আবার অপরদিকে রোগীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তখন সবধরনের কুসংস্কারমূলক ধারনা উপেক্ষা করে আর্ত-মানবতার সেবায় এগিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি একই প্লেটে জনৈক কুষ্ঠরোগীর সাথে খানা খেয়ে রোগীর সেবার এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা ইতিহাসের পাতায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত জনৈক ব্যক্তির হাত ধরে তাঁর হাত নিজের আহারের পাত্রের মধ্যে রেখে বলেন, "আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা রেখে এবং আল্লাহ্‌র নামে খাও।" (আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [১৫১]

ছ্যুত-ছাত, সংক্রামক ব্যাধি বা ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কে আমাদের দেশে দুটি বিপরীত মত দেখা যায়। একদল লোক কোনো প্রকার ছ্যুত-ছাত বা সংক্রামক ব্যাধিতে বিশ্বাসী নয়। তাদের মতে এমন কোনো রোগ নেই যা একজন থেকে অন্যের মধ্যে ছড়াতে পারে। তারা ছ্যুত-ছাতকে মনগড়া খেয়াল মনে করে এবং ঈমানের দুর্বলতার কারণ অথবা কমপক্ষে আল্লাহ্ প্রদত্ত তাকদীর থেকে দূরে চলে গেছে বলে অহেতুক মন্তব্য করে থাকে।

অপরদিকে একদল লোক এ নিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি করে থাকে। তারা সব কিছুতেই ছোঁয়াচে রোগের গন্ধ পায়। এই দলের লোক ছ্যুত-ছাত সম্পর্কে কল্পিতভাবে ভয়ের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে রোগীর সাথেও মিশেনা, শরিকানায় পানির গ্লাস ব্যবহার করেনা এবং রুমাল, তোয়ালে একজন অন্যজনেরটা ব্যবহার করেনা। তাদের মন-মগজে ছ্যুত-ছাত লাগার চিন্তা এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে যে প্রতিটি শরিকানা বিষয়কেই তাদের নিকট স্বাস্থ্য রক্ষানীতির পরিপন্থি বলে মনে হয়।

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা! বাস্তবে বেশ কয়েকটি সংক্রামক ব্যাধি রয়েছে যেমন : যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত রোগ, কলেরা, প্লেগ ইত্যাদি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। গত কয়েকদিন যাবত আমরা swine flue-এর নাম শুনে আসছি, যা এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। বস্তুত এসব রোগের জীবাণু একজন অসুস্থ ব্যক্তি থেকে অপর সুস্থ ব্যক্তির উপর এমন প্রভাব ফেলে যেমন আগুন, পানি, ঠাণ্ডা ও গরম শরীরের উপর স্বীয় বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব বিস্তার করে। তবে এগুলো সবই আল্লাহ্‌র হুকুমে হয়ে থাকে। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আতীয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীস বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ছ্যুত-ছাত পেঁচা ও মৃত আত্মার শুভা-শুভ

গণনা (ভবিষ্যতে ভালো-মন্দের লক্ষণ) কোনো বিষয় নয়। আর সফর মাসেও কোনো কিছু নেই। অবশ্য রুগ্ন পশুকে সুস্থ পশুর নিকট নিয়ে যাবেনা। সুস্থ জানোয়ারকে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাও। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এর কারণ কী? তিনি ইরশাদ করলেন, এটা ঘৃণ্য অথবা কষ্টের বিষয়।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মু'জামুল আওসাত) [১৫২]

প্রশ্ন-৫২ : সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন?

উত্তর : **নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার রোধে বেশ কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। এ বিষয়টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমি বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যাহোক, আমি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ছয়টি হাদীস এখানে আলোচনায় নিয়ে আসবো। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :**

১. "সুস্থ ব্যক্তি যেকোনো জায়গায় বা আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তিদের মাঝে আনা উচিত নয়।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও ইবনে মাজাহ) [১৫৩]

২. "অসুস্থ উটগুলোর মালিক তার উটগুলোকে সুস্থ পশুর দলে পাঠিয়ে দেবেনা। (কারণ এতে ঐসব সুস্থ প্রাণী অসুস্থতায় আক্রান্ত হতে পারে।)" (আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু; সহীহ মুসলিম ও ইবনে মাজাহ) [১৫৪]

৩. "কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত রোগীর দিকে অপলক নেত্রে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকবেনা।" (ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু; ইবনে মাজাহ) [১৫৫]

"Do not continue looking at the person affected with leprosy." (Ibn Majah) [155]

৪. "যখন কোনো কুষ্ঠরোগীর সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয়, তখন তাদের মাঝে এক ধনুকের দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলবে।" (মুসনাদে আবি ইয়ালা) [১৫৬]

৫. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সিংহের আক্রমণ থেকে পালাবার বা বাঁচবার জন্য যেমন চেষ্টা করো, তেমন কুষ্ঠরোগী থেকেও দূরে থেকো।" (সহীহ আল বুখারী) [১৫৭]

৬. হযরত আমর ইবনে আশ-শারীদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর পিতা থেকে জেনে বলেন, "সাকিফ-এর প্রতিনিধি দলে এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পাঠালেন, তোমরা ফিরে যাও। আমরা তোমাদের আনুগত্যের অঙ্গীকারনামা (বায়আাত) কবূল করে নিয়েছি।" (সহীহ মুসলিম ও ইবনে মাজাহ) [১৫৮]

সম্মানিত দর্শক-পাঠক ও শ্রোতামণ্ডলী! উপরে বর্ণিত ৪টি হাদীসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুষ্ঠরোগ ও তজ্জাতীয় রোগাক্রান্ত লোকদের নিকট থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। কুষ্ঠরোগ ও কুষ্ঠরোগী সম্পর্কে যে ক'টি হাদীস বর্ণনা করলাম তা জেনে একথা বলা ঠিক হবেনা যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুষ্ঠরোগীকে ঘৃণা করতেন। বরং তিনি কুষ্ঠরোগীর সাথে একত্রে খানা খেয়েছেন। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জনৈক কুষ্ঠ রোগীর ডান হাত ধরে তিনি যে প্লেটে খানা খাচ্ছিলেন সে পেটে তার হাত রেখে বলেন, আল্লাহ্‌র উপর আস্থা রেখে আল্লাহ্‌র নামে খাওয়া শুরু করো।" Trust in Allah and eat in the Name of Allah. (আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [১৫৯]

এ হাদীসটি এ কথাই প্রমাণ করে যে তিনি কুষ্ঠরোগীকেও খাদ্য গ্রহণের সময় শরীক করতেন। হাদীসটি আগের পর্বেও আলোচনা করেছি।

সম্মানিত দর্শক-পাঠক! আমি যে কয়েকটি সহীহ হাদীস আলোচনা করলাম তা প্রমাণ করে যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বে ছোঁয়াচে রোগ বা সংক্রামক ব্যাধি নামক concept এর প্রথম আবিষ্কারক। স্পেনে মুসলমানগণ যখন বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় নিয়োজিত, তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বাণীগুলো গ্রীক ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। সে সময় অনেক সাদা চামড়ার লোক ঐ Prophetic traditions গুলোতে যেসব scientific wisdom লুকায়িত ছিলো, তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু করেন। সাদা চামড়ার লোক বলতে আমরা সাধারণত European, American ও Australian-দেরকে বুঝে থাকি। We are neither black nor white. আমাদের গায়ের রং কিছুটা হলদে। অর্থাৎ আমরা আমাদেরকে yellow or brown skinned বলতে পারি।

যাহোক, ঐসব গবেষণার ফলে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনেক বিষয়ের নতুন নতুন ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করেন। তাই ঐ মেডিকেল concept গুলো যে তারাই আবিষ্কার করেছেন তা মেনে নেয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। বস্তুত ইসলামের ইতিহাস আমাদের তাই বলে। মূলত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন spreading contagious diseases, contra-indications in sickness, adverse effects of medicines, quarantine system ইত্যাদি বিস্ময়কর মেডিকেল concept গুলোর প্রথম আবিষ্কারক। কারণ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যগুলো ছিলো ৭ম শতাব্দীতে। অথচ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের concept গুলোর অধিকাংশই আবিষ্কৃত হয়েছে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে।

প্রশ্ন-৫৩ : মুহতারাম, আমরা জানি প্লেগ এক প্রকার সংক্রামক ব্যাধি ও ছোঁয়াচে রোগ। এই প্লেগ রোগ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুনির্দিষ্ট statement বা বক্তব্য আছে কি?

উত্তর : প্লেগ যে একটি ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি তা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বপ্রথম বর্ণনা করেন ৭ম শতাব্দীতে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যখন সংক্রামক ব্যাধি আবিষ্কার করেছে, তার প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তিনি প্লেগ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আমি এখানে প্লেগ রোগ সম্পর্কে একটি বিখ্যাত হাদীস আলোচনা করবো যা সহীহ মুসলিম ও বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত উসামা ইবনে যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন জানতে পারবে যে অমুক জায়গায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, তখন সেখানে তোমরা যাবেনা। আর তোমরা যেখানে আছো সেখানে যদি প্লেগের আবির্ভাব হয়, তাহলে ঐ স্থান থেকে পলায়ন করবেনা।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [১৬০]

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা-পাঠক! এই হাদীসটির মর্মার্থ খুবই ব্যাপক। এখানে চিকিৎসা সম্পর্কিত দুটো শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। যারা মেডিকেল সায়েন্স সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন তারা সহজেই বুঝতে পারবেন।

প্রথম দিকটি হলো, প্লেগ বা pestilence নামক রোগটি যদি কোনো এলাকায় প্রবেশ করে বা ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে সেখানে গিয়ে নিজে রোগটিকে আমন্ত্রণ জানিওনা। অর্থাৎ এ ধরনের ব্যাধি থেকে নিজেকে দূরে রাখো এবং জেনে-শুনে নিজকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিওনা।

দ্বিতীয় দিকটি হলো, যদি নিজে এ ব্যাধি থেকে বাঁচতে না পারো তবে কমপক্ষে অপরকে বাঁচাতে চেষ্টা করো। কেননা যেভাবে কোনো মারাত্মক ব্যাধি থেকে নিজকে রক্ষা করা প্রয়োজন, তদ্রূপ অন্যকে রক্ষা করাও প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। বস্তুত এধরনের আদেশের উপর ভিত্তি করেই quarantine (No in No out) নামক medical concept আবিষ্কৃত হয়েছে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "প্লেগ রোগ প্রত্যেক মুসলামানের জন্য শাহাদাত।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) ১৬১

অর্থাৎ প্লেগে মৃত্যুবরণ করা মুসলমানগণ শাহাদাতের মর্যাদা পাবে।

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি সুপরিচিত হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন উৎসর্গ ছাড়াও শহীদ হওয়ার আরো পাঁচটি উপায় আছে। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো প্লেগ।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) ১৬২

অর্থাৎ প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেক মুসলমানই শহীদের মর্যাদা পাবে।

প্লেগ সম্পর্কে আরো Prophetic statements রয়েছে, যা সময় স্বল্পতার কারণে আলোচনা করা সম্ভব হলোনা।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কলেরা বা পেটের দাস্ত ও প্লেগ রোগে মারা গেলে (সে মুসলমান) শাহাদাত লাভ করবে।" (সহীহ আল বুখারী) ১৬৩

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মদীনায় মসীহে দাজ্জাল ও প্লেগ রোগ ঢুকতে পারবেনা।" (সহীহ আল বুখারী) ১৬৪

অধ্যায়-৪

রোগ ও তার প্রতিকার

প্রশ্ন-৫৪ : "রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধের গুরুত্ব বেশি" এ প্রসঙ্গে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আছে কি?

উত্তর : এ বিষয়ে একটি বিখ্যাত proverbial statement হচ্ছে, "An ounce of prevention is better than one ton of treatment." অর্থাৎ "এক আউন্স রোগ প্রতিরোধ এক টন রোগ নিরাময় থেকে উত্তম।"

এ উক্তিটি নবী করীম সল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলে ইন্টারনেটে তথ্য পেয়েছি। কিন্তু হাদীস গ্রন্থে কোনো রেফারেন্স পাইনি। যাহোক, আমি বেশ কয়েকজন সম্মানিত হাদীসশাস্ত্র বিশারদকে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা বলেছেন যে এ উক্তিটি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়।

আমরা আরো জানি যে "Prevention is better than cure." রোগ প্রতিরোধ রোগ নিরাময়ের চেয়ে শ্রেয়। বর্তমানে এ কথাও শোনা যায় যে "Prevention is cheaper than cure." অর্থাৎ "রোগ প্রতিরোধ হচ্ছে রোগ নিরাময়ের চেয়ে সস্তা।"

বর্তমানে আরো শোনা যাচ্ছে যে A stitch in time saves nine. অর্থাৎ সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়ের সমান। উদাহরণস্বরূপ, যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধের জন্য BCG vaccine নেয়া আর যক্ষ্মা রোগ হবার পর Anti TB ওষুধের মাধ্যমে ছয় মাসব্যাপী চিকিৎসা গ্রহণ করা, এর মধ্যে কোনটি কম ব্যয়বহুল? নিশ্চয়ই BCG নেয়ার জন্য সম্ভবত কোন টাকা-পয়সাই খরচ হবে না। কারণ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এটা বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকে।

এসব কারণেই ইসলাম এসব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। যাহোক, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধকে বেশি গুরুত্ব দিতেন তা আমরা বিভিন্ন হাদীস থেকে জানতে পারি। "The Prophet (SAWS) advised the Muslim Ummah that one should try to prevent disease instead of just curing them." তিনি রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যেমন, প্রতিদিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাওয়া। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে তাকে ওই দিন কোনো বিষ বা যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [১৬৫]

তা ছাড়া রমযানের রোযা রাখা, নিয়মিত সলাত বা নামায আদায় করা, পাঁচবার উযূ করা, পরিমিত পরিমাণে নিয়মিত হালাল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা ও হারাম খাদ্য বর্জন করা, দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন বৈধ নিয়ম-নীতি মেনে চলা, ব্যক্তিগত জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা ইত্যাদির মাধ্যমেও রোগ প্রতিরোধ করা যায়। আমরা এগুলোকে ধাপে ধাপে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

পরিমিত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ

হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "মানুষ পেটের তুলনায় নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করেনা। আদম সন্তানের জন্য কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট যা তার মেরুদণ্ড সোজা রাখে। তবে যদি এর অতিরিক্ত গ্রহণ করতে হয় তাহলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য আর এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।" (মুসনাদে আহমাদ ও আত-তিরমিযী) [১৬৬]

বিখ্যাত আরবীয় চিকিৎসক ও নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রখ্যাত সাহাবী হারিস ইবনে কালাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "What is the best medicine?" "সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ কী?" তিনি উত্তর দিয়েছেন, "প্রয়োজন।" অর্থাৎ necessity, hunger বা ক্ষুধা। আর যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো, "What is a disease?" অর্থাৎ "রোগ কী?" তিনি উত্তর দিলেন, "entry of food upon food." অর্থাৎ আগের খাবার হজম হবার আগেই পুনরায় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা।

ইবনে সীনাও একই ধরনের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "Never have a meal until the one before it has been digested." অর্থাৎ আগের খাবার হজম হবার পূর্বে পুনরায় খাদ্য গ্রহণ না করাই শ্রেয়।

অপরদিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক Hippocrates বলেন, "All excess is contrary to the law of Nature. Let your eating, your drinking, your sleeping and your sexual intercourse all be in moderation." (As Suyuti) [167] অর্থাৎ "সকল প্রকার বাড়াবাড়ি বা অতিরিক্ততাই প্রকৃতির স্বভাব বিরুদ্ধ। তোমার পানাহার, তোমার ঘুম, তোমার নারী সম্ভোগ, সবকিছুই পরিমিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।" (আস-সুয়ূতী) [১৬৭]

আর আমরা তো প্রায়ই বলে থাকি, Excess of everything is bad. (সবকিছুর অতিরিক্তই খারাপ) একজন প্রখ্যাত কবি বলেছেন, "O! you who eat whatever you feel like and then curse medicine and doctors, you can only reap what you have sown. Prepare yourself for the illness that is coming to you." (হে মানুষ তোমার যা মন চায় তাই তুমি খাও এবং পরে চিকিৎসক এবং ওষুধকে দোষারূপ করে থাক। তুমি যে বীজ রোপণ করবে সে অনুযায়ী তুমি ঘরে ফসল তুলবে। তোমার যে অসুস্থতা তোমার দিকে ধেয়ে আসছে তা থেকে তুমি সতর্কতা অবলম্বন করো।)

অতএব মন যা চায় সেরকম নিষিদ্ধ কোন খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পরে অন্যকে দোষারূপ করা উচিত নয়। Therefore we should not eat the prohibited food items and fall sick.

রোযা রাখলে কী কী medical benefits পাওয়া যাবে তা অন্য কোনো পর্বে আলোচনা করা যাবে। মূল কথা হলো বর্তমান বিশ্বেও fasting-কে রোগ নিরাময়ের অন্যতম উপায় মনে করা হয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কোনো কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা জুস fasting করে। আবার কোনো কোনো fasting-এ partial abstinence-এর কথা বলা হয়, যেখানে শুধু পানি

পান করা যাবে। আবার অনেক fasting-এ total abstinence from food and drink-এর কথা বলা হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তা শিথিলযোগ্য। তবে ইসলামের বর্ণিত রোযা যুগ যুগ ধরে তার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে সমাজে পালিত হয়ে আসছে। কোনো কিছু যোগ-বিয়োগ করার সুযোগ বা প্রয়োজন এতে নেই। হিন্দু ধর্মে রোযাকে উপবাস বলা হয়ে থাকে।

রোযার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ

প্রশ্ন-৫৫ : আচ্ছা মুহাতারাম রোযার মাধ্যমে কিভাবে রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব ?

উত্তর : রোযা বা fasting তাকওয়াসম্পন্ন সমাজ গড়া ছাড়াও রোগ থেকে মুক্ত থাকার অন্যতম উপায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়া'লা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন যে "এই সাওম বা রোযা রাখার বিধান পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের জন্যও ফরয করা হয়েছিল"। (আল বাকারাহ ২:১৮৩)

ইমাম কুরতুবী রহমতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন যে হযরত মুজাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা রমযানে রোযা প্রত্যেক উম্মতের ওপর ফরয করেছেন। (আল-জামি'লি আহকামিল কুরআন লিল কুরতুবী, ২/২৭৪) অনুরূপ ইবনে কাছীর রহমতুল্লাহি আলাইহিও তদীয় তফসীরে হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহির থেকে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

আমি বেশ কয়েকটি তাফসীরগ্রন্থ অধ্যয়ন করেও জানতে পারিনি যে পূর্ববর্তী উম্মতগণের রোযার সংখ্যা, সময়কাল ও অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ কী ছিলো। অর্থাৎ, তারা দিনে কয় ঘণ্টা রোযা রাখতেন, বছরে কতোদিন ইত্যাদি। যাহোক, এটি সত্য যে, মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই রোযার এ বিধান দেয়া হয়েছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা রোযা রাখো, সুস্থ থাকবে।" (আল মু'জামুল আওসাত) [১৬৮]

নামাযের মাধ্যমে রোগ থেকে নিরাপদ থাকা

প্রশ্ন-৫৬ : আচ্ছা নামাযের মাধ্যমে কীভাবে রোগ থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব?

উত্তর : নামাযের মাধ্যমে রোগ নিরাময় বা রোগ থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব। নামাযের যেসব physical activities রয়েছে, তা প্রত্যেকটি মানবদেহের various physiological and respiratory process গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। It helps in many ways. নামাযে নড়াচড়া ও উঠা-বসায় রক্ত সঞ্চালনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এতে শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই সামঞ্জস্যশীল মাঝারি ধরনের দৈহিক ব্যায়াম হয়। চর্বির স্ফীতিরোধে সর্বোত্তম পন্থা হলো ব্যায়াম। আর নামায সেই কাজটিই করে। তাছাড়া তাকবীর, কিয়াম, জলসা, রুকূ-সিজদা, তাশাহ্হুদ-দরূদ, সালাম ইত্যাদি কাজ দেহের বিভিন্ন অংশে অনেক উপকার সাধন করে।

জামায়াতে নামায পড়ার জন্য দৈনিক পাঁচবার মসজিদে উপস্থিতি, বাড়ি থেকে মসজিদ আর মসজিদ থেকে বাড়ি যাতায়াত। এ কাজটি যদি কেউ দিনে পাঁচবার করেন তাহলে সেটা প্রায় এক মাইল বা এক

কিলোমিটার দূরত্বের সমান হয়। অবশ্য মসজিদের পাশেই যাদের বাড়ি তাদের কথা আলাদা। এভাবে প্রতিদিন কেউ যদি এক কি.মি. বা দুই কি.মি. পথ হাঁটাহাঁটি বা exercise করেন তাহলে তার diabetes হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আর থাকলেও তা নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

আপনারা যারা শহরে বাস করেন, বিশেষ করে যারা ঢাকা শহরে থাকেন তারা সকাল বেলা গণভবনে বা সংসদ ভবন এলাকায় গিয়ে দেখুন, কতো লোক হাঁটাহাঁটি করছে। সকালে অনেকে প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটেন। এ সবই সুন্দর স্বাস্থ্যের জন্য বা স্বাস্থ্যকে অটুট রাখার জন্যই। অপরদিকে নামাযের উযূতে, যা দিনে পাঁচবার করা হয়, তাতে দেহ ও মনের অনেক উপকার হয়। শরীরের যে কয়টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্বদা খোলা থাকে, ধূলাবালি যেখানে সহজে পড়ে, উযূতে সেসব অঙ্গ ধোয়ার বিধান রাখা হয়েছে। তাই পাঁচবার কেউ উযূ করলে তিনি সর্বদা সুস্থ বা fresh থাকবেন। ক্লান্তিবোধ তার থাকবেনা। দেহ ও মন উৎফুল্ল থাকবে। মিসওয়াক করা ও মুখমণ্ডল পাঁচবার ধোয়া স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উত্তম কাজ।

নামায রোগমুক্ত করে। এ বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন, আমিও হিজরত করলাম। আমি নামায পড়ার পর তাঁর পাশে বসলাম। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "তোমার পেটে কী ব্যথা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তুমি উঠে দাঁড়িয়ে নামায পড়ো। কেননা নামাযের মধ্যে রোগমুক্তি আছে।" (ইবনে মাজাহ ও আস-সুয়ূতী) [১৬৯]

হযরত আবুল হাসান আল-কাত্তান-ইবরাহীম ইবনে নাসর-আবূ-সালামা-দাঊদ ইবনে উলবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে যে তিনি ফারসী শব্দযোগে (দরদভরা কণ্ঠে) বলেন, তোমার পেটে কি ব্যথা অনুভব করছো? আবূ আব্দুল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এক ব্যক্তি এ হাদীসের বরাতে তার পরিবারবর্গকে বললো, "নামাযের দ্বারা সাহায্য নিয়ে সাফল্য অর্জন করো।" (ইবনে মাজাহ) [১৭০]

বস্তুত নামাযে যদি আমরা রসূল সল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করি অর্থাৎ, তিনি যে নিয়মে নামায পড়েছেন বা পড়তে বলেছেন, তা যদি সঠিকভাবে মেনে চলি, তাহলে শরীরের এমন কোনো অঙ্গ বাকি থাকে না যার ব্যায়াম এমনি উত্তম পদ্ধতিতেই হয়ে যায়না। Medical science আজকাল হাত, মুখ, নাক, পা ইত্যাদি ধোয়াকে রোগ প্রতিরোধের স্বাস্থ্যসম্মত উপায় হিসেবে বর্ণনা করেছে। অমুসলিম সম্প্রদায় মাত্র কিছুদিন পূর্বে বুঝতে পেরেছে যে ঘন ঘন hand washing-এর গুরুত্ব কতো বেশি। তাই আজকাল রোগ-জীবাণুর বিস্তার রোধে হাসপাতাল ও ক্লিনিক ঘন ঘন hand washing-এর নিয়ম প্রচলন করেছে। বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) 'হাত ধোয়া দিবস' পালন করছে যা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লামের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার মূলনীতিসমূহ

প্রশ্ন-৫৭ : আমরা গত কয়েকটি পর্বে স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও পবিত্রতার মূলনীতিসমূহ নিয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। নবী করীম সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তথা স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য বেশ কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তা মেনে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এসব বিষয়ে ইসলামের বিধান আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপদেশ এ দুটোর সমন্বয় করে আলোচনা করুন।

উত্তর : **হ্যাঁ, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বেশ কতগুলো বিষয় মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও নিরাপত্তার জন্য চারটি সুনির্দিষ্ট উপদেশ দিয়েছেন, যা মেনে চললে আমাদের সঠিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।**

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা নিদ্রা যাবার কালে তৈজসপত্রসমূহ ঢেকে রাখবে। মশকগুলোর মুখ বন্ধ করবে, দরজা-জানালা বন্ধ করে দিবে এবং বাতিগুলো নির্বাপিত করবে। কেননা শয়তান মশকের মুখ ছুটাতে পারে না, বন্ধকৃত দরজা খুলতে পারে না এবং আবৃত পাত্র অনাবৃত করতে পারে না। যদি তোমাদের কেউ পাত্র ঢাকার জন্য কাঠি ছাড়া আর কিছু না পায়, তবে তাই পাত্রের মুখের ওপর রেখে যেনো আল্লাহর নাম নেয়। জেনে রাখবে, (চেরাগ বা বাতি জ্বালিয়ে ঘুমালে) ইঁদুর গৃহকর্তার ঘর জ্বালিয়ে দেয়।" (সহীহ মুসলিম) [১৭১]

ইবনে মাজাহ শরীফের হাদীসের বর্ণনা নিম্নরূপ। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র ঢেকে রেখো, মশকের মুখ বন্ধ করো, প্রদীপ নিভিয়ে দাও এবং (শয়নকালে) ঘরের দরজা বন্ধ করো। কারণ শয়তান (মুখবন্ধ) মশক খুলতে পারেনা এবং (ঢেকে রাখা) পাত্রও খুলতে পারেনা। তোমাদের কেউ যদি পাত্র ঢাকার কিছু না পায় তবে সে যেনো তার উপর অন্তত কোনো লাকড়ি বা কঞ্চির টুকরাই আড়াআড়িভাবে রেখে দেয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে। কেননা ইঁদুর মানুষের ঘর জ্বালিয়ে দিতে পারে।" (ইবনে মাজাহ) [১৭২]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রাতের বেলা তিনটি পাত্র রাখতাম এবং তিনটিই ঢেকে রাখতাম। একটি তার পবিত্রতা অর্জনের জন্য, একটি তার মিসওয়াকের জন্য এবং একটি তাঁর পান করার জন্য।" (ইবনে মাজাহ) [১৭৩]

এ তিনটি হাদীসে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক চারটি নীতি বর্ণনা করেছেন।

প্রথম নীতি **হচ্ছে, খাদ্যদ্রব্যের বাসনপত্র ঢেকে না রাখা হলে মশা-মাছি, তেলাপোকা, টিকটিকি ইত্যাদি কীট-পতঙ্গ পড়ে খাদ্যদ্রব্যকে দূষিত করতে পারে। অন্যত্র এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে যে, পাত্রের মুখ ঢাকার জন্য কোনো কিছু পাওয়া না গেলে মুখে অন্তত কোনো কাঠি বা কঞ্চির টুকরাই রেখে দিও। কারণ খোলাপাত্রে যেকোনো পোকামাকড়, ক্ষতিকর জিনিস বা কীট পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে সে খাদ্য বা পানীয় দূষিত হয়ে যাবে। আর দূষিত খাদ্যদ্রব্য খেলে অসুস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে। সত্যিই কী গুরুত্বপূর্ণ hygienic advice বা স্বাস্থ্যসম্মত উপদেশ, যা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পুরোপুরি সমর্থন করে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উপদেশটিই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বলে আসছে।**

দ্বিতীয় নীতি **হচ্ছে, কলস বা পানীয় পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখা। এটিও এক স্বাস্থ্যসম্মত উপদেশ, যা মেনে**

চললে আমরা অসুস্থতার আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারি। আমরা যদি পানির পাত্রের মুখ বন্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করি তাহলে শয়তান বন্ধ পাত্রের মুখ খোলার এবং পানি দূষিত করার সুযোগ পাবেনা।

এখানেও পানি দূষিত করার জন্য ধুলাবালি কীটপতঙ্গের আশঙ্কার কথা অনুমান করা যায়। তাছাড়া বাসনপত্র ঢেকে রাখলে তা শয়তানের পক্ষে খোলা সম্ভব হবেনা। শয়তান তো আমাদের অকল্যাণ করতে সর্বদা নিয়োজিত থাকে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে খালি পাত্র উপুড় করে রাখার নির্দেশ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, "নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্র ঢেকে রাখতে, মশকের মুখ বন্ধ করতে এবং খালি পাত্র উপুড় করে রাখতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।" (ইবনে মাজাহ) [১৭৪]

তৃতীয় নীতি হচ্ছে, 'ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখা।' নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ রেখে শয়তানের ঘরের ভেতর প্রবেশ করার সুযোগ নষ্ট করতে পারবে। নতুবা শয়তান তোমাদের গাফিলতির সুযোগ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে তোমাদের অনেক অনিষ্ট করে ফেলতে পারে।

এ রিওয়ায়াতের মর্মার্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে রাতের বেলায় আমরা যদি ঘুমাতে যাবার আগে দরজা বন্ধ করে না রাখি, তাহলে চোর-ডাকাত সহজেই ঘরে ঢুকে মূল্যবান মালামাল চুরি করে নিয়ে যেতে পারে এবং দুষ্ট লোকেরা অনেক অনিষ্ট করতে পারে। তাই নিরাপত্তার জন্য এ উপদেশ মেনে চলা আমাদের নিজেদের স্বার্থেই বেশি প্রয়োজন। আমার মনে হয় ঘরে security lock লাগানোর বিধান নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উপদেশের উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়েছে।

সর্বশেষ বা চতুর্থ নীতি হচ্ছে, 'ঘুমানোর পূর্বে বাতি নিভিয়ে দেয়া।' এ বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তোমরা যদি বাতি জ্বালিয়ে রেখেই ঘুমিয়ে পড়ো তাহলে ঘুমন্ত অবস্থায় ইঁদুর বাতির আগুন থেকে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে, যা খুবই বিপজ্জনক। তাছাড়া ঘরে বাতাস প্রবেশ করেও আগুন লাগতে পারে বা ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই হাদীসে naked light তথা কুপির আলো বা উন্মুক্ত আলোর কথা বলা হয়েছে। কারণ ঐ সময়ে কোনো electric light ছিলোনা। আমাদের দেশে গ্রামের শতকরা ৯০ ভাগ বাড়িতে যুগ যুগ ধরে উন্মুক্ত বাতিই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বালিয়ে ঘুমানো উচিত নয়। তাতে একদিকে বিদ্যুতের অপচয় হয়, আর একদিকে শর্ট সার্কিটে মারাত্মক দূর্ঘটনা ঘটার ও সমূহ আশংকা থেকে যায়।

প্রশ্ন-৫৮ : ঘুমানোর পূর্বে আগুন নিভিয়ে রাখার বিষয়ে আরো কোনো হাদীস আছে কি?

উত্তর : ঘুমানোর পূর্বে আগুন নিভিয়ে রাখার বিষয়ে আরো কয়েকটি হাদীস রয়েছে। প্রথমটি বর্ণনা করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমিওনা।" (সহীহ মুসলিম) [১৭৫]

হযরত সালেম রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার পিতার সূত্রে জেনে বর্ণনা করেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা (রাতে) ঘুমানোর সময় তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখোনা।" (সহীহ আল বুখারী ও ইবনে মাজাহ) [১৭৬]

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রাতে

তোমরা শোবার সময় প্রদীপগুলো নিভিয়ে দিবে, ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিবে, মশকের (পানির পাত্রের) মুখ বেঁধে রাখবে এবং আহার ও পানীয়দ্রব্য ঢেকে রাখবে। (সহীহ আল বুখারী) [১৭৭]

এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীস এখানে আলোচনায় আনবো যা বর্ণনা করেন হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, একবার মদীনা শরীফের কোনো এক ব্যক্তির বাড়িতে আগুন লেগে যায়। ঘটনাটি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই এই আগুন তোমাদের দুশমন। সুতরাং তোমরা ঘুমানোর পূর্বে আগুন নিভিয়ে দাও।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজাহ) [১৭৮]

সুপ্রিয় দর্শক-শ্রোতা-পাঠক! আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, এই চারটি মূলনীতি মেনে চলা, তথা ১. খাদ্যদ্রব্যের পাত্র ঢেকে রাখা, ২. পানীয় দ্রব্যের পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখা, ৩. শয়নের পূর্বে ঘরের দরজা বন্ধ রাখা এবং ৪. ঘুমানোর পূর্বে বাতি নিভিয়ে দেয়া, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য অতীব প্রয়োজন, যা আমাদের নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম শতাব্দীতে বর্ণনা করে গেছেন আজ হতে ১৪০০ বছর পূর্বে। আল্লাহ্ এই চারটি মূলনীতি থেকে ফায়দা হাসিলের তাওফীক দিন। (আমিন)

শুধু তাই নয়, নিরাপত্তার জন্য তিনি ঘুমাতে যাবার আগে শয্যাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ঝেড়ে নিতে উপদেশ দিয়েছেন, যা সত্যি বিস্ময়কর। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ শুতে যায় তখন সে যেনো শয্যাটি ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না যে তার অবর্তমানে কোনো বিষাক্ত প্রাণী বা কীটপতঙ্গ বিছানায় লুকিয়ে আছে কিনা। বিছানা ঝেড়ে ফেলার পর এই দু'য়া পড়বে।" "বিইস্‌মিকা রব্বি ওয়াঅদ্বাতু জামবি ওয়াবিকা আরফাউহু ইন আমসাকতা নাফ্‌সী ফাবহামহা ওয়া ইন আরসালতাহা ফাহফাজহা বিমা তাহ্‌ফাজু বিহিস্‌সলিহীন।"

"হে প্রতিপালক! আপনারই নামে (বিছানায় আমার) দেহ এলিয়ে দিলাম এবং আপনারই সাহায্যে আবার তা উঠাবো। যদি আপনি (এর মধ্যে) আমার জান কবজ করে নিন তবে তার ওপর রহম করুন। আর যদি তাকে থাকতে দিন তবে ঠিক সেভাবেই হিফাজত করুন যেভাবে আপনি সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জানের হিফাজত করে থাকেন।" (সহীহ আল বুখারী) [১৭৯]

প্রশ্ন-৫৯ : গত কয়েকটি পর্বে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয় এবং রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও কমিউনিটি হেলথ নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা শুনেছি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে। এ বিষয়ে উপসংহারে কিছু বলুন আমাদের সম্মানিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে। সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোনো মন্তব্য আছে কি?

উত্তর : গত ২০১১ সালের ৫ ডিসেম্বর Medical Biochemists of Bangladesh-এর জাতীয় কনফারেন্সে সম্মানিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী দুজনেই গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। সেখানে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নজরে Prophetic medicine বিষয়টি আনি। তিনি আমাকে

আশ্বস্ত করে বলেন, বিষয়টি দেখবেন। তিনি বলেন, আমরা আগামীতে স্বাস্থ্যনীতি ব্যাপকভাবে ঢেলে সাজাতে চাই এবং এ উদ্দেশ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি মন্ত্রী মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ করেছি যে, Prophetic medical practices স্বাস্থ্যনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করুন। দেখবেন, এতে মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং মানুষ সাধারণ অসুখ-বিসুখ থেকে দূরে থাকবে। রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বেশি কার্যকর হবে। ফলে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বরাদ্দকৃত বাজেট অনেক সাশ্রয় হবে। আরব দেশে যদি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশিত স্বাস্থ্য ও পানাহার বিষয়ক বিধি-বিধান মেনে চলার কারণে দু'বছর কোনো লোক অসুস্থ না হয়ে থাকে, তাহলে এ দেশে তা সম্ভব হবে না কেন? যাহোক, আল্লাহ্‌র দেয়া অক্সিজেন ও আলো-বাতাস যেমন সমগ্র মানব জাতির উপকার ও কল্যাণের জন্য, তেমনি স্বাস্থ্য বিষয়ক নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক-নির্দেশনাও সকল মানুষের কল্যাণের জন্যই। যে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছে করলে তা থেকে উপকার লাভ করতে পারেন।

আমি সম্মানিত দর্শক-পাঠকদের নিকট আহ্বান জানাবো প্রাথমিক পর্যায়ে চলুন আমরা নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের preventive health বিষয়ক নির্দেশনাগুলো মেনে চলি। তাহলে আমরা অনেক রোগব্যাধি থেকে দূরে থাকতে পারবো ইনশা'আল্লাহ।

মানুষ যদি অসুস্থ না হয় তখন তার কোনো ওষুধও প্রয়োজন হয়না, আর ডাক্তারও দরকার হয়না। ফলে নিঃসন্দেহে আর্থিক সাশ্রয় হবে। সবচেয়ে বড় কথা, তার দৈনন্দিন কর্মঘণ্টা বেড়ে যাবে। কারণ অসুস্থ ব্যক্তি অফিস-আদালত ও কারখানায় কাজ করতে পারেনা। তাই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক 'সুন্দর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অভ্যাসগুলো' Good Hygienic Practice যদি মেনে চলি, তবে আমরা সর্বদিক দিয়ে কল্যাণ লাভে সমর্থ হবো। আমাদের দেহ-মন উভয়ই সুস্থ থাকবে।

যাহোক, আমি আবেদন জানাবো সরকারের নিকট, "Prophetic medical sciences" বিষয়টি আমাদের medical college গুলোতে undergraduate level-এ পড়ানো হোক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন সম্মানিত সাবেক vice chancellor অধ্যাপক ডা. এম এ তাহের ও অধ্যাপক ডাক্তার মো. নজরুল ইসলাম এ বিষয়ে দৃঢ়মত পোষণ করেন যে, Prophetic medical science can be successfully taught at the undergraduate levels in our medical colleges. আমি তাদের সুচিন্তিত জ্ঞানগর্ভ মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

প্রিয় দর্শক-শ্রোতা-পাঠক! স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, নিরাময় ইত্যাদি সম্পর্কে অনেকগুলো কুরআনের আয়াত এবং সহস্রাধিক সহীহ হাদীস রয়েছে, বিশেষ করে রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে। আমি এ সবগুলো হাদীস আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি। আমার জানামতে এতে একটি মাত্র হাদীসও খুঁজে পাওয়া যাবে না যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। আমি তাই বিনীতভাবে ও দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, স্বাস্থ্য ও রোগ নিরাময় সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য তথা 'তিব্বুন নববী' আধুনিক

এলোপ্যাথিক মেডিসিন বা হার্বাল মেডিসিনের সাথে অথবা পাশাপাশিভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে আমাদের সমাজে চালু করা যেতে পারে। কারণ, বিদ্যমান বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে কোনো একটিও রোগ নিরাময়ে সফলতার ক্ষেত্রে একক কৃতিত্বের দাবিদার হতে পারেনি। প্রত্যেক পদ্ধতিরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

তাই আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন জানাবো বর্তমানের জনস্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক স্বাস্থ্য নীতিকে অনুগ্রহপূর্বক রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ নিরাময় সম্পর্কিত বাণীসমূহের আলোকে সংশোধন করতঃ নতুনভাবে সংশোধিত স্বাস্থ্যনীতিতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা বিধান অন্তর্ভুক্ত করুন। কারণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কিত নবীজির বক্তব্য সমগ্র বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য। এসব বিধি-বিধান শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং তা সকল যুগে সকল জাতির ও সকল জনগোষ্ঠীর লোকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর দেয়া অক্সিজেন ও আলো-বাতাস যেমন সকল মানুষের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য, তেমনি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহের লুকায়িত শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সকল দেশের, সকল এলাকার, সকল সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর এবং সকল ভাষাভাষীর মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ নিরাময়ে সমভাবে প্রযোজ্য।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী! আপনি যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা বিধান আমাদের স্বাস্থ্যনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে কৃতকার্য হন, তাহলে আপনার নাম বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে এবং আপনি এ মহান কাজের বিনিময়ে ইহকালে কল্যাণ লাভ করবেন ও পরকালে জান্নাতের বিনিময়ে পুরস্কৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। আর এজন্য আপনি বাংলাদেশের সকল পেশা এবং রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে সবার ভালোবাসা অর্জন করতে সমর্থ হবেন।

My dear viewers-readers, In fact there have been over 500 Prophetic traditions and many Quranic verses on health and wellness, sickness and cure, particularly the preventive aspects of health. I have carefully examined them in the light of modern knowledge. In my humble opinion they can be used in combination with modern allopathic medicines and or partially herbal medicine as an integrated medical system in Bangladesh.

May I therefore, urge the Honourable Minister of Health of the Government of the People's Republic of Bangladesh to please restructure and reorganise the existing health care system on the basis of the traditions of the Holy Prophet (SAWS). Please include the Prophetic medical practices in the revised Health Policy. This is because Prophetic traditions on health and hygiene are for the entire mankind. They are not only for the Muslims, but for the people of all nations and in all ages, irrespective of their religious beliefs, colour, language

and creed. In fact all health-conscious and truth-loving men believed and lived in these traditions of the Prophet (SAWS).

Honourable Minister of Health, if you succeed in including the Prophetic medical practices in the National Health Policy, your name will be written in golden letters in the history of the health care delivery system in Bangladesh, and you will be rewarded in this life and in the life after death inshallah. You will be remembered by all people irrespective of the political beliefs and affiliations.

প্রশ্ন-৬০ : আচ্ছা মুহতারাম, স্বাস্থ্য, পবিত্রতা ও নিরাপত্তার বিষয়ে মূলনীতিসমূহ জানলাম। এবার অন্য প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন করছি। আমরা প্রায় দেড় কোটি লোক ঢাকায় বাস করি। হাজার হাজার দালানকোঠা আর অফিস-আদালত আমাদের এই শহরে। তাই এ মেগাসিটিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য আমাদের রাস্তাঘাট কেমন হওয়া উচিত? এ বিষয়ে হাদীস পাকে কোনো বর্ণনা এসেছে কি?

উত্তর : অত্যন্ত চমৎকার প্রশ্ন। বস্তুত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো টাউন প্ল্যানার বা road expert ছিলেননা। তবুও তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত একটি হাদীস থেকে আমরা রাস্তার প্রশস্ততা সম্পর্কিত নির্দেশনা পাই। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমরা কোন রাস্তার ব্যাপারে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে তখন তোমরা রাস্তা বা গলি সাত হাত প্রশস্ত রাখো।" (আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ) [১৮০]

অপরদিকে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা রাস্তার প্রস্থ নিয়ে মতানৈক্য করলে তা সাত হাত চওড়া করো।" (ইবনে মাজাহ) [১৮১]

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা! এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে আমাদের শহরের রাস্তার প্রশস্ততা কী হবে। ৭ হাত মানে ১০$\frac{১}{২}$ ফুট। যদিও ঐ সময়ে গাড়ি, বাস, ট্রাক ছিলোনা, তথাপিও তিনি রাস্তা বা গলি প্রশস্ত রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং রাস্তার প্রশস্ততা ১০$\frac{১}{২}$ ফুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তাই রাজউকের টাউন planner-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো, অন্তত ঢাকা শহরের কোনো রাস্তা যেনো কিছুতেই ১০$\frac{১}{২}$ ফুটের নিচে না হয়। বেশি হলে উত্তম। কোনো গলির প্রশস্ততা যেনো কিছুতেই এর কমে না হয় তা অনুগ্রহপূর্বক নিশ্চিত করুন। তাহলে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের শিক্ষা বাস্তবায়ন করা হবে এবং সুস্বাস্থ্যকর পরিবেশও গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

হাঁচি দেয়া ও হাই তোলা সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ

প্রশ্ন-৬১ : আমরা সবাই বিভিন্ন সময় হাঁচি দিয়ে থাকি। সাধারণভাবে হাঁচি দেয়াকে সভা-সমিতি ও মজলিসে আদবের পরিপন্থি বলে মনে করা হয়। অনেকে হাঁচির মধ্যে অশুভ লক্ষণ আছে বলে মনে

করেন। যাহোক, এই হাঁচি দেয়ার ব্যাপারে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো উপদেশ বা বক্তব্য আছে কি? হাঁচি এলে কী দু'য়া পাঠ করতে বা কী করতে হয়? হাঁচি দেয়াকে চিকিৎসা বিজ্ঞান সমর্থন করে কি? অনুগ্রহপূর্বক বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর : সম্মানিত দর্শক, হাঁচি দেয়া কোনো অভিশাপ নয়; কোনো কুলক্ষণও নয়; যদিও হিন্দু সম্প্রদায় ও কল্পনাপূজারী সম্প্রদায় একে অশুভ লক্ষণ মনে করে থাকে।

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "মহান আল্লাহ্ হাঁচি আসাকে পছন্দ করেন, কিন্তু হাই তোলা পছন্দ করেননা।" (সহীহ আল বুখারী ও আত-তিরমিযী) [১৮২]

হযরত আবূ আইউব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "কোনো ব্যক্তির হাঁচি আসলে সে উচ্চস্বরে 'আলহামদু লিল্লাহ 'আলা কুল্লি হাল' অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রশংসা বলবে, যেনো তার নিকট যারা থাকে, তারা তা শুনতে পায়। আর হাঁচি শ্রবণকারী জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' অর্থাৎ 'তোমার উপর আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন' বলবে। অতঃপর দু'য়ার জবাবে হাঁচিদাতা বলবে, 'ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া য়ুসলিহ্ বালাকুম' অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের সঠিক পথ দেখান এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন (অর্থাৎ তোমাদের মন্দকে ভালো করে দিন)।" (সহীহ আল বুখারী ও আত-তিরমিযী) [১৮৩]

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুও ঠিক অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন, তখন তিনি তাঁর হাত বা কাপড় তাঁর মুখে রাখতেন এবং যথাসম্ভব আস্তে শব্দ করে হাঁচি দিতেন।" (আবূ দাউদ) [১৮৪]

তাই দেখা যাচ্ছে, হাঁচি আল্লাহ্র রহমত লাভের অসীলা। এই কারণেই হাঁচিদাতার ওপর আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। আর হাঁচিদাতার সঙ্গে একত্রে উপবেশনকারী ও শ্রবণকারীদের উপর হাঁচিদাতার জন্য দু'য়া করা সুন্নত। যার শুকরিয়া হিসেবে হাঁচিদাতা পুনরায় তাদের সুস্থতা, নিরাপত্তা ও হিদায়াতের জন্য দু'য়া করে থাকেন। সত্যি, দু'য়া করা ও দু'য়া গ্রহণের কী সুন্দর নিয়ম। অথচ এ অভ্যাসগুলো পালন করতে আমাদের কোনো সময়ও লাগেনা আর কোনো টাকা-পয়সাও খরচ হয়না। আর এভাবেই সমস্ত জায়গাটি বা আলোচনার স্থানটি রহমত, সওয়াব, মঙ্গল ও বরকতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

একজন ইউরোপীয়ান গবেষক ডাক্তার হাঁচির ওপর গবেষণা করে দেখেছেন যে, একবার হাঁচি দিলে শরীর থেকে প্রায় তিন হাজার জীবাণু বের হয়ে যায়। আর সাধারণত হাঁচি এক সাথে দুটি হয়ে থাকে। সে হিসেবে প্রায় ছয় হাজার জীবাণু বের হয়ে যায় হাঁচি দেয়ার সময়। সুব্হানাল্লাহ! অথচ এতে আমাদের কোনো খরচ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। এ গবেষণার পর ঐ ডাক্তার সাহেব সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ।

হাঁচি দেয়ার সময় মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা উচিত।

হাঁচি দেয়ার সময় মুখমন্ডল ঢেকে রাখা উত্তম।

প্রশ্ন-৬২ : হাঁচি আসলে দু'য়া পাঠ ছাড়া আর কী করতে হবে? এ বিষয়ে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনো উপদেশ আছে কী, যা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সমর্থন করে?

উত্তর : 'মেডিকেল সায়েন্স' নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁচি দেয়ার সময় যা করতেন তা পুরোপুরি সমর্থন করে।

In medical science a sneeze is defined as a sudden uncontrollable noisy outburst of air through nose or mouth. It is usually caused by irritation in the nose from dust or when one has a cold. It may be triggered by irritation of a small foreign object or substance of the URT. Sneezing is an involuntary action. It removes offending materials from nasal passages and upper respiratory tract. It clears URT. It also prevents foreign particles from entering the LRT.

হাফিয শায়খ আবূ হাইয়্যান ইস্‌ফাহানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আখলাকুন্নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' নামক একটি বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেছেন, যে গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ একদল বিদগ্ধ আলেম দ্বারা অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করেছে। আবূ দাঊদ শরীফেও হাদীসগুলো উদ্ধৃত আছে। সেই বইটিতে তিনি ৬টি সহীহ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন, যার প্রত্যেকটি হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন,

১. "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁচি দেওয়ার সময় নিজ আওয়াজকে যথাসম্ভব ছোট করে নিতেন এবং নিজের মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলতেন।" (আখলাকুন্নবী) [১৮৫]

২. "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন তখন এক টুকরা কাপড় কিংবা আপন বাম হাতের সাহায্যে নিজের মুখমণ্ডল ঢেকে নিতেন এবং হাঁচির আওয়াজ ছোট করতেন।" (আখলাকুন্নবী) [১৮৫]

৩. "হাঁচি এলে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক টুকরা কাপড় (যাকে আমরা রুমাল বা handkerchief বলি) দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল (চেহারা মুবারক) ঢেকে নিতেন এবং দুই হাত কপাল মুবারকের উপর রাখতেন। অর্থাৎ হাতের তালুদ্বয় নিজের ভ্রূদ্বয়ের উপর স্থাপন করতেন।" (আখলাকুন্নবী) [১৮৫]

এ তিনটি বর্ণনা হলো হাঁচি এলে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতেন। বাকি তিনটি হাদীসের ভাষ্যগুলোও অনুরূপ। সামান্য ২/৩টি শব্দ কমবেশি করা হয়েছে। তাই সে হাদীসগুলো উপস্থাপন করা হলোনা।

এই তিনটি হাদীসে যে বর্ণনা এসেছে তা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত। কারণ অনেক ক্ষেত্রে হাঁচি দেয়ার সময় নাক থেকে পানি ঝরতে পারে যাতে জীবাণু থাকে। তাই কাপড় বা হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে নেয়া উত্তম। ফলে আশপাশের কারো দেহে সে জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারবেনা। বিশেষ করে যাদের ঠাণ্ডা লাগে বা যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ভোগে, তাদের ঘন ঘন হাঁচি আসে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হাঁচিদাতার উত্তর দিতে হবে তিনবার। এর অধিকবার কেউ হাঁচি দিলে সে ঠাণ্ডায় আক্রান্ত।" (আত-তিরমিযী) [১৮৬]

তাই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতে আমাদেরও হাঁচি দেবার সময় মুখমণ্ডল নিয়মিত ঢেকে নেয়া উচিত। এটি একটি good medical and hygienic practice. It prevents air-borne diseases from spreading, **যা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আর জেনে হোক বা না জেনে হোক, আমাদের অনেকেই এ হাদীসটি মেনে চলে আসছি। অনেকে হয়তোবা বলবেন, এ উপদেশগুলো আমরা ডাক্তারি বইতে পেয়েছি। কিন্তু ডাক্তারি বই তো লেখা হয়েছে তাঁর বক্তব্যের বহু শতাব্দী পরে।**

প্রশ্ন-৬৩ : আচ্ছা মুহতারাম, আপনি এ আলোচনার শুরুতে তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে আল্লাহ্ পাক হাই তোলা পছন্দ করেননা। এই হাই তোলা কী? কীভাবে এর

উৎপত্তি হয়? হাই এলে আমাদের কি করা উচিত? এসব বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আছে কি?

উত্তর : এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস থেকে দেয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্ যা সহীহ আল বুখারীতে লিপিবদ্ধ করা আছে। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'য়ালা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তখন যতোসব মুসলমান তা শুনবে তাদের প্রত্যেককে এর জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলতে হবে। পক্ষান্তরে হাই আসে শয়তানের দিক হতে। সুতরাং তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেনো যথাসাধ্য তা রোধ করে (অর্থাৎ মুখে হাত দিবে)। কেননা, তোমাদের কেউ হাই তুললে শয়তান তার প্রতি হাসতে থাকে (ঠাট্টা করে)।" (সহীহ আল বুখারী) [১৮৭]

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা-পাঠক! In medical terms হাই তোলা বা yawning means taking a deep breath with the mouth wide open as when one is sleepy or honed. Yawning is an involuntary action. Yawning causes one to take a deep breath when one needs some extra oxygen. Yawning is induced by hypoxia, that is, low level of oxygen in the blood stream.

প্রশ্ন-৬৪ : আচ্ছা মুহতারাম সাধারণত কি অবস্থায় বা কোন সময় হাই আসে?

উত্তর : সাধারণত ক্লান্তি বা খারাপ জল্পনা-কল্পনার কারণে হাই এসে থাকে বা যখন ঘুমের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তখন বারবার হাই আসতে থাকে। অনুরূপভাবে অনিচ্ছা বা অনাগ্রহও হাই আসার কারণ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো আলোচনা সভায় বা বক্তৃতা দেবার সময় শ্রবণকারী বক্তব্য শুনতে শুনতে বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখনই তার হাই আসা শুরু হয়ে যায়। তাছাড়া হাই আসার সময় মানুষের চেহারার অবস্থা খুবই বিকৃত হয়ে পড়ে। সুশ্রী মানুষের আকৃতিও বিগড়ে যায়, যা খুবই দৃষ্টিকটু। ক্লাস চলাকালীন সময়ে ছাত্রদের হাই তোলা, আর বক্তৃতা শোনার সময় শ্রোতাদের হাই তোলা শিক্ষক ও বক্তা উভয়েরই মনোকষ্টের কারণ হয়। Sigh is a mark of disregard to a teacher or speaker. তাই কোনো মেহমান হাই তুলতে লাগলে মেজবানের নিকট তা অসহ্য মনে হয়।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ হাঁচি দেয়া পছন্দ করেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তখন সকল শ্রোতা জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। আর যখন তোমাদের কারো হাই ওঠে, তখন যথাসম্ভব সে যেনো তা ফিরিয়ে রাখে এবং 'হা' 'হা' না বলে। কেননা, এটি শয়তানের তরফ থেকে হয় এবং সে হাসতে থাকে।" (সহীহ আল বুখারী, আবূ দাউদ, আত-তিরমিযী ও আন-নাসাঈ) [১৮৮]
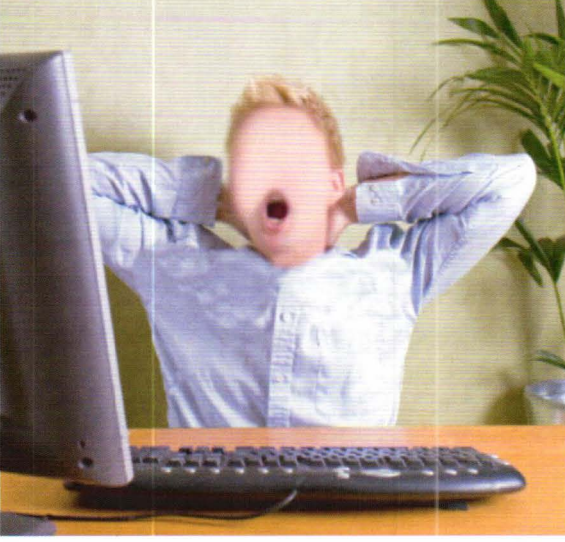
হাই তোলার সময় স্বাভাবিক দৃশ্য। তাই হাই তোলার সময় মুখ ঢাকা বাঞ্ছনীয়

অপরদিকে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "একবার দুই ব্যক্তি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাঁচি দিলো। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন, অন্যজনের হাঁচির জবাব দিলেন না। তখন সেই ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি তার হাঁচির জবাব দিলেন অথচ আমার হাঁচির জবাব দিলেননা? তিনি বললেন, সে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেছে আর তুমি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলোনি।" (সহীহ আল বুখারী) [১৮৯]

তাই এসব বাস্তবতার নিরিখেই মনোচিকিৎসক নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, হাই তোলা শয়তানের কাজ, যথাসম্ভব তা ফিরিয়ে রেখো। আর যদি অনিচ্ছাকৃত হাই এসেই পড়ে, তবে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা উচিত যেনো আওয়াজ বের না হয় এবং অন্য কেউ 'হা' করা মুখ দেখতে না পায়।

হাই তোলা সম্পর্কে মেডিকেল সায়েন্সের ভাষ্য হচ্ছে, হাই তোলার দ্বারা মন-মেজাজ ও প্রকৃতির অলসতা ও জড়তা বৃদ্ধি পায়। ফলে সে উদাসীনতা ও অলসতার মাঝে হারিয়ে যায়, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ্ তা অপছন্দ করেন। আর শয়তান তাতে আনন্দবোধ করে। কারণ বান্দার ক্ষতিতেই শয়তানের আনন্দ। পক্ষান্তরে হাঁচি মানুষের মন-মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে, জড়তা দূর করে। তাই এটি মানুষের জন্য কল্যাণকর। যাহোক, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্যবিষয়ক নির্দেশনা মেনে চললে আমাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, স্বাস্থ্য অটুট থাকবে, রোগ ব্যাধি সহসা আক্রমণ করবেনা। অপরদিকে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মেনে চলার জন্য আমরা পরকালেও কল্যাণ লাভে সামর্থ হবো ইনশাআল্লাহ!

অধ্যায়-৫

সঠিক নিয়মে মলমূত্র ত্যাগের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন ও রোগ প্রতিরোধ

প্রশ্ন-৬৫ : মলমূত্র ত্যাগ করা সকল মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর প্রাকৃতিক বিধান। আর উত্তমরূপে শৌচকার্য করা পবিত্রতা লাভের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এ বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো নির্দেশনা আছে কি? বিশেষ করে তিনি কোন্ হাতে শৌচকার্য সম্পাদন করতে বলেছেন এবং কোন্ হাতে শৌচকার্য করতে নিষেধ করেছেন জানাবেন কী?

উত্তর : জি হ্যাঁ, আছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হচ্ছে প্রস্রাব-পায়খানার পর প্রথমে ঢিলা ব্যবহার করা এবং অতঃপর পানি দিয়ে ধুয়ে পবিত্রতা অর্জন করা। কোনো স্বাস্থ্য সচেতন লোক নিজের মলমূত্র নিজহাতে স্পর্শ করেনা। এটি রুচি বিরোধী ও অত্যন্ত অপবিত্র কাজ। এটি স্বাস্থ্যসম্মতও নয়। কারণ মলমূত্র থেকে অনেক জীবাণু হাতের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন স্থানে সংক্রমিত হতে পারে। তাই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সম্পর্কিত সুন্নাতগুলো পুরোপুরি আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত। এ বিষয়ে আমি বেশ কয়েকটি হাদীস আলোচনায় আনবো যা থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যাবে যে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে কী কী কাজ নিষেধ করেছেন। আর কী কী অভ্যাস চালু রাখতে বলেছেন।

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র ইস্তিনজা বা শৌচকার্য সম্পাদনের জন্য বেশ কয়েকটি বক্তব্য রেখেছেন যা হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "ইস্তিনজা করার সময় ডানহাত ব্যবহার করবেনা এবং কোনো বরতন বা পাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করবেনা।" (আবূ দাউদ ও আন-নাসাঈ) [১৯০]

সহীহ আল বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হাদীস দুটো বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। (সহীহ আল বুখারী) [১৯১]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবার লোকদের বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের পবিত্রতার খুবই প্রশংসা করেছেন। তিনি কুবার লোকদের নিকট জানতে চাইলেন, এর রহস্য কী? তারা উত্তর দিলেন, আমরা ঢিলা ও পানি উভয়টি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করি।" (মুসনাদে আহ্‌মাদ ও আবূ দাউদ) [১৯২]

দ্বিতীয় হাদীসটি হচ্ছে, "ইস্তিনজার পর পবিত্রতা লাভের জন্য বাম হাত ব্যবহার করবে।" (আবূ দাউদ)

তৃতীয় হাদীসটি হচ্ছে, "পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের আগে ঢিলা ব্যবহার করবে।" (আবূ দাউদ ও আন-নাসাঈ) [১৯৩]

ঢিলা বলতে মাটির টুকরাকে বোঝানো হয়েছে। বর্তমানে এর স্থান দখল করেছে টিস্যু পেপার। এ সম্পর্কিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ প্রত্যেক হাদীস গ্রন্থের 'কিতাবুত

তহারাত' অধ্যায়ের ইস্তেনজা পরিচ্ছেদে বিশদভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রিয় দর্শকবৃন্দ! যে সকল লোক মলত্যাগের পর পানি দ্বারা শৌচকার্য করেনা বা শুধুমাত্র কাগজ ব্যবহার করে, তাদের বেশ কয়েক ধরনের রোগ সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, মলদ্বারের আশপাশে ফোঁড়া এবং গোদের মধ্যে পুঁজ, যা প্রস্রাবের সময় বের হয়ে আসে। তাই পানি দ্বারা মলমূত্র ত্যাগের স্থানসমূহ পরিষ্কার করার আগে কোনো ঢিলা বা টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে নেয়া উচিত। তবে গোবরের ঢিলা ব্যবহার করতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

হযরত আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হলো, "আপনাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি বিষয় আপনাদের শিক্ষা দিয়েছেন; এমনকি পায়খানা-পেশাবের শিষ্টাচার পর্যন্ত। সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদের কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করতে, মল ত্যাগের পর ডানহাত দিয়ে ইস্তিনজা (মল ত্যাগের জায়গা পরিষ্কার করা ও পবিত্রতা অর্জন করা) করতে নিষেধ করেছেন। তিনি কাউকে তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্তিনজা করতে এবং শুকনো গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন।" (আত-তিরমিযী ও আন নাসাঈ) [১৯৪]

আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেনো পানি পান করার সময় পাত্রে নিশ্বাস না ফেলে। আর পায়খানায় এসে কেউ যেনো ডানহাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে এবং সে যেনো ডানহাত দ্বারা শৌচক্রিয়া না করে।" (সহীহ আল বুখারী) [১৯৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহুও এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা শুকনো গোবর আর হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করবেনা।" (আত-তিরমিযী ও আন-নাসাঈ) [১৯৬]

এ বিষয়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডানহাত ছিলো খাদ্য গ্রহণ ও পবিত্রতা অর্জনের জন্যে, আর বামহাত ছিলো শৌচকর্ম ও এ ধরনের নিকৃষ্ট কাজের জন্য।" (আবূ দাঊদ) [১৯৭]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৌচ করার পর মাটিতে তাঁর হাত ঘষে পরিষ্কার করতেন এবং উযূ করতেন।" (আন-নাসাঈ) [১৯৮]

হযরত জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি একদা পায়াখানায় গেলেন এবং প্রয়োজন সমাধা করে বলেন, "হে জারীর! পানি আনো। অতএব আমি তাঁকে পানি এনে দিলাম। তিনি পানি দিয়ে শৌচকার্য করেন এবং পরে পানি দিয়ে হাত মাটিতে ঘষেন।" (আন-নাসাঈ) [১৯৯]

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি তোমাদের পিতৃতুল্য। আমি তোমাদের দ্বীনের বিষয়সমূহ শিক্ষা দেই। যখন কেউ টয়লেটে যায়,

সে যেনো কিছুতেই কিবলামুখী হয়ে বা কিবলাকে পেছনের দিকে রেখে না বসে। আর মলত্যাগের পর উক্ত স্থান যেনো ডানহাত দিয়ে পরিষ্কার না করে।" (আবূ দাউদ ও আন-নাসাঈ) ২০০

ঠিক এমনি একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ আইয়ূব আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা কেউই কিবলামুখী হয়ে বা কিবলা পেছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করবেনা।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও আন-নাসাঈ) ২০১

আবূ আইয়ূব আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, "আমরা যখন সিরিয়ায় এলাম তখন দেখতে পেলাম সেখানকার টয়লেটগুলো কিবলামুখী করে নির্মাণ করা হয়েছে। তখন আমরা আমাদের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিই এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।" (সহীহ মুসলিম ও আবূ দাউদ) ২০২

আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গর্তে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।" (আবূ দাউদ ও আন-নাসাঈ) ২০৩

এর সম্ভাব্য কারণ গর্তে সাপ বা বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ থাকতে পারে যা বের হয়ে কামড় দিতে পারে। অপরদিকে দুর্বল কীট-পতঙ্গগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। হাদীসগুলো সবই যৌক্তিক ও বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

প্রশ্ন-৬৬ : রাস্তাঘাটে, যেখানে সেখানে জনসাধারণের চলাফেরার স্থানে মলমূত্র ত্যাগের বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন?

উত্তর : জি হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা দুটো বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থেকো, যা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতের কারণ স্বরূপ। উপস্থিত সাহাবীরা বলে উঠলেন, সে দুটো জিনিস কী হে আল্লাহ্‌র রসূল! যা অভিসম্পাতের কারণ? তিনি উত্তর দেন, জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় এবং ছায়াপ্রদানকারী গাছের নিচে যেখানে লোকজন বিশ্রাম গ্রহণ করে ও আশ্রয় নেয়, সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা।" (সহীহ মুসলিম) ২০৪

ঠিক এ ধরনের আরেকটি হাদীস রয়েছে, যা হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউই বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করবেনা, যে পানি প্রবাহিত হয়না এবং পরে সে পানিতে গোসল করা উচিত নয়।" (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) ২০৫

প্রশ্ন-৬৭ : আমরা জানি প্রস্রাব আটকিয়ে রাখা একটি গর্হিত কাজ। কারণ এতে মারাত্মক অসুখ সৃষ্টি হতে পারে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সর্বদা বলে যে প্রস্রাবের বেগ হলে তৎক্ষণাৎ মূত্রত্যাগ করে urinary bladder খালি করা উচিত। যাতে শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে harmful excretory products প্রস্রাবের সাথে মূত্রথলি হতে বের হতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যসমূহ আলোচনা করুন?

উত্তর : আপনি ঠিকই বলেছেন যে, প্রস্রাব আটকিয়ে রাখলে মারাত্মক অসুখ সৃষ্টি হতে পারে। হযরত আবূ

হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "একদা এক গ্রাম্য লোক মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে আরম্ভ করে। উপস্থিত লোকেরা তাকে বাধা দিতে যায়। ঐ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটিকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কঠোরতা অবলম্বন করার জন্য নয়।" **(সহীহ আল বুখারী)** [২০৬]

সম্মানিত দর্শক-পাঠক! দৃশ্যটি একবার কল্পনায় আনুন। মসজিদে নববীতে এক রাকাআত নামায আদায় অন্য স্থানে ৫০ হাজার রাকাআত নামায আদায়ের সমান। সেখানে এক অপরিচিত ব্যক্তি প্রস্রাব করেছে এবং জায়গা অপবিত্র করেছে। সংগত কারণেই সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম উত্তেজিত হয়ে **থাকবেন। আমাদের এখানে এ অবস্থা হলে আমরা কী করতাম? তাই তাকে পাকড়াও করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করা, শোরগোল করা, প্রস্রাব করতে বাধাদান ইত্যাদি সবই ছিলো স্বাভাবিক কাজ। কিন্তু মানবতার মুক্তিদূত, রহমতের নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রাণপ্রিয়** সাহাবীদের বাধা দিলেন এবং বললেন, তাকে প্রস্রাব করতে দাও। Allow him to urinate. পরে জায়গাটি পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে। পরে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমাদেরকে সহজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কঠোরতা অবলম্বনের জন্য তৈরি করা হয়নি।" **সত্যিই কী মহানুভবতার শিক্ষা! আমরা কি এসব অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতে পারতাম?**

অধ্যায়-৬

খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা

গত বেশ কয়েকটি পর্বে আমরা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর জীবনের বিভিন্ন দিক তথা ঘুম, বিশ্রাম অর্থাৎ তাঁর life-style নিয়ে আলোচনা করেছি। এ পর্যায়ে আমরা তাঁর খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

বস্তুত সঠিক খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বেশকিছু নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি কী কী খাদ্যদ্রব্য খেতেন, কী কী খেতেননা, কখন খেতেন, কতোটুকু খেতেন ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। আমরা যদি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পন্থায় পানাহার করি, পরিমিত পরিমাণ হালাল খাবার সঠিক সময়ে সঠিক নিয়মে গ্রহণ করি, তাহলে আমরা অনেক রোগ-ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকতে পারবো এবং আমাদের স্বাস্থ্য অটুট থাকবে, অকালে বার্ধক্য ঘনিয়ে আসবেনা।

প্রশ্ন-৬৮ : পবিত্র কুরআনে পানাহার তথা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ সম্পর্কে কী কী বর্ণনা এসেছে? মেহেরবানী করে কুরআনের আয়াতের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ আমাদের সম্মানিত দর্শকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলবেন কি?

উত্তর : ধন্যবাদ ডা. আজহার। বিশ্বনবীর চিকিৎসা বিধান মূলত তিন প্রকার। প্রথমটি হচ্ছে তিব্বুন রূহানী বা দু'য়া-দরূদ এবং আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনার মাধ্যমে চিকিৎসা। ইংরেজীতে এটাকে বলে spiritual medicine of the Prophet (SAWS). দ্বিতীয়টি হচ্ছে তিব্বুন রিফায়ী, অর্থাৎ সঠিক পানাহার তথা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা। That is, preventive medicine of the Prophet (SAWS). আর তৃতীয়টি হচ্ছে তিব্বুন তবয়ী বা তিব্বুন জিসমানী, অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ বা গাছ-গাছড়া মাধ্যমে চিকিৎসা। এটাতে ইংরেজীতে বলা হয় physical medicine of the Prophet (SAWS). আর এই তিনটির সমন্বয়ে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গেছেন, তাকে বলা হয় তিব্বুন নববী বা Prophetic medicine বা Medicine of the Prophet (SAWS).

বস্তুত রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পন্থায় যদি আমরা পানাহার করি অর্থাৎ পরিমিত পরিমাণ হালাল, ভালো ও পবিত্র খাদ্যদ্রব্য সঠিক সময়ে সঠিক নিয়মে গ্রহণ করি, তাহলে অনেক রোগ-ব্যাধি থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো।

ইসলাম তথা কুরআন-সুন্নাহ পানাহার সম্পর্কে বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা বলে এমনটি হয়েছে। পবিত্র বাইবেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ Genesis থেকে Revelation পর্যন্ত কয়েকবার আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল। তখন আমি নাইজেরিয়ার জস বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসি অনুষদে অধ্যাপনা করতাম। তবে কুরআন ও সুন্নাহর মতো এতো সুন্দর, সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত পানাহারের বিধান সেখানে আমি পাইনি। পবিত্র কুরআনে পানাহার সম্পর্কে

আমি ৫টি আয়াত সম্মানিত দর্শক-পাঠকদের উদ্দেশে পেশ করছি।

প্রথম আয়াতটি হচ্ছে সূরা বাকারাহর ১৬৮ নম্বর আয়াত। এখানে আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

"ইয়া আইয়্যুহান্ নাসু, কুলু মিম্মা ফিলআরদ্বি হালালান ত্বাইয়্যিবান, অলা তাত্তাবিয়ূ খুতুওয়াতিশ্ শায়তানি ইন্নাহু লাকুম 'আদুওউম মুবীন।" (আল বাকারাহ ২:১৬৮)

"হে মানবজাতি! যমীনে বা পৃথিবীতে যাকিছু রয়েছে তা থেকে হালাল ও পবিত্র জিনিসগুলি খাও। এবং শয়তানের শেখানো পথে চলোনা বা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (আল বাকারাহ ২:১৬৮)

"O you Mankind! Eat of what is on earth, lawful and wholesome. Do not follow the footsteps of the Devil." (Al-Bakarah 2:168)

হালাল জিনিস বলতে শরীয়ত অনুমোদিত খাদ্য বোঝায়। যেমন দুধ, ঘি, মাছ, ফলমূল, শাকসবজী ও হালাল জীবজন্তুর গোশ্ত। তবে শরীয়তের অনুমোদনের পর তা হালাল উপায়ে অর্জিত হতে হবে। যেমন চুরিকৃত না হওয়া বা অবৈধ পন্থায় অর্জিত না হওয়া। গরুর গোশতের ভেতর যদি নাপাকি কিছু পড়ে যায়, তাহলে সেটা খাওয়া ঠিক হবেনা। যেমন গরুর মূত্র অথবা শূকরের রক্ত।

দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে সূরা আল-কাহ্ফ-এর ১৯ নম্বর আয়াত :

﴿ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ ﴾

"ফাব্'আছু আহাদাকুম বিওয়ারিকিকুম হাযিহী ইলাল মাদীনাতি ফালইয়ানযুর আইয়্যুহা আযকা ত্ব'আমান, ফাল-ইয়া'তিকুম বি রিযক্বিম্ মিনহু।" (আল-কাহ্ফ ১৮:১৯)

"এবার তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাও এবং সে যেনো দেখে সবচেয়ে ভালো খাবার কোন্টি। সেখান থেকে সে কিছু খাবার নিয়ে আসে তোমাদের জন্য।" (আল-কাহ্ফ ১৮:১৯)

"So, send them one of you with this silver coin (money) of yours to the town, let him find out which is the best lawful food, and bring some of that to you." (Al-Kahf 18:19)

তৃতীয় আয়াতটি হচ্ছে সূরা আল আ'রাফের ১৬০ নম্বর আয়াত। এখানে আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ﴾

"কুলূ মিন ত্বইয়িবাতি মারাযাক্বনাকুম।"

"তোমাদের যেসব ভালো ও পবিত্র জিনিস দিয়েছি, সেগুলো খাও।" (আল আ'রাফ ৭:১৬০)

"Eat of the good and lawful things which We have provided for your sustenance." (Al-Araf 7:160)

চতুর্থ আয়াতটি হচ্ছে সূরা ত্বহার ৮১ নম্বর আয়াত। এখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ ﴾

"কুলূ মিন ত্বইয়্যিবাতি মা রাযাক্বনাকুম, অলাতাতগাউ ফিহি।" (ত্বহা ২০:৮১)

"তোমাদের যে পবিত্র রিযিক দেয়া হলো তা থেকে আহার করো। তবে সীমা লঙ্ঘন করোনা।" (ত্বহা ২০:৮১)

"Eat of the good and lawful things which We have provided for your sustenance, but commit no transgression or oppression (excess) therein." (Taha 20:81)

পানাহার সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আয়াতটি হচ্ছে সূরা আল আ'রাফের ৩১ নম্বর আয়াত, যার reference বক্তৃতার সময় প্রত্যেক আলেমই দিয়ে থাকেন। In fact this is the focal point of our discussion. এখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

"কুলূ ওয়াশরাবু ওয়ালা তুসরিফূ ইন্নাহু লা য়ুহিব্বুল মুস্‌রিফীন।" (আল আ'রাফ ৭:৩১)

"তোমরা খাও এবং পান করো। তবে অপব্যয় করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।" (আল আরাফ ৭:৩১)

"Eat and drink, but waste not by extravagance, for Allah does not love the extravagant or prodigals" (Al Araf 7:31)

যা হোক, পবিত্র কুরআনের এসব বাণী থেকে আমরা পানাহার সম্পর্কে নির্দেশনা পেতে পারি। তাই পানাহারের কারণে যদি রোগ-ব্যাধি হয় তবে তার জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। কারণ তাকে তো বলেই দেয়া হয়েছে সে কী খাবে আর কী খাবেনা। কুরআনের সূরা আন-নিসার ৭৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾

"মা আছাবাকা মিন হাসানাতিন ফামিনাল্লাহি ওয়া মাআছাবাকা মিন সায়্যিয়াতিন ফামিন নাফ্‌সিকা।" (আন-নিসা ৪:৭৯)

"তোমাদের যাকিছু কল্যাণ হয় তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় এবং যাকিছু অকল্যাণ হয় তা তোমাদের নিজেদের কারণে।" (আন-নিসা ৪:৭৯)

"Everything good that happens to you, O Man, is from Allah; everything bad that happens to you, is from your own actions." (An-Nisa 4:79)

কাজেই আমরা যেনো হারাম খাদ্য বা নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়ে অসুস্থ হয়ে না পড়ি সেজন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

প্রশ্ন-৬৯ : একজন সুস্থ মানুষ কতোটুকু আহার গ্রহণ করলে তার স্বাস্থ্য ভালো বা অটুট থাকবে এবং সহসা তার কোনো রোগ-ব্যাধি হবেনা?

উত্তর : এ প্রশ্নের জবাব আমি সহীহ্ হাদীস থেকে দেবার চেষ্টা করবো। হাদীসটি বর্ণনা করেন ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

"আদম সন্তান তার পেটের চেয়ে খারাপভাবে আর কোনো পাত্রই পূর্ণ করেনা। মানুষের জন্য কোমর সোজা রাখার লক্ষ্যে কয়েক লোকমা বা সামান্য খাদ্যই যথেষ্ট। আর যদি একান্তই বেশি খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যদ্রব্য, আর এক-তৃতীয়াংশ পানীয় বা পানি দিয়ে পূর্ণ করবে। বাকি এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখতে হবে।" হাদীসটি মুসনাদে আহমদ, আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে উল্লেখ আছে।[২০৭]

হাদীসটির ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে, "The son of Adam never fills a vessel worse than his stomach. The son of Adam only needs or requires a few bites to sustain him, so that he does not loose his strength and become inactive. If one intends to exceed the minimum requirements, he should ensure that one third of his stomach is filled with food, one third for water or drink and the remaining one third for breathing." (Musnade Ahmad, At-Tirmizi and Ibn Majah)[207]

ঠিক এই হাদীসের অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা এসেছে "A Medical History of Persia and the Eastern Caliphate" নামক বইয়ে। বইটি লিখেছেন C. Elgood in 1951. Oxford University Press বইটি publish করেছে।

পারস্যের এক রাজা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক পাঠান। তিনি প্রায় ১ থেকে ২ বছর মদীনা শরীফে ছিলেন। কিন্তু এ সুদীর্ঘ সময়ে কোনো রোগী চিকিৎসার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়নি। অবশেষে তিনি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে অভিযোগ করলেন, "আমাকে আপনার সহকর্মীদের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে অসুস্থতার কারণে কেউই আমার শরণাপন্ন হয়নি বা আমার ব্যবস্থাপত্র নিতে আসেননি।" তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এখানকার লোকদের অভ্যাস হচ্ছে, ক্ষুধা না লাগলে তারা খাবার গ্রহণ করেনা এবং খাবারের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এক পর্যায়ে তারা খাওয়া বন্ধ করে থাকে।" তখন চিকিৎসক বললেন, "এটিই তাদের সুন্দর স্বাস্থ্যের মূল কারণ।" That is the perfect reason of their excellent health.

চিকিৎসকটি তখন পবিত্র মাটিকে চুমু দিলেন এবং নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সে স্থান থেকে বিদায় নিলেন। বস্তুত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সাহাবায়ে কিরামের স্বাস্থ্য ও শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত ভালো ছিলো। তারা যখন তখন অসুস্থ হতেননা। ইতিহাস বলে যে, ঐ সময়ের লোকদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে আমাদের সময়ের লোকদের স্বাস্থ্যের অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। ঐ সময়ের লোকেরা সামনা-সামনি যুদ্ধ করতেন তলোয়ার দিয়ে, যেখানে অনেক

কৌশল ও দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হতো। সামান্য কয়েকটি খেজুরই তাদের সেই শক্তি জোগাতো।

প্রশ্ন-৭০ : মুহতারাম, একটু আগে যে হাদীসটি আলোচনা করলেন যে খাদ্য গ্রহণের সময় পেটের $\frac{১}{৩}$ অংশ খালি রাখা। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উদাহরণ সহকারে বুঝিয়ে বলুন, যাতে সবাই, বিশেষ করে গ্রামের মানুষগণ বুঝতে পারে যে মানুষের কতোটুকু খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

উত্তর : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার সময় পেটের $\frac{১}{৩}$ ভাগ খাদ্যদ্রব্য এবং $\frac{১}{৩}$ অংশ পানি দিয়ে পূর্ণ করতে বলেছেন। আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখতে বলেছেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বা বাতাসের জন্য। সত্যি, কী সুন্দর শিক্ষা! এ শিক্ষাটিকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পুরোপুরি সমর্থন করে। এবার দেখি হাদীসটি ভাষ্যের সাথে বিজ্ঞানের মিল কতটুকু, অর্থাৎ বিজ্ঞান এই হাদীস সম্পর্কে কি বলে?

আমরা যারা শহরে থাকি, তাদের প্রায় অনেকের বাসায় blender বা লিকুইডাইজার থাকে ফলমূল থেকে শরবত তৈরি আর পেঁয়াজ-রসুন-আদা একত্রে মিশিয়ে আধা তরল মিশ্রণ তৈরি করার জন্য, যা তরকারি রান্নায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আপনি যদি blender-এর কানায় কানায় পেঁয়াজ, রসুন, আদা ইত্যাদি ভর্তি করেন এবং পানি না দেন, তাহলে কি blender-এর ব্লেড ঘুরবে বা blender কাজ করবে? কতোটুকু খালি রাখলে বা কতোটুকু পানি দিলে ভেতরের sharp blade গুলো ঘুরবে, আর দ্রুত ঘুরে পেঁয়াজ-রসুনকে মিহি করে সামান্য পানির সাহায্যে মিশ্রিত করে একটি আধা তরল মিশ্রণ তৈরি করবে, তা নিশ্চয়ই আমাদের গৃহিনীগণ জানেন। আপনি নিজেও blender-এর catalogue থেকে জেনে নিতে পারেন।

তেমনি মানুষের পেট একটি blender বা reaction tank যেখানে নানাবিধ খাবার, কঠিন ও তরল জাতীয় একত্রে থাকে। হজমসহ অনেক ধরনের physiological process এখানে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পেট যদি শুধু খাবার দিয়ে পূর্ণ করেন আর পানি বা বাতাসের জন্য জায়গা না রাখেন, তখন হজম প্রক্রিয়া কি স্বাভাবিকভাবে চলবে? কখনই চলবেনা। আমার বিশ্বাস সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই আমার এ যুক্তির সাথে একমত হবেন।

পরিশেষে সম্মানিত দর্শকদের নিকট বিনীত অনুরোধ জানাব, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথ যদি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক হয়, তবে কেনো তা পুরোপুরি অনুসরণ করবোনা বা সমাজে চালু করবোনা? এখানে দু'টো উপকার পাওয়া যাবে। এক, আপনার স্বাস্থ্য অটুট থাকবে, আপনি সর্বদা সুস্থ ও ভালো থাকবেন, আপনি সহসা অসুস্থ হবেননা। দ্বিতীয়ত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পালন করার জন্য আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করবেন এবং কিয়ামতের কঠিন দিনে আপনাকে সাহায্য করবেন ও পুরস্কৃত করবেন।

প্রশ্ন-৭১ : পরিমিত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি আর কী কী গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা এসেছে? মেহেরবানী করে বলুন।

উত্তর : বিখ্যাত আরবীয় চিকিৎসক হারিস ইবনে কালাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'What is the best medicine?' অর্থাৎ 'সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ওষুধ কী?' তিনি উত্তরে বলেন,

'Necessity.' অর্থাৎ প্রয়োজন, মানে ক্ষুধা বা Hunger. যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'রোগ কী?' তখন তিনি উত্তর দেন, 'Entry of food upon food' বা 'খাবারের পর খাবার গ্রহণ' অর্থাৎ অতি ভোজন। এ রিওয়ায়াতটি আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।[২০৮]

হারিস ইবনে কালাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, 'ক্ষুধাই রোগ নিরাময়ের উপায়'। Hunger is a cure. কথাগুলো ভালোভাবে উপলব্ধি করুন। অপরদিকে Hippocrates বলেন, "All excess is contrary to the laws of nature. Let your eating, your drinking, your sleeping and your sexual intercourse, all be in moderation" (As-Suyuti)[২০৯]

ইবনে সীনা বলেন, "Never have a meal until the one before it has been digested." অর্থাৎ "আগের খাবার হজম না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় খাদ্য গ্রহণ করোনা।" (আস্-সুয়ূতী)[২১০]

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "Avoid a pot-belly, for it spoils the body, causes diseases and makes doing prayer tiring. Make use of bloodletting, for this puts the body right. Avoid all excess, for Allah hates a learned man who is fat." (As-Suyuti)[211]

এ রিওয়ায়াতটি আস-সূয়ুতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আবূ নু'য়াইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত তিব্বুন নববী হাদীস গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়াতে যারা বেশি পরিতৃপ্ত হবে (উদরপূর্ণ করে আহার করবে), কিয়ামতের দিনে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত থাকবে।" (আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্)[২১২]

সম্মানিত দর্শকমণ্ডলী! মানুষের পেট ও খাবারই হচ্ছে সকল প্রকার অসুস্থতা ও রোগ-ব্যাধির উৎস তা আমরা এ আলোচনা থেকে জানলাম। উপরোক্ত সবগুলো বর্ণনাই অতি ভোজনের কুফল সম্পর্কে ইঙ্গিত বহন করেছে। বস্তুত সুষম খাবার সঠিক পরিমাণে না খেলেই মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে। অপরদিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহারের কারণে হজমের সমস্যা ও অন্যান্য ব্যাধির লক্ষণ দেখা দেয়। বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে মানুষ হঠাৎ অতিরিক্ত ও চর্বি জাতীয় খাবার খেয়ে পরদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন সে বলে যে food poisioning বা খাবারে বিষক্রিয়া হয়েছে।

মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকা কী পরিমাণ খাবার খাবে তার উপর নির্ভর করেনা। এটি নির্ভর করে খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মানের উপর। সম্ভবত এ কারণেই প্রখ্যাত আরবীয় ডাক্তার হারিস ইবনে কালাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "খাদ্যদ্রব্য বা পথ্যই উৎকৃষ্ট রোগ নিরাময়। পেটই হচ্ছে সকল প্রকার অসুখের কেন্দ্রবিন্দু। প্রত্যেককে তার অভ্যাস ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমিত খাবার ও ওষুধ দাও।" (ইবনুল কাইয়িম)[২১৩]

প্রশ্ন-৭২ : পানাহারের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পর্কে হাদীসে যে সব বর্ণনা এসেছে তা অনুগ্রহপূর্বক আলোচনা করুন?

উত্তর : হ্যাঁ, পানাহারের পরিমাণ সম্পর্কে বেশ ক'টি বর্ণনা সহীহ হাদীস শরীফে এসেছে, তন্মধ্যে আমি এখানে দুটো হাদীস বর্ণনা করবো। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, একজনের খাবার দু'জনের, দু'জনের খাবার চারজনের, আর চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট হয়।" (সহীহ মুসলিম) [২১৪]

ঠিক এ হাদীসের অনুরূপ আরেকটি হাদীস আছে, যেটি বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু। এই হাদীসটি ইসলামিক টিভি প্রতিনিয়ত প্রদর্শন করে, যেনো হাদীসটি আমরা ভুলে না যাই। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দুইজনের খাবার তিনজনের জন্য, আর তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।" এটি সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস। [২১৫]

প্রিয় দর্শক-পাঠক! রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমরা যদি খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে পারি, তাহলে স্বাস্থ্য অটুট থাকবে। অধিক পানাহারের কুফল থেকে আমরা রক্ষা পাবো। আসল কথা আমাদেরকে culture পরিবর্তন করতে হবে। UnProphetic culture বদলাতে হবে। এ ব্যাপারে ইসলামিক টিভি তার সূচনালগ্ন থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের সম্মানিত উলামা মাশায়েখ ও ইসলামি বুদ্ধিজীবীরা গত ২৫ বছরে যা না করতে পেরেছেন ইসলামিক টিভি বিগত এক বছরে তা করতে সক্ষম হয়েছে, আলহামদু লিল্লাহ। তাই ইসলামিক টিভির মাননীয় চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কলা-কুশলীসহ সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহ্ আপনাদেরকে জান্নাত দিয়ে পুরস্কৃত করবেন।

যাহোক, আমি যে হাদীসটির উপর আলোচনা করছিলাম তা হলো, হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটি। এই হাদীসটি যদি বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে ১০ কোটি লোকের খাবার ১৫ কোটি লোকের জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, তবে সাড়ে ৭$\frac{১}{২}$ কোটি লোকের খাদ্য ১৫ কোটি লোকের জন্য যথেষ্ট হবে। ফলে বাংলাদেশে খাদ্যাভাব থাকবেনা। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, বিদেশ থেকে চড়াদামে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করতে হবেনা। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

প্রশ্ন-৭৩ : অতিরিক্ত আহারের ফলে কী কী রোগ দেখা দেয় বা দিতে পারে? অর্থাৎ অধিক আহারের কুফল কী?

উত্তর : অতিরিক্ত ভোজনে মানুষের মাঝে অনেক কুফল দেখা দেয়। বিজ্ঞান আমাদের বলে যে অধিক পানাহার করলে তার বহুমূত্র (diabetes), উচ্চ রক্তচাপ (high blood pressure), stroke, paralysis, হৃদরোগ (heart disease), gastric acidity, অকাল বার্ধক্য, শরীর মোটা হওয়া (obesity) ইত্যাদি রোগ হতে পারে। তাছাড়া অত্যধিক ভোজন হজমজনিত অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। বিজ্ঞ ডাক্তারগণ এ ব্যাপারে সুপরামর্শ দিতে পারবেন।

সুপ্রিয় দর্শক-পাঠক! খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার বিষয়ে আল্লাহ্‌র নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব উপদেশ দিয়েছেন তা বাস্তবায়িত হলে আমাদের দেশে খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দেশে খাদ্যাভাব থাকবেনা। ফলে কেউ অভুক্তও থাকবেনা, আবার কেউ অতিভোজনের জন্য অসুস্থও হবেনা।

বর্তমানে বাংলাদেশে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের জন্য বেশ আলোচনা হচ্ছে। দেশে খাদ্যের অভাব মেটানোর জন্য সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে ভাতের পরিবর্তে বেশি করে আলু খাওয়ার সুপরামর্শ দিয়েছেন। মূলত ভাত ও আলু একই ধরনের খাদ্য। উভয়ই Carbohydrates বা শর্করা জাতীয় খাদ্য। এ দুটির যে কোনো একটি খেলেই চলবে। তবে আমি বলবো, খাদ্যাভ্যাস যদি পরিবর্তন করতেই হয় তবে আমাদের উচিত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশের দিকে নজর দেয়া। কারণ স্বাস্থ্য, সুস্থতা, পানাহার, অসুখ-বিসুখ, নিরাময় ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর প্রতিটি বাণী আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থন করে।

প্রশ্ন-৭৪ : মুহতারাম, গরীব, দুঃখী, অভুক্ত, অভাবগ্রস্তদের খাবার খাওয়ানো অত্যন্ত উত্তম ও নেকীর কাজ। এটি মহৎ মানুষের গুণাবলী, সৎকর্মশীলদের কর্ম। এ বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী কী হাদীস আছে?

উত্তর : আল্লাহ্‌র নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কেউ যদি কোনো ক্ষুধার্ত মুসলমান ভাইকে তৃপ্তিভরে খানা খাওয়ায়, আল্লাহ্ তাকে এমন দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যে দরজা দিয়ে এই ধরনের লোক ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারবেনা।" (আল-মু'জামুল কাবীর) [২১৬]

সুপ্রিয় দর্শক-পাঠক, ইসলামি সমাজে মেহমানদের আদর-আপ্যায়ন হচ্ছে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলির বৈশিষ্ট্য। আপনারা অনেকেই জানেন, হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম মেহমান ছাড়া খানা খেতেননা। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণও মেহমানদের যথেষ্ট সম্মান করতেন। এমনকি তারা নিজে অভুক্ত থেকেও মেহমান-মুসাফিরকে খানা খাওয়াতেন। তাদের নিকট একজন মেহমান আল্লাহ্‌র রহমতের ফেরেশতার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। মেহমানদের খাতিরে তারা স্বীয় আরাম-আয়েশ কুরবানী করে দিতেন। আর এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, অনেক সাহাবী মেহমানদারিতে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "একদা এক ব্যক্তি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খুব ক্ষুধার্ত হয়ে এলো। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে লোকটিকে আপ্যায়ন করানোর মতো কিছুই ছিলোনা। তখন উপস্থিত সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলে আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু নামে এক আনসার সাহাবী লোকটিকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে কোনো খাবার আছে, যা দিয়ে মেহমানকে আপ্যায়ন করা যায়? স্ত্রী বললেন, শুধু বাচ্চাদের খাওয়ার মতো সামান্য খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ছেলেমেয়েদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। এরপর যখন মেহমানকে খানা পরিবেশন করা হলো তখন আবূ তালহাও খেতে বসলেন। পরে পূর্ব পরামর্শমতো কোনো একটি বাহানা করে স্ত্রী বাতি নিভিয়ে দিলেন। এতে আবূ তালহা বিভিন্ন ধরনের চপ চপ শব্দের মাধ্যমে এটিই বোঝাতে চাইলেন যে, তিনিও মেহমানের সাথে খানায় শরীক আছেন। এভাবে মেহমান অন্ধকারে পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নিলেন, আর আবূ তালহা, তাঁর স্ত্রী ও শিশু সন্তানেরা

রাতে উপোস রয়ে গেলেন। পরদিন আবূ তালহা রসূলের খিদমতে হাজির হলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের অতিথিপরায়ণতায় অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।" (সহীহ মুসলিম) [২১৭]

সুপ্রিয় দর্শক! বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বে কোনো নেতা বা তার অনুসারীদের এ ধরনের আতিথেয়তার নজির কেউ দেখাতে পারে কি?

বস্তুত ওপরে বর্ণিত এ কয়েকটি হাদীসই হচ্ছে ইসলামি অর্থনীতি ও ইসলামি সাম্যবাদের মূল ভিত্তি। এই হাদীসগুলো যদি আমাদের এ সুন্দর দেশটিতে বাস্তবায়ন করা যেতো, তবে এখানে কোনো অভাবী-দুঃখী মানুষ থাকতোনা। বস্তুত যে ব্যক্তি অভাবী, দুঃখী, মিসকীন বা অভাবগ্রস্তদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেনা, তাকে কিয়ামত দিবসের প্রতি মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এখানে আমি আরেকটি মর্মস্পর্শী হাদীস আলোচনা করবো যে একজন আদর্শ স্নেহময়ী মা তার সন্তানের অভুক্ততায় কিরূপ আচরণ করে থাকেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "একবার একজন অসহায় মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তান নিয়ে আমার নিকট আগমন করলো। আমি তাদেরকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে তাঁর কন্যাদ্বয়কে দু'টি খেজুর দিয়ে বাকী খেজুরটি নিজে খাওয়ার জন্য মুখে পুরলো। তখন কন্যাদ্বয় ঐ খেজুরটিও খেতে চাইলো। তখন খেজুরটি সে তার নিজের মুখ থেকে বের করে ওদের মধ্যে ভাগ করে দিলো। এ দৃশ্যটি দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। পরে এ ঘটনাটি আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি শুনে বললেন, আল্লাহ্ পাক এ কারণে তার জন্য বেহেশ্ত ওয়াজিব করে দিয়েছেন অথবা আল্লাহ্ তাকে এ কারণে দোযখ থেকে রেহাই করে দিয়েছেন।" (সহীহ মুসলিম) [২১৮]

প্রশ্ন-৭৫ : আল্লাহ্র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী ধরনের খাদ্য একই সময়ে একই দস্তরখানে বসে খেতেন? অথবা তিনি কী কী খাদ্য অধিক পছন্দ করতেন?

উত্তর : **আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,** "আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাকা খেজুর ও শসা একত্রে খেতে দেখেছি।" (সহীহ আল বুখারী ও আত-তিরমিযী) [২১৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শুকনো খেজুর রুটির উপর রেখে বললেন, "এটি ঐটির তরকারি স্বরূপ।" "This is a condiment of that." **অর্থাৎ** এই খেজুরটি রুটিটির তরকারি স্বরূপ।" (আবূ দাউদ) [২২০]

সিরকা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীস আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন,

"একদা রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে তার গৃহে নিয়ে গেলেন। এক টুকরা রুটি তার সামনে পেশ করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোনো তরকারি (condiment, sauce) নেই কি? গৃহের লোকেরা বললেন, না; তবে সামান্য সিরকা বা ভিনেগার আছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সিরকা তো খুবই উত্তম তরকারি!' জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এ কথা শোনার পর থেকে সিরকা পছন্দ করে

থাকি। তালহা বলেন, আমিও জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এ কথা শোনার পর থেকে সিরকা পছন্দ করতে শুরু করছি।" (সহীহ মুসলিম) [২২১]

টমেটো ও আপেল থেকে তৈরি ভিনেগার

সিরকা (Vinegar) হচ্ছে এক প্রকার টক ও ঝাঁজযুক্ত পানীয় যার ভিতর অল্প পরিমাণ (৬% এর নীচে) এসিটিক এসিড রয়েছে। এটি ভুট্টা, টমেটো ও আপেল থেকে তৈরি হয়ে থাকে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন,

"আল্লাহ্র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরমুজ ও খেজুর একত্রে খেতেন আর বলতেন, তরমুজ খেজুরের গরম দূর করে, আর খেজুর তরমুজের ঠাণ্ডা দূর করে দেয়।" (আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী) [২২২]

পাকা তরমুজ (Ripe watermelon)
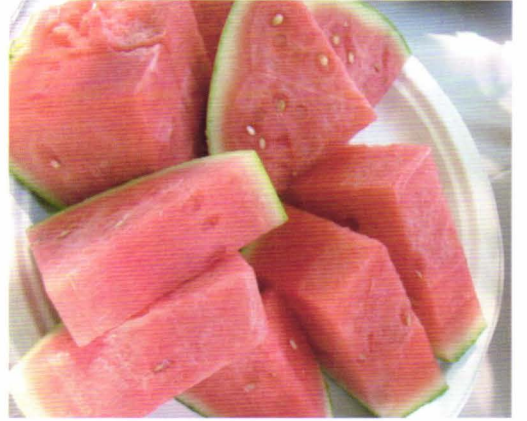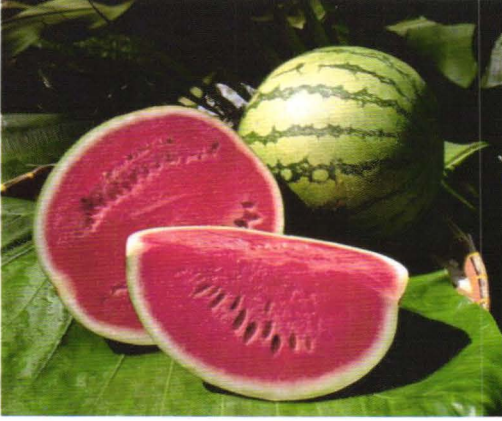
তরমুজের ফালি (Watermelon slice)

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুরের সাথে একত্রে শসা খেতেন।" (আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী) [২২৩]

"নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুর ও মাখন খুবই পছন্দ করতেন।" (আবূ দাউদ) [২২৪]

এটি বুসর সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র আতিয়া ও আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণিত হাদীস, যা আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে উল্লেখ আছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশত খুবই পছন্দ করতেন এবং এর প্রশংসা করতেন। গোশত সম্পর্কে দুটো হাদীস রয়েছে। প্রথমটি বর্ণনা করেন হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু। আল্লাহ্‌র নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "দুনিয়াবাসী ও জান্নাতবাসীদের প্রধান খাদ্য হলো গোশত।" (ইবনে মাজাহ) [২২৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দের খাবার হচ্ছে সারিদ।" (আবূ দাউদ) [২২৬]

সারিদ হচ্ছে এক প্রকার স্যুপ জাতীয় খাবার এটা গোশতের ঝোলে ভেজানো রুটির টুকরো বিশেষ। তবে কোনো কোনো সময় এতে খেজুর, পনির, ঘি বা মাখন এবং ময়দাও দেয়া হতো।

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নারী সমাজের ওপর আয়েশার এমন মর্যাদা রয়েছে যেমন অন্যান্য সকল প্রকার খাদ্যের ওপর রয়েছে সারিদের প্রাধান্য।" (ইবনে মাজাহ) [২২৭]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু ও মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন।" (সহীহ আল বুখারী) [২২৮]

অন্যত্র হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালুয়া, মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন।" (আত-তিরমিযী) [২২৯]

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন, "তোমরা যায়তুন (জলপাই)-এর তেল খাও এবং তা শরীরে ব্যবহার করো। কেননা এটি একটি বরকতময় ও প্রাচুর্যময় বৃক্ষের ফল থেকে উৎপন্ন হয়।" (আত-তিরমিযী) [২৩০]

আবূ উসাইদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুও উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আত-তিরমিযী) [২৩১]

যায়তুন (জলপাই গাছ)

Olive plants with green olives

যায়তুন (জলপাই ফল, Olive fruit)

আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে যায়তুন (জলপাই) এর তেল নাশপাতি ও খাঁটি ঘি অপেক্ষা উত্তম। যায়তুন (জলপাই) হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহের শক্তিবর্ধক। আরবদেশে যায়তুন (জলপাই) এর তেল ঘি-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "এক দর্জি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত

করলো। ঐ দাওয়াতে আমিও শরীক হলাম। খাবারে লাউসহ তরকারি পরিবেশন করা হলো। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউ বেছে বেছে খেতে লাগলেন, যা তাঁর নিকট পছন্দনীয় তরকারি ছিলো। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নিজে লাউ না খেয়ে তা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এগিয়ে দিতে লাগলাম। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, এরপর থেকেই আমার নিকট লাউ বা কদু তরকারি পছন্দনীয়।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [২৩২]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে খাবার আসলে তিনি সেই খাদ্যদ্রব্যের ভেতর যেটি অধিকতর সহজ ও সাধারণ (simple & ordinary) সেটিই বেছে নিতেন।" (সহীহ আল বুখারী) [২৩৩]

এটি শুধু খাবারের ক্ষেত্রেই নয়, বরং সকল ক্ষেত্রেই তিনি সহজ-সরল পদ্ধতি পছন্দ করতেন। কঠিন বিষয় তিনি কখনো গ্রহণ করতেননা।

প্রশ্ন-৭৬ : খাদ্যদ্রব্য তৈরি করতে ভুল-ক্রটি হলে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করেছেন?

উত্তর : হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো খাদ্যদ্রব্যে ক্রটি ধরতেননা বা ধরেননি। মনে চাইলে খেতেন আর মনে না চাইলে বা পছন্দ না হলে খেতেননা। অথবা চুপ থাকতেন।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজাহ) [২৩৪]

জনৈক বুযুর্গ ইন্তিকাল করলে তাকে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন আছেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হিসাব-নিকাশের ঝামেলা সহজেই মিটে গেছে।' প্রশ্নকারী পুনরায় বললো, 'কোন্ নেক কাজটি কাজে এসেছে?' বুযুর্গ জবাবে বললেন, "আমার স্ত্রী একদিন খিচুড়ি পাকাতে গিয়ে ভুলে অতিরিক্ত লবণ দিয়ে ফেলে। আমি খিচুড়ির লোকমা মুখে দিতেই মনে হলো মুখে বিষ পুরে দিয়েছি। তখন অনিচ্ছায় লোকমা মুখ থেকে ফেলে দিতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হলো, এটি তো আল্লাহ্‌র নিয়ামত। বিবির সামনে অসন্তোষের একটি কথাও উচ্চারণ না করে খিচুড়িটা পেটভরে খেয়ে নিই। এ আমলটি আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালার নিকট পছন্দ হয় এবং আমার ক্ষমার নির্দেশ মিলে।" (নযর আহমদ) [২৩৫]

যায়তুন (জলপাই) তেল

সুপ্রিয় পাঠক! এবার দেখুন আমাদের দেশে এমন ঘটনা আছে যে অনেকেই রাগের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীকে মারধর পর্যন্ত করে থাকে, যা সত্যি অন্যায়। কারণ তরকারিতে কেউ তো ইচ্ছে করে লবণ বেশি দেয় না। যিনি রান্না করেন তিনিও তো সেই তরকারি একত্রে খাবেন। হঠাৎ কোনোদিন যদি এ ধরনের ভুল হয়ে যায়, তবে খাদ্যদ্রব্যকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত মনে করে ফেলে না দিয়ে খেয়ে নেয়াই উত্তম। আর স্ত্রীকে বা যিনি রান্না করেন তাকে ক্ষমা করাই উচিত। কারণ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাঁর খাদেমকে দিনে ৭০ বার ক্ষমা করতেন। রমাদান মাসে এ ধরনের ভুল বেশি হয়ে থাকে। কারণ রোযা রেখে তরকারির স্বাদ গ্রহণ করা যায়না।

প্রশ্ন-৭৭ : এবার বলুন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী হালাল খাবার বর্জন করতেন, খেতেন না বা অপছন্দ করতেন? বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের খাদ্যদ্রব্য কিসের ভিত্তিতে নির্বাচন করতেন?

উত্তর : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য আহারের ব্যাপারে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন, যা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। তাঁর এই উপদেশগুলো যদি আমরা মেনে চলতে পারি তবে অনেক রোগ-ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন দুটো খাদ্যদ্রব্য একত্রে খেতেননা, যা একই স্বভাব ও মেজাজবিশিষ্ট। অর্থাৎ উষ্ণ প্রকৃতির খাদ্যের সঙ্গে শীতল বা আর্দ্র প্রকৃতির খাবার একত্রে মিশিয়ে নিতেন এবং এই নীতির উপর ভিত্তি করেই খাদ্য নির্বাচন করতেন। এতে শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকতো। ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের ক্রিয়াকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে হতো। যেমন :

১. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ ও মাছ এবং দুধ ও টক জাতীয় জিনিস একত্রে খেতেন না।

২. তিনি দুটি গরম জাতীয় খাবার কিংবা দুটি ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার একত্রে খেতেননা।
বিজ্ঞান আমাদের বলে যে দুটি গরম জাতীয় খাবার একত্রে খেলে একসঙ্গে বেশি ক্যালরি খাওয়া হয়। ফলে রক্ত ও চর্বিতে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

৩. তিনি দুটো শক্ত অথবা দুটো অত্যধিক নরম খাদ্য একত্রে খেতেননা।

৪. তিনি ভুনা গোশতের সাথে টাটকা গোশতের তরকারি একত্রে খেতেননা। অর্থাৎ মুরগির রোস্ট-এর সাথে মুরগির তরকারি একত্রে খেতেননা।

৫. তিনি দুটো জোলাপ সৃষ্টিকারী খাবার অর্থাৎ যেসব খাবার একই সাথে ডায়রিয়া বা আমাশয় সৃষ্টি করে, তা একত্রে খেতেননা। অথবা এমন দুটি খাবার একত্রে খেতেননা, যা উভয়ই কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি করে।

৬. তিনি তাজা খাবার ও বাসি (অর্থাৎ আগের দিনের রান্না করা) খাবার একত্রিত করে খেতে নিষেধ করেছেন।

৭. তিনি দ্রুত হজমশীল ও দেরীতে হজমশীল খাবার একত্রে খেতে নিষেধ করেছেন।

৮. তিনি রসুন ও পেঁয়াজ একসাথে খেতে নিষেধ করেছেন।

৯. তিনি ডালিম ও গোশতের পুডিং একত্রে খেতে নিষেধ করেছেন।

১০. তিনি এমন দুটো খাবার একত্রে খেতে নিষেধ করেছেন, যা পেটে বায়ু সৃষ্টি করে।

১১. তিনি কোনো পেঁয়াজ-রসুন বা দুর্গন্ধযুক্ত খাবার ও চটপটি জাতীয় খাবার পছন্দ করতেননা।

১২. তিনি রাতের রান্না পরের দিন খেতেননা। এর সম্ভাব্য কারণ মরুভূমির তাপমাত্রা বেশি থাকে।

চব্বিশ ঘণ্টা পর খাবার স্বভাবতই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া সেখানে ঐ সময় কোনো ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটর ছিলো না যার ভেতর আগের দিনের রান্নাকরা খাবার সংরক্ষণ করা যেতো। খাদ্য ও পানাহার সম্পর্কিত এসব তথ্যাবলি বিখ্যাত লেখক, গবেষক ও হাদীসশাস্ত্র বিশারদ হাফিজ ইবনুল কাইয়িম-এর বিখ্যাত গ্রন্থ যাদুল মা'আদ-এ উল্লিখিত আছে।

প্রশ্ন-৭৮ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানাহার সম্পর্কে হাদীসে কোনো বর্ণনা এসেছে কি?

উত্তর : সঠিক পানাহার সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশ ক'টি হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন,

ক. "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অধিক খাবে, কিয়ামত দিবসে সে ঐ পরিমাণ ক্ষুধার্ত থাকবে।" (আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [২৩৬]

খ. "মুমিন ব্যক্তি এক আঁতে খায় আর কাফির ব্যক্তি সাত আঁতে খায়।" (আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও আত-তিরমিযী) [২৩৭, ২৩৮]

অর্থাৎ মুসলমান এক নাড়ি বা পাকস্থলী দিয়ে খায়, আর কাফির সাত নাড়ি দিয়ে খায়। অন্যভাবে বলা যায় যে একজন অবিশ্বাসী একজন মুসলমানের চেয়ে সাতগুণ বেশি আহার করে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আত-তিরমিযী) [২৩৯]

প্রশ্ন-৭৯ : অতিথিদের খাওয়ানোর ব্যাপারে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো উপদেশ আছে কী? প্রতিবেশীদের আপ্যায়নের ব্যাপারে তিনি কি বলেছেন?

উত্তর : ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের মধ্যে সে উত্তম, যে মেহমানদেরকে বা অতিথিদেরকে খানা খাওয়ায়।" হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ও মুস্‌তাদরাকে হাকিম গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। শু'আবুল ঈমানেও উদ্ধৃত আছে। [২৪০]

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীদের সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা আমাদের দর্শকদের অনেকেই জানেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সে সত্যিকার মুসলমান নয়, যে পেটভরে খায় আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত বা না খেয়ে থাকে।" (মুসতাদরাক ও আল-মু'জামুল কাবীর) [২৪১]

এখানে আমি আরো দুটো হাদীস আলোচনায় আনবো যে খাদেম বা দাসের খাবারের বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সজাগ ও সহানুভূতিশীল ছিলেন।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কারো খাদেম তার জন্য খাবার এনে উপস্থিত হলে সে যেনো তাকে নিজের সাথে বসায় ও নিজের সাথে খাওয়ায়। সে যদি তাকে নিজের সাথে বসাতে না চায় তবে খাবার থেকে যেনো তাকে দেয়।" (ইবনে মাজাহ) [২৪২]

অপরদিকে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কারো খাদেম যখন তার নিকট খাদ্য নিয়ে আসে তখন সে যেনো তাকে নিজের সাথে বসায় অথবা খাদ্য থেকে তাকেও খেতে দেয়। কারণ সে খাদ্যদ্রব্য রান্না করতে গিয়ে গরম ও ধোঁয়া সহ্য করেছে।" (ইবনে মাজাহ) [২৪৩]

সত্যি কি এক মহানুভব ও বিস্ময়কর শিক্ষা! তথাকথিত কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশেও এ ধরনের মহাবুভবতার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন-৮০ : মুহতারামের নিকট প্রশ্ন, কোন্ হাতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা জায়েয, আর কোন হাতে খাবার খাওয়া নিষেধ বা নাজায়েয? আমরা যুগ যুগ ধরে ডানহাতে খাবার খেয়ে আসছি। ইদানিং কিছু লোক আবার বামহাতে খানা খায়। এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনাপূর্বক বিস্তারিত আলোচনা করুন। আমাদের ইসলামিক টিভির অগণিত দর্শকদের বিষয়টি উদাহরণ স্বরূপ বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর : ধন্যবাদ আপনাকে অত্যন্ত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করার জন্যে। কোন্ হাতে খাদ্যদ্রব্য খাওয়া যাবে এ বিষয়ে আমি ৫টি হাদীস বর্ণনা করবো ইনশা'আল্লাহ। প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো বামহাতে আহার না করে আর পানও না করে। কেননা শয়তান বামহাত দিয়ে পানাহার করে।" (আত-তিরমিযী) [২৪৪]

আবূ দাউদ শরীফে উদ্ধৃত হাদীসের ভাষা হচ্ছে, "তোমাদের কেউ যখন খাবার খায় সে যেনো ডানহাত দিয়ে খায় এবং যখন কেউ পানি পান করে সে যেনো তখন ডানহাতে পান করে। কেননা শয়তান বামহাতে খায় ও পানি পান করে।" (আবূ দাউদ) [২৪৫]

ইবনে মাজাহ শরীফে উদ্ধৃত হাদীসের বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু। [২৪৬]

মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ-

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা বামহাত দিয়ে খানা খাবে না। কারণ শয়তান বামহাত দিয়ে খানা খায়।" (সহীহ মুসলিম) [২৪৭]

তৃতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেন ইবনে আবূ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, "যখন কেউ খানা খেতে চায়, তার উচিত সে যেনো ডানহাত দিয়ে খায়, যখন কেউ পানি পান করতে চায়, তার উচিত সে যেনো ডানহাত দিয়ে পানি পান করে। কারণ শয়তান বামহাত দিয়ে খানা খায় ও বামহাত দিয়ে পান করে।" (সহীহ মুসলিম ও আত-তিরমিযী) [২৪৮]

চতুর্থ হাদীসটি হযরত উমর ইবনে আবূ সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদা আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির ছিলাম। খাওয়ার সময় আমার হাত প্লেটের ভেতর বিভিন্ন জায়গায় যেতো। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, হে বৎস! আল্লাহ্‌র নামে খাওয়া শুরু করো, ডানহাতে খাও, আর তোমার সামনে (নিকটবর্তী স্থান) থেকে খাও।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও আত-তিরমিযী) [২৪৯]
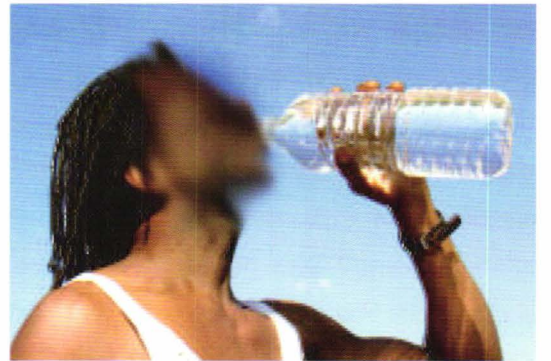
নিচের হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডানহাত ছিলো তাঁর উযূ ও খাবার গ্রহণের জন্যে, আর বামহাত ছিলো পায়খানা-প্রস্রাবের পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবার জন্যে এবং এমন কাজের জন্যে যা ছিলো অপছন্দনীয়।" হাদীসটি আবু দাউদ শরীফ থেকে নেয়া। [২৫০]

বসে ডানহাতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা আরামদায়ক ও উত্তম

হাদীসটির ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে, "The Messenger's (SAWS) right hand was for ablution and food, and his left hand was for evacuation, that is, washing after defecation and urination, and anything repugnant." (Abu Dawood) [250]

নাক পরিষ্কারের ক্ষেত্রে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বামহাত ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসটি মূসা ইবনে আবদূর রহমান রহমাতুল্লাহি আলাইহি সূত্রে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

"তিনি পানি আনতে বলেন, পরে তিনি কুলি করেন এবং নাকে পানি দেন। বামহাতে তিনবার নাক ঝাড়েন এবং বলেন, এই হলো নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু।" (আন-নাসাঈ) [২৫১]

অপরদিকে কুলি করার ব্যাপারে তিনি ডানহাত ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি হাদীস ইমাম নাসাঈ উদ্ধৃত করেছেন যা বর্ণনা করেছেন হুমরান রাদিয়াল্লাহু আনহু। (আন-নাসাঈ) [২৫২]

এ হাদীস দুটোর শিক্ষা আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্পূর্ণ সমর্থন করে। কারণ নাক থেকে যে শ্লেষা বের হয় তা দূষিত পদার্থ এবং অনেক সময় তাতে জীবাণু তাকে। তাই এ কাজে ডানহাত ব্যবহার করা উচিত নয়। অপরদিকে মুখের অভ্যন্তর পরিষ্কার করতে হলে ডানহাতই ব্যবহার করতে হয় কারণ সাধারণত ডানহাত দিয়ে খাদ্যদ্রব্য মুখের প্রবেশ করানো হয় এবং খাদ্য গ্রহণের সময় বিভিন্ন অবস্থায় ডানহাতই সর্বদা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সুপ্রিয় দর্শক-পাঠক! এই পাঁচটি হাদীসের শিক্ষা বাস্তব জীবনের উদাহরণের আলোকে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। কারণ আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদীস শুনি কিন্তু ভুলে যাই তাড়াতাড়ি। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগুলো যাতে আমরা ভুলে না যাই সে চেষ্টা করবো। আর এই ভুলে যাবার কারণেই ইসলামিক টিভি প্রত্যহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদীস রেফারেন্স বা সনদসহ আপনাদের সামনে টিভির পর্দায় এনে হাজির করে, যাতে তা বারবার দেখতে দেখতে মুখস্থ হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৮১ : অনুগ্রহপূর্বক বাম হাত দিয়ে খাওয়া-দাওয়ার বিষয়টি উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলবেন কি?

উত্তর : খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান কাজটি বামহাতে সম্পন্ন করা একেবারেই অনুচিত। আমাদের দেশের ৬৮ হাজার গ্রামের প্রায় সকল লোকই খাবার গ্রহণের পূর্বে হাত ধুয়ে নেয় এবং ডানহাতে খাবার খায়। তবে শহরে কিছু কিছু শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোক style মনে করে অন্যকে দেখিয়ে দেখিয়ে বামহাতে খায়। এসব লোক নিজেদের আধুনিক বা প্রগতিশীল বলে দাবি করে। তারা কাঁটা- চামচের মাধ্যমে বামহাতে খানা খায়, যা সত্যিই নিন্দনীয়।

একটি প্রশ্ন করবো, সুপ্রিয় দর্শক-পাঠক! কোনো সেনাকর্মকর্তা কি বামহাতে তার General বা অধিনায়ককে salute করতে পারে? এটি কি গ্রহণযোগ্য? Can an Army officer salute his General or Commandant with his left hand? Will it be acceptable in army discipline?

আপনারা কি কখনো কোনো দুই রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রীকে বামহাতে করমর্দন করতে দেখেছেন? আর আপনিও ঈদের দিনে মহামান্য প্রেসিডেন্ট বা মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কিংবা অপরাপর শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় বামহাতে মুসাফাহা করবেন? এটি কি সভ্যতা বা পররাষ্ট্রনীতির খেলাপ নয়? কোনো সন্তান কি তার বাবার কাছ থেকে বা কোনো ছাত্র কি শিক্ষকের কাছ থেকে বাম হাতে কোনো জিনিস গ্রহণ করে থাকে? কখনোই না। এমনকি আমরা কোনো সময় কাউকে টাকা বা অন্য কিছু দেয়ার প্রয়োজন হলে এবং ডানহাত বন্ধ থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিই। বলি, মনে কিছু নেবেননা, ডানহাতটা বন্ধ। এটিই নিয়ম, কি সুন্দর অভ্যাস! তাই আমাদের সবারই উচিত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা মেনে ডানহাতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা ও পানীয় পান করা।

প্রশ্ন-৮২ : বামহাতে খাওয়া, বামহাতের কাজ বা বামদিক সম্পর্কে কী কী ধারণা আমাদের সমাজে বিদ্যমান?

উত্তর : পবিত্র কুরআনে সূরা ওয়াকিয়াহ-য় বামদিকের লোকের কথা বলা হয়েছে। তাদেরকে দুর্ভাগা বা 'আস্‌হাবুল মাশ্‌আমাত' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আরবরা 'বামহাত' ও 'অশুভ লক্ষণ' শব্দ দুটোকে সমার্থক শব্দ মনে করে থাকে। তাদের কাছে বামহাত মানে দুর্বলতা। সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় যদি কোনো পাখি বামদিক দিয়ে উড়ে যেতো, তাহলে তারা একে অশুভ লক্ষণ মনে করতো। বাংলা ভাষাতেও এটিকে খুব হালকা, সহজ বা অন্যায় কাজ বলে বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন, এটি আমার বামহাতের খেলা বা বামহাতের কামাই অর্থাৎ অসৎ উপার্জন।

সুপ্রিয় দর্শক, বামহাতে খাওয়া কোনো style, fashion, culture কোনোটিই নয়। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী এটি শয়তানের কাজ। এটা একটি বদ অভ্যাস। এটি অবশ্যই

পরিত্যাজ্য। It is a bad eating practice. তাছাড়া বামহাতে খেলে কোনো বাড়তি উপকার আছে বলেও মনে হয়না। বড় বড় হোটেলের পার্টিতে দেখা যায়, অনেকে ডানহাতে ছুরি নিয়ে গোশত কেটে ছোট ছোট করে বামহাতে রাখা ফর্ক দিয়ে তা মুখে ঠেলে দেন। আমার প্রশ্ন, কেউ কি এটি দেখে প্রশংসা করবে? এই বদভ্যাসটি কি বদলানো যায়না? আমরা কাকে দেখানোর জন্য বামহাতে ফর্ক নিয়ে খাবার মুখে দিই?

সালামাহ ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "একদা এক ব্যক্তি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে বামহাত দিয়ে আহার শুরু করলে তিনি বললেন, তুমি তোমার ডানহাত দিয়ে আহার করো। সে বলল, আমি তা পারবোনা। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যেনো না-ই পারো। অহংকারবশেই সে এ আচরণ করেছিল। অতঃপর সে আর কখনো ডানহাত মুখের নিকট তুলতে পারেনি।" (সহীহ মুসলিম) [২৫৩]

প্রশ্ন-৮২ : সর্বদা আমাদের কোন্ কোন্ কাজ ডানহাতে এবং কোন্ কোন্ কাজ বামহাতে করা উচিত? কাঁটা- চামচের মাধ্যমে কি সকল খাদ্যদ্রব্য ভালোভাবে খাওয়া যায়?

উত্তর : সুপ্রিয় দর্শক! এ দুটো হাত মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বড় নি'য়ামত। তিনিই রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ঠিক করে দিয়েছেন, কোন্ হাতের কি কাজ। বামহাতের কাজ এক ধরনের, আর ডানহাতের কাজ অন্য ধরনের। একহাতের কাজ অন্যহাত দিয়ে করলে সমস্যা হয়। যারা ডানহাত দিয়ে সর্বদা খাওয়া-দাওয়া করেন, তারা কি পায়খানা-প্রস্রাব সেরে private parts ডান হাতে পরিষ্কার করবেন?

অন্যদিকে স্বাভাবিকভাবেই ডানহাতে অধিক শক্তি থাকে এবং তার প্রয়োজনও আছে। মুরগির রান থেকে গোশত বের করে খাওয়া এবং মাছের কাঁটা থেকে সবটুকু নরম অংশ আলাদা করে খাওয়ার জন্য ডানহাত ও দাঁতের বিকল্প আছে কি না তা আমার জানা নেই। সবাই জানেন হাড় ও কাঁটা থেকে গোশত-মাছ পৃথক করা কঠিন কাজ। এটা ডানহাতের কয়েকটি আঙ্গুলের সাহায্য ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কাঁটা-চামচের মাধ্যমে খেলে অনেক খাবার অপচয় হয়। কারণ সব খাবার knife ও fork দ্বারা পৃথক করা যায়না। তবে হ্যাঁ, কোনো কোনো লোককে আল্লাহ তা'য়ালা বামহাতে শক্তি দিয়েছেন, সেটা ভিন্ন কথা। এটা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা চিরাচরিত নিয়মের বহিঃপ্রকাশ, যার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কুদরতের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। নতুবা ভুল বিশ্বাস জন্মানোর সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

যাহোক, আমি যে কথা বলে প্রশ্নের উত্তর দেয়া শেষ করতে চাই, তাহলো অনেক জনগোষ্ঠীর লোক আছে, যারা ১০-১৫ দিন পরও গোসল করেনা, যারা পায়খানা-প্রস্রাব করার পরও পানি ব্যবহার করে না, টিস্যু ব্যবহার করে কাজ সেরে নেয় এবং হাত ধৌত করেনা; এমনকি অনেক লোক আছে, যারা স্ত্রী সহবাস করেও উযূ-গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করেনা। তাই এসব লোকের হাতে সর্বদা নাপাক ও দূষিত পদার্থ লেগে থাকে, যা খালি চোখে দেখা যায়না। তাই আমার সুচিন্তিত মতামত হচ্ছে, যারা খানা খাওয়ার আগে ও পরে হাত ভালোভাবে ধোয়ার গুরুত্ব, প্রয়োজন ও উপকার বুঝতে পারেনা, তারাই কাঁটা-চামচের মাধ্যমে খাদ্য খাওয়ার বিধান চালু করেছে।

I strongly feel that people whose hands always remain, dirty, unclean, impure and polluted are the ones who developed the practice of using fork and spoon for eating. Please let us change this unscientific and unProphetic culture. Let us say, thank you for not eating with the left hand, as we used to say, thank you for not smoking.

সুপ্রিয় দর্শক-পাঠক! কাঁটা-চামচের সাহায্যে খাওয়া নিষেধ নয়। প্রয়োজনে অবশ্যই কাঁটা-চামচ ব্যবহার করতে পারেন। বিশেষ করে স্যুপ, ডাল ও অন্যান্য তরল খাবার খেতে চামচ ব্যবহার করতে দোষের কিছু নেই। আর যদি পার্টিতে বা হোটেলে কাঁটা-চামচের মাধ্যমে খানা খাওয়ার প্রয়োজন বেশি অনুভূত হয়, তাহলে knife-টি বামহাতে নিন আর ডানহাতে ফর্ক নিন। খাবার কাটাকাটির কাজটি দু'হাতেই সেরে নিন। আর খাবারের লোকমা ডানহাতে রাখা ফর্কের বা spoon-এর সাহায্যে বিস্‌মিল্লাহ বলে মুখে নিন। এতে আপনিও তৃপ্তি পাবেন আর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসও মানা হবে।

জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে পিতার সূত্রে বর্ণিত।

"তিনি (আমর ইবনে উমাইয়া) নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বকরির কাঁধের (রান্নাকৃত) গোশত চাকু দিয়া কাটতে এবং তা খেতে দেখেছেন। অতঃপর তিনি নামায পড়তে গেলেন কিন্তু (পুনরায়) উযূ করেননি।" (আত-তিরমিযী) [২৫৪]

তবে এখানে একটি হাদীস আমার মনে পড়ছে। হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফে উদ্ধৃত আছে, "ছুরি দ্বারা গোশত কেটে খেয়োনা। কারণ এটি বিদেশি অভ্যাস। তবে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে খাও। কারণ এটি অধিক উপকারী এবং স্বাস্থ্যসম্মত।" (আত-তিরমিযী ও আন-নাসাঈ) [২৫৫]

The Prophet (SAWS) said, "Do not eat with a knife, for it is a foreign practice, but bite it, for it is more beneficial and wholesome." (At-Tirmizi and An-Nasai) [255]

প্রশ্ন-৮৪ : খাদ্যগ্রহণ ও বর্জন সম্পর্কিত রসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসগুলোর সাথে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনো বৈপরীত্য বা contradiction আছে কি? থাকলে আমাদের অগণিত দর্শকমণ্ডলীকে উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলবেন কি মুহতারাম?

উত্তর : **খুব সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কিত অভ্যাস বা খাদ্যাভ্যাসকে আমি এক কথায়** Good Eating Practices (GEP) of the Prophet (SAWS) **বলতে পারি। কারণ এ সুন্দর অভ্যাসগুলো সবই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানভিত্তিক। এসবের সাথে বিজ্ঞানের কোনো সংঘর্ষ, বিরোধ বা** contradiction **নেই। আমি অমুসলিম জগৎকে** challange **দিয়ে বলতে পারি যে স্বাস্থ্য, সুস্থতা, ওষুধ, পানাহার সম্পর্কিত একটি হাদীসও কেউ খুঁজে পাবেনা, যা বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক বা অবৈজ্ঞানিক। তিনটি উদাহরণ দিয়েই আমি সহজভাবে তা প্রমাণ করবো।**

আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধপান করার পর কুলি করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

দুধপান করলেন, অতঃপর তিনি পানি দিয়ে কুলি করলেন আর বললেন, এতে তৈলাক্ত পদার্থ আছে।" (সহীহ আল বুখারী) [২৫৬]

সুপ্রিয় দর্শক! দুধে যে তৈলাক্ত পদার্থ বা fat থাকে, তা আমরা জেনেছি অনেক গবেষণার ফলে, আনুমানিক কয়েক দশক আগে। আমরা সর্বদা fat বা চর্বি জাতীয় পদার্থ পানাহার থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করি। কারণ, এর ক্ষতিকর প্রভাব অনেক। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মরুভূমির কোন্ গবেষণাগারে research করে বললেন যে, দুধে তৈলাক্ত পদার্থ আছে? কে তাঁকে এই গবেষণার ফল জানিয়ে দিলেন যে milk contains fat. অর্থাৎ দুধে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে।

এই হাদীসের ভেতর আরো একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য সুপ্ত অবস্থায় আছে। আমরা জানি, অর্থাৎ বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, পানি ও তেল একত্রে মেশেনা। তবু কেনো নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি চাইলেন কুলি করার জন্য? এর উত্তর হচ্ছে, দুধে যে তৈলাক্ত পদার্থ বা fat থাকে, দুধের পানি ও অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় তার পরিমাণ অনেক কম, এবং তা পানিতে দ্রবণীয় অন্যান্য কঠিন পদার্থের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। তাই যে সামান্য তৈলাক্ত পদার্থ দুধপান করার পর মুখের ভেতর থেকে যায়, তা পানিতে দ্রবণীয় অন্যান্য পদার্থের সাথে মিশ্রিত থাকে বলে সহজেই তা পানির সাহায্যে extract করে আনা যায়। কারণ পানি হচ্ছে all purpose solvent, যা সউদি আরবের মরুভূমিতে পাওয়া যেতো। Water immiscible কিছু solventও বেশি পরিমাণ পানির ভেতর ঝেঁকে নিলে তা সামান্য পরিমাণ miscible হয়ে যায়। তাই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখের অভ্যন্তরের তৈলাক্ত পদার্থ বেশি পরিমাণ পানির সাহায্যে কুলি করে দূর করলেন।

দ্বিতীয় উদাহরণটি আরো সহজ। গ্রামের মা-বোনেরা পর্যন্ত এটি জানেন। আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ ও ভিনেগার একত্রে খেতেননা এবং খেতে নিষেধ করেছেন। এটি অনেক হাদীস গ্রন্থে এসেছে। এবার চলুন এই হাদীসটি বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই করি।

ভিনেগারে কী থাকে? এর প্রধান উপাদান এসিড। কোন্ এসিড? এসিটিক এসিড, সম্ভবত ৩-৬% এসিড যদি দুধে দেয়া হয়, তখন কী হয়? দুধ কি তখন দুধ থাকে? দুধ কি তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হয়না? অনেকে লেবু বা citric এসিড দুধে দিয়ে ছানা তৈরি করেন। Vinegar দিলেও তো ছানা হবে। তাই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ ও ভিনেগার একত্রে খেতেন না এবং খেতে নিষেধ করেছেন, যা পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত।

প্রশ্ন-৮৫ : খাদ্য গ্রহণের জন্য বসার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীসে কোনো বর্ণনা এসেছে কি?

উত্তর : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা এক গ্রাম্য লোক রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাঁটুতে ভর দিয়ে (নামাযের ভঙ্গিতে) বসে খেতে দেখে বলল, এটি কেমন বসা? লোকটির কথা শুনে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "মহান আল্লাহ্ আমাকে উদার, দয়াশীল করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাকে অবাধ্য, হঠকারী ও উদ্ধত করেননি। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা বর্তনের একপার্শ্ব হতে খাও এবং উপরের অংশ বাদ রেখো। কারণ আল্লাহ্ এটি থেকে তোমাদের জন্য বরকত নাযিল করেন।" (আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ) [২৫৭]

এই হাদীসটি আমাদের সেই ভাইদের জন্য প্রযোজ্য যারা তাবলীগে গিয়ে একত্রে বসে বড় থালে খানা খান। আবূ জুহায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমি তাকিয়া লাগিয়ে (ঠেঁস দিয়ে বসে) খাইনা।" (সহীহ আল বুখারী ও আবূ দাঊদ) [২৫৮]

অর্থাৎ কখনো হেলান দিয়ে আহার করিনা। **অন্যভাবে বলা যায় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো হেলান দিয়ে আহার করতেননা।**

"I do not eat while leaning on my side, that is, while reclining." (Sahih Al-Bukhari and Abu Dawood) [258]

হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ অহংকারী ব্যক্তিদের কাজ। এভাবে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সোজা হয়ে খাদ্য গ্রহণ করলে খাদ্যদ্রব্য সরাসরি খাদ্যনালি দিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে এবং সহজে হজম হয়।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, যখন তিনি হেলান দিয়ে খাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন। এরপর তাকে আর কোনো দিন হেলান দিয়ে বসতে দেখা যায়নি।" **রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,** "আমি আল্লাহ্‌র একজন গোলাম মাত্র। আমি খানা খাই সেভাবে যেভাবে একজন গোলাম খানা খায় এবং আমি পান করি সেভাবে যেভাবে একজন গোলাম পান করে।" এ হাদীসটি ইবনে আদি রচিত আল-কামিল ফী দুয়াফা ইর-রিজাল হাদীস গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। [২৫৯]

হাদীসটিতে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়, নম্রতা, বন্দেগি ও দাসত্বের উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

Look at the level of gratefulness, humility, obedience and submission of the Prophet (SAWS) to Allah, the Cherisher, Nourisher and Sustainer of the Worlds, and all praises are for Him.

অন্যদিকে আমাদের মধ্যে অনেকেই খাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকে ফ্যাশন মনে করে উদ্ধত ও বাবুয়ানায় লিপ্ত থাকে, তাদের জন্যে এটি একটি অনুকরণীয় বিষয়। তবে অসুস্থতা বা অন্য কোনো অপরাগতার কারণে কখনো তাকিয়া লাগিয়ে খানা খেলে তাতে কোনো দোষ নেই। একজন সুস্থ সমর্থ ব্যক্তির হেলান দিয়ে বা তাকিয়া লাগিয়ে খাওয়ার অনুমতি নেই। In fact eating is a good practice. It is a kind of Ibadah. It is not a fun, fashion or play.

হযরত সালিম যুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শুয়ে খানা খেতে নিষেধ করেছেন।" (আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ) [২৬০]

এ হাদীসটির শিক্ষা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শারীরিক সুস্থতার জন্য এ উপদেশ মেনে চলা জরুরী। কারণ উপুড় হয়ে খেলে এটি হজমশক্তি ও পরিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়।

প্রশ্ন-৮৬ : খানা মুখে দেয়ার সময় লুকমাহ পড়ে গেলে আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করতেন বা কী করতে উপদেশ দিয়েছেন?

উত্তর : হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কারো লুকমাহ (খাবারের গ্রাস) পড়ে গেলে তা তুলে নাও এবং মাটি বা ময়লা পরিষ্কার করে তা খেয়ে নাও। শয়তানের জন্য ফেলে রেখোনা" (সহীহ মুসলিম, আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [২৬১]

অন্যত্র জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শয়তান সর্বাবস্থায় তোমাদের সকল কাজে হাজির হয়। এমনকি তোমাদের আহারের সময়ও সে এসে উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কারো খানার লুকমাহ পড়ে গেলে সে যেনো ময়লা দূর করে তা খেয়ে ফেলে, শয়তানের জন্য রেখে না দেয়। আহার শেষে সে যেনো আঙ্গুলগুলো চেটে খায়। কেননা সে জানেনা যে খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত নিহিত আছে।" (সহীহ মুসলিম) [২৬২]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (সহীহ মুসলিম) [২৬৩]

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতিত খানা দস্তরখানা থেকে উঠিয়ে খেয়ে নিতেন।

সুপ্রিয় দর্শক! সাধারণত দেখা যায় যে কারো মুখ থেকে খাওয়ার সময় কোনো খাবার মাটিতে পড়ে গেলে তা অনেকে ফেলে দেয়, আবার অনেকে তা তুলে পরিষ্কার করে খেয়ে নেয়। তবে খাবার বস্তুটি যদি খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায় তবে তা ফেলে দেয়াই ভালো। কিন্তু তা না হলে কুড়িয়ে নিয়ে পরিষ্কার করে খাওয়া উত্তম। কারণ শয়তান আমাদের খাওয়ার সময় আশেপাশেই থাকে। তাকে সে খাদ্য গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি মুরগির রান হঠাৎ করে হাত থেকে পড়ে যায়, তবে তা ফেলে দেয়া কি ঠিক হবে? কখনোই না। আর যদি তরল বা আধা তরল জাতীয় খাবার পড়ে যায়, তবে তা কুড়িয়ে নেয়া যায়না। এ হাদীসগুলোতে সেসব খাবারের কথা বলা হয়নি। বস্তুত এই হাদীসের গুরুত্ব অনুধাবন করে পীর-মাশায়েখ, আলেম-দরবেশ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি খাবার সময় যদি ১টি ভাতও দস্তরখানে পড়ে যায়, তাও তারা তুলে খেয়ে নেন আর আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে থাকেন এটা খুবই বরকতপূর্ণ কাজ। এটিই good eating practice of the Prophet (SAWS).

প্রশ্ন-৮৭ : রাস্তায় চলতে-ফিরতে বা বাজারে ঘোরাঘুরির সময় খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো উপদেশ থাকলে বুঝিয়ে বলবেন?

উত্তর : আবূ উমামা আল-বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বাজারে বা shopping place-এ কোনো কিছু খাওয়া নিম্নমানের কাজ।" (আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তবারানী) [২৬৪]

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হেঁটে-চলে, দাঁড়িয়ে পানাহার করতাম। (আত-তিরমিযী)

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে হাঁটা-চলার সময় বা দাঁড়িয়ে পানাহার অপছন্দনীয়, তবে

হারাম বা নাজায়েয নয়, যেহেতু সাহাবায়ে কিরামের আমল রয়েছে। তবে বাজারে চলাফেরা বা হাঁটাহাঁটির সময়, এক দোকান থেকে অন্য দোকানে যাওয়ার পথে বা হাঁটতে হাঁটতে খাওয়া ভদ্রতা ও সভ্যতার পরিপন্থি। চলতে ফিরতে এটা-সেটা মুখে দেয়া মানুষের সুন্দর স্বভাবের আওতায় পড়েনা। তবে ব্যাপকভাবে সবার ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। কারো ক্ষেত্রে বাজারে খাওয়া দাওয়া করা রুচি বহির্ভূত ও বদহজমীর কারণ হতে পারে এবং তার জন্য এটা উৎকৃষ্ট স্বভাব এবং ভদ্রতার পরিপন্থি। আবার কারো জন্য এটা কোন খারাপ অসুবিধা নয়। বরং যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তার জন্য এটা ভদ্রতার পরিপন্থি নয়। তদ্রূপ তবে কেউ যদি ক্ষুধার্ত হয় বা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তবে নিকটবর্তী কোনো স্থানে বা fast food shop-এ গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বসে খেলে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন চিড়িয়াখানায় গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কোনো ভালো জায়গায় বসে ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে খানা খাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন-৮৮ : রাতের খাবার গ্রহণ সম্পর্কে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ জানাবেন কী?

উত্তর : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কখনো রাতে না খেয়ে ঘুমাতে যেয়োনা। যদিও তা এক মুঠো খেজুরও হয়। কারণ রাতে আহার ত্যাগ করলে তার বার্ধক্য ঘনিয়ে আসে।" (ইবনে মাজাহ) [২৬৫]

এ হাদীসের সনদে ইবরাহীম ইবনে আব্দুস সালাম নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যিনি যয়ীফ (দুর্বল)। অপরদিকে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই রাতে আহার করবে, যদিও তা এক মুঠ খেজুরও হয়। কেননা রাতের খাবার ত্যাগ বার্ধক্যের কারণ।" (আত-তিরমিযী) [২৬৬]

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) বলেছেন। এ হাদীস দুটোর বক্তব্য একই। এটি আধুনিক medical science-এর নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোনো চিকিৎসক এটি অস্বীকার করতে পারবেননা।

সুপ্রিয় দর্শক-শ্রোতা-পাঠক! এবার চলুন এ হাদীস দুটো চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে আলোচনা করি। সাধারণত আমরা যে আহার করি, তা ৫-৬ ঘণ্টার ভেতর হজম হয়ে যায়। এ জন্যই পরবর্তিতে ক্ষুধা লাগে। সুতরাং ক্ষুধা লাগলে খাওয়ার বিধান আছে। যদি দুপুরে আপনারা খানা খান, মনে করুন ১-২ টার দিকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে রাত ৮টার দিকে আপনার ক্ষুধা লাগবে। যদি আপনি রাতে না খান তাহলে আপনার পেটে ১৫-১৬ ঘণ্টা কোনো খাবার থাকবেনা। এতে স্বাভাবিকভাবেই পেটের physiological process বাধাগ্রস্ত হবে। এটিই তো medical science. নিয়মিতভাবে দীর্ঘক্ষণ যদি আপনার পেটে খাবার না থাকে তবে gastric acidity হতে পারে।

সুপ্রিয় দর্শক-পাঠক! আমি সম্মানিত medical scientist দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বার্ধক্য বা aging সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেকথা বলেছেন তা প্রমাণ করার জন্য controlled conditions-এ clinical trial দিতে হবে। আমরা ২০-২৫ জন সুস্থ মানুষকে, যাদের বয়স ৪০-৫০ বছর এমন লোকদের নির্বাচন করতে পারি। এই লোকদেরকে দুটি দলে বিভক্ত করে এক দলকে

নিয়মিত সকালে, দুপুরে ও রাতে খাবার দেবেন আর অন্য দলকে সকালে ও দুপুরে খাবার দেবেন, আর রাতে কোনো খাবার দেবেননা। তারপর তিন মাস পর বার্ধক্যের চিহ্ন বা signs গুলো measure করতে হবে। Aging characteristic গুলো হচ্ছে চুল পাকা, শরীরের ওজন কমে যাওয়া, গায়ের চামড়া কুঁচকানো, চলাচল কম হওয়া, গায়ের পানির অপ্রতুলতা, চেহারার লাবণ্যহীনতা ইত্যাদি। এ characteristic গুলো মাপলেই বোঝা যাবে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সত্যতা। কোনো clinical pharmacist তার M. Phil. degree-এর partial fulfilment এর জন্য এই thesis প্রজেক্ট হাতে নিতে পারেন।

প্রশ্ন-৮৯ : রাতের খাবার গ্রহণের পরপরই ঘুমাতে যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী বর্ণনা হাদীস শরীফে এসেছে অনুগ্রহপূর্বক জানান?

উত্তর: আবূ নু'য়াইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের খাবার গ্রহণের পরপরই ঘুমাতে যেতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্র নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "খানা আল্লাহ্র নামে এবং দু'য়ার মাধ্যমে হজম করো এবং রাতের খানা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাতে যেয়োনা। কারণ এটি তোমার কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি করতে পারে।" (আস-সুয়ূতী) [২৬৭]

এ হাদীসটি আবু নু'য়াইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন তার তিববুন নববী গ্রন্থে। আর ইমাম আস-সূয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তিববুন নববী কিতাবে রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। তবে অন্য কোন কিতাবে হাদীসটি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ইদানিং অনেক পরিবারে লক্ষ্য করছি যে, তারা অনেক দেরিতে অর্থাৎ রাত ১২-১ ঘটিকায় সময় ঘুমাতে যায়। তারা dinner খায় রাত প্রায় ১ ঘটিকায় দিকে এবং খাওয়ার পর দেরি না করেই বিছানায় শুয়ে পড়ে। এটি স্বাস্থ্যগত কারণেই সঠিক নয় এবং medical science এটি সমর্থন করেনা। এটি সঠিকভাবে খাদ্যদ্রব্য হজম করতে বাধার সৃষ্টি করে এবং পেটের হজমশক্তিকে কমিয়ে দেয়।

তাই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন, খাদ্যকে যিকির ও নামায দিয়ে হজম করতে এবং আহারান্তে সঙ্গে সঙ্গে শয়ন না করতে। তিনি দুপুরের খাবারের পর কিছুটা বিশ্রাম নিতে উপদেশ দিয়েছেন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন যে রাতের খাবারের পর ইশার নামায পড়া শ্রেয়। অনেক চিকিৎসক রাতে আহারের পর ৪০ কদম হাঁটা উচিত বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন-৯০ : তাড়াতাড়ি খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারে রসূল পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ কী?

উত্তর : খানা খাওয়ার সময় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি খানা প্রস্তুত হয়ে যায় এবং সামনে আনা হয় এবং নামাযের ইকামতও হয়ে যায় তবুও নামায আদায়ের আগেই খেয়ে নাও।" (সহীহ আল বুখারী) [২৬৮]

এই হাদীস থেকে আমরা এ শিক্ষা লাভ করি যে যখন কেউ ক্ষুধার্ত হয় এবং খানাও প্রস্তুত থাকে; আর তা সামনে আনা হয়, তখন ভালোভাবে খানা খেয়ে পরে নামায পড়বে। যদি ঘটনাক্রমে খাবার সামনে

চলে আসে আর অপরদিকে নামাযের ইকামত শোনা যায়, তখন নামাযের পূর্বে খানা খাওয়ার জন্য রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন।

সুপ্রিয় দর্শক-পাঠক! নামাযের পূর্বে খানা সামনে আসলে এবং খাওয়া শুরু করলে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করেছেন। এর কারণ ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে একাগ্রচিত্তে নামায পড়তে পারেনা। তাই খেয়ে নিয়ে তারপর নামায পড়বে। ফলে খাওয়াও সুষ্ঠভাবে হবে, আর নামাযও ঠিকমতো পড়া হবে।

তবে এটি একটি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে বলা। এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, প্রতিদিন নামাযের আযানের সময় খাবার আসবে আর আপনিও আস্তে আস্তে খেয়ে জামাত কাযা করবেন। বস্তুত মাগরিব নামাযের পর এবং ইশার নামাযের পূর্বে রাতের খাবার সেরে নেয়া উত্তম। কারণ রাতের খাবারের পর কমপক্ষে ৪০ কদম হাঁটার জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন-৯১ : পেঁয়াজ-রসুন খাওয়ার ব্যাপারে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ কী? পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া কী নিষেধ না হারাম?

উত্তর : **আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য অপছন্দ করতেন। যেমন পেঁয়াজ, রসুন বা এই ধরনের কোনো কোনো খাদ্যদ্রব্য। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,** "একদা হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তৈরি করা কিছু খাদ্য পাঠালেন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে খাদ্য খেলেননা। তখন আবূ আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে বিনীতভাবে খানা না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, এর মধ্যে (কাঁচা) পেঁয়াজ কিংবা রসুন মিশ্রিত ছিলো। তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'পেঁয়াজ বা রসুন কি হারাম?' তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হারাম নয় বটে, তবে দুর্গন্ধের কারণে আমি এটা পছন্দ করি না।" (আত-তিরমিযী) [২৬৯]

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে একটু অন্যভাবে এসেছে। আবূ আইয়ূব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

"একদা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি রসুনমিশ্রিত খাবার পাঠালে তিনি তা খেলেননা। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি হারাম? তিনি জবাব দিলেন, এটি হারাম নয়। তবে আমি এটির গন্ধ পছন্দ করিনা। তখন আমি বললাম আপনার অপছন্দনীয় দ্রব্য আমিও পছন্দ করবোনা।" (সহীহ মুসলিম) [২৭০]

আবূ আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী উম্মে আইয়ূব রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

"নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাদ্য তৈরি করলাম, যার মধ্যে শাকসবজি এবং সম্ভবত পেঁয়াজ ছিলো। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত খাদ্য খেতে পছন্দ করলেন না। তিনি সাহাবীদের বললেন, তোমরা খেয়ে নাও। আমি তোমাদের মতো নই। আমার ভয় হয়, এ খানার কারণে আমার সাথীদের তথা ফেরেশতাদের কষ্ট হবে। কারণ যাদের সাথে আমি কথা বলি, তোমরা তাদের সাথে কথা বলোনা।" (আত-তিরমিযী) [২৭১]

পেঁয়াজ (Onion)

রসুন (Garlic)

সহীহ মুসলিম শরীফে [২৭২] উদ্ধৃত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। হাদীসের ভাষা প্রায় একই। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যদি কাঁচা পেঁয়াজ-রসুন খায়, অথবা যার নিঃশ্বাসে পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ আছে, সে যেনো আমাদের কাছে তথা আমাদের মসজিদে না আসে।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [২৭৩]

অন্যদিকে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু পেঁয়াজ সম্পর্কে বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি রসূন খাবে তার আমাদের মসজিদে প্রবেশ করা উচিত নয়।" (সহীহ আল বুখারী) [২৭৪]

রসুন সম্পর্কে আরও হাদীস আছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, "রান্না করা ছাড়া (কাঁচা) রসুন খেতে নিষেধ করা হয়েছে।" (আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী) [২৭৫]

আস্-সুয়ূতী রহমতুল্লাহি আলাইহি আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ননা করেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হে আলী! রসুন খাও। আমার নিকট যদি ফেরেশতা না আসতেন তবে আমি নিজেও রসুন খেতাম।" (আস্-সুয়ূতী, তারিখে আস্‌বাহান ও আখবারে আস্‌বাহান) [২৭৬]

মুসনাদে আহ্‌মাদে আরেকটি হাদীস উদ্ধৃত করা আছে, যেখানে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "যে ব্যক্তি পেঁয়াজ-রসুন খেতে চাবে, সে যেনো তা উত্তমরূপে রান্না করে খায়, যাতে ওটার গন্ধ তিরোহিত হয়।" (সহীহ্ মুসলিম ও মুসনাদে আহ্‌মাদ) ২৭৭

প্রশ্ন-৯২ : ধন্যবাদ মুহতারাম, পেঁয়াজ-রসুনের উপর যেসব হাদীস বর্ণনা করলেন তা থেকে আমরা পেঁয়াজ-রসুন খাওয়ার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি? আধুনিক বিজ্ঞান পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া সম্পর্কে কী বলে?

উত্তর : যে সমস্ত হাদীস আলোচনা করলাম, তা থেকে এটি প্রমাণিত যে, আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁচা পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া পছন্দ করতেননা। কারণ এর গন্ধ ভালো নয়। এমনকি আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণও এ গন্ধ পছন্দ করেননা। অপরদিকে পেঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ। কারণ আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন।

এখন আমি সুপ্রিয় দর্শক-পাঠকমণ্ডলীকে জিজ্ঞেস করি, পেঁয়াজ খাওয়া জরুরী কি না? না খেলে চলবে কি না? কারণ এটি নেশার সৃষ্টি করেনা। সালাদে পেঁয়াজ না দিয়ে শসা, গাজর, টমেটো, লেটুস দিলে কি সালাদের গুণগত মান কমে যাবে? পেঁয়াজ-রসুন কি তরকারির কার্যকরী উপাদান? নাইজেরিয়াসহ অনেক দেশ আছে যেখানে তারা তরকারিতে মসলা খায়না বললেই চলে। এসব প্রশ্নের উত্তর সামনে রেখে আপনি সিদ্ধান্ত নিন আপনি পেঁয়াজ খাবেন কি না?

আমি সরাসরি পেঁয়াজ-রসুন খেতে নিষেধ করছিনা, কারণ আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করেননি। আর যদি খেতেই হয় তাহলে পেঁয়াজ না খেয়ে রসুন খান। এবার দেখি বিজ্ঞান এ দুইটি সম্পর্কে কী বলে?

পেঁয়াজ সম্পর্কে আস্-সুয়ূতী বলেন, পেঁয়াজ মাথাব্যথা সৃষ্টি করে এবং দৃষ্টিশক্তি বাধাগ্রস্ত করে। অধিক পরিমাণে কাঁচা পেঁয়াজ খেলে স্মরণশক্তি কমে যায়। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, পেঁয়াজে মিগ্রেইন আর পেটফাঁপা বাড়ায় এবং চোখে ঝাপসা দেখা যায়। অন্যদিকে রসুনের গুণাগুণ অনেক। রসুনের অপকারিতা নেই বললেই চলে। আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে রসুন একটি আদর্শ antiseptic (পচনবিরোধী)। রসুনের রস কফ দূর করে এবং expectorant হিসেবে কাজ করে। যদি কোনো antibiotic হাতের কাছে না পাওয়া যায় তখন আহত স্থানে রসুনের রস লাগিয়ে দিলে এটি জীবাণু আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

প্রতিদিন নিয়মিত রসুনের রস সেবন করলে বা ১টি করে রসুনের কোয়া বা ছোট অংশ খেলে heart attack-এর ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং রক্তে cholesterol-এর আধিক্য কমায়। আধুনিক বিজ্ঞান আরো বলে যে, রসুন blood pressure কমিয়ে আনে এবং এটি stimulant, carminative, antirheumatic and anthelmintic. It is useful in treating bronchial and asthmatic complaints.

এ আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে রসুন খুবই উপকারী। বিজ্ঞান রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার প্রতিধ্বনি করছে মাত্র। কারণ এক রিওয়ায়াতে জানা যায় যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে রসুন ৭০টি রোগের উপশমে কাজ করে। তিনি রসুনের সাহায্যে

চিকিৎসা নেয়ার উপদেশও দিয়েছেন। আর যে ভাইয়েরা নিয়মিত মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়ে থাকেন, তাদের জন্য সহজ নিয়ম শিখিয়ে দিই। প্রতিদিন ফজর ও ইশার জামায়াতে নামাযের পর অর্থাৎ পরবর্তী জামায়াতে নামাযের ৫-৬ ঘণ্টা আগে রসুন খান আর তা চিবিয়ে খাবেননা। কারণ চিবিয়ে খেলে রসুনের গন্ধে মুখ ভরে যাবে। রসুনের গন্ধ এতোই তীব্র যে একমাত্র মৃগনাভি কস্তুরি ছাড়া অন্য কিছু এ গন্ধ suppress করতে পারেনা।

রসুনের একটি ক্ষুদ্র অংশ বের করে নিয়ে এ দুই সময়ে পানির সাহায্যে গিলে খান। তাহলে আপনি ওষুধ হিসেবে রসুন নিয়মিত খেতে পারবেন, আবার জামায়াতে নামাযও ঠিকমতো আদায় করতে পারবেন। ফলে ফেরেশতাগণ আপনাকে ভালোবাসবে। My humble request is that you must respect the Prophetic tradition and at the same time you must offer your obligatory prayers in congregation regularly.

সর্বশেষে সম্মানিত দর্শকদের বলবো, রসূলের হাদীস অনুযায়ী আমরা যদি পেঁয়াজ খাওয়া বন্ধ করি বা কমিয়ে দিই, তবে নিশ্চয়ই পেঁয়াজের দামও কমে যাবে। এতে গরীব মানুষের উপকার হবে। আশা করি রসুন-পেঁয়াজ সম্পর্কে আপনার প্রশ্নের উত্তর বিশদভাবে দিতে পেরেছি।

প্রশ্ন-৯৩ : একত্রে পানাহার সম্পর্কে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনির্দিষ্ট উপদেশগুলো কী?

উত্তর : **হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সচরাচর একাকী খাদ্য গ্রহণ করতেননা। তিনি সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের সাথে একই দস্তরখানে (dining mat) একত্রে খাবার খেতেন এবং খাওয়াতেন। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করছি। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,** "একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছয়জন সাহাবী নিয়ে খানা খাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে একজন বেদুঈন এসে তাদের সাথে খানায় যোগ দিয়ে কয়েক লোকমাতেই সব খাবার শেষ করে ফেললো। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করতো, তবে তোমাদের সকলের জন্য এই খাবারই যথেষ্ট হতো।" (আত-তিরমিযী) [২৭৮]

অনেক সাহাবীই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হযরত ওয়াহশী ইবনে হারব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী আরজ করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা পানাহার করি কিন্তু তৃপ্তি পাইনা বা তৃপ্তি মিটেনা।" তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খাও।" তারা উত্তর দিলেন, "জি, হ্যাঁ।" অতঃপর নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা একত্রে খানা খাও এবং আল্লাহ্‌র নামে খাও। আল্লাহ্ পাক এতে তোমাদের বরকত দেবেন।" (মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ) [২৭৯]

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য হলো সেই খাদ্য, যার মধ্যে অধিক হাত শরীক হয়।" (আল-মুজামুল আওসাত) [২৮০]

সুপ্রিয় দর্শক! আমাদের দেশে একত্রে খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। বিশেষ করে পবিত্র রমযান মাসে এটি বেশি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। দেখা যায় প্রায়ই কোনো বাড়িতে, অফিসে বা ভালো কোনো খোলা জায়গায় বা স্কুল-কলেজে ইফতার পার্টি হয়। এতে অনেক লোক একত্রে খানা খান। সত্যি কি সুন্দর নিয়ম। অনেক পরিবারের পিতা-মাতা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ডেকে নিয়ে একত্রে খানা খান। এটি সত্যি সুন্দর অভ্যাস এবং রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। সাহাবায়ে কিরাম বলেছেন, একত্রে খাওয়া মহৎ চরিত্রের পরিচয় বহন করে।

প্রশ্ন-৯৪ : খানা শেষ করে হাত ধোয়ার আগে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করতেন? এ ব্যাপারে তাঁর কী উপদেশ ছিলো?

উত্তর : **হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।** "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা শেষ করে তিনটি আঙ্গুল চাটতেন।" (আত-তিরমিযী) [২৮১]

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুল ও বর্তন চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি আরো বলেছেন, তোমরা জানোনা যে খাদ্যের কোন অংশে কল্যাণ (বরকত) নিহীত আছে।" (সহীহ মুসলিম) [২৮২]

কা'ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতার থেকে জেনে বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তিন আঙ্গুল দ্বারা খানা খেতেন এবং খানা খাওয়ার পর আঙ্গুলগুলো চেটে খেতেন।" (সহীহ মুসলিম) [২৮৩]

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি তার আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার না করা পর্যন্ত রুমাল দ্বারা স্বীয় হাত সাফ বা পরিষ্কার করবেনা, কারণ কোন খানার ভেতর কি বরকত আছে তা জানা নেই।" (সহীহ মুসলিম ও আত-তিরমিযী) [২৮৪]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ খানা খেলে ঐ পর্যন্ত আঙ্গুল মুছবেনা, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে চেটে না নেয় অথবা অন্য কারো দ্বারা না চাটায়।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [২৮৫]

সুপ্রিয় দর্শক-পাঠক! রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়া শেষ করার পর প্লেট মুছে খেতেন এবং পানি দিয়ে ধৌত করার পূর্বে আঙ্গুল চেটে নিতেন। এতে খানায় বরকত হয়। খানার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কারণ রিযিক আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালার সবচেয়ে বড় নিয়ামত।

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "যে ব্যক্তি খানা খাওয়ার পর প্লেট চেটে খায়, ঐ প্লেট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ) [২৮৬]

তাছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে যে আঙ্গুল চোষে খাওয়া পরিপাকের জন্য উপকারী। আঙ্গুল চাটা মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস। শৈশব থেকে দেখা যায় যে শিশুরা আঙ্গুল চোষে।

সুপ্রিয় দর্শক-পাঠক! আজকাল আমাদের মাঝে অনেকটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে যে প্লেটে কিছু খাবার রেখে দেয়া। এটি নাকি ভদ্রতা? তবে কী ধরনের ভদ্রতা বা কোন্ দেশীয় ভদ্রতা তা জানা যায়না। আমি

কোনো মুসলিম দেশে এটা দেখিনি। অনেকে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার ইচ্ছে করেই প্লেটে নিয়ে নেয়। আর সামান্য কিছু খেয়ে বেশির ভাগ খাবার প্লেটে রেখে দেয়। কার জন্য? সম্ভবত শয়তানের জন্য। তার কি মনে হয়, তার এই কালচার দেখে কেউ তাকে প্রশংসা করবে! Is it the latest fashion? Indeed it is the devil's culture বা শয়তানের সংস্কৃতি।

সুধী দর্শক! খানা অপব্যয় করা গুনাহের কাজ। কুরআনের সূরা আল আ'রাফের ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন,

﴿ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾

"কুলূ ওয়াশরাবু অলাতুসরিফূ, ইন্নাহু লা য়ুহিব্বুল মুসরিফীন।"

"তোমরা খাও এবং পান করো। তবে অপব্যয় করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেননা।" (আল আ'রাফ ৭:৩১)

"Eat and drink, but waste not by extravangence, for Allah does not love those who are extravagant or prodigals." (Al Araf 7:31)

কুরআনের এ আয়াত আমাদের এ শিক্ষাই দেয় যে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট বা অপচয় করা গুনাহ। এ জন্য দেখা যায়, গ্রামের মহিলারা চাউল বাছাই করার সময় প্রতিটি চাউল মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে কুড়িয়ে নেন। একটি চাউলও ফেলে রাখেননা। অপরদিকে লক্ষ্য করা যায় যে বড় বড় হোটেলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে খাবার নষ্ট হয়। আমার বিশ্বাস, এসব হোটেলে যে পরিমাণ খানা নষ্ট হয়, তা দিয়ে ঢাকা শহরের ফুটপাথের সকল অভুক্ত লোককে খাওয়ানো সম্ভব। স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এদিকে দৃষ্টি দেবেন কি?

প্রশ্ন-৯৫ : খানা খাওয়ার পর হাত ধৌত করা সম্পর্কে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো উপদেশ বা বাণী আছে কি?

উত্তর : হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি তাওরাতে পড়েছি যে খাওয়ার আগে উযূ করলে খাদ্যের মধ্যে বরকত হয়।" আমি একথা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললে তিনি বলেন "খাওয়ার মধ্যে বরকত হলো খাদ্য গ্রহণের আগে ও খাওয়ার শেষে উযূ করাতে।" (আবূ দাঊদ ও আত-তিরমিযী) [২৮৭]

অপরদিকে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি চায় যে আল্লাহ্ সুব্হানাহু তা'য়ালা তার ঘরের বরকত বৃদ্ধি করে দেবেন, তার উচিত যখন খানা সামনে আসে তখন এবং দস্তরখান যখন উঠিয়ে নেয়া হয় (অর্থাৎ যখন খানা শেষ হয়ে যায়) তখন হাত-মুখ উত্তমরূপে ধৌত বা উযূ করা।" (ইবনে মাজাহ) [২৮৮]

উযূর আভিধানিক অর্থ ধৌত করা বা পবিত্র করা। আমরা তিন প্রকারের উযূ সম্পর্কে জানতে পারি। ১. নামাযের উযূ, এখানে হাত-মুখ ধোওয়া, মাথা মাসেহ করা এবং পা ধোওয়া ফরয। কুলি করা ও

নাকে পানি দেয়া সুন্নাত; ২. ঘুমের উযূ, (ঘুমের উযূ নামাযের উযূর ন্যায়) এ উযূতে হাত-মুখ ধৌত করতে হয় এবং তার আগে প্রস্রাব করা উচিত। কারণ এতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে না এবং ৩. খাওয়ার উযূ, এ উযূতে হাত ধোওয়া ও কুলি করা সুন্নাত।

সুপ্রিয় পাঠক! খাবার পূর্বে হাত-মুখ ভালোভাবে ধুয়ে নেয়ার পর কোনো রুমাল বা তোয়ালে দিয়ে পানি না মোছা সুন্নাহ। এর মেডিক্যাল কারণ হচ্ছে, খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার পর হাত মোছার কাছে যদি towel বা handkerchief ব্যবহার করা হয়, তবে তোয়ালে বা রুমালে লেগে থাকা জীবাণু হাতের মাধ্যমে খাদ্যে প্রবেশ করতে পারে। তাই খাবার আগে হাত ধোয়ার পর রুমাল বা তোয়ালে ব্যবহার করলে হাত ধোয়ার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে পারে। তবে খাওয়ার পর হাত ধুয়ে রুমাল বা তোয়ালে ব্যবহার করায় কোনো দোষ নেই।

প্রশ্ন-৯৬ : একত্রে আহারের ক্ষেত্রে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন? অথবা আমরা কী কী শিষ্টাচার কুরআন-সুন্নাহ থেকে জানতে পারি?

উত্তর : **আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একত্রে খাবার গ্রহণ বা শেষ করার ক্ষেত্রে সুন্দর শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন এবং সম্ভবত এই সুন্দর উপদেশটিই যুগ যুগ ধরে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে** "খানা একত্রে খেলে এতে বরকত নিহিত রয়েছে।"

জাফর ইবনে মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর সাহাবী ও অন্যান্যদের সাথে খেতেন তখন সবাই খাওয়া শেষ করার পর তিনি খাওয়া শেষ করতেন।" (মিশকাত) [২৮৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "দস্তরখান (কোন মজলিসে একত্রে খাওয়া শুরু করার সময় যে কাপড় বা তদ্রূপ জিনিস) বিছানো হলে তা পুনরায় তুলে না নেয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি যেনো উঠে না যায় এবং সে আহারে পরিতৃপ্ত হলেও হাত গুটিয়ে না নেয়, যতোক্ষণ না অন্য সকলের আহার শেষ হয়। একান্তই যদি উঠার প্রয়োজন হয় তবে সে যেনো অপারগতা প্রকাশ করে। কারণ সে হাত গুটিয়ে নিলে খেতে বসা তাঁর অন্যান্য সাথীরা লজ্জিত হবে, এবং হয়ত বা তাঁদের আরো খাদ্যের প্রয়োজন থাকতে পারে।" (ইবনে মাজাহ) [২৯০]

সম্ভবত রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উপদেশের জন্যই আমাদের এই উপমহাদেশে এ ঐতিহ্য চালু আছে যে মুরুব্বিগণ খাওয়া শেষে হাত ধোয়ার জন্য না দাঁড়ালে যুবকরা বা অল্পবয়স্ক লোকেরা দাঁড়ায় না এবং মুরুব্বিগণই প্রথম খানা শুরু করে থাকেন।

প্রশ্ন -৯৭ : খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পূর্বে বা খানা খাওয়ার সময় রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কি দু'য়া পাঠ করতেন এবং পাঠ করতে উপদেশ দিয়েছেন? খাওয়া শেষ হবার পর আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী দু'য়া পাঠ করতেন বা কী বলতেন?

উত্তর : **নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য গ্রহণের পূর্বে** 'বিসমিল্লাহি ওয়া বারাকাতিল্লাহি'

বলে দু'য়া করতেন। "আমি আল্লাহ্‌র নামে এবং তার অনুগ্রহে শুরু করছি।" (মুসতাদরাক) [২৯১]

'I begin in the name and blessings of Allah.'

উমর ইবনে আবূ সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে থাকতাম। খানা খাওয়ার সময় আমার হাত (বরতনের) চারদিক হাতড়াতো। তখন তিনি বললেন, "হে বৎস! আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খানা শুরু করো এবং ডানহাত দিয়ে খানা খাও। আর থালের ভেতর তোমার সামনের নিকটবর্তী জায়গা থেকে খাও।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও আত-তিরমিযী) [২৯২]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম উম্মাহকে নিম্নোক্তভাবে উপদেশ দিয়েছেন, "তোমাদের ভেতর যে কেউ খাওয়া শুরু করবে, সে যেনো আল্লাহ্‌র নামে খানা শুরু করে, অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' বলে। আর যদি কেউ আল্লাহ্‌র নাম বলতে ভুলে যায়, তখন যখনই তার মনে হবে, তখন সে যেনো পাঠ করে, "বিসমিল্লাহি আওআলাহু ওয়া আখিরাহু (আল্লাহ্‌র নামে খাওয়া শুরু করছি, প্রথমে এবং শেষে)।" (আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী) [২৯৩]

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "কোনো ব্যক্তি যদি স্বীয় ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দিয়ে এবং খানা খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করে খাওয়া শুরু করে, তখন শয়তান তার সঙ্গী-সাথীদের বলতে থাকে, "এটি আমাদের জন্য রাত কাটাবার এবং খানা খাবার স্থান নয়। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি ঘরে প্রবেশের সময় সালাম না দেয় ও খানা খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' না পড়ে, তখন শয়তান তার সঙ্গী-সাথীদের বলতে থাকে যে "তোমাদের জন্য রাত যাপন করা ও খানা খাওয়ার স্থান উভয় মিলে গেছে।" (সহীহ মুসলিম) [২৯৪]

হযরত আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার পর কতিপয় শব্দ দিয়ে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় ও দু'য়া করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আলহামদু লিল্লাহিল্ লাযী আত্ব'আমানা ওয়াসাকানা, ওয়াজা'আলানা মিনাল মুসলিমীন।"

"সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্লাহর, যিনি আমাকে আহার করিয়েছেন ও পান করিয়েছেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।" (আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [২৯৫]

হযরত আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থেকে দস্তরখান ওঠানো হলে তিনি বলতেন, "আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান, ত্বয়্যিবান মুবারকান ফীহি, গয়রা মাগফিয়্যিন অলা মুসতাগনীন 'আনহু রব্বানা'।"

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, পবিত্র ও বরকতময় অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তা কখনো ত্যাগ করতে পারবোনা এবং তা থেকে অমুখাপেক্ষীও হতে পারবোনা।" (আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [২৯৬]

আবূ ঈসা তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

প্রশ্ন-৯৮ : লৌকিকতা বলতে আমরা কী বুঝি? আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী লৌকিকতা দেখাতে নিষেধ করেছেন? মেহেমানদারীর সীমার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর : কষ্টের সাথে এমন কাজ করা বা এমন কোনো বিষয়, যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত নেই এবং যাতে কোনো উপকারও হয়না, তাকে লৌকিকতা বলে।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে "আমরা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ছিলাম। তখন তিনি বললেন, অযথা কষ্ট করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।" (সহীহ আল বুখারী) [২৯৭]

সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন "তোমাদের নিকট যা নেই, মেহমানদের খাতিরে তা জোগাড় করতে গিয়ে অযথা কষ্ট করবেনা, (বরং যাকিছু উপস্থিত আছে তাই তাদের সামনে দেবে)।" (শু'আবুল ঈমান) [২৯৮]

আবূ শুরাইহ কা'বী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে, সে যেনো অবশ্যই তার মেহমানের সম্মান করে। একদিন ও একরাত পর্যন্ত তাকে উত্তম খাদ্য পরিবেশন করতে হবে। আর মেহমানদারী হলো তিন দিন। এর বেশি হলে হবে সদকাহ্। আর মেজবানের কষ্ট হতে পারে এমন দীর্ঘ সময় কোনো মেহমানের তথায় অবস্থান করা বৈধ নয়।" (সহীহ আল বুখারী) [২৯৯]

ইমাম আত-তাবারানী লিখিত হাদীস গ্রন্থে দু'একটি শব্দের পরিবর্তন সাপেক্ষে শু'য়াবুল ঈমানে উদ্ধৃত হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে- "আমাদের নিকট যা নেই, মেহমানদের খাতিরে তা নিয়ে লৌকিকতা করতে আমাদেরকে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।" (আল মু'জামুল কাবীর) [৩০০]

সুপ্রিয় দর্শক! এই হাদীস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে আমাদের হাতের কাছে যা নেই তা জোগাড় করতে দৌড়াদৌড়ি করা, কোথাও কিছু না পাওয়া গেলে প্রতিবেশীদের বাসায় গিয়ে ধরনা দেয়া, টাকা-পয়সা ধার-কর্জ করে জিনিসপত্র কিনে আনা ইত্যাদি করা অনুচিত। অনেক সময় এসব কারণে মেহমানও লজ্জায় পড়ে যায় এবং আমরা খামাকাই পেরেশান হই। আর এ কারণে রহমতের ফেরেশতা তথা মেহমানকে বিপদের কারণ মনে করি। কারণ এতে লোকে মেহমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। ফলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন। কারণ যে মেহমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে।

অধ্যায়-৭

পানীয়দ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা

প্রশ্ন-৯৯ : মুহতারাম, পানি বা পানীয়দ্রব্য পান করার বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদিত সাধারণ বিধি-নিষেধ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আপনাকে ধন্যবাদ। গত কয়েকটি পর্বে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও বর্জনের উপর আলোচনার এক পর্যায়ে আমি পানীয়দ্রব্য গ্রহণের ব্যাপারে ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ নিয়ে সামান্য আলোকপাত করেছিলাম। আজ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের ব্যাপারে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও উপদেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশা'আল্লাহ।

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে পানি পান করতেন, ডানহাতে পানির গ্লাস বা কাপ ধরে তিনি অল্প অল্প করে তিন চুমুকে পানি পান করতেন এবং পান করার পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম' এবং পানি পান করার পর 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলতেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সোনা-রূপার পানির পাত্র ব্যবহার করতেননা। তিনি পানির পাত্র খোলা রাখতে এবং ফুঁক দিয়ে পানীয় পান করতে নিষেধ করেছেন। আর এগুলোই হচ্ছে, Good Drinking Practices of the Prophet Muhammad (SAWS). বস্তুত পানি পান করার এসব নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি ও সুন্দর অভ্যাসগুলো সবই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানীয় জিনিসের মধ্যে ঠাণ্ডা ও মিষ্টি পানীয় পছন্দ করতেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় পানীয় ছিলো ঠাণ্ডা, মিষ্টি পানীয়।" (মুসতাদরাকে হাকিম) [৩০১]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরো বলেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ঠাণ্ডা ও মিঠা পানি ছাকায়ার কূপ থেকে আনা হতো।" ছাকায়া একটি বস্তির নাম, যা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় দুই দিনের পথ। অপরদিকে হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "স্মরণ রেখো, দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে পানি হলো পানীয় জিনিসের সর্দার।" [৩০২] এ হাদীসটিও মুসতাদরাকে হাকিম-এ উদ্ধৃত আছে। অর্থাৎ যতো প্রকার পানীয় দ্রব্য আছে তার মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে পানি।

পানি পান ও পানির গুরুত্ব সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "কিয়ামতের দিবসে বান্দার নিকট থেকে সর্বপ্রথম যে হিসাব নেয়া হবে, তা হলো আল্লাহ তা'য়ালা তার সুস্থতা ও ঠাণ্ডা পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।" [৩০৩]

এ হাদীসটিও মুসতাদরাকে হাকিম হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। এসব হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠাণ্ডা পানিকে আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত মনে করতেন।

প্রশ্ন-১০০ : আচ্ছা মুহতারাম, কিভাবে পানি পান করা মোটেই উচিত নয়? এ ব্যাপারে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত বাণী কি?

উত্তর : **ইবনে আবূ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত।** নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পানি পান করে সে যেনো আস্তে আস্তে ঢোক গিলে পান করে এবং এক নিঃশ্বাসে যেনো পানি পান না করে।" (শু'আবুল ঈমান) [৩০৪]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "উটের মতো এক দমে গটগট করে পানি পান করোনা; বরং দুই বা তিন দমে (নিঃশ্বাসে) পান করো। পান করার সময় আল্লাহর নাম লও (অর্থাৎ বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম বলো), আর পান করার পর আল্লাহর প্রশংসা করো।" (আত-তিরমিযী) [৩০৫]

অর্থাৎ 'আলহামদু লিল্লাহ' বলো। **আর প্রশংসার সর্বাপেক্ষা উত্তম বাক্য হলো,** 'আলহামদু লিল্লাহ'।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি পৃথক নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন এবং বলতেন, এ নিয়মে পানি পান করলে তৃষ্ণা ভালোভাবে নিবারণ হয়, খাদ্য ভালোভাবে হজম হয় এবং এটি অধিক আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যকর। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, পান করার সময় আমিও তিনবার শ্বাস নিয়ে থাকি।" (সহীহ মুসলিম, আবূ দাঊদ ও আত-তিরমিযী) [৩০৬]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যখন পানি পান করবে তখন এক নিঃশ্বাসে পান করোনা।" (আত-তিরমিযী) [৩০৭]

কারণ এভাবে পানি পান করলে বুকে বেদনা হয়। চলুন, এ হাদীস দুটো বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা আলোচনা করি ।

প্রথমত, পানিতে মুখ ডুবিয়ে পানি পান করা পশুর স্বভাব। এতে নাক ও মুখের দূষিত পদার্থ ও নিঃশ্বাস পানিকে দূষিত ও নষ্ট করে ফেলে। দাড়ি-গোঁফের চুল ও ময়লা পরিষ্কার পানিকে নোংরা ও দূষিত করে থাকে। এটা আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে প্রমাণিত। যাদের গোঁফ বড়, পানি পান করার সময় তাদের গোঁফের সংস্পর্শে পানি দূষিত হয়। চুলে যেমন ধুলাবালি লেগে থাকে, তেমনি গোঁফেও ধুলা ও ময়লা লেগে থাকতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অধৈর্য হয়ে, ব্যস্ততার সঙ্গে, দৌড়ে এসে বিশ্রাম না নিয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করা সঠিক নয়। এটা উটের স্বভাব। এতে বেশ কয়েক প্রকার অসুবিধাও আছে, যা বিজ্ঞানে প্রমাণিত। দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি ব্যস্ততার সাথে পানি পান করলে পানি হুলকুমে আটকে যেতে পারে এবং হৃদযন্ত্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। অপরদিকে এভাবে পানি পান করলে পিপাসাও ঠিকমতো মেটেনা এবং পরিতৃপ্তিও আসেনা।

Drinking water while standing and in a hurry have the following disadvantages.

1. Difficulty in irritation of peristalsis or difficulty in downward movement of food or drinks
2. Chest pain

3. Choking (sense of suppocation)
4. Food/drinks in laryngs (বিষম লাগা)

প্রশ্ন-১০১ : পানি পান করার সুন্দর অভ্যাসগুলো সম্পর্কে এবার কিছু আলোকপাত করুন, যা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত।

উত্তর : পানি পান করার ব্যাপারে তিনটি সুন্দর অভ্যাস নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রথম সুন্দর অভ্যাসটি জানতে পারি আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস থেকে। তিনি বলেন, "আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পানি পান করতেন তখন তিন ঢোকে পানি পান করতেন, প্রত্যেক ঢোকে আল্লাহর প্রশংসা করতেন এবং সবশেষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।" (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা, ইবনুস সুন্নি) [৩০৮]

সুমামা ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দুই কিংবা তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন এবং তাঁর ধারণা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।" (সহীহ আল বুখারী) [৩০৯]

নওফল ইবনে মুআবিয়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো পানীয় পান করতেন, তিনি তিনবার থেমে নিঃশ্বাস নিতেন এবং যখনই পানি পান করা শুরু করতেন তখন আল্লাহর নাম নিতেন এবং যখন থামতেন, তখনই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।" (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা ও জামে সগীর) [৩১০]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন। তিনি আরো বলেন যে "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।" (ইবনে মাজাহ) [৩১১]

তৃতীয় সুন্দর অভ্যাসটি হচ্ছে, "পান করার সময় পানিতে বা পানীয়তে নিঃশ্বাস না ফেলা।" এ ব্যাপারে তিনটি হাদীস রয়েছে, যা আমি পরে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, যখন পানি বিরতির সাথে গরম ও তৃষ্ণার্ত পেটে বা পাকস্থলীতে ধীরে ধীরে পৌঁছে, তখন সাধারণত দ্বিতীয় ও তৃতীয় চুমুকেই পরিপূর্ণভাবে তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে যায়। এক নিঃশ্বাসে পানি পান করলে পানির ঠাণ্ডা প্রকৃতি ও স্বভাব সহসা পাকস্থলীতে আক্রমণ করে বসে। এতে তৃষ্ণা আংশিকভাবে নিবারণ হয়। আস সুয়ূতী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেন, কেউ যদি এক চুমুকেই পানি পান শেষ করে, তাহলে তার বুকে ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে, যাকে আরবিতে 'আল-কারব' বলা হয়।

হাফিয ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এক চুমুকে বা এক নিঃশ্বাসে পানি পান করা তাদের জন্য মোটেই উচিত নয়, যাদের instinctive heat দুর্বল এবং যারা বিশেষ করে গরম আবহাওয়ায় বাস করেন। তাছাড়া এক চুমুকে অধিক পরিমাণ পানি পান করলে তা হুলকুমে আটকে গিয়ে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

Drinking water in a sip has the following disadvantages.

Taste of water not felt proprerly.

Peristalsis not irritated.

No satisfaction, quench of thirst not fulfilled.

প্রশ্ন-১০২ : দাঁড়িয়ে পানি পান না করার ব্যাপারে হাদীসের বক্তব্য কি? অনুগ্রহপূর্বক বর্ণনা করুন। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের দিকটাও আলোচনায় আনুন।

উত্তর: এ প্রসঙ্গে প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পানি পান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।" (সহীহ মুসলিম ও আবূ দাউদ) [৩১২]

দাঁড়িয়ে পানাহার করা নিষেধ। ইহা একটি অবৈজ্ঞানিক অভ্যাস।

দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে পানি পান করবেনা। ভুলক্রমে পান করলে তা বমি করে ফেলে দেবে।" (সহীহ মুসলিম) [৩১৩]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। দাঁড়িয়ে আহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "এতো আরো খারাপ।" (সহীহ মুসলিম ও আত-তিরমিযী) [৩১৪]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পানি পান করার কারণে ধমক দিয়েছিলেন।" (সহীহ মুসলিম) [৩১৫]

এ হাদীস তিনটির ভাষ্য অত্যন্ত সহজ এবং বোধগম্য। এতে কোনো অস্পষ্টতা বা ambiguity নেই। দুটো হাদীসের শিক্ষাই বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা অনেকে না জেনে বা ফ্যাশন মনে করে দাঁড়িয়ে পানি পান করি। হাঁটতে হাঁটতে পানি পান করি। বস্তুত দাঁড়িয়ে পানি পান করলে পানি দ্রুততার সাথে সরাসরি

পাকস্থলীতে চলে যায় এবং তা সঠিকভাবে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সমানভাবে পৌঁছতে পারেনা এবং আস্তে আস্তে তা পাকস্থলীতে এসে স্বাভাবিকভাবে জমা হতে বাধাগ্রস্ত হয়। অধিকন্তু এ অভ্যাসের দরুন তৃষ্ণা সঠিকভাবে নিবারণ হয়না। অনেক চিকিৎসক বলেন, দাঁড়িয়ে পানি পান করলে পেটে বেদনা হয়।

পানি পান করার উৎকৃষ্ট সময় তখন, যখন খাদ্যদ্রব্য হজম হবার সময় হয়। আহার হজম হওয়ার পর পানি পান করা উত্তম। অনেক চিকিৎসক বলেন, আহারের সময় বা আহারের অব্যবহিত পরেই পান করা ভালো নয়। Because it dilutes the digestive enzyme. If the stomach is full, it makes the peristalsis difficult. এতে হজমক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়না। খালিপেটে পানি পান করলে হজমশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার 'এহ্ইয়াউল উলূম' কিতাবে লিখেছেন, শয়নের পরে পানি পান করোনা, কারণ তাতে প্রাকৃতিক তাপ কমে যায়।

দ্বিতীয় হাদীসটি প্রথম ও তৃতীয় হাদীস দুটোর চেয়ে অধিক শক্তিশালী নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত। তাই তা মেনে চলা আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যই প্রয়োজন। তবে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেনো এতো আত্মবিশ্বাসে ভরা মন্তব্য করলেন তা আগামী দিনে বিজ্ঞানই আমাদের বলে দেবে।

সাধারণত আমাদের পাকস্থলীর তাপমাত্রা ৩৭° সে: এর মতো থাকে। অপরদিকে পানির তাপমাত্রা সচরাচর room temperature-এ অর্থাৎ ২৫° সে: থেকে ২৮° সে: পর্যন্ত থাকে। দাঁড়িয়ে পানি পান করলে সে পানি অত্যন্ত দ্রুত পাকস্থলীতে পৌঁছে। ফলে এই তাপমাত্রার পানীয় সহসা পাকস্থলীতে পৌঁছে পেটের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে। আর বসে আস্তে আস্তে পানি পান করলে পানীয় দ্রব্যের তাপমাত্রা অতি সহজেই পাকস্থলীর তাপমাত্রার সাথে একীভূত হতে পারে।

যাহোক, এই হাদীসের ব্যতিক্রম একটি হাদীস রয়েছে তা হচ্ছে, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন।" (আত-তিরমিযী) [৩১৬]

এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "যেহেতু যমযমের কুয়ার নিকট প্রচুর জনসমাগম হয়, খুব ভিড় থাকায় বসার সুযোগ থাকেনা, তাই মানুষের কষ্ট কিছুটা লাঘবের নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে যমযমের পানি পান করেছিলেন।" তাই যমযমের পানি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাত।

প্রশ্ন-১০৩ : দাঁড়িয়ে পানাহার সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্য কি? এ বিষয়ে medical science কী বলে? কাঁটা-চামচের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও দাঁড়িয়ে না খাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করুন, যা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অনুমোদিত।

উত্তর : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পানাহার নিষেধ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও পরিপন্থি। আমরা অনেকে এটাকে ফ্যাশন মনে করি।

দাঁড়িয়ে পানি বা অন্য কোনো পানীয় পান করতে অনেক হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। সবদিক বিচার-বিবেচনা করে হাদীস বিশারদগণ এভাবে সমাধান দিয়েছেন যে দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয হলেও যেহেতু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তাই অনেকের মধ্যে দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ। এর মূল কারণ হচ্ছে পেট বা

পাকস্থলী অতি স্পর্শকাতর (Sensitive) ও দুর্বল। দাঁড়িয়ে পান করলে সবেগে পানি পেটে প্রবেশ করে এবং পাকস্থলীতে আঘাত পড়ে। কারণ এভাবে পানির জার বা মশক থেকে পানি পান করার সময় পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়না। তবে ফযীলত বা বরকতের পানি দাঁড়িয়ে পান করা উত্তম। যেমন, যমযমের পানি ও উযূর পর পাত্রের অবশিষ্ট পানি। এ পানি যেহেতু পরিমাণে সামান্ন তাই এতে ক্ষতির আশংকা নেই বললেই চলে।

আজকাল অনেক হোটেল বা রেস্টুরেন্টে বুফেতে আমরা খানা খাই। অনেকে আবার খাবার টেবিল থেকে খানা নিয়ে চেয়ারে বসে খান। আবার অনেকে দাঁড়িয়েই খাওয়া শেষ করেন। আমি নিশ্চিত, আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে দাঁড়িয়ে এক হাতে প্লেট ধরে অন্য হাতে খাওয়া খুবই অসুবিধাজনক, যা মোটেও আরামদায়ক নয়। It is an uncomfortable and difficult task. Medical science এটা সমর্থন করেনা। অনেক ক্ষেত্রে কোনো খাবার নেবার জন্য বামহাতের প্রয়োজন হয়। আর যদি কাঁটা-চামচের মাধ্যমে খাওয়া হয়, তাহলে অসুবিধা তো আরো অনেক। কাঁটা-চামচের মাধ্যমে খেতে হলে তো দু'হাত দরকার। বামহাতে প্লেট ধরলে, ডানহাতে খেলে তৃতীয় হাত পাবেন কোথায়? এ অদ্ভুত এক সংস্কৃতি! এই সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। Let us come and change this practice.

সম্মানিত দর্শক-পাঠক! ছুরি ও কাঁটা-চামচের মাধ্যমে খেয়ে অনেকেই তৃপ্তি পাননা। মুরগির রান থেকে গোশত আলাদা করা, আর কাঁটাযুক্ত মাছ থেকে কাঁটা দূর করতে কাঁটা চামচ কি কার্যকরী? এ সংস্কৃতি কি বিজ্ঞানসম্মত? কাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা এই অবৈজ্ঞানিক প্রথা চালু করেছি? এর কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি? আমি আগে এক পর্বে আলোচনা করেছি যে, যাদের হাত বিভিন্ন কারণে অপবিত্র ও দূষিত থাকে (যা খালি চোখে দেখা যায়না), তারাই এই কাঁটা-চামচ-এর মাধ্যমে খাওয়ার বিধান চালু করেছে। অপরদিকে হোটেলে চেয়ার-টেবিলের এতোই কি অভাব যে, অতিথিদের বসার ব্যবস্থা করতে পারে না? আর যদি সকল মেহমানের বসার বন্দোবস্ত করতে না পারে, তাহলে এই বড় বড় হোটেলগুলো পার্টি আয়োজনের দায়িত্ব নেয় কেনো?

বস্তুত ভালোভাবে বসে খানা খেয়ে যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা হাঁটতে হাঁটতে খেতে অসম্ভব। বসে সুন্দরভাবে প্রতিটি খাবারের লোকমা মুখে দিয়ে ভালোভাবে চিবিয়ে সহজেই গিলে ফেলা যায়। দাঁড়িয়ে খানা খেলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি। তাই যারা এভাবে দাঁড়িয়ে খানা খায়, তারা একদিকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের বিরোধিতা করছে, অপরদিকে খানাকে অসম্মান করছে এবং খাওয়ার মধ্যে অযথা কষ্ট করছে। তাই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিজ্ঞানভিত্তিক কালচার বাস্তবায়ন করতে হবে। আপনারা যারা বড় বড় হোটেলে খানা খান, তারা খাদ্য গ্রহণের আগে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে খাওয়া শুরু করুন। দেখবেন, এতে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসও মানা হবে, আর স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে এবং খেয়েও তৃপ্তি পাবেন।

আরেকটি unProphetic culture আমরা লক্ষ্য করছি তা হচ্ছে দাঁড়িয়ে খাওয়ার সময় গল্প করা। অনেকে খাওয়ার চেয়ে কথাই বেশি বলেন এবং খাওয়া অর্ধেক শেষ করে বাকি অর্ধেক শয়তানের জন্য রেখে দেন। এ গল্প কি অন্য সময়ে করা যায়না? Two separate works cannot go together. Either you eat

or talk. মূলকথা, খানা আল্লাহর নিয়ামত; খাওয়া-দাওয়া এক প্রকার ইবাদত। আর বেশি কথা বলা, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা এমনিতেই অনুচিত। তাই খাওয়ার সময় গল্প করার প্রশ্নই ওঠেনা।

বস্তুত Pharyngx এবং laryngx এর opening পাশাপাশি থাকে। খাওয়ার সময় laryngeal opening বন্ধ থাকে। আর শ্বাস-প্রশ্বাস ও কথা বলার সময় pharyngeal opening বন্ধ থাকে। তাই দু'টো কাজ এক সাথে হয়না বা হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন-১০৪ : আমরা অনেক সময় চায়ের স্টলে বসে গরম চা, দুধ বা অন্যান্য পানীয়দ্রব্য গ্রহণ করে থাকি। অনেক সময় ফুঁক দিয়ে গরম চা বা দুধ ঠাণ্ডা করে পান করি। এ বিষয়ে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস কী? যা জেনে আমাদের সম্মানিত দর্শক-শ্রোতাবৃন্দ উপকৃত হবেন?

উত্তর : চা, দুধ বা অন্য কোনো পানীয়দ্রব্য ফুঁক দিয়ে পান করা নিষেধ। এ ব্যাপারে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেশ ক'টি সহীহ হাদীস আছে যা আমি আলোচনায় আনবো।

প্রথম হাদীসটির বর্ণনাকারী হলেন হযরত ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা ও পানীয়ের মধ্যে ফুঁক দিতে এবং খাবার পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।" [৩১৭]

এটা আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফের হাদীস। এ হাদীসটিতে দুটো নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। একটি খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় দ্রব্যে ফুঁক দেয়া ও তাতে নিঃশ্বাস ফেলা। এ ব্যাপারে একটু পরে আলোচনা করবো। অপরদিকে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেক প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানিতে ফুঁক দিতে নিষেধ করলে এক ব্যক্তি আরয করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি গ্লাসে ক্ষতিকর কিছু দেখি, (অর্থাৎ যদি কোনো ময়লা গ্লাসে বা কাপে ভেসে থাকতে দেখা যায়, তবুও কি ফুঁক দেবনা), তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটা ফেলে দাও।" (মুসনাদে আহমাদ, আত-তিরমিযী ও মুসতাদরাক) [৩১৮]

আসুন, এবার আমরা হাদীস তিনটির শিক্ষাগুলো আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই করে দেখি। প্রথম নিষেধাজ্ঞা হলো, পানীয়তে নিঃশ্বাস ফেলা অর্থাৎ CO_2 পানীয়তে প্রবেশ করানো। আমরা নিঃশ্বাসের সময় অক্সিজেন নিই আর CO_2 বের করে দিই। আমরা সাধারণত CO_2 দেহে নিই না। কারণ তার দরকার নেই। বস্তুত CO, CO_2, are not inhalable gases. These are poisonous. এগুলো বিষাক্ত। আমাদের আশপাশে এসব গ্যাসের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত থাকলে পরিবেশ দূষণ হয়। এটা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

তদ্রূপ পানীয় দ্রব্যে ফুঁক দেয়াও অস্বাস্থ্যকর কাজ। এতে দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস পানীয়ে ঢোকে। তদুপরি ফুঁকে CO_2 থাকে। কারণ এটা expired air. ফুঁক দেবার সময় দূষিত বাতাস পানীয়ে প্রবেশ করে বলেই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, যা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আলোকে যুক্তিযুক্ত। অপরদিকে অধিক গরম কোনো পানীয় পান করার প্রথা এদেশীয় নয়। এটা অন্য দেশ থেকে ধার করা। এটা বিজ্ঞানসম্মতও নয়। আমাদের দেশে

অধিকাংশ লোক চা খাওয়ার সময় কাপে ঘন ঘন ফুঁক দিয়ে থাকেন।

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতাদের বলবো, খুব গরম চা বা দুধ পান করার প্রয়োজন আছে কি, যার তাপমাত্রা ৯০° বা তার কাছাকাছি? ঈষৎ গরম থাকলেই তো যথেষ্ট। অত্যধিক গরম চা পান করায় অনেকের ঠোঁট ও জিহ্বা পুড়ে যায়। এটা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। অপরদিকে দীর্ঘক্ষণ দুধ বাইরে রাখলে সে দুধ গরম না করে খাওয়া উচিত নয়। কারণ সাধারণ তাপমাত্রায় দুধ সংরক্ষণ করলে bacteria সহসা আক্রমণ করে। অপরদিকে অত্যধিক তাপে দুধ গরম করলে দুধের ভিটামিন ও nutrients সব নষ্ট হয়ে যায়। তাই অল্প গরম দুধ খাওয়াই উত্তম।

রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী তাই গরম চা, কফি বা দুধ ফুঁক দিয়ে ঠাণ্ডা করে খাওয়া একটি বদভ্যাস। It is an unscientific and unProphetic culture. আমরা জানি সৌদি আরব ও মালয়েশিয়া সহ অনেক দেশে ঠাণ্ডা চা খাওয়ার বিধান আছে। ইদানীং আমাদের দেশেও লেবু চা, spicy চা পরিবেশন করা হচ্ছে, যা ঈষৎ গরম।

প্রশ্ন-১০৫ : আমরা অনেক সময় পনির গ্লাস বা কাপ ব্যবহার না করে জগ, কলস বা মশক থেকে সরাসরি পানি পান করে থাকি। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ বা নির্দেশ কি?

উত্তর : হযরত আবূ হুরায়য়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশক বা মসকিয়ায় মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করছেন।" (সহীহ আল বুখারী) [৩১৯]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও একই হাদীস বর্ণনা করেন যা সহীহ আল বুখারীতে উল্লেখ আছে। সহীহ মুসলিমে যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে তার রাবী আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।" (সহীহ মুসলিম) [৩২০]

প্রথমত : ভরা মশকে মুখ লাগালে পানির মধ্যে এর প্রভাব পড়ে। কারো দাঁতে যদি অসুখ বা মুখে ঘা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকে, তবে তার প্রভাব সমস্ত পানিতে ছড়িয়ে পড়বে, যা স্বাস্থ্য রক্ষার নীতির পরিপন্থি। কারণ সেই মশকের পানি অন্য কেউ পান করতে পারে। HIV transmission also occurs through saliva and tears. তাছাড়া saliva borne diseases রয়েছে।

দ্বিতীয়ত : ভরা কলস বা মশক থেকে পানি পান করার সময় কিছু পানি অবশ্য বাইরে পড়ে নষ্ট হতে পারে, যা এক প্রকার অপচয়। এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া এ অবস্থায় একজন ব্যক্তি কতোটুকু পানি পান করবে, তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়না। তাই যেহেতু আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মধ্যে অক্সিজেনের পরেই পানির স্থান, তাই পানি অপচয় করা অন্যায়।

তৃতীয়ত : রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হলো, ধীরে ধীরে কমপক্ষে তিন ঢোকে পানি পান করা। কিন্তু ভরা কলস বা মশক থেকে নিশ্চিন্ত মনে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি তিন ঢোকে পান করা সম্ভব নয়। পানি উপচে গিয়ে নাকে প্রবেশ করতে পারে। ফলে বিষম লাগতে পারে।

চতুর্থত : সাধারণত কলস বা মশকে রক্ষিত পানির ভেতরে কোনো কীট-পতঙ্গ, ময়লা বা অন্য কোনো দূষিত বা ক্ষতিকর পদার্থ থাকলে তা বাইরে থেকে দেখা যায়না। তাই মশক থেকে সরাসরি পানি পান

করলে এসব পদার্থ দ্রুত পাকস্থলীতে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। এতে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তাই স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল হাদীস মেনে চলা আমাদের সবার জন্যই প্রয়োজন। কারণ তিনি তো আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই এসব স্বাস্থ্যরক্ষার মূলনীতি মূলক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ছাড়া আর কে-ই বা আছেন যিনি মুসলিম জাহান তথা সারা বিশ্ববাসীর কথা ভাবেন।

প্রশ্ন-১০৬ : ভাঙা গ্লাস বা কাপে পানি পান করা কি নিষেধ? এ সম্পর্কে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে আছে কী?

উত্তর : হাদীসের বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের ভাঙা অংশের দিক থেকে অথবা পাত্রের ছিদ্রপথে পানি পান করতে এবং পাত্রের মধ্যে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।" (আবূ দাঊদ) [৩২১]

তিনি আরো বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকিয়ার মুখ খুলে (বা ভেঙ্গে) তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।" (সহীহ আল বুখারী) [৩২২]

দুটো রিওয়ায়াত মিলিয়ে একত্র করলে আমাদের সামনে তিনটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। তা হচ্ছে,

১. পাত্রের ভাঙা অংশ থেকে পানি পান না করা;

২. পানীয়ের মধ্যে ফুঁক না দেয়া, যা আমি আগে আলোচনা করেছি এবং

৩. কলসের বা কাপের ভাঙা জায়গায় মুখ লাগিয়ে পানি পান না করা।

"পাত্রের ভাঙা অংশ থেকে পানি পান করা যাবে না" রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রথম উপদেশের মধ্যে বিজ্ঞান পুরোপুরি বিদ্যমান। কারণ, ভাঙা কাপ বা গ্লাসের ভাঙা অংশ সাধারণত ধারালো থাকে। এতে পানি পান করার সময় কারো ঠোঁট কেটে যেতে পারে। তদুপরি এ কারণে যে, ভাঙা কাপ বা গ্লাস পরিষ্কার করার পরও ময়লা আবর্জনা ভাঙা স্থানে লেগে থাকতে পারে। অনেক সময় মুখের লালা, খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ আটকে থাকতে পারে যা ঐ দিক দিয়ে পানি পান করার সময় পেটে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। আমাদের অনেকের ঘরে ব্যবহৃত মেটে বা চীনামাটির থালা-বাসনের ক্ষেত্রে এ অবস্থাটি খুবই লক্ষ্য করা যায়। কারণ চীনামাটির থালা-বাসনের ভাঙা অংশের মধ্যে নিঃসন্দেহে ময়লা জমে থাকতে দেখা যায়। পরিষ্কার করা সত্ত্বেও ভাঙা অংশের বিভিন্ন কোণায় তা লেগে থাকে। ফলে তা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়না। তাই কলস বা কাপের ভাঙ্গা জায়গা মুখ লাগিয়ে পানি করা উচিত নয়।

প্রশ্ন-১০৭ : মশা-মাছি বা অন্য কোনো কীটপতঙ্গ থেকে খাদ্য ও পানীয়দ্রব্য রক্ষা করার জন্য রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ কী? এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান কী বলে? সর্বপ্রথম খাদ্য ঢেকে রাখার বিধান কে চালু করেছেন?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস থেকে দেয়ার চেষ্টা করবো ইনশা'আল্লাহ, যা সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাঊদ শরীফে উদ্ধৃত আছে।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমরা (রাতে) ঘুমানোর সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দাও। (ঘরের) দরজাগুলো বন্ধ করে দাও, পান পাত্রের মুখ বন্ধ করে দাও এবং খাবার ও পানীয়ের পাত্রগুলো ঢেকে রাখো। সম্ভবত তিনি একথাও বলেছেন যে ঢাকবার কিছু না পেলে অন্তত একটি কাঠি হলেও আড়াআড়িভাবে তার উপর রেখে দাও।" **(সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)** ৩২৩

আবূ দাউদ শরীফে উদ্ধৃত হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, "তোমরা ঘরের দরজা 'বিসমিল্লাহ' বলে বন্ধ করবে। কেননা, এভাবে দরজা বন্ধ করলে শয়তান তা খুলতে পারেনা। আর আল্লাহর নাম নিয়ে বাতি নিভাবে এবং স্বীয় পাত্রের মুখ ঢেকে রাখবে, যদিও তা এক টুকরা কাঠি দিয়েও হয়। আর তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার মশকের মুখ বন্ধ করবে।" **(আবূ দাউদ)** ৩২৪

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারেনা, সে বন্ধ মশকের মুখও খুলতে পারেনা এবং সে পাত্রের মুখও খুলতে সক্ষম হয়না। (আর তোমরা এজন্য বাতি নিভিয়ে রাখবে যে), অধিকাংশ সময় ইঁদুর লোকের ঘর জ্বালানোর কারণ হয়ে থাকে।" **(আবূ দাউদ)** ৩২৫

কারণ অধিকাংশ সময় বাতি জ্বালানো থাকলে রাতে ইঁদুর তা টেনে নিয়ে যায়, ফলে গৃহে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্য ঘরের উন্মুক্ত বাতির আগুন নিভিয়ে শয়ন করা উত্তম। প্লেগ বা মহামারী নামক ব্যাধি থেকে নিরাপদে থাকার জন্য তিনি ১৪৫০ বছর পূর্বেই খাদ্যদ্রব্য ও পানির পাত্রের মুখ রাতে বন্ধ বা ঢেকে রাখতে উপদেশ দিয়েছেন, যা সত্যি বিস্ময়কর। নিম্নবর্ণিত হাদীসটি থেকে এ বিষয়ে জানা যায়।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমরা খাদ্যদ্রব্যের পাত্র ঢেকে রেখো, পানির মশকের মুখ বেঁধে রেখো, কারণ সত্যিই বছরে এমন একটি রাত রয়েছে যখন মহামারী নেমে আসে এবং যেসব পাত্র ঢাকা থাকেনা এবং যেসব পানির মশক ভালোভাবে বাঁধা থাকেনা, সেসব জায়গায় তা প্রবেশ করে।" **(সহীহ মুসলিম)** ৩২৬

লাইস ইবনে সা'দ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত হাদিসে দিনের কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেন যে, "বছরে এমন একটি দিন আছে যে দিনে মহামারী নাযিল হয়। **রাবী হাদীসের শেষে বাড়িয়ে বলেছেন যে** লাইস বলেন, আমাদের মধ্যে অনারবগণ এ সময় সতর্ক থাকে।" **(সহীহ মুসলিম)** ৩২৭

মশক হচ্ছে চামড়ার থলে, যাতে করে পানি বহন করা যায়। আমাদের এদেশে এর বিকল্প হচ্ছে কলস বা পানির জার। খাদ্যদ্রব্য বা পানীয়দ্রব্য ঢেকে রাখার বিষয়ে আরেকটি হাদীস আছে যা বর্ণনা করেছেন হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, "আবূ হুমাইদ নামক জনৈক আনসার ব্যক্তি নকী নামক স্থান থেকে এক পেয়ালা দুধ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে আসলেন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি ঢেকে আনোনি কেনো? এক টুকরা কাঠি দিয়ে হলেও ঢেকে আনা উচিত ছিলো।" **(সহীহ আল বুখারী)** ৩২৮

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে তরল পদার্থ দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি পাত্র ঢেকে রাখার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করতেন।

সম্মানিত দর্শক, পাঠক ও শ্রোতামণ্ডলী! এ দুটো হাদীস থেকে আমরা যেকথা জানতে পারি তা হচ্ছে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বপ্রথম খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখার মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কথা বলে গেছেন, যখন বিজ্ঞানের আবিস্কার বলতে কিছুই ছিলোনা। চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের বলে যে খাদ্য ও পানীয়দ্রব্য খুবই সাবধানে রাখা উচিত। কোনো কিছুই যেনো খাদ্যদ্রব্য বা পানীয়কে দূষিত করতে না পারে, যাকে ইংরেজিতে বলি food safety or food security. এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশিত হয়েছে, যা IS0 22000 Food Safety Management System (FSMS) নামে অভিহিত।

বস্তুত মশা-মাছি হঠাৎ করে কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে খাদ্যদ্রব্যে বসে যায় তা বলা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ কাঁঠালের রোয়া খাওয়ার সময় কতো বড় বড় মাছির হঠাৎ সমাগম, সত্যি আশ্চর্যের বিষয়। এসব মাছি তাদের পায়ে অসংখ্য রোগজীবাণু নিয়ে আসে। মাছির আক্রমণ ও উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া এবং খাদ্যদ্রব্য দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যের পাত্র ঢেকে রাখা। আর স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এই মূলনীতির কথাই বলে গিয়েছেন, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় ১৪৫০ বছর আগে, যখন বিজ্ঞান এসব বিধি-বিধান আবিষ্কারের ধারে -কাছেও ছিলোনা।

খাবার পাত্র খোলা রাখার আরেকটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, খাবার পাত্রে এমন কিছু পড়তে পারে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং এতে রোগ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে টিকটিকি বাস করে। এদের দেহ যেমন বিশ্রী, তেমন এদের শরীরও বিষাক্ত। কোনো খাদ্রদ্রব্য বিষাক্ত হওয়ার জন্য এর মধ্যে একটি টিকটিকি পতিত হওয়াই যথেষ্ট। সুতরাং আমি সম্মানিত দর্শক ও পাঠকবৃন্দকে স্বাস্থ্যরক্ষার এই দিকটির উপর সতর্ক দৃষ্টি দেবার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাবো।

বস্তুত শত শত বছর ধরে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞান আজ যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আগেই অর্থাৎ ১৪৫০ বছর পূর্বেই বলে গেছেন। খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় পাত্র ঢেকে রাখার বিধান এর অন্যতম উদাহরণ। বস্তুত সে জাতিই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করেছে যে জাতি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ও উপদেশকে তাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগিয়েছে।

অধ্যায়-৮

সঠিক ঘুম ও বিশ্রামের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা

প্রশ্ন-১০৮ : ঘুম বা বিশ্রাম সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস শরীফে কী কী বর্ণনা এসেছে, অনুগ্রহপূর্বক সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : আপনাকে ধন্যবাদ। সম্মানিত দর্শক-পাঠক-শ্রোতামণ্ডলী! নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের lifestyle তথা প্রাত্যহিক জীবন পদ্ধতি একদিকে যেমন নৈতিকতা ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উৎকৃষ্ট, অপরদিকে তা স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমি লক্ষ্য করেছি যে প্রাত্যহিক তাঁর জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত। নবীজি কী করতেন, কি করতেননা, কী খেতেন, কী খেতেননা, কখন ঘুমাতেন, কীভাবে ঘুমাতেন, কতোক্ষণ ঘুমাতেন, কখন ঘুম থেকে জেগে উঠতেন, জেগে ওঠার পর কী করতেন মোটকথা, তাঁর ঘুম, বিশ্রাম, নামায, উযূ-গোসল, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান সবই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত। They are well documented and preserved in voluminous Sahih books of Ahadth. Nothing remains hidden. His entire life is a mirror to the Muslim community in the world. আমরা তাই তাঁর lifestyle বা ব্যক্তিগত জীবন পদ্ধতি নিয়ে আগামী কয়েকটি পর্বে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করবো ইনশা'আল্লাহ।

আমরা যদি নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যক্তিগত জীবনেও অনুসরণ করি, তবে তাতে আমাদেরই কল্যাণ হবে। আমাদেরই স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকবে। অকালে আমাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে না।

শুরুতেই ঘুম নিয়ে আলোচনা করছি। আমরা যদি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম ও বিশ্রাম, ঘুম থেকে জেগে ওঠা ইত্যাদি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো যে তাঁর শরীর ও তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার অন্যান্য ফ্যাকাল্টিগুলোর কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। These activities are all balanced. তিনি বলেন, "তোমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম (ঘুমিয়ে) নাও। কারণ শয়তান কখনো বিশ্রাম নেয়না (ঘুমায়না)।" (আখবারে আসবাহান ও আস্-সুয়ূতী) [৩২৯]

ঘুম সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনের সূরা নাবার ৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন,

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾

"এবং তোমাদের ঘুমকে করেছি শান্তির বাহন।" (নাবা ৭৮:৯)

বস্তুত মানুষ ঘুম ছাড়া বাঁচতে পারেনা। কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর মানুষ কয়েক ঘণ্টা ঘুমাতে বাধ্য হয়। সূরা রূমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ﴾

"ওয়ামিন আইয়াতিহী মানামুকুম বিল লাইলি ওয়ান নাহারি ওয়াবতিগাউকুম মিন ফাদ্বলিহী।" (আর-রূম ৩০:২৩)

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাতে ও দিনে ঘুমানো এবং তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করা।" (আর-রূম ৩০:২৩)

অনুগ্রহ সন্ধান করার অর্থ জীবিকার জন্য সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালানো।

প্রশ্ন-১০৯ : ঘুমের উত্তম সময় কখন? অর্থাৎ কখন ঘুমানো মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী? দিনের বেলা ঘুমানো কি সঠিক?

উত্তর : উত্তম ঘুমের সময় হচ্ছে তখন, যখন পেটের খাদ্যদ্রব্য হজম হয়ে যায়। আল্লামা আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "দিনের বেলার ঘুম স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এটি মানুষের চেহারায় পরিবর্তন আনে, রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে এবং মানুষকে অলস করে তোলে।" (আস সুয়ূতী) ৩৩০

ডাক্তারের উপদেশ বা প্রয়োজন ছাড়া সাধারণত দিনের বেলায় ঘুমানো পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। তবে গরমকালে দুপুরে সামান্য কিছুক্ষণ ঘুমানো বা আরাম করা যেতে পারে।

সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত। তিনি বলেন, ''আমরা জুমু'আর (নামাযের) পর দুপরের খানা খেতাম এবং কাইলুলা করতাম।'' (সহীহ আল বুখারী) ৩৩১

দিনের বেলা ঘুম সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা দিনের বেলায় দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে (বা ঘুমিয়ে নিয়ে) রাতে জেগে নামায পড়তে সহযোগিতা নাও।" (ইবনে মাজাহ ও শু'য়াবুল ঈমান) ৩৩২

বস্তুত নিদ্রার ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। অত্যধিক ঘুমানো আর সারারাত জেগে থাকা উভয়ই দূষণীয়। বেশি নিদ্রায় শরীর দুর্বল হয়ে যায়। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের মা তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন, হে বৎস! তুমি অতিরিক্ত ঘুমিওনা। কারণ, অতিরিক্ত নিদ্রা কিয়ামতের দিন গরীব অবস্থায় হাজির হবার কারণ হবে।" (ইবনে মাজাহ) ৩৩৩

প্রশ্ন-১১০ : কোন্ কোন্ সময় ঘুমানো নিষেধ? সকালবেলা ঘুমানো সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য কী?

উত্তর : আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে নামাযের পর সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত এবং ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো অপছন্দ করতেন। তবে সবচেয়ে খারাপ ঘুম হচ্ছে দিনের বেলা সূর্য ওঠার পর এবং বিকেল বেলার ঘুম। আমির ইবনে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সকালে ঘুমানো মানুষের জীবিকা অন্বেষণকে বাধাগ্রস্ত করে।" (মুসনাদে আহমাদ) ৩৩৪

অর্থাৎ রিযিকের প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়। কারণ সাধারণত দিন হলো কাজের জন্য আর রাত হলো ঘুম ও আরামের জন্য। মানুষ যদিও সাধারণত রাতের বেলা ঘুমায় এবং দিনের বেলায় জীবিকার জন্য চেষ্টা-মেহনত করে, তবুও শতকরা একশো ভাগ লোক এমনটি করেনা। বরং বহু লোক দিনের বেলায় ঘুমায় ও রাতে জীবিকা অর্জনের জন্য মেহনত করে। যাহোক, সে আলোচনায় আমরা এখন যাবোনা। তবে

সারারাত ঘুমানোর পরও যদি কেউ নতুন উদ্যমে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তৎপর হয়ে ওঠার পরিবর্তে ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তার রিযিকের দরজা সে নিজেই বন্ধ করে দেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা তার পুত্রকে সকালে ঘুমাতে দেখে বলেন, "উঠে পড়ো, তুমি কি এই সময়ে ঘুমাচ্ছ, যখন মানুষের জীবিকা বণ্টন হয়ে থাকে?" (ইবনুল কাইয়িম) ৩৩৫

এ রিওয়ায়াতটি পেশ করেছেন আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি। অপরদিকে হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে একদা এক ব্যক্তি সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো যে সে ফজরের নামাযের জন্য ঘুম থেকে উঠেনি। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "শয়তান তার কানে প্রস্রাব করে দিয়েছে।" (সহীহ আল বুখারী) ৩৩৬

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা-পাঠক! সকালবেলা ঘুমানো একটা বদাভ্যাস। It is a bad habit. অনেক আধুনিক শিক্ষিত লোক এমনটি করতে অভ্যস্ত। এটি মানুষের জীবিকা অন্বেষণকে বাধাগ্রস্ত করে। এই সময় সৃষ্টি-জগত, পশু-পাখি, জীব-জন্তু তাদের খাবার অন্বেষণে বের হয়ে থাকে। যারা সকালবেলা দীর্ঘক্ষণ ঘুমায় বা ঘুমাতে অভ্যস্ত, তারা কর্মক্ষেত্রে পৌছতেও সর্বদা দেরি করে ফেলে। অর্থাৎ তারা habitual late-comers. পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কলকারখানা সমূহে সকালবেলা কাজ শুরু হয়। কর্মস্থলে পৌছতেও অনেক সময় লাগে। তাই যারা ঘুম থেকে দেরিতে উঠে, তারা তাদের কর্মস্থলে পৌঁছতে সর্বদা late-comer দের খাতায় নাম লিখায়। বস্তুত সেনাবাহিনী বা আইন-শৃংখলা বহিনীতে যারা কাজ করেন, তাদের নীতি বাক্য হচ্ছে, "আল 'আমালু খয়রুম মিনান নাউম।" অর্থাৎ ঘুম থেকে কাজ বা কর্তব্য উত্তম। এটি তারা দিনের পর দিন সঠিকভাবে পালন করে ও মেনে চলে। কারণ অত্যন্ত শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সকালে duty-তে দেরি করে উপস্থিত হওয়া এক প্রকার অপরাধ। আমি যখন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার Principal এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় ISO 9000 Consultant ছিলাম তখন এটি আমি ভালভাবে স্বচোখে দেখেছি। তবে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা আরো উত্তম। তিনি মুসলমান উম্মাহর জন্য প্রতিদিন ফজরের আযানে ঘোষণা করতে বলেছেন, "আস্‌সলাতু খয়রুম মিনান নাউম।" "ঘুম থেকে নামায উত্তম।"

অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সলাত আদায় করে মানুষ কর্মস্থলে অগ্রসর হবে আল্লাহর নি'য়ামত লাভের আশায়। এটিই নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা। যারা ফজরের নামায জামায়াতে নিয়মিত পড়েন, কখনো তাদের কর্মস্থলে পৌছতে দেরি হয়না।

প্রশ্ন-১১১ : আসরের নামাযের পর তথা বিকেলবেলা ঘুমানো সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা এসেছে কী?

উত্তর : হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা বলেছেন, "যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর নিদ্রা গেলো, তার আক্কেল-বুদ্ধি ভোঁতা করে ফেললো। এজন্য সে যেনো নিজেকেই তিরস্কার করে।" (জামে সগীর) ৩৩৭

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার এ বর্ণনা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের বেশ কয়েকজন সাহাবী সমর্থন করেছেন বলে জানা যায়। অর্থাৎ তারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার এই

বর্ণনারই প্রতিধ্বনি করেছেন। তারা বলেন, "যারা বিকেলবেলা ঘুমায় তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। আর এজন্য তারা যেনো নিজেদেরকেই দায়ী করে।" (ইবনুল কাইয়িম) ৩৩৮

এ রিওয়ায়াতটি আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সুবিখ্যাত তিব্বুন নববী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে ইমাম আল্লামা আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আল ইমাম (সম্ভবত তাঁর শিক্ষক) নামে জনৈক সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, "যে ব্যক্তি আসরের পর নিদ্রা গেলো সে যেনো তার বোধশক্তি হারিয়ে ফেললো।" (আস-সুয়ূতী) ৩৩৯

সম্মানিত দর্শক! আমার মনে হয় একজন আধুনিক ডাক্তারও একই ধরনের উপদেশ দিয়ে থাকবেন, "বিকেলবেলা ঘুমানো অনুচিত।" এটি নিষেধ। তাই আমি সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা বা পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলছি, অসুস্থ না থাকলে কেউ আছরের নামাযের পর ঘুমাবেননা। প্রয়োজনে রাতের খাবার তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ইশার নামায আদায় করে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর ঘুমিয়ে পড়ুন। এতে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

প্রিয় দর্শক-পাঠক! আপনি কখন ঘুমাচ্ছেন তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কতোক্ষণ ঘুমাচ্ছেন। দেরিতে ঘুমালে দেরিতে ঘুম থেকে উঠবেন, এটিই স্বাভাবিক। যদি ইশার নামাযের পরে টেলিভিশনে আজেবাজে অবাস্তব, নাটক-সিনেমা দেখে সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যান, তাহলে আপনার ঘুম প্রত্যুষে আপনা আপনি ভাঙবে। তখন আপনি অবশ্য কর্তব্য সলাত আদায় করে অফিসে বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার প্রস্তুতির যথেষ্ট সময় পাবেন। এটি অতীব সত্যকথা। যিনি ফজরের নামায জামায়াতে পড়তে অভ্যস্ত, তিনি কর্মস্থলে সর্বদা ঠিক সময়ে উপস্থিত হন। একটি প্রবাদ আপনারা জানেন, "যে দিনে ঘুমায় আর রাত জাগে, তার রোগ হয় সবার আগে।" আমরা এটিও জানি যে, 'early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.' এ প্রবাদগুলো এখনো সত্য বলেই প্রমাণিত। আর এই প্রবাদের চেতনা হচ্ছে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ।

প্রশ্ন-১১২ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন কীভাবে ঘুমাতেন? অর্থাৎ ঘুমানোর ব্যাপারে তাঁর কী রীতি ছিলো?

উত্তর : সাধারণভাবে শয়নের চারটি পদ্ধতি প্রচলিত। চিৎ হয়ে, ডানপাশে কাত হয়ে, বামদিকে কাত হয়ে ও উপুড় হয়ে। এ চারটি পদ্ধতির মধ্যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত ডান কাতে শয়ন করতেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাযের পর ডানকাতে শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন।" অর্থাৎ আরাম করতেন। (সহীহ আল বুখারী) ৩৪০

হযরত বারা ইবনে 'আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিশ্রাম নিতেন তখন তিনি ডান দিকে কাত হয়ে ঘুমাতেন।" (সহীহ আল বুখারী) ৩৪১

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামায আদায়ের পর আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলে তিনিও একটু আরাম করতেন। তিনি আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখলে আমার সাথে দ্বীন সম্পর্কে আলোচনা করতেন।" (সহীহ আল বুখারী, আবূ দাউদ ও তিরমিযী) ৩৪২

ঘুমানোর ব্যাপারে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলো- তিনি ইশার নামাযের পর খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তেন। কিছু সময় ঘুমানোর পর তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য জেগে যেতেন। হযরত আবূ বারযা আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের আগে ঘুমানো ও ইশার পর গল্প-গুজব করাকে অপছন্দ করতেন।" **(সহীহ আল বুখারী)** ৩৪৩

আবূ নু'য়াইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা খাবার আল্লাহর নামে ও 'নামাযের' মাধ্যমে হজম করো। আর রাতের খাবার খাওয়ার পর পরই ঘুমাতে যেয়োনা কেননা, এটি তোমাদের কোষ্টকাঠিন্য সৃষ্টি করবে।" **(আস-সুয়ূতী)** ৩৪৪

আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো অতিরিক্ত ঘুমাতেননা। অর্থাৎ সারারাত ঘুমে কাটিয়ে দিতেননা; আবার সারারাত ইবাদতও করতেননা। চোখে যখন ঘুম আসে, তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। বস্তুত একজন মুমিনকে তার ঘুমের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। হযরত হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাতে যেতেন তখন তাঁর ডানহাত তাঁর চোয়ালের নিচে রাখতেন এবং নিম্নোক্ত দু'য়া তিনবার বলতেন,

'রব্বি কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাব'আছু 'ইবাদাকা' (হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে আপনার শাস্তি থেকে বাঁচান ঐ দিন, যে দিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন)।" **(আন-নাসাঈ)** ৩৪৫

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত রাতের প্রথম অংশে ঘুমাতেন এবং দ্বিতীয় অংশের শুরুতেই ঘুম হতে উঠে পড়তেন। এরপর মিসওয়াক ও উযূ করে নামাযে মনোনিবেশ করতেন। তিনি বালিশ ব্যবহার করতেন এবং মাঝে মাঝে ডানহাত ডান গালের নিচে রাখতেন। নবী করীম সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ডানকাতে শয়ন করা উত্তম।

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা-পাঠক ভাইবোনেরা! ঘুমানো সুন্নাত নয়। সকল মানুষই ঘুমায়। পশু-পাখিও ঘুমায়। তবে ডানকাতে ঘুমানো সুন্নাত। এটি নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম। আধুনিক বিজ্ঞান এটি পুরোপুরি সমর্থন করে। আজকাল সকল ডাক্তার এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে হৃদযন্ত্রের উপর কোনো প্রকার ভার চাপানো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই মানুষ যদি বামদিকে কাত হয়ে শয়ন করে, তাহলে অবশ্যই হৃদযন্ত্রের উপর ডান ফুসফুসের চাপ পড়বে। কারণ মানুষের হৃদযন্ত্র তার বুকের বামপার্শ্বে থাকে।

তাছাড়া বামপাশের ফুসফুস ডানদিকের ফুসফুসের চেয়ে ছোট। সুতরাং এ অবস্থায় হৃদযন্ত্রকে অল্প ওজন বহন করতে হয়। অপরদিকে এ অবস্থায় লিভারও স্থির এবং অপরিবর্তিত থাকে। ডানকাতে শোয়া স্বাস্থ্যগত কারণেই উৎকৃষ্ট। কারণ, this posture facilitates the function of the bronchi of the left lung, which quickly expels its mucous secretions. **বামকাতে শয়নও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া প্রভাবিত করে থাকে এবং এর কার্যক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। বিশেষ করে যারা অধিক মোটা, তাদের জন্য বামকাতে শয়ন একেবারেই অনুচিত।**

বাম কাতে শয়ন করা নিষেধ।

ডান কাতে শয়ন করা উত্তম।

ডানকাতে শয়ন করলে খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে ভালভাবে জমা হতে পারে। ফলে অতিরিক্ত ঘুমানোর সুযোগ থাকেনা। তবে বামকাতেও কিছুক্ষণ শয়ন করা উচিত, যেনো খাদ্যদ্রব্য অতি দ্রুত হজম হয়। কারণ পাকস্থলী লিভারের সাথে হেলে থাকে। তারপর 'ডান কাতে শয়ন করা' খাদ্যদ্রব্যকে পাকস্থলীতে পৌঁছতে সাহায্য করে। আর এভাবেই আমাদেরকে ঘুমানো ও বিছানায় শয়ন করার অভ্যাস করা উচিত। কেউ যদি সর্বদা বামকাতে ঘুমায়, তবে সে তার হৃদযন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কারণ এতে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওজন হৃদযন্ত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করবে।

প্রশ্ন-১১৩ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে কোথায় কীভাবে রাত্রি যাপন করতেন, কীভাবে আরাম বা শয়ন করতেন? এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য কী? অনুগ্রহপূর্বক আলোচনা করুন।

উত্তর : হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আমরা জানতে পারি যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সফররত অবস্থায় (কোথাও) রাত যাপনের প্রয়োজন হলে সচরাচর চলাচলের স্থান বা রাস্তা থেকে সরে গিয়ে আরাম করবে। কেননা রাস্তা চতুষ্পদ জন্তু ও বিষাক্ত কীট, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ইত্যাদির চলাচলের স্থান।" (মুসলিম ও মিশকাত) [৩৪৬]

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন্দেগীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়েও ভেবেছেন। ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্র এতো যে ব্যাপক তা জেনে অনেক বিধর্মীও বিস্ময় প্রকাশ করে থাকেন। সফরে রাত যাপনের প্রয়োজন হলে রাস্তা ছেড়ে, প্রধান সড়ক থেকে দূরে সরে তাঁবু ফেলা উত্তম। কারণ বড় রাস্তা রাতে পোকামাকড়, গবাদিপশু ও সাপ-বিচ্ছুর বিচরণের স্থান। গভীর ঘুমের মধ্যে এগুলোর দ্বারা যেনো কেউ আক্রান্ত না হয়, এজন্যই তাঁর এ উপদেশাবলী। রাত যাপন ও বিছানায় শুয়ে আরাম করার বিষয়ে বহু সংখ্যক রিওয়ায়াত আছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানকাতে শয়ন করতেন। তাঁর ডানহাত গালের নিচে তাকিয়া হিসেবে রেখে দিতেন। আর তিনি কিবলামুখী হয়ে আরাম করতেন।

হযরত আবূ কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে "নবী করীম

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের আবস্থায় কোথাও রাত যাপন করতেন তখন তিনি ডান কাতে শুতেন। আর রাত্রির শেষদিকে নিজের হাত দাঁড় করিয়ে তাতে মাথা মুবারক রেখে আরাম করতেন।" (সহীহ মুসলিম) [৩৪৭]

উলামায়ে কিরাম এ রিওয়ায়াতের ব্যাখ্যা নিম্নবর্ণিতভাবে করে থাকেন। **"সফরে ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক, বিশেষত যখন রাতের বেলায় সফর করা হয়। সফরের শেষ পর্যায়ে এসে মুসাফির ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। তাই নিদ্রা তাকে প্রচণ্ডভাবে হামলা করে বসে। ফলে মুসাফির গভীর নিদ্রায় আছন্ন হয়ে পড়ে। হাত উঁচু করে তাতে মাথা রেখে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য শুতেন যাতে নিদ্রা গভীর হয়ে ফজরের নামায আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করতে অসুবিধা না হয়। সত্যি বিস্মকর এক শিক্ষা।"**

খাওলা বিনতে হাকীম রাদিয়াল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ কোনো গন্তব্যে পৌঁছে যদি এই দু'য়া পড়ে, "আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক," (আমি আল্লাহ পাকের কল্যাণকর বাক্যাবলীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি), তাহলে সে স্থান থেকে বিদায় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না। (ইবনে মাজাহ) [৩৪৮]

প্রশ্ন-১১৪ : উপুড় হয়ে বা চিৎ হয়ে শোওয়া সম্পর্কে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো উপদেশসমূহ অনুগ্রহপুর্বক আলোচনা করুন।

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস থেকে দেয়ার চেষ্টা করবো ইনশা'আল্লাহ।

উপুড় হয়ে শয়ন করা নিষেধ।

চিত হয়ে শয়ন করা নিষেধ।

হযরত আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন, "একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে একজন ঘুমন্ত ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি মুখের উপর উপুড় হয়ে পেটের উপর ভর দিয়ে শুয়ে আছেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পা দিয়ে স্পর্শ করে বললেন, "উঠে দাঁড়াও বা উঠে বসো। কারণ এটি জাহান্নামীদের শোয়া।" (মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ) [৩৪৯]

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে উপুড় হয়ে পেটের উপর চাপ দিয়ে ঘুমানো একটি বদভ্যাস। It

is a bad habit. তাই এটা পরিত্যাজ্য। কারণ দোযখের অধিবাসীরা এভাবে ঘুমায়। হযরত তাখ্ফা ইবনে কায়স গিফারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমার পিতা আস্হাবে সুফ্ফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে একদা আমি ভোরের দিকে মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়েছিলাম। হঠাৎ আমি অনুভব করলাম, কেউ আমাকে তার পা দিয়ে নাড়া দিচ্ছে। অতঃপর বলছেন যে, "এভাবে উপুড় হয়ে শোয়াকে আল্লাহ পাক অপছন্দ করেন। আমার পিতা বলেন, "অতঃপর আমি চোখ খুলে দেখলাম, স্বয়ং (এ ব্যক্তি আর কেউ নন) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।" (আবূ দাঊদ) [৩৫০]

আসহাবে সুফ্ফা হলেন সেসব সম্মানিত সাহাবী যাঁরা দুনিয়ার ব্যস্ততা পরিহার করে সব সময় মস্জিদে নববীতে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতে থাকতেন এবং সলাত, যিকির ও অজিফায় সময় কাটাতেন।

তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণিত হাদীসটিতে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "উপুড় হয়ে শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেননা।" (আত-তিরমিযী) [৩৫১]

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা ও পাঠক! উপুড় হয়ে শোয়া অত্যন্ত ভুল পদ্ধতি যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এটি মানুষের পাকস্থলী, হজমশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক বিরূপ প্রভাব ফেলে। হৃদয়ের স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তাই আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপুড় হয়ে শুতে নিষেধ করেছেন।

এমনকি হিপোক্রাটস্ও তার বইয়ে একই ধরনের কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, "কোনো অসুস্থ ব্যক্তি যদি উপুড় হয়ে ঘুমায়, যা অসুস্থ না থাকলে তার স্বাভাবিক ঘুমের নিয়ম নয়, তাহলে সে মানসিক দুর্বলতা বা পেটব্যথায় ভুগছে।" (ইবনুল কাইয়িম) [৩৫২]

আব্বাস ইবনে তামীম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার চাচা হতে জেনে বর্ণনা করেন, "তিনি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে নববীতে এক পা আরেক পায়ের উপর রেখে শায়িত অবস্থায় দেখেছেন।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী) [৩৫৩]

অপরদিকে প্রসিদ্ধ সাহাবী জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কেউ যেন চিৎ হয়ে শুয়ে এক পা অপর পায়ের উপর তুলে না রাখে।" (সহীহ মুসলিম) [৩৫৪]

চিৎ হয়ে ঘুমানো সাধারণভাবে অনুচিত। এ দুটো হাদীসই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। এটি সত্য যে অধিকাংশ সময়ই ঘুমানোর সময় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডানহাত তাঁর মাথা মুবারকের নিচে থাকতো এবং চেহারা কিবলামুখী থাকতো। তবে সম্ভবত কাত পরিবর্তনের সময় তিনি স্বল্প সময়ের জন্য এমনটি করে থাকবেন। কারণ স্বাভাবিকভাবে বেশি সময়ের জন্য চিৎ হয়ে শোয়া সঠিক নয়, যা হযরত জাবির বর্ণিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে জানা যায়। এটি মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে প্রভাবিত করে। কারণ যখন কেউ চিৎ হয়ে শয়ন করে, তখন তার মুখ খোলা থাকে, কেননা the lower jaw is relaxed. এ অবস্থান sleep apnea ঘটতে পারে। অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে

শ্বাস বন্ধ হতে পারে। তাছাড়া snorring বা নাক ডাকা স্বভাব সৃষ্টি হতে পারে।

জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি নবী সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি।" (আত-তিরমিযী) [৩৫৫]

প্রশ্ন-১১৫ : ছায়া ও রোদে ঘুমানো, বসা বা অবস্থান সম্পর্কে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক-নির্দেশনা কী?

উত্তর: **হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন,** "যখন কোনো ব্যক্তি ছায়াযুক্ত স্থানে থাকে, আর যখন শরীরের অংশবিশেষ আস্তে আস্তে সূর্যের আলোতে আসে, তখন সে যেনো সে স্থান পরিত্যাগ করে।" (আবূ দাঊদ ও মুসতাদরাক) [৩৫৬]

ইবনে বুরাইদা রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আংশিক ছায়াযুক্ত স্থান ও আংশিক রোদযুক্ত স্থানে বসতে নিষেধ করেছেন।" (ইবনে মাজাহ ও মুসতাদরাক) [৩৫৭]

অপরদিকে আবূ নু'য়াইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে আংশিক রোদে এবং আংশিক ছায়াতে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন।" (আবূ নু'য়াইম) [৩৫৮]

এ তিনটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে ছায়া ও রোদের মাঝে অবস্থান করা, বসে থাকা ও ঘুমানো নিষেধ। তাই গ্রামের বাড়িতে শীতকালে কেউ যদি দিনের বেলায় রোদে ঘুমায়, আর বেলা পড়ে গিয়ে সে স্থানে ছায়া চলে আসে, তখন তার সে স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। Radiation from sunlight affects our body. **তাই একই শরীরে দু'ধরনের** effect **থাকা কাম্য নয়।**

প্রশ্ন-১১৬ : ঘুমানোর আগে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ বা নির্দেশনা কী?

উত্তর : **হযরত আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,** "আগুন তোমাদের শত্রু। সুতরাং নিদ্রা যাবার পূর্বে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিবে।" (সহীহ মুসলিম) [৩৫৯]

অপরদিকে হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমাতে যাবেনা।" (সহীহ মুসলিম) [৩৬০]

অধিকন্তু হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বিছানায় যাবার সময় ঘরের বাতি নিভিয়ে ফেলো, দরজা বন্ধ করো এবং পানির পাত্রের মুখ বন্ধ করো।" (সহীহ আল বুখারী) [৩৬১]

কতো সুন্দর ও যথাযথ উপদেশ। এ উপদেশটি আমরা অনেকেই জেনে বা না জেনেই মেনে চলছি যুগ যুগ ধরে। শুধু তাই নয়, নিরাপত্তার জন্য তিনি ঘুমাতে যাবার পূর্বে শয্যাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে বা ঝেড়ে নিতে উপদেশ দিয়েছেন, যা সত্যি বিস্ময়কর।

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ শয়ন করতে যাবে তখন সে যেনো শয্যাটি (বিছানা) ঝেড়ে

নেয়। কেননা সে জানেনা তার অবর্তমানে তাতে কোনো বিষাক্ত প্রাণী বা কীটপতঙ্গ লুকিয়ে রয়েছে কি না। ঝেড়ে ফেলার পর এ দু'য়া পড়বে।"

"বিইস্‌মিকা রব্বি ওয়াদ্বাতু জামবি ওয়াবিকা আরফাউহু ইন আমসাকতা নাফ্‌সী ফাবহামহা ওয়াইন আরসালতাহা ফাহফাযহা বিমা তাহ্‌ফাযু বিহিস্‌সলিহীন।"

"হে আমার প্রতিপালক! আপনারই নামে আমি (শয্যায়) দেহ এলিয়ে দিলাম এবং আপনারই সাহয্যে আবার তা উঠাবো। যদি আপনি (এর মধ্যে) আমার জান কবয করে নেন তবে আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। আর যদি তাকে থাকতে দেন তবে ঠিক সেভাবেই হিফাজত করুন, যেভাবে আপনি নেককারদের জানের হিফাজত করে থাকেন।" (সহীহ আল বুখারী) [৩৬২]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে ঘুমানোর আগে অবশ্যই বাতি নিভিয়ে ফেলা উচিত। বিশেষ করে তা যদি উন্মুক্ত কোনো দোয়াতের বাতি, মোমবাতি বা naked lamp জাতীয় বাতি হয়। বিছানা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নেয়া উচিত। তাছাড়া কীট-পতঙ্গ উন্মুক্ত আগুনে বসে তা কাপড়-চোপড়ে লাগিয়ে দিতে পারে। টিকটিকি উন্মুক্ত আগুনের বাতি ফেলে দিয়ে কাপড়ে আগুন লাগাতে পারে। তাই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব নির্দেশনা পালন করা আমাদের সকলের নিরাপত্তার জন্যই জরুরি। এতে আমাদের সকলের কল্যাণ ও সার্বিক সফলতা নিহিত।

প্রশ্ন-১১৭ : ঘুমানোর পূর্বে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী দু'য়া পাঠ করতেন?

উত্তর : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাক পবিত্রতার সাথে শয়ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। **বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন,** "যখন তুমি বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছে করবে তখন নামাযের ন্যায় উযূ করবে, তারপর ডানকাত হয়ে বিছানায় শুয়ে বলবে, "আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা ওয়া ফাওঅদ্বতু আমরী ইলাইকা ওয়া আলজা'তু যাহ্‌রী ইলাইকা রহ্‌বাতান ওয়া রগ্‌বাতান ইলাইকা, লা-মালজা'আ ওয়ালা মানজাআ মিনকা ইল্লা ইলাইকা আমান্‌তু বিকিতাবিকাল্লাযী আনযালতা ওয়াবি নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।" "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার কাছে সোপর্দ করলাম, আমি আমার সব বিষয় আপনার ইখতিয়ারে ছেড়ে দিলাম এবং আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম আপনার আযাবের ভয়ে এবং আপনার রহমতের আশায়। আপনার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেবার এবং নাজাত পাওয়ার স্থান আপনার কাছে ছাড়া আর কোথাও নেই। আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর আমি ঈমান এনেছি। আপনি যে নবী পাঠিয়েছেন তাঁর উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।" **যদি এটা পড়ে নিদ্রা যাওয়ার পর তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে ফিতরাতের (ইসলামের) উপরই মৃত্যুবরণ করবে।** (সহীহ আল বুখারী) [৩৬৩]

দু'য়াটির ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে, O Allah! I surrender my life to You and submit all my affairs to You. I seek shelter from You with hope and fear. Certainly there is no shelter, protection and destination except You. I believe The Book You have revealed, and I believe in the Messenger who is sent down from You.

অপরদিকে হযরত বারা ইবনে 'আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অছিয়ত করে বলেন, তুমি যখন বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন এ দু'য়া পাঠ করবে, "আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা ওয়াফাওআদতু আমরী ইলাইকা ওয়াওয়াজ্জাহতু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়াআলজা'তু যাহ্‌রী ইলাইকা রগবাতান ওয়া রহবাতান ইলাইকা লা-মালজাআ ওয়ালা মানজাআ মিনকা ইল্লা ইলাইকা আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনাযালতা ওয়াবি নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।"

"হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার নিকট সমর্পণ করলাম এবং আমার সব বিষয় আপনার ইখতিয়ারে ছেড়ে দিলাম এবং আমার চেহারা আপনার অভিমুখী করলাম। এবং আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম আপনার শাস্তির ভয়ে ও আপনার রহমতের আশায়। আপনার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাবার স্থান আপনার ছাড়া আর কোথায়ও নেই। আমি আপনার প্রেরিত কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি ও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছি।"

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এ দু'য়া পাঠ করে নিদ্রায় যায় এবং সে রাতেই মারা যায় সে ফিতরাতের (দ্বীন ইসলামের) উপর মারা যায়।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৩৬৪]

প্রশ্ন-১১৮ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠে কী দু'য়া পাঠ করতেন?

উত্তর : **হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,** তোমরা যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, তখন এ দু'য়া পাঠ করবে। "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমার আত্মা আমার দেহে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমার দেহকে আরাম দিয়েছেন এবং আমাকে স্বীয় যিকিরের তওফিক দিয়েছেন।" (সহীহ আল বুখারী) [৩৬৫]

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় যেতেন তখন পড়তেন, "বিইসমিকা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া" (হে আল্লাহ! আপনার নামে আমি মৃত্যু বরণ করছি বা ঘুমাচ্ছি) এবং বেঁচে থাকি (জাগি)। তিনি ঘুম থেকে উঠে বলতেন, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর" (সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে মৃত্যুর পর আবার জীবন দান করেছেন এবং তাঁরই দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।) (সহীহ আল বুখারী ও আবূ দাউদ) [৩৬৬]

সহীহ মুসলিমে বারা' ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের ভাষাও প্রায় একই রূপ। [৩৬৭]

আবূ যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহুও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে বিছানায় যেতেন তখন এই দু'য়া পাঠ করতেন, "আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া।" "হে আল্লাহ! আমি আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং আপনার নামেই বেঁচে থাকি।" **আর যখন তিনি ঘুম থেকে জাগতেন তখন বলতেন,** "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমা'তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।" "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি মৃত্যুর পর আমাকে জীবন দান করলেন। আর অবশেষে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।" (সহীহ আল বুখারী) [৩৬৮]

প্রশ্ন-১১৯ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর আর কী করতেন বা করার জন্য উপদেশ দিতেন?

উত্তর : **হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,** "তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন সে যেনো তার হাত তিনবার ধোওয়ার আগে পানির পাত্রে না ডুবায়। কেননা, সে জানেনা ঘুমানোর পর তার হাত শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে গিয়েছে (ঘুমের ঘোরে হয়তো তা লজ্জাস্থানে পৌছে যেতে পারে)।" (আত-তিরমিযী) [৩৬৯]

বিজ্ঞান আমাদের বলে যে ঘুমের সময় হাত যদি মলদ্বারে চলে গিয়ে মলদ্বার চুলকালে গুড়ো কৃমির কারণে হাত দূষিত হয়। ইংরেজীতে একে আমরা pruritus বা গুহ্যদ্বার চুলকানো বলে থাকি, যা threadworm infestation. তাছাড়া অন্যান্য লজ্জাস্থানে পৌছেও হাত দূষিত হতে পারে।

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে পাক-পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতো তীক্ষ্ণ নযর ছিলো। বস্তুত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতিও তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিলো। আর তাই ঘুম থেকে জেগে উঠার পর হাত না ধুয়ে কোনো পাত্রে হাত দিতে নিষেধ করেছেন। কারণ অবচেতন ও ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের হাত কোন কোন জায়গায় যায়, আর তা পাক রয়েছে না নাপাক হয়ে গেছে তা আমাদের জানা নেই। তাই খাবার বা পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করলে তা নাপাক বা দূষিত হতেই পারে।

অধ্যায়-৯

সুগন্ধি ও সৌরভের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা

প্রশ্ন-১২০ : সুগন্ধি বা সৌরভ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় বস্তুগুলোর অন্যতম। এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী কী বাণী আছে?

উত্তর : আপনি ঠিকই বলেছেন যে সুগন্ধি বা perfume নবী করীম সল্লাল্লাহু সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। তিনি শুধু সুগন্ধির প্রতি আকৃষ্টই ছিলেন না, বরং তিনি নিজেই ছিলেন সুগন্ধির উৎস। বস্তুত সুগন্ধি না লাগালেও নবী করীম সল্লাল্লাহু সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীর থেকে সর্বদা সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়তো। বাস্তবিকপক্ষে সুগন্ধিকে 'আত্মার রোগ নিরাময়ে' যথাযথ ও সহায়ক ঔষুধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত রয়েছে। প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বর্ণনা করেন,

"তিনি কখনোও খুশবু প্রত্যাখ্যান করতেননা এবং তার জানামতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খুশবু ফিরিয়ে দিতেননা।" (সহীহ আল বুখারী) [৩৭০]

দ্বিতীয় হাদীসটি সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "কাউকে কোনো ফুল হাদিয়া (উপহার) দিলে সে যেনো তা প্রত্যাখান না করে। কেননা ঐ বস্তুটি ক্ষুদ্র ও হালকা হলেও তার সুঘ্রাণ উত্তম।" (সহীহ মুসলিম) [৩৭১]

রায়হানের বাংলা নাম বাবুই তুলসী, আর ইউনানি নাম হচ্ছে ফারান্‌জ মুশক। সুগন্ধি সম্পর্কে রায়হানের কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা সূরা আর-রাহমানে (৫৫:১২) উল্লেখ করেছেন,

﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾

এখানে রায়হানকে মিষ্টি সুগন্ধিযুক্ত গাছ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

রায়হান গাছ ও পাতা (Sweet basil)

তৃতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু, যার ভাষা উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কাউকে যদি কিছু সুগন্ধি প্রদান করা হয় তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। কারণ সুগন্ধি-দ্রব্য ওজনে অত্যন্ত হালকা এবং এতে উত্তম সৌরভ থাকে।" (আবূ দাঊদ ও আন-নাসাঈ) [৩৭২]

মনে করুন, কেউ আপনাকে আতর উপহার দিলেন, আপনি গ্রহণ করুন। আতরের ওজন তো বেশি নয়, এটি হালকা, পকেটে রাখা যায়।

চতুর্থ হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেন,

তিনি আরো বলেন, "সুঘ্রাণ হচ্ছে আত্মার খোরাক বা খাদ্য, আর আত্মা বা রূহ হচ্ছে সমাবেশকৃত সেনাবাহিনীসদৃশ।" (সহীহ আল বুখারী, ইবনুল কাইয়িম ও আস-সুয়ূতী) [৩৭৮]

প্রশ্ন-১২১ : এবার মানবদেহে সুগন্ধি দ্রব্যসমূহের প্রভাব ও এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : বাস্তবিক পক্ষে মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং রোগ-ব্যাধি দূরীকরণে সুগন্ধির প্রভাব বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি মানুষের দেহে শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। উত্তম সুগন্ধি ও উত্তম আত্মার মধ্যে একটি বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। ভালো সৌরভ ও উত্তম সুগন্ধি মানুষের আত্মার পুষ্টি বিধান করে থাকে। অধিকন্তু ফেরেশ্‌তারা সুগন্ধি পছন্দ করেন আর শয়তান তা অপছন্দ করে। শয়তান বিশ্রী গন্ধ, পুঁতি গন্ধ পছন্দ করে। আর উত্তম আত্মা উত্তম সুগন্ধি পছন্দ করে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বিশ্রী বা পুঁতি গন্ধ পছন্দ করতেননা। তিনি প্রতিনিয়ত সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

আল্লামা আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "স্ত্রী সহবাসের পর সুগন্ধি ব্যবহারের চেয়ে উপকারী আর কিছু নেই।" (আস-সুয়ূতী) [৩৭৯]

প্রশ্ন-১২২ : মুহতারাম, কী কী ধরনের সুগন্ধি আমাদের প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন? মৃগনাভি কস্তুরি বা মিস্‌ক সম্পর্কে বলুন। এটি কী ধরনের সুগন্ধি? কি এর পরিচয়? মৃগনাভি বা কস্তুরি সম্পর্কে কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন কী ইরশাদ করেছেন?

উত্তর : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্‌ক (কস্তুরি) ও আম্বর ব্যবহার পছন্দ করতেন। কস্তুরি মধ্য এশিয়ার musk deer নামক শিংবিহীন ছোট হরিণ বিশেষ প্রাণীর নাভি থেকে উৎপন্ন হয়। এ প্রাণীটি চীন ও হিমালয় অঞ্চলেও পাওয়া যায়। প্রাণীটির zoological নাম হচ্ছে *Moschus mochifera* Linn. এই প্রাণীর নাভি থেকেই কস্তুরি সংগ্রহ করা হয়। It is obtained from the navel of musk deer. It is the dried secretion of the preputial follicles of the musk deer.

কস্তুরির আরবী নাম মিস্‌ক। Persian ও উর্দুনাম হচ্ছে Mushk. বাংলা ও হিন্দি নাম কস্তুরি। কস্তুরিসহ চামড়ার থলেটিকে ইংরেজিতে pods বলা হয়ে থাকে। মৃগনাভি কস্তুরিকে সুগন্ধি দ্রব্যসমূহের রাজা বলা হয়ে থাকে। It is the king of perfumes.

মধ্য এশিয়ার শিংবিহীন ছোট্ট হরিণ বিশেষ (Musk deer)

মৃগনাভি, কস্তুরি (Navel of musk deer)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা সূরা আল-মুতাফফিফীন-এর ২৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন,

﴿خِتَامُهُ مِسْكٌ﴾

"খিতামুহু মিসক।" অর্থাৎ "মিস্কের মোহর বা মিস্কের সুগন্ধ।" (আল মুতাফফিফীন ৮৩:২৬)

এখানে বলা হয়েছে যে পানীয় ভর্তি পাত্রের মুখ কস্তুরি দ্বারা মোহরাঙ্কিত থাকবে অথবা পানীয়তে কস্তুরি মেশানো থাকবে। ফলে পান করার পর শেষের দিকে তারা কস্তুরির খুশবু পাবে।

প্রশ্ন-১২৩ : মৃগনাভি কস্তুরি সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী কী বক্তব্য হাদীস শরীফে লিপিবদ্ধ আছে? মেহেরবানী করে আলোচনা করুন।

উত্তর: মৃগনাভি কস্তুরি বা মিসকের ব্যবহার সম্পর্কে ৮টিরও অধিক সহীহ্ হাদীস রয়েছে। প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি বেহেশতে পাথরের মালা (অলংকার) এবং মিসকের ন্যায় মাটি দেখেছি।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৩৮০]

দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, "আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সুগন্ধি লাগাতেন?" তিনি বললেন, "নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের জন্য উপযোগী সুগন্ধি হিসেবে মিস্ক ও আম্বর ব্যবহার করতেন।" (আন-নাসাঈ) [৩৮১]

তৃতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যাকে আল্লাহর রাস্তায় যখম করা হয়েছে কিয়ামতের দিন সে যখমী অবস্থায় আসবে। আর রক্তের বর্ণ হবে লাল এবং ঘ্রাণ হবে মিসকের ।" (সহীহ মুসলিম) [৩৮২]

"The smell of the blood of the martyr would be like musk on the Day of Judgement." (Sahih Muslim) [382]

চতুর্থ হাদীসটিও বর্ণনা করেন হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে

এমন অবস্থায় আসবে যে তার আহত স্থান থেকে রক্ত ঝড়ে পরতে থাকবে। এবং (সে রক্তের) রং হবে লাল টকটকে এবং গন্ধ হবে কস্তুরির (মিসক) ন্যায় সুগন্ধিময়।" **(সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)** [৩৮৩]

"Whoever gets injury for the cause of Allah his blood would smell like musk." (Sahih Al Bukhari and Muslim) [383]

পঞ্চম হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহের তুলনায় বেশি সুঘ্রাণময় কোনো আম্বর, মিস্ক বা অন্য কোনো বস্তু আমি দেখিনি এবং তাঁর দেহের কমনীয়তা থেকে অধিক স্নিগ্ধ ও কোমল কোনো রেশম বা মোলায়েম কাপড় আমি কখনো স্পর্শ করিনি।" **(সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)** [৩৮৪]

"The smell of the Prophet's (SAWS) body was better than amber and musk." (Sahih Al Bukhari and Muslim) [384]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো পথ বা গলি দিয়ে যেতেন তখন সমস্ত রাস্তায় সুগন্ধি ছড়িয়ে যেতো। ঐ সুগন্ধির কারণে যাতায়াতকারী যে কেউ বুঝতে পারতো যে একটু আগেই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাস্তা দিয়ে গমন করেছেন।" **(মুসনাদে আবি ইয়ালা আল মাওছিলী)** [৩৮৫]

হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে মুসলিম শরীফে এ বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, "একবার নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুমানোর সময় তাঁর পবিত্র শরীর থেকে ঘাম ঝরছিলো। তখন তিনি ঐ ঘাম একটি ছোট বোতলে জমা করতে শুরু করলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, একি করছো? উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, এ ঘাম আমি আমার খুশবুর সাথে মিশাবো। কারণ এ ঘাম সর্বাপেক্ষা খুশবুযুক্ত।"**(সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)** [৩৮৬]

আবূ হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের হাত যেনো বরফ হতেও অধিক শীতল এবং মিস্ক হতেও বেশি সুঘ্রাণযুক্ত।" **(সহীহ আল বুখারী)** [৩৮৭]

মিসক সম্পর্কে ৬ষ্ঠ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে বনী ইসরাঈল গোত্রের এক মহিলা একটি সোনার আংটি বানালো এবং তাতে কস্তুরি-আম্বর ভরে দিলো। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মিস্ক হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধি।" **(সহীহ মুসলিম ও আন-নাসাঈ)** [৩৮৮]

"The best type of perfume is musk." (Sahih Muslim and An-Nasai) [388]

সপ্তম হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেন, "কুরবানীর দিনে, কা'বাঘরের চারদিকে তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে ও ইহরাম পরিধান করার আগে ও ইহরাম খোলার সময় আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (মিসকের সাহায্যে) সুগন্ধিযুক্ত করতাম।" **(সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)** [৩৮৯]

অষ্টম হাদীসটিও বর্ণনা করেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেন, "আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে ও ইহরামের পোশাকে সহজলভ্য ও সর্বাপেক্ষা উত্তম খুশবু (মিসক) লাগাতাম।" (সহীহ আল বুখারী) [৩৯০]

"I used to apply the best available perfume (musk-based) on the body and ihram dress of the Prophet (SAWS)." (Sahih Al Bukhari) [390]

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পুরুষের সুগন্ধি হলো যার গন্ধ স্পষ্ট, কিন্তু রং চাপা আর মহিলাদের সুগন্ধি হলো যার রং স্পষ্ট কিন্তু গন্ধ চাপা।" (আত-তিরমিযী ও আন-নাসাঈ) [৩৯১]

এ হাদীস থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক ধরনের সুগন্ধি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নারীদের সুগন্ধি লাগিয়ে ইশার নামাযের জামায়াতে অংশ গ্রহণ নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম আন-নাসাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাতটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যার প্রথমটি বর্ণনা করেছেন আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু। আর বাকীগুলো বর্ণনা করেছেন ইবনে মাসউদের স্ত্রী যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা। [৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮ এবং ৩৯৯]

হযরত আবূ মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে এই উদ্দেশ্যে লোক সমাজে গমন করে যে তারা তার সুগন্ধির ঘ্রাণ পাবে, সে ব্যাভিচারিণী।" (আন-নাসাঈ) [৪০০]

প্রশ্ন-১২৪ : আম্বর কী? কোথা থেকে এর উৎপত্তি? এ সুগন্ধি কী কাজে ব্যবহৃত হয়? এ সুগন্ধির উপর নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো বক্তব্য আছে কি?

উত্তর : আম্বর বা *Ambra grasea* অথবা কাহরুবা এক প্রকার সুগন্ধি। It is described as the king of perfumes. একে সুগন্ধিসমূহের রাজা বলা হয়। মুসলিম বিজ্ঞানীরা আম্বরকে ওষুধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং এর উন্নয়নে বেশ গবেষণা করেছেন। আম্বরের আরবি নাম আনবার বা ইনকাতারান। হিন্দি ও উর্দু নাম আম্বর। ইউনানি নাম হচ্ছে আম্বর আসহাব। ইংরেজি নাম হচ্ছে Ambergris. It is obtained from the sperm-whale. In fact it is the pathological product of the stomach and intestines of sperm whale. It is a fatty odourous substance and black in colour.

তবে আম্বর উৎপন্নের জন্য animal source ছাড়া botanical source-ও রয়েছে। Botanical source টি হচ্ছে, *Pinus succinifera* Cornw. এটি Pinaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

এ হাদীসটি দ্বারা আম্বর বা Ambergris-এর দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। কারণ আম্বরে সুগন্ধি ও সৌরভ আছে কিন্তু রং নেই। দেখতে ধূসর বা কালো রংয়ের মতো। আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন,
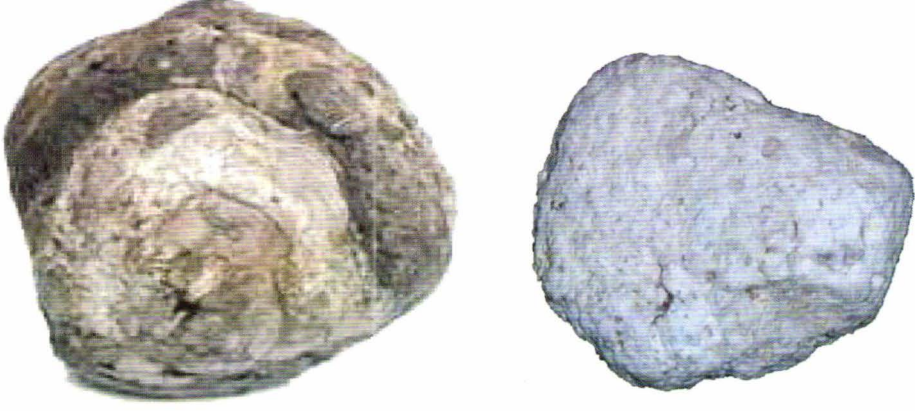
তিমি মাছের অন্ত্র থেকে আহরিত বর্তমান মোমতুল্য পদার্থবিশেষ
(Raw ambergris from sperm whale)

"আমরা জাইশুল খাবতের যুদ্ধে ছিলাম। আমাদের সেনাপতি ছিলেন আবূ উবায়দাহ। আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। সমুদ্র একটা মরা তিমি জাতীয় মাছ উপকূলে নিক্ষেপ করলো। এই ধরনের মাছ আমরা (ইতোপূর্বে) দেখিনি। এই মাছকে আম্বর বলা হয় (এ মাছ থেকে আম্বর সংগৃহীত হয়)। আমরা পনের দিন পর্যন্ত মাছটি খেলাম। আবূ উবায়দাহ তার হাড়গুলোর মধ্য থেকে একটি হাড় তুলে ধরলেন। তার নিচ দিয়ে সওয়ার চলে গেলো। আবার আবূ যুবাইর জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আমাকে একথা জানিয়েছেন যে তিনি জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন যে আবূ উবায়দাহ বললেন, খাও। এরপর আমরা মদীনায় ফিরে এসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একথা বললাম। তিনি বললেন, এটি রিযিক। এটি আল্লাহ পাঠিয়েছেন। (আর) তোমাদের সাথে যদি এর কিছু (অংশ) থাকে, তাহলে আমাকেও এর স্বাদ গ্রহণ করতে দাও। তাদের কেউ তার কিছুটা এনে দিলে তিনি তা খেলেন।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাঊদ) [৪০১]

বস্তুত আম্বর খুবই মূল্যবান বস্তু যা সুগন্ধিশিল্পে ব্যবহৃত হয়। It is a very expensive perfume. মৃগনাভী বা কস্তুরির পরেই এর স্থান। বাজারে বেশ কয়েক রঙের আম্বর থাকলেও ধূসর বা কালো রঙের আম্বরই উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয়। স্বর্ণের মতো আম্বর নষ্ট হয়না বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়না।

হাফিয ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আম্বর মানুষের হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের আবেগ-অনুভূতি এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গকে শক্তিশালী করে। অপরদিকে আল্লামা আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আম্বর মানুষের heart, brain এবং স্নায়ুকেন্দ্রকে সুরক্ষিত করে এবং ইন্দ্রিয়কে শাণিত ও সচেতন করে।

ঘর দুয়ার সুগন্ধময় করার জন্য হযরত নাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি রিওয়ায়াত করছেন। তিনি বলেন, "ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি অভ্যাস ছিলো যে তিনি যখন কোনো সুগন্ধি জ্বালাতেন তখন অন্য কোনো সুগন্ধি না মিশিয়ে শুধু আগর জ্বালাতেন। অবশ্য কখনো কখনো আগরের সাথে কিছু কর্পূর

ঢেলে দিতেন আর বলতেন, রসূল পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই সুগন্ধি জ্বালিয়ে সুঘ্রাণ উপভোগ করতেন।" (সহীহ আল বুখারী) [৪০২]

হাফিয ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সকল প্রকার সুগন্ধিকে মিস্‌কের সাথে তুলনা করে তার মান নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ সুগন্ধিকে standardise করা হয়। কিন্তু মিস্‌ককে কারো সাথে তুলনা করা হয় না। বর্ণিত আছে যে বেহেশ্‌তে পাহাড়-পর্বত-বালি সবই মিস্‌কের তৈরি।

অপরদিকে আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মিস্‌ক যদি কোনো পানীয়ের সাথে মিশিয়ে গ্রহণ করা হয়, তবে সেটি দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোকে শক্তিশালী করে। Fainting attack and palpitation এর চিকিৎসায় মিস্‌ক বেশ কার্যকরী। তিনি বলেন, ওষুধে মিস্‌কের ব্যবহার হালাল বা বৈধ। হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মিস্‌ক হৃদয়ে প্রশান্তি ও আনন্দ আনে এবং দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহকে শক্তিশালী করে। এটি প্রবীণ লোকদের জন্য বেশ উপকারী এবং সাধারণ দুর্বলতায় কার্যকরী একটি ওষুধ। তবে মিস্‌কের চেয়ে উৎকৃষ্টতম সুগন্ধি বা ঘ্রাণ হচ্ছে রোযাদারের মুখের সুঘ্রাণ। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট মিস্‌ক সুগন্ধির তুলনায়ও অধিক সুঘ্রাণপুর্ণ।" (সহীহ আল বুখারী) [৪০৩]

অধ্যায়-১০

ইসলামের আলোকে ধূমপান ও তার প্রতিকার এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা

প্রশ্ন-১২৫ : মুহতারাম, পবিত্র কুরআনের আলোকে ধূমপান নিষিদ্ধের বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করবেন কী?

উত্তর : ধন্যবাদ ডা. আজহার। বর্তমানে ধূমপান একটি ভয়ঙ্কর মহামারির আকার ধারণ করেছে। এক সমীক্ষায় জানা যায়, শুধু আমেরিকাতেই প্রত্যেক দিন প্রায় ৩,০০০ লোক ধূমপান শুরু করে যাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে। এটি অকল্পনীয় বটে। Hard to imagine. অথচ আমেরিকায় ধূমপানবিরোধী আইন বলবৎ আছে। বাংলাদেশে ইদানিং রাস্তায় অনেক ভিক্ষুককেও ধূমপান করতে দেখা যায়। ধূমপায়ী স্কুলগামী ছেলেদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। তারা মনে করে, এটি সম্ভবত ফ্যাশন বা culture অথবা অহংকার করার মতো একটি অভ্যাস কিংবা smartness দেখানোর একটি কায়দা। অথচ তারা জানেনা যে এটি তাদের সর্বনাশ ডেকে আনবে। ধূমপানকে সরাসরি উদ্দেশ্য করে কোনো আয়াত নাযিল না হলেও আমি এখানে কয়েকটি আয়াত আলোচনায় আনবো যা ধূমপানের কদর্যতার দিকে ইঙ্গিত বহন করে থাকে।

প্রথম আয়াতটি হচ্ছে আল কুরআনের ৭ নম্বর সূরা আল আ'রাফের ১৫৭ নম্বর আয়াত। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াত দুটি হচ্ছে আল কুরআনের ৮৮ নম্বর সূরা আল-গাশিয়াহ-এর ৬ ও ৭ নম্বর আয়াত। সূরা আল আ'রাফে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾

"বার্তাবাহক (নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাধা দেয়, তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং তাদেরকে গুরুভার ও শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে যা তাদের উপর ছিলো।" (আল আ'রাফ ৭:১৫৭)

﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝ لَّا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ﴾

"ওদের জন্য কোনো খাদ্য থাকবেনা কন্টকময় গুল্ম ব্যতীত, যা তাদেরকে পুষ্টও করবেনা এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবেনা।" (গাশিয়াহ ৮৮:৬-৭)

অর্থাৎ তাদের জন্য কাঁটাযুক্ত শুকনো ঘাস ছাড়া আর কোনো খাদ্য থাকবেনা। এ আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালা যদিও আখিরাতে কাফিরদের খাদ্যের কথা বুঝিয়েছেন, কিন্তু পার্থিব জগতেও আমার মনে হয় তামাক এরূপ একটি গাছই, যা ব্যবহারে কোনো পুষ্টি অর্জিত হয়না আবার পেটও ভরেনা। কারণ ধূমপান কোনো পুষ্টিকর খাদ্য বা পানীয় নয়। এটি ক্ষুধা নির্বারণ করেনা।

কালাম পাকের ৪ নম্বর সূরা নিসার ২৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴾

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়।" (আন-নিসা ৪:২৯)

ধূমপানের কারণে পৃথিবীতে প্রতি বছর অগনিত লোক মারা যায়। এটি দ্বারা কি নিজেকে হত্যা করা বোঝায় না?
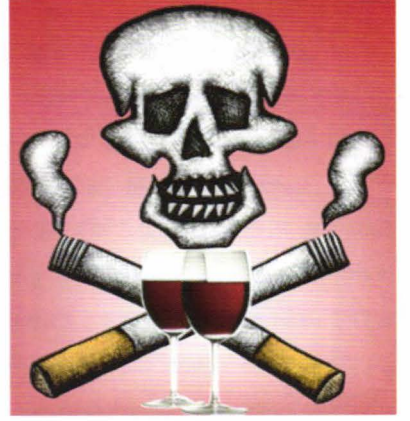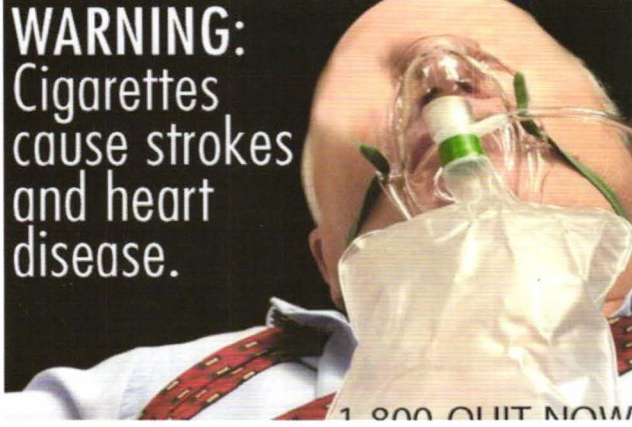
সূরা বাকারাহর ১৯৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"তোমরা তোমাদের নিজের হাতে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনোনা।" (আল বাকারাহ ২:১৯৫)

ধূমপানের শেষ পরিণতি মৃত্যু বা ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া। Heart attack, stroke, cancer ইত্যাদি ধূমপানের কুফল। এগুলোকে কি নিজের হাতে নিজের ধ্বংস করা বোঝায়না? Buerger's disease (dry gangrene of foot) ইত্যাদি অন্যান্য কুফল। সূরা বনী ইসরাঈলের ২৬ ও ২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন,

﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝٢٦ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ﴾

"কিছুতেই অপব্যয় করো না। যারা অপব্যয় করে, তারা শয়তানের ভাই।" (বনী ইসরাঈল ১৭:২৬-২৭)

এই ৬টি আয়াত ক্ষতিকর পানীয়দ্রব্য বা কার্যকলাপের ইংগিত বহন করে। কুরআন মদ্যপানকে হারাম ঘোষণা করেছে। কারণ স্বাস্থ্যের জন্য তা অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এর অপকারিতা অনেক। মদ্যপানের ক্ষতিকর দিক এতোই ব্যাপক যে তা আলোচনা করতে হলে বেশ ক'টি পর্ব দরকার। তবে কুরআনই বলে যে মদ্যপানে সামান্য কিছু benefit রয়েছে (আল বাকারাহ ২: ২১৯)। তারপরও মদকে কঠোরভাবে হারাম করা হয়েছে।

তবে ধূমপানের কোনো উপকারিতা আজ অবধি জানা যায়নি। বিশ্বের কোথাও কোনো মেডিকেল জার্নাল বা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি যে ধূমপানের সুফল আছে। ইন্টারনেট খুলে দেখুন। শুধু কুফল আর

কুফল। যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়ংকর, মারাত্মক ও বেদনাদায়ক। ধূমপায়ীদের পরিণতি করুণ।

বস্তুত ধূমপান নিষিদ্ধ হবার জন্য এই কুফলই যথেষ্ট। তাই ধূমপান থেকে আপনাকে বাঁচতেই হবে। আমি আরবি শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো আলেম নই। কুরআনের একজন ছাত্র মাত্র। আপনি কোনো আলেম ব্যক্তি বা আরবি ভাষায় শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি অথবা ইসলামী চিন্তাবিদকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি নিশ্চয়ই বলবেন এ আয়াতগুলো ধূমপানের কদযর্তার প্রতিও ইঙ্গিত করে থাকে।

প্রশ্ন-১২৬ : আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ধূমপান অথবা ধূমপানের ন্যায় কোনো কাজ বা অভ্যাস সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য কী?

উত্তর : ধূমপান সম্পর্কে সরাসরি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস নেই। কারণ ধূমপান আবিষ্কার হয় ১৫০০ খৃষ্টাব্দের দিকে, যখন আমেরিকার উপকূল এলাকায় স্পেনের সৈন্যরা ধূমপানে লিপ্ত ছিলো। তবে যেহেতু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ধূমপান চালু ছিলোনা, তাই ধূমপানের উপর নিষেধাজ্ঞা সংবলিত সরাসরি কোনো হাদীস আমরা খুঁজে পাইনা। তবে পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী বস্তু এবং মদ ও অন্যান্য নেশা সৃষ্টিকারী ড্রাগ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইসলামে ধূমপান নিষেধ।

যাহোক, আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় হাদীস বর্ণনা করবো যার প্রত্যেকটিই ধূমপান বা তদ্রূপ কাজের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে থাকে।

এক. হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি পেঁয়াজ-রসুন খায় সে যেনো অবশ্যই আমাদের থেকে পৃথক থাকে এবং সে যেনো আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৪০৪]

অপরদিকে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি রসুন খায় সে যেনো আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে।" (সহীহ আল বুখারী) [৪০৫]

কাঁচা পেঁয়াজ-রসুন খেলে মুখে দূর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। তাই দূর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে আসলে আশেপাশের লোকের কষ্ট হয় এবং ফেরেশতাগণও কষ্ট পান। পেঁয়াজ-রসুনের মতো সর্বদা সিগারেট ও তামাক সেবনকারীদের মুখেও দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে থাকে যা ফেরেশতাগণ সহ্য করতে পারেননা।

দুই. হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবূ বারযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন কোনো মানুষকে তার প্রভুর সামনে

৫টি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও যেতে দেয়া হবেনা :
১. তার জীবনকাল কীভাবে সে অতিবাহিত করেছে;
২. তার যৌবন সে কীভাবে ব্যয় করেছে;
৩. তার ধনসম্পদ কীভাবে অর্জন করেছে;
৪. আর কোথায় কীভাবে তা ব্যয় করেছে এবং
৫. আর অর্জিত জ্ঞান সে কীভাবে কাজে লাগিয়েছে।" (আত-তিরমিযী) [৪০৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি, ধূমপানের মাধ্যমে মানুষ তার সম্পদ নষ্ট করে থাকে। একজন ধূমপায়ী ব্যক্তি এমন একটি কাজে তার টাকা-পয়সা খরচ করে, যে কাজ তার আদৌ কোনো উপকারে আসে না; বরং তা তার স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে মাত্র। অর্জিত সম্পদ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সে সম্পদ কোথায় কীভাবে ব্যয় করেছে। আপনাকে তাই এই তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে বলতেই হবে যে লেখাপড়া শেষ করে জ্ঞান অর্জন শেষে চাকরি করে, ব্যবসা করে, অর্থ উপার্জন করেছি এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্যকর, ভালো ও হালাল খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে ধূমপান করে তা অপচয় করেছি।

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা ও পাঠক! একটি সিগারেট খেতে কমপক্ষে ৫ মিনিট সময় লাগে। কেউ যদি প্রতিদিন কমপক্ষে ১২টি সিগারেট সেবন করেন তাহলে তিনি ২৪ ঘণ্টায় ৫ x ১২ = ৬০ মিনিট তথা ১টি ঘণ্টা ধূমপানের জন্য অপচয় করলেন। অর্থাৎ প্রতিদিন ১ ঘণ্টা সময় আপনার জীবন থেকে minus হয়ে গেলো। আর তিনি যদি ৫০ বছর বেঁচে থাকেন, তাহলে ৩৬৫ x ৫০ = ১৮,২৫০ ঘণ্টা অর্থাৎ ৭৬০ দিন সময় নষ্ট করলেন। তাই তিনি এ প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দেবেন? প্রায় প্রত্যেক ডাক্তার এই প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারবেন। কারণ তারা সর্বদাই মানুষের কল্যাণ তথা তাদের রোগ-ব্যাধি নিরাময় ও দুঃখ-কষ্ট দূর করতে সময় ব্যয় করে থাকেন।

মুগীরাহ ইবনে শো'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তিনটি কাজ ঘৃণা করেন। অযথা গল্প করা, ভিক্ষাবৃত্তি করা ও অপব্যয় করা।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৪০৭]

অন্যত্র হাদীসটির অনুবাদ এভাবে এসেছে। মুগীরাহ ইবনে শো'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। অতিরিক্ত বা অনর্থক কথা বলা, সম্পদ নষ্ট বা ধ্বংস করা ও আর্থিক প্রার্থনা (ভিক্ষা বা যাচ্না) করা।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৪০৭]

ধূমপানের মাধ্যমে প্রতি মাসে যে টাকা-পয়সা খরচ হয়, তাকে কি অপব্যয় বলবেন না? একজন লোক যদি প্রতিদিন ২০-২৫টি সিগারেট খান তাহলে তিনি প্রায় ১০০ টাকা ব্যয় করেন। অর্থাৎ মাসে প্রায় ৩,০০০-৩,৫০০ টাকা ব্যয় করেন। এ টাকা কি নগণ্য? যেসব লোক এসএসসি পর্যন্ত লেখাপড়া করে চাকরি করেন, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেন, তাদের অনেকের বেতনও ৩,০০০ টাকার অনেক কম।

প্রশ্ন-১২৭ : আচ্ছা মুহতারাম, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার আলোকে সামগ্রিকভাবে স্পষ্ট করে বলুন, ধূমপান করা কি শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম বা নিষেধ?

উত্তর : এতোক্ষণ যে আলোচনা করা হলো তার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে ধূমপানের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম হচ্ছে, এটি নিষেধ বা নাজায়েয। কোনো মুফতীর নিকট যান তিনি একথাই বলবেন। তবে অনেক আলেম একে মাকরূহ বলে থাকেন। অর্থাৎ ধূমপান করা হারামের কাছাকাছি।

প্রশ্ন-১২৮ : কুরআন ও হাদীসে সরাসরি উল্লেখ নেই অথচ তা কেমন করে নিষেধ বা নাজায়েয হয়, এ ব্যাপারে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলবেন কী?

উত্তর : আমরা জানি যে, কুরআন ও হাদীসে সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যসমূহ হতে গবেষণা করে মুজতাহিদ ইমামগণ যে সকল মূলনীতি (Basic principles) উদঘাটন করেছেন সে সকল মূলনীতির আলোকে নবসৃষ্ট কোনো ইস্যু, অবস্থা, বিষয় বা কাজ এ যা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইসলামে কোনো কাজ নাজায়েয বা নিষিদ্ধ হয় কুরআন ও হাদীস অনুযোগী ইসলামী বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মতামতের উপর ভিত্তি করে। Heart বা kidney transplantation কি কুরআনে বা হাদীসে আছে? নেই। তবু এটি জায়েয বা permitted. কারণ, মুসলিম বিজ্ঞানীদের এটি সর্বসম্মত মতামত। যেসব কাজের নিষেধাজ্ঞা বা জায়েয হবার ব্যাপারে সরাসরি শরীয়াতের কোনো বিধান পাওয়া যায়না, তার জন্য তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরের আইনের উৎস খুঁজতে হয়। ইসলামী শরীয়াতের তৃতীয় স্তরের আইনের উৎস হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যমত্য বা 'ইজমা'। আর চতুর্থ স্তরের আইনের বিধান হচ্ছে চারটি Schools of Thoughts-এর চারজন বিজ্ঞ ইমাম ও সমসাময়িক আলেমদের অভিমত যা সাধারণত 'কিয়াস' নামে অভিহিত। তাই হানাফী, শাফিঈ, হাম্বলী ও মালিকি মাযহাবের মতামত বা নির্দেশনাও মেনে চলা ইসলামী শরীয়াতের দাবি।

প্রশ্ন-১২৯ : ধূমপানের ব্যাপারে কোনো Islamic legal verdict বা ফতোয়া কী?

উত্তর : প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষক ও লেখক ড. ইউসুফ আল-কারযাভী 'ধূমপান নিষেধ' বলে Islamic legal verdict দিয়েছেন।

প্রখ্যাত মুফতী মুহাম্মদ আল-হানূতীও ইউসুফ আল কারযাভীর বরাত দিয়ে বলেছেন, "ইসলামে হালাল হারাম বইতে তিনি একে নিষিদ্ধ বলেছেন।" তিনি আরো বলেছেন, ১৮-০৪-২০০০খ্রি. রাতে বিবিসিতে প্রচারিত এক সংবাদে জানলেন, সর্বশেষ গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা তাদের জীবনের শেষদিকে ধূমপান করে থাকে, তাদের স্মরণশক্তি কমে যায়। এছাড়া সচারাচর পরিসংখ্যান এটাই বলে যে, সিগারেটে যে নিকোটিন নামক alkaloid পদার্থ আছে তাতে ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদান রয়েছে, যা খরগোশের উপর পরীক্ষায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্ন-১৩০ : মুহতারাম ধূমপান যে নিষেধ, এর অনুকূলে আরো কোনো প্রমাণ আছে কি?

উত্তর : অবশ্যই আছে। ধূমপান যে নিষেধ তার প্রধান প্রমাণ হচ্ছে, যাদের নিকট কুরআন-হাদীস ও Theology-এর জ্ঞান গভীর। অর্থাৎ যারা ইসলামী বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তি, তারা ধূমপান নিষিদ্ধ মনে

করেন এবং নিজেরাও ধুমপান করেন না। কারণ তারা সবাই জানেন যে এটা শরীরের জন্য নিশ্চিত ক্ষতিকর। আর নিশ্চিত ক্ষতিকর বস্তু খাওয়া বা পান করা বৈধ নয়। তাই ধুমপানও বৈধ নয়। বাংলাদেশে প্রায় ৭০ হাজার গ্রামে প্রায় আনুমানিক পাঁচ লক্ষাধিক মসজিদ রয়েছে। গড়ে ৫-১০টি মসজিদ আছে প্রতি গ্রামে। এই লক্ষ লক্ষ মসজিদের ৫-৬ লক্ষ ইমাম বা খতীব এবং মুয়াজ্জিনের ভিতর কাউকে খুঁজে পাবেন না, যিনি ধূমপান করা শরীআতসম্মত মনে করেন এবং নিজেও করেন। কারণ তাদের নিকট ইসলাম ও কুরআনের জ্ঞান আছে। ধূমপানে নৈতিক দিক বিবেচনা করলে দেখবেন- কোনো সন্তান তার পিতামাতার সামনে ধূমপান করেনা বা করতে সাহস পায় না। কোনো ছাত্র তার শিক্ষকের সামনে ধূমপান করাকে বেয়াদবী মনে করে। এছাড়া শ্বশুর-শাশুড়ি বা এমন বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বীর সামনেও কেউ ধূমপান করার মতো দুঃসাহস করেনা। এর দ্বারা অবশ্যই প্রতীয়মান হয় যে ধূমপান নিষিদ্ধ। ধূমপান যদি নিষিদ্ধ না হতো তাহলে কোনো মুফাসসিরে কুরআন, কুরআনের হাফিয, ক্বারী কিংবা মাওলানা সাহেব ধূমপান করেন না কেনো? তবে অবশ্য ব্যতিক্রম থাকাটা স্বাভাবিক, যার কারণে কোন বস্তু বৈধ হয় না।

প্রশ্ন-১৩১ : কোনো লেখাপড়া না জানা লোক যদি ধূমপান করেন তাহলে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি যে, তিনি ধূমপানের কুফল বা ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে অজ্ঞ। কিন্তু শিক্ষিত কোনো লোক যদি ধূমপান করেন বা ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন অথবা ধূমপান পরিত্যাগ না করেন, তাহলে এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং intelligent প্রশ্ন, যা প্রতিটি মানুষের মাঝেই চিন্তার উদ্রেক করবে। তবে উত্তর কিন্তু সহজ। নিরক্ষর বা অক্ষরজ্ঞানহীন কোনো লোক যদি ধূমপান করেন তাহলে বুঝা যায় যে অজ্ঞতার কারণে তিনি নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। ধূমপানের কুফল সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ। আর যদি কোনো শিক্ষিত লোক ধূমপান করেন, তাহলে এতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন বটে, তবে তিনি জ্ঞানী হননি। কারণ যে ব্যক্তি নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নন তাকে কী কেউ জ্ঞানী লোক বলবে? আর যদি কোনো ডাক্তার বা চিকিৎসক ধূমপান করেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি নিজের স্বাস্থ্যের চেয়ে তার রোগীর স্বাস্থ্যকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তার রোগীকে অবহিত করেন এবং prescription বা ব্যবস্থাপত্রে 'ধূমপান নিষেধ' বা 'ধূমপান থেকে বিরত থাকুন' কথাটি লিখে দেন। এটি তিনি ভালো করে জেনেই লিখেন। এর পেছনে কারণ হচ্ছে, তিনি রোগীকে সুস্থ করতে পারলে পারিশ্রমিক বা fee পাবেন। আর নিজের চিকিৎসা করলে তো কোনো টাকা-পয়সা পাবেন না।

সম্মানিত দর্শকমণ্ডলি! আমি বিনয়ের সাথে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই যে যেসব আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোক ধূমপান করেন, তারা কেউই বুদ্ধিমান নন। কারণ, একজন সত্যিকার বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বেশি সচেতন থাকেন। স্বাস্থ্যই সম্পদ, 'Health is Wealth', এই ধ্রুব সত্যটি যিনি মানেন না তাকে কি আপনি বুদ্ধিমান বলবেন? এ প্রসঙ্গে এখানে আমি স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করবো।

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে এক ব্যক্তি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, "হে আল্লাহর রসূল! কোন দু'য়া সর্বোত্তম? তিনি বলেন, "তুমি তোমার রবের নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। যদি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করা হয় (অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং সুস্থতা প্রদান করা হয়) তাহলে তুমি পরম সাফল্য লাভ করলে।" (আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [৪০৮]

আওসাত ইবনে ইসমাঈল আল-বাজালী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তিনি আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন "তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সুস্থতা ও নিরাপত্তা কামনা করো। কেননা ঈমানের পর কাউকে সুস্থতা ও নিরাপত্তার চেয়ে অধিক উত্তম (সম্পদ) আর কিছু দান করা হয়নি।" (ইবনে মাজাহ) [৪০৯]

বস্তুত মানুষের সুস্থ দেহ থাকা মানে সমগ্র পৃথিবী তার হাতের মুঠোর মধ্যে থাকার সমান। উদাহরণস্বরূপ, একজনের নিকট ১ কোটি টাকা আছে। কিন্তু তিনি সর্বদা অসুস্থ। অপরজনের নিকট মাত্র ১০০০ টাকা আছে। তবে তিনি সর্বদা সুস্থ থেকে দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। কে বেশি সুখী? নিশ্চয়ই যিনি সুস্থ তিনিই। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "হে আব্বাস! হে আল্লাহ্‌র রসূলের চাচা! আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা প্রার্থনা করুন।" (আত-তিরমিযী) [৪১০]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত এক সাহাবী রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! কোন দু'য়া সর্বোত্তম? রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: "তোমার প্রতিপালকের নিকট সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কামনা করো।" লোকটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে এসে একই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ জবাব দিলেন এবং বললেন, "তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা লাভ করলেই সফলকাম হবে।" (আত-তিরমিযী) [৪১১]

তিরমিযী শরীফের আরো একটি হাদীস বর্ণনা করছি। আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য দু'য়া) ছাড়া আর কোনো উত্তম দু'য়া নেই।" (আত-তিরমিযী) [৪১২]

"No supplication is more pleasing, more rewarding, more favourite and more important than a request for good health." (At-Tirmizi) [412]

সালামা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মুহসিন আল খিতমী রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে মিহসান আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যুষে সুস্থতা নিয়ে পরিবার-পরিজনসহ ঘুম থেকে ওঠে, বাসায় নিরাপদে থাকে, সারাদিনের খাদ্য-সামগ্রী তার নিকট মওজুদ থাকে, তাকে সমগ্র পৃথিবী দান করা হয়েছে।" (আত-তিরমিযী) [৪১৩]

আধুনিক বিশ্ব আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এসব বাণীরই প্রতিধ্বনি করছে মাত্র। তারা যখন বলেন, 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল', এতে নতুনত্ব কিছুই নেই।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! স্বাস্থ্য ও তার গুরুত্ব সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতোগুলো হাদীস থাকা সত্ত্বেও আমি ভেবে পাই না যে কীভাবে একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম ধূমপানে আসক্ত হতে পারেন। তার কাছে ধূমপানের হাজারো কুফল ও জটিল জটিল ব্যাধির তথ্য থাকা সত্ত্বেও কেনো তিনি ধূমপান থেকে বিরত থাকতে পারেননা? এর উত্তর সম্ভবত এটিই যে তিনি রোগ নিরাময়কে রোগ প্রতিরোধের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ তার নিকট গ্রহণযোগ্য concept হচ্ছে 'Cure is better than prevention'. অথচ সারা বিশ্বব্যাপী উৎকৃষ্ট slogan হচ্ছে 'Prevention is better than cure'.

এজন্যই আমরা দেখতে পাই, ধূমপায়ী যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন, তখন রোগ থেকে বাঁচার জন্য, সুস্থ থাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তখন বৃদ্ধ বয়সে সিঙ্গাপুর, মাদ্রাজ, ব্যাংকক, আমেরিকা, ইউরোপ ছুটে যান চিকিৎসার জন্য। তারা কেউই এ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যেতে বা মরতে চাননা। কবি শামসুর রাহমান যখন মৃত্যু পথযাত্রী, তখনও তাকে সিঙ্গাপুর নেয়ার জন্য প্রায় এক প্রকার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু পরে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রশ্ন-১৩২ : মানবদেহে ধূমপানের প্রধান প্রধান ক্ষতিকর দিক কী কী? অর্থাৎ ধূমপানে আসক্ত ব্যক্তি সাধারণত কী কী রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে?

উত্তর : খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যার সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞান সরাসরি সম্পৃক্ত। এ প্রশ্নের উত্তর একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকই ভালোভাবে দিতে পারবেন। যাহোক, ধূমপান মানবদেহে যে অসংখ্য ক্ষতি সাধন করে, তা কেউই অস্বীকার করতে পারবেননা। ধূমপান বাস্তবিকই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এটি সকল রোগের মূল। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর স্বপক্ষে ব্যাপক প্রমাণাদি আছে বলেই অনেক দেশেই ধূমপানের ওপর প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে সতর্কবাণী উল্লেখ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যেসব সিগারেট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এ নিষেধাজ্ঞা মানবে না, তাদের শাস্তির বিধান করা হয়েছে। মানুষের স্বাস্থ্য ও
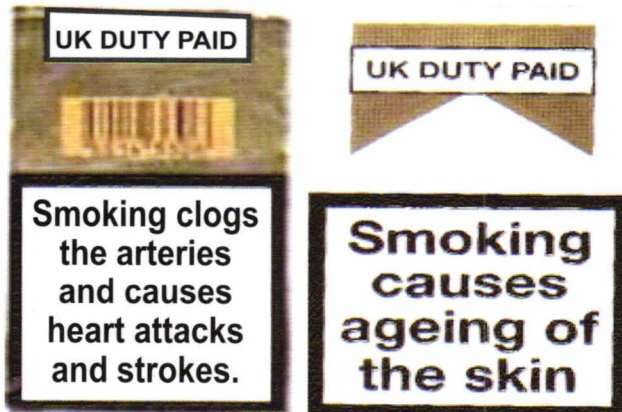
তার কল্যাণে এটি একটি সুন্দর আইন। আমি এই আইন প্রণেতাদের অভিনন্দন জানাই।

সম্মানিত দর্শক-পাঠক! সারা বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে একমত যে, ধূমপান ক্যান্সার, যক্ষ্মা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক, এ্যাজমা, কফ, অকালজন্ম, বন্ধ্যাত্ব, পরিপাকতন্ত্রে সংক্রমণ ইত্যাদি রোগের প্রধান কারণ। হাত ও আঙুলের হলুদ দাগসহ অন্যান্য রোগের উৎপত্তি হচ্ছে এই ধূমপান থেকে। ফুসফুসের ক্যান্সার তামাক ও সিগারেটে যে tar ও nicotine আছে, একমাত্র তারই জন্য। Heart disease ও stroke এ দুটো মারাত্মক রোগ ধূমপায়ীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। ধূমপান রক্তে cholesterol এর আধিক্য বাড়ায়। There are nearly 15 types of cancer. বর্তমানে পনেরো ধরনের ক্যান্সার আছে বলে বিজ্ঞানীরা জানান, যাদের ৭০% ধূমপানের জন্যই হয়ে থাকে। Cancer গুলো হচ্ছে Cancer of the bladder, pancreas, colon, cervis, larynx, lung, breast, uterus, lips, mouth, stomach and oesophagus. Lung cancer is a very painful and unpleasant way to die. ফুসফুসের ঘা অতীতে কদাচিৎ দেখা দিতো। বিগত শতাব্দীতে তা বেড়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে।

বর্তমানে ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য মৃত্যুর হার অনেক বেশি। Smoking is the single largest preventive cause of diseases and premature death. It is a prime factor in heart disease, stroke and chronic lung disease.

Smoking is the major cause of cancers affecting mouth and throat.
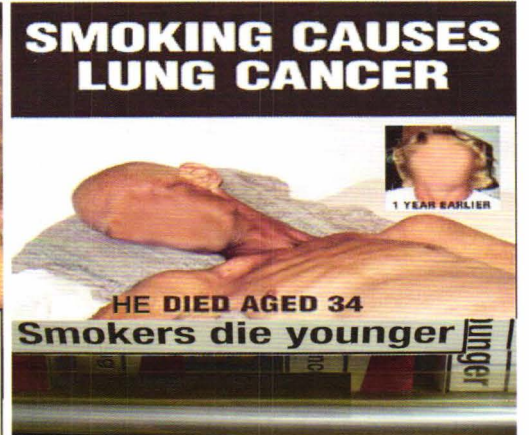
প্রশ্ন-১৩৩ : সিগারেটে বা তামাকে কী কী পদার্থ আছে, যা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর?

উত্তর : সিগারেট বা তামাকে প্রায় ৪০০০ chemicals বা বিষময় পদার্থ রয়েছে, যার মধ্যে অনেক chemicals হচ্ছে carcinogenic. That is, cancer সৃষ্টিকারী। উল্লেখ্যযোগ্য কেমিকেলগুলো হচ্ছে নিকোটিন, অ্যামোনিয়া, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন, বিউটেন, ক্যাডমিয়াম, ফরমালডিহাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড, আরসেনিক, টার ও বেনজোপাইরিন। এ সকল পদার্থ একজন ধূমপায়ী ধীরে ধীরে, অল্প অল্প করে গলাধঃকরণ করে থাকে। ফলে দীর্ঘদিন ধূমপানের ফলে তা আস্তে আস্তে মানবদেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ টিস্যু ও অঙ্গসমূহের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটায়।

এবার বলি, এসব কেমিকেলের স্বাভাবিক ব্যবহার সম্পর্কে। নিকোটিন ইঁদুরের বিষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। HCN গ্যাস চেম্বার-এর poison হিসেবে, আরসেনিক ইঁদুরের বিষ হিসেবে, মিথেন রকেটের জ্বালানি হিসেবে, CO গাড়ির exhaust যা silencer থেকে নির্গত ধোঁয়া, বিউটেন হালকা জ্বালানি গ্যাস হিসেবে, ক্যাডমিয়াম ব্যাটারিতে আর ফরমালডিহাইড ল্যাবরেটরিতে মানুষের টিস্যু ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সংরক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়। এসব পদার্থই আমরা ধূমপানের সময় আস্তে আস্তে শরীরে নিয়ে থাকি। এসব পদার্থের ভেতর কি কোনো ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, মিনারেলস, নিউট্রিয়ান্টস, ফাইবার্স, আমিষ ও পানি জাতীয় পদার্থ আছে, যা আমাদের খাদ্যদ্রব্যের আওতাভুক্ত? এক কথায় যেসব পদার্থ খেলে মানুষ বেঁচে থাকে তার কোনোটিই সিগারেট বা তামাকে নেই। অন্তত বিজ্ঞান আমাদের এটাই বলে।

প্রশ্ন-১৩৪ : মানুষ যখন ধূমপান করে তখন তার কী কী physical and emotional পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করে থাকি?

উত্তর : একজন ধূমপায়ী যখন ধূমপান করে তখন তার মাংসপেশি আস্তে আস্তে অকার্যকর হতে থাকে এবং ধূমপানের ফলে একটি বিশেষ সময় অতিবাহিত করে। তার চিন্তাশক্তির সামনে পর্দার আবরণ পড়ে যায়। তার হজম প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়, যার ফলে সে একটুতেই ঘাবড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে তার হাত-পা কাঁপতে থাকে। তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় এবং সে প্রায়ই অনিদ্রায় ভোগে। ধূমপানে আসক্ত ব্যক্তির হাতের দুই আঙুলে যে হলুদ দাগ পড়ে যায় তা alkaloid nicotine এর জন্য। এ ধরনের দাগ ধূমপায়ীদের ফুসফুস, যকৃত ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহে পড়ে তা আস্তে আস্তে অকেজো হয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, গোশতের দোকানে গিয়ে গরু বা ছাগলের কলিজার দিকে তাকান। কতগুলো কলিজা নষ্ট হয়ে গেছে, রংও পরিবর্তিত হয়েছে যা কেউ কিনতে চায় না। আবার কতগুলো কলিজা তরতাজা ও দেখতে সুন্দর। ঐগুলোর গ্রাহকই বেশি।

প্রশ্ন-১৩৫ : ধূমপানের যে মারাত্মক কুফল-এর ওপর পরিসংখ্যান কী বলে?

উত্তর : আমার কাছে শুধু দুটো পরিসংখ্যান আছে। পরিসংখ্যান বলে যে, একজন ধূমপায়ীর গড় আয়ু একজন অধূমপায়ীর গড় আয়ু অপেক্ষা ১০ বছর কম। ২০০০ সালে পৃথিবীতে ধূমপানের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৮ লক্ষ ৩০ হাজারে। এর মধ্যে ২৪ লক্ষ উন্নয়নশীল দেশে, আর ২৪,৩০,০০০

শিল্পোন্নত দেশে। সংখ্যাটির মধ্যে ৩৮,০৪,০০০ হচ্ছে পুরুষ। আর বাকীরা মহিলা বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক। আরো বিশ্লেষণ করে জানা যায়, উক্ত সংখ্যার মধ্যে–

১৬,৯০,০০০ cardio vascular diseases-এর জন্য মৃত্যু হয়েছে;

৯,৭০,০০০ obstructive pulmonary discases-এ; এবং

৮,৫০,০০০ ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য মৃত্যু হয়েছে।

প্রায় প্রতি বছরই survey হয়। এই সার্ভেটি ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক মেডিকেল জার্নাল LANCET-এ প্রকাশিত হয়েছে। কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইচ্ছা করলে verify করতে পারেন। Vol 362, Issue 9387, page. 847 Editor, Ezzati, A Loper.

প্রশ্ন-১৩৬ : ধূমপান বন্ধ করার জন্য সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে এবার কিছু বলুন। আপনি কি মনে করেন ধূমপান বন্ধ করতে সরকার যা করছে তা যথেষ্ট?

উত্তর : পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ধূমপানের অপকারিতা ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বড় বড় রাস্তার মোড়ে, হাসপাতালের সামনে বড় বড় দর্শনীয় বিলবোর্ড স্থাপন করে।

সম্মানিত দর্শক-পাঠক! আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের উত্তর পার্শ্বে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের সামনে একটি বিরাট বিলবোর্ড শোভা পাচ্ছে। সেখানে লেখা আছে, **"ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি এড়াতে ধূমপান ও তামাক বর্জন করুন।"** এটি কার কথা? আমার-আপনার নিশ্চয়ই নয়। **সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কথা। সারা বিশ্বের নন্দিত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কথা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কথা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সারকথা। আর আমরা এই সতর্কবাণীকে অবজ্ঞা করবো ?**

তবে সরকারকে আরো বেশি সক্রিয় হতে হবে। জনস্বাস্থ্যে প্রণীত গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানগুলো আরো বেশি বেশি হওয়া উচিত। প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেলে ধূমপানের কুফল সম্পর্কে সরকারের বেশি বেশি বিজ্ঞাপন দেয়া উচিত। অন্তত বেহায়াপনা, নগ্নতা ও নোংরামীতে পরিপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলো কমিয়ে ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো caption আকারে টেলিভিশনের পর্দায় আনলে উপকার বেশি হবে। বর্তমানে মানুষ যেহেতু ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়া প্রভাবিত, তাই মিডিয়ার গুরুত্ব সমধিক। সরকারের উচিত টেলিভিশনে নাটক বা সিনেমা কমিয়ে দিয়ে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলো বেশি বেশি প্রচার করা। সরকার দুধে মেলামাইন নিয়ে যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি উঠে পড়ে লাগা উচিত এই ধূমপানের বিরুদ্ধে।
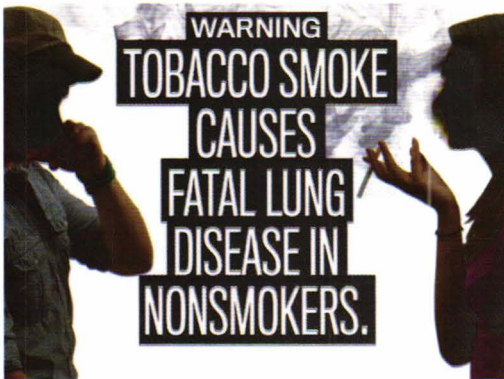
সম্মানিত দর্শক-পাঠক! কুরুচিপূর্ণ নাটক লিখে

জাতির সেবা করা যায়না। যতোসব মিথ্যা, অশ্লীল, কাল্পনিক, বানোয়াট ও নোংরা তথ্যে পরিপূর্ণ নাটক বা গল্পের বই একজন মানুষের জীবন থেকে হাজার হাজার ঘণ্টা হাইজ্যাক করতে পারে মাত্র। অন্য কোনো উপকার তো এতে দেখিনা। যারা ঘরে বেশি বেশি নাটক দেখে, যারা হাজার হাজার ঘণ্টা সময় এ কাজে অপচয় করে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কিয়ামতের দিনে ১ নম্বর প্রশ্নটির উত্তর দেয়া কঠিন হবে।

প্রশ্ন-১৩৭ : মানুষের মন ও পরিবেশের উপর ধূমপানের প্রভাব কী কী?

উত্তর : মানুষের মন ও মুক্তিবুদ্ধির উপর ধূমপানের ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। যে ব্যক্তি ধূমপানে আসক্ত তার পক্ষে ধূমপান না করা পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে কোনো কিছু চিন্তা করা, কোনো ভালো কাজে মনোনিবেশ করা, কোনো সমস্যা সমাধানে কাজ করা বা কোনো জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন। অনেকে ধূমপানের জন্য সিগারেট হাতে টয়লেটে প্রবেশ করেন। তার মতে ধূমপান না করলে মলত্যাগ করা কঠিন হয়ে যায়। সাধারণত টয়লেটে একটি বিশেষ ধরনের দুর্গন্ধ থাকে। আর ধূমপায়ী সিগারেট সেবনের সাথে সাথে দুর্গন্ধ ও দূষিত বাতাসও নিজের শরীরে টেনে নিচ্ছে। এটিই কি medically accepted good practice? Is a cigarette substitute for laxative tablets?

তাই একজন ধূমপায়ী আল্লাহ্‌র দাস না হয়ে একটি সিগারেটের দাসে পরিণত হয়, যা সত্যি অপমানজনক। তার চিন্তাশক্তি, যুক্তি বুদ্ধি ও বিবেক বাধাগ্রস্ত হয়। একজন ধূমপায়ী তার আশপাশের বন্ধুবান্ধব ও স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের সামনে সিগারেটের ধোঁয়া নির্গত করে থাকেন। তাই অধূমপায়ী হয়েও তাদেরকে ধূমপানের সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কারণ এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, passive smoking is as dangerous as active smoking. অর্থাৎ যারা কারো ধূমপানের সময় তার আশপাশে থাকে, তারাও একই ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। Passive smoking এ শতকরা ৩০-৪০ ভাগ cancer এর ঝুঁকি থাকে। এছাড়া ধূমপায়ী যদি কোনো ছোঁয়াচে রোগী হয়ে থাকেন, তখন তিনি তার নির্গত ধোঁয়ার মাধ্যমে আশপাশের লোকদেরকে অসুস্থ করে তুলতে পারেন।

এটি অতীব সত্য যে, ধূমপায়ী ধূমপানের বাজে গন্ধের মাধ্যমে চারপাশের লোকদের কষ্ট দিয়ে থাকে। আর তার যদি সর্দি-কাশি, এ্যাজমা বা এলার্জি থাকে, তাহলে তার আশপাশের লোকেরা বাধ্য হয়ে ধূমপানের সময় দূরে চলে যায়। তাই ধূমপায়ীর নিকট কোনো রহমতের ফেরেশতা আসেননা। কারণ আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেনো তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।" (সহীহ আল বুখারী) [৪১৪]

অনেকে ধূমপানের গন্ধ সহ্য করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে সে স্থান ত্যাগ করে। তাই পরিবেশের উপর ধূমপানের প্রভাব ব্যাপক। ওঠাবসার সঙ্গী-সাথীদের মাঝে একজন ধূমপায়ীকে খারাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন খারাপ সঙ্গী ও ভালো সঙ্গীর পার্থক্যটি নিম্নে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই একজন ভালো সঙ্গী ও খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে একজন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবসায়ী এবং আরেকজন লৌহকর্মকার বা কামার। সুগন্ধি ব্যবসায়ীর নিকট কেউ গেলে তিনি প্রথমে তাকে সুগন্ধিযুক্ত করবেন আর তার নিকট কিছু সুগন্ধি দ্রব্য বিক্রয় করবেন। তা না হলে তিনি

সেখান থেকে অন্তত কিছু সৌরভ লাভ করবেন। অপরদিকে লৌহকর্মকারের নিকট কেউ গেলে তিনি তাকে দুর্গন্ধ উপহার দিবেন অথবা তার আগুনে কাপড় পুড়ে ফেলবে।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৪১৫]

নবজাতক, শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের উপর ধূমপানের কুফল

প্রশ্ন-১৩৮ : ধূমপান কি নৈতিক অবক্ষয় বা অধঃপতন ডেকে আনে? এ বিষয়ে একটু ব্যাখ্যা করবেন কী?

উত্তর : ধূমপান নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। সাধারণত ধূমপান কোনো চায়ের স্টলে, বার, ডিসকো পার্টি, ক্যাসিনো, আড্ডার স্থানে অথবা পাপের কাজ হয় এমন জায়গায় বেশি হয়ে থাকে। পকেটে সিগারেট কেনার টাকা না থাকলে ধূমপানে আসক্ত ব্যক্তি তাৎক্ষণিক নেশা নিবারণের নিমিত্তে সিগারেট ক্রয়ের জন্য অন্যের নিকট ধর্ণা দিয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে পিতা-মাতা বা ভাই-বোনের পকেট থেকে টাকাও চুরি করে থাকে ঐ কাজের জন্য। কোনো ধূমপায়ী যদি নির্দিষ্ট সময়ে সিগারেট না পায় তখন সে বন্ধু-বান্ধবের এবং পরিবারের লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, যা নৈতিক অধঃপতনের শামিল। ধূমপানের মাধ্যমে যে বিষময় পদার্থ শরীরে ঢুকে থাকে তাকে ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তিগণ 'খবীস' বা খারাপ পদার্থ নামে অভিহিত করে থাকেন।

প্রশ্ন-১৩৯ : বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ধূমপান বন্ধ করা কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তাহলে তা কীভাবে? বিস্তারিত আলোচনা করবেন কী?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ ও straight forward. বাংলাদেশে ধূমপান তখনই পুরোপুরি বন্ধ হবে, যখন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, আইন-শৃঙ্খলা ও দেশ রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ধূমপান

থেকে বিরত থাকবেন। কারণ একটি দেশে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি তথা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দের উপরই আইনের শাসন বাস্তবায়ন বেশি নির্ভরশীল। কাজেই যারা ধূমপান বন্ধ করবেন, সর্বপ্রথম তাদের ধূমপান পরিত্যাগ করতে হবে। সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপদেষ্টা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ যদি ধূমপান না করেন, বা সেনাবাহিনী, র‍্যাব, বিডিআর ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ যদি ধূমপান থেকে বিরত থাকেন তাহলে বাংলাদেশে ধূমপান বন্ধ করা কোনো ব্যাপারই নয়। নতুবা দেশে ধূমপানের জন্য যে শাস্তির বিধান আছে, তা কখনো বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর নয়। কারণ ধূমপানের শাস্তি কোনো ধূমপায়ী বিচারক দিতে পারবেননা। কোনো বিচারক যদি ধূমপায়ী হন তখন তিনি ধূমপানের অপরাধে শাস্তি দিতে নৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল থাকবেন, কারণ তিনি নিজে ধূমপান করেন বা তা করতে অভ্যস্ত।

উদাহরণ স্বরূপ, এ অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ডাক্তার আজহারুল ইসলাম ও আমি আপনাদের সামনে ধূমপান ও তার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা করছি। এখন আমরা যদি ধূমপান করি, তাহলে এ বিষয়ের উপর আলোচনা করার কোনো নৈতিক অধিকার আমাদের থাকবেনা। ঠিক তেমনি বিচারক যদি ধূমপান করেন তবে ধূমপায়ী জনগণের শাস্তি দেবার জন্য তিনি কি উপযুক্ত? তদ্রূপ যে পুলিশ আইন ভঙ্গকারী ধূমপায়ীকে গ্রেফতার করে আইনের হাতে সোপর্দ করবেন, সেই পুলিশই যদি ধূমপায়ী হয়ে থাকেন তবে ধূমপায়ীকে গ্রেফতার করার নৈতিক অধিকার কি তার থাকবে?

প্রশ্ন-১৪০ : সর্বসাধারণের চলাচলের জায়গায় যথা, বাস, ট্রেন, লঞ্চ, স্টীমার, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজ বা public place-এ ধূমপান নিষেধ, এ ধরনের কোনো আইন আছে কি? যা মেনে চলা আমাদের সকলের উচিত?

উত্তর : হ্যাঁ আছে। বস্তুত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ধূমপানের উপর কঠোর মনোভাব পোষণ করে থাকে। কারণ এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা যখন মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনো ঘোষণা দেন, তখন তার পেছনে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান থাকে।

২০০৫ সালের ১৪ মার্চ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন কার্যকর করেছে (২০০৫ সনের ১১ নম্বর আইন)। উক্ত আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি পাবলিক স্থানে এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করতে পারবেনা। আইনের এ বিধান লংঘিত হলে আইন লংঘনকারী ব্যক্তিকে অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। বাংলাদেশে পাবলিক স্থানগুলো যথা : স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, লঞ্চ-স্টিমার, বাস-ট্রেন, পার্ক ইত্যাদি যেসব স্থানে অধিক লোকের সমাগম ঘটে সেখানে ধূমপান নিষেধ। এ আইন অমান্যকারীদের শাস্তি মাত্র ৫০ টাকা জরিমানা। এই জরিমানার পরিমাণটি অপরাধীদের জন্য খুবই কম। প্রতিবেশী দেশ ভারতও জনসাধারণের উন্মুক্ত স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ করে আইন পাস করেছে। আর আইন অমান্যকারীদের জন্য ৫ ডলার বা ২০০ রুপিয়া জরিমানার বিধান করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতে ধূমপায়ীর সংখ্যা আনুমানিক ১৫ কোটি। তবে এসব আইন সাধারণত বাস্তবায়ন হয়না। বাংলাদেশে কি এ আইন বাস্তবায়িত হয়েছে? এর কারণ একটু আগে যা বললাম তাই। এ আইন বাস্তবায়নের জন্য পুলিশের আইজি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমার হাতে দেশে তৈরি বেশ কয়েকটি ব্রান্ডের সিগারেটের প্যাকেট আছে। এগুলোর প্রত্যেকটির গায়ে আলাদা আলাদা সতর্কবাণী উল্লেখ করা আছে। আমি তা আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। বাংলাদেশে তৈরি প্যাকেটের একটিতে লেখা আছে 'ধূমপান ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণ'। অপরটিতে লেখা, 'ধূমপান হৃদরোগের কারণ'। তৃতীয়টিতে লেখা আছে 'ধূমপানের কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়'। আর চতুর্থটিতে লেখা আছে 'ধূমপান মৃত্যু ঘটায়'। এসব কিছুই সত্য। কিন্তু বর্তমানে ধূমপান বিরোধী আইন কী বলে? কোন্ সতর্কবাণীটি লেখা বাধ্যতামূলক? আগে ছিলো, "সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।" বর্তমানে সিগারেট প্যাকেটের গায়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত যেকোনো সতর্কবাণী মুদ্রণ করা বাধ্যতামূলক -

ক. ধূমপানে মৃত্যু ঘটায়;

খ. ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়;

গ. ধূমপান হৃদরোগের কারণ;

ঘ. ধূমপান ফুসফুস ক্যান্সারের কারণ;

ঙ. ধূমপানের কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয় বা

চ. ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

বাংলাদেশে তৈরি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেটের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা

এখন আপনি চিন্তা করে দেখুন কোনো জ্ঞানী লোক কী ধূমপানে আসক্ত হতে পারে?

প্রশ্ন-১৪১ : ধূমপান পরিত্যাগ করার উপযুক্ত সময় কখন? একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে ধূমপান থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে কার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি? এ ব্যাপারে মসজিদের ইমামদের কোনো সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে কী?

উত্তর : ধূমপান পরিত্যাগ করার উত্তম সময় রমযান মাস। রমযান মাসই পারে একজন chain

smoker-এর smoking নিয়ন্ত্রণ করতে। রমযান মাসে স্বাভাবিকভাবেই ধূমপানের frequency কমে যায়। অন্তত প্রতিদিন তা ৪-এ নেমে আসে। সেহরীর পর ও ফজরের নামাযের আগে ১ বার, ইফতারের পর ১ বার, ইশার নামাযের আগে ও পরে ২ বার। এই চারবারে ৪টি সিগারেট হিসেবে পুরো ১ মাস চলবে। তারপর হয়তো বা দিনে ২টি বা ১টি এবং সর্বশেষ তা শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা সম্ভব।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে ধূমপান থেকে বিরত রাখতে তার স্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমার জানামতে বাংলাদেশে সাধারণত কোনো মহিলা ধূমপান করেননা। তাছাড়া বাসায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ধূমপান করেনা। তাই head of the family অর্থাৎ কর্তাব্যক্তি যদি ধূমপান করেন, তবে বাড়ির সবাই তার শিকার হবে। সবাই affected হবে এটাই স্বাভাবিক।

কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বিনয়ের সাথে বলেন যে, my dear husband, for better for worse we are together. আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। তোমার সকল কাজই আমার পছন্দের একটি মাত্র কাজ ছাড়া, তা হলো ধূমপান। ধূমপানের গন্ধ আমি সহ্য করতে পারিনা। তাই যেহেতু passive smoking is as dangerous as active smoking, তাই আমাদের উভয়ের ও আমাদের ছেলেমেয়েদের ধূমপানের কুফল থেকে বাঁচাও। এ ধরনের সুন্দর সুন্দর কথা যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে বিনয়ের সাথে, শ্রদ্ধার সাথে, ভালোবাসার সাথে, আবেগের সাথে পেশ করেন, তাহলে অন্য কিছুর জন্য না হলেও একমাত্র স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ স্বামী অবশ্যই ধূমপান পরিত্যাগ করবেন।

মসজিদের খতীবদেরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তারা জুমু'আ নামাযের খুতবায় আমি যেসব হাদীস বা কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করলাম, তা আলোচনা করে বক্তব্য রাখতে পারেন। কারণ আমাদের দেশে আনুমানিক ৫ লক্ষ ইমাম বা খতীব রয়েছেন। তাঁদের মুসল্লি অর্থাৎ যারা তাঁদের পেছনে নামায পড়েন, তাদের সংখ্যাও কমপক্ষে (মহিলা ও শিশু বাদ দিলে) ৪-৫ কোটি হবে। এসব লোক প্রতি শুক্রবার মনোনিবেশ সহকারে খতীব বা ইমামের বয়ান শুনে থাকেন।

বস্তুত ইসলামী সমাজে ইহকাল-পরকালীন কল্যাণ লাভের দিক-নির্দেশনা মসজিদের সম্মানিত খতীবগণ দিয়ে থাকেন। তাই তারা যদি ধূমপানের কুফল মুসল্লিদের ভালোভাবে বোঝাতে পারেন

এবং ধূমপান যে হারাম বা মাকরূহ, তা যদি সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারেন, তবে ধূমপায়ীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে।

প্রশ্ন-১৪২ : মুহতারাম, এবার বলুন ধূমপান পরিত্যাগ করার সহজ কোনো পদ্ধতি উপায় আছে কি? অর্থাৎ ধূমপান পরিত্যাগের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা উপায় আছে কী, যা সহজেই অনুসরণ করে ধূমপান থেকে বিরত থাকা যায়?

উত্তর : ধূমপান পরিত্যাগ করার জন্য সদিচ্ছাই যথেষ্ট। ধূমপায়ীকে সর্বদা মনে রাখতে হবে দুটো ধ্রুবসত্য কথা যে ধূমপান মানে বিষপান ও ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। পৃথিবীতে এমন কোনো একক সাধারণ অভ্যাস বা কাজ নেই, যার ক্ষতি ধূমপানের চেয়ে সর্বাত্মক, ব্যাপক যা স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ। তাই ধূমপান পরিত্যাগের ব্যাপারে আমি কয়েকটি পরামর্শ দিতে চাই।

১. ধূমপান পরিত্যাগ করতে হলে প্রথমে আপনি ধূমপান-এ ফিরে না আসার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখুন। সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

"যখন তুমি কোনো কাজ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো বা সংকল্প করো, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখো।" (আলে ইমরান ৩:১৫৯)

২. যখন কেউ ধূমপান পরিত্যাগ করতে সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন তাৎক্ষণিকভাবে তা বর্জন করা উত্তম। আস্তে আস্তে বর্জনের অভ্যাসের চেয়ে একবারে সহসা বর্জন করা উত্তম। দেখবেন, এতে আপনার কোনোই ক্ষতি হবেনা। ভালো কাজে আল্লাহ্ সর্বদা সাহায্য করে থাকেন। সাহাবীগণের জীবন থেকে শিক্ষা নিন। মদ্যপানের উপর যখন আল্লাহ্ পাক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, তখন তারা সকলে তৎক্ষণাৎ মদের পিপা ভেঙে-চুরে মদীনার রাস্তায় মদ ঢেলে ফেলেন। কোনো অন্যায়, খারাপ বা অবৈধ কাজ ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করার চেয়ে দ্রুততার সাথে একবারেই তা করা উত্তম। মদ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন,

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾

"তোমরা কি তবে উহা হতে বিরত থাকবে না?" (আল মায়িদাহ ৫:৯১)

তখন সাহাবীগণ একবাক্যে বলে ওঠেন, "হে আমাদের রব। আমরা বিরত থাকলাম। "হে আমাদের রব! আমরা বিরত থাকলাম।"

৩. যথাসম্ভব যারা ধূমপায়ী তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করুন এবং যেসব জায়গায় সর্বদা ধূমপান চলে, সে পরিবেশ বর্জন করুন। তাছাড়া কেউ আপনাকে কোনো সিগারেট offer করলে, আপনি দৃঢ়তার সাথে বলুন, sorry, I don`t smoke. দুঃখিত, আমি ধূমপান করিনা। I don`t waste money for useless practices. আমি বাজে কাজে টাকা-পয়সা নষ্ট করিনা।

৪. যখনই ধূমপান করার ইচ্ছে জাগবে, তখন অন্য কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। দেখবেন কিছুক্ষণ পর আপনি ধূমপান করার কথা ভুলে যাবেন। আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রকৃত শক্তিশালী ও বাহাদুর সে নয়, যে তার শত্রুকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করে। প্রকৃত শক্তিশালী সেই, যে তার ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) ৪১৬

সুতরাং ধূমপানের মতো বদঅভ্যাসকে যে পরিত্যাগ করতে সক্ষম, সে-ই সবচেয়ে শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান।

৫. সবশেষে আমি অনুরোধ জানাবো, চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন, কীভাবে ধূমপান পরিত্যাগ করা যায়। তিনি হয়তো আরো কার্যকরী উপদেশ দিতে পারেন। কারণ কেউ অসুস্থ হলে সে সুস্থ জীবন ফিরে পেতে পিতামাতার চেয়ে চিকিৎসকের উপদেশকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পরিশেষে আমি আপনাদেরকে সূরা মায়িদার ২ নং আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানাবো।

﴿....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....﴾

"সৎকর্ম ও তাকওয়ার ভিত্তিতে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও অশ্লীল কাজে ও সীমা লঙ্ঘনে একে অন্যকে সাহায্য করবেনা।" (মায়িদাহ ৫:২)

প্রশ্ন-১৪৩ : ধূমপানের ন্যায় আরো কোনো পদার্থ বা জিনিস আছে কী, যা মানুষ সেবন বা গ্রহণ করে থাকে এবং যার কুফলও ধূমপানের মতোই?

উত্তর : ধূমপান শুধু তামাক বা সিগারেটেই সীমাবদ্ধ নয়। যারা পাইপ টানেন, তামাক sniffing করেন, cigar নেন তাদের বেলায়ও এটি প্রযোজ্য। কারণ এসব জিনিস সেবনের অপকারিতা ধূমপানের মতোই। তদুপরি ভাং, গাঁজা, Marijuana, Hashish, Indian Hemp, Amphetamine, Heroine, Pethidine, LSD-25, MDMA, MPTP, Angel Dust, Yaba Tablet ইত্যাদি ড্রাগও ভয়ংকর। এসব ড্রাগে কোনো ব্যক্তি একবার আসক্ত হয়ে পড়লে তার জীবন শেষ। এসব ড্রাগের প্রভাবে আস্তে আস্তে সেবনকারীদের behavioral disorder ঘটে। অর্থাৎ CNS disorders হয়। তখন মৃত্যু ছাড়া তার সামনে আর কিছু থাকেনা। কাজেই সম্মানিত পিতামাতাকে অনুরোধ করবো, আপনারা আপনাদের আদরের সন্তানদের প্রতিটি movement বা step পর্যবেক্ষণ করুন, নিয়ন্ত্রণ করুন। সারাদিন কোথায় যায়, কি করে, কি খায় ইত্যাদি খোঁজ-খবর নিন। অসৎ সঙ্গ পেয়ে যদি এসব ড্রাগ বা ধূমপান শুরু করেই ফেলে, তাহলে ভালোভাবে যুক্তির সাথে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলুন যে, সত্যি সত্যি ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। It seriously damages health. এটি সুন্দর চেহারাকে অসুন্দর করে ফেলবে।

কারণ একবার যেসব ছেলে এ পথে পা বাড়ায় তাদের পক্ষে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা অসম্ভব বা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায়, যেকোনো নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই হারাম। তাই drug addiction is prohibitted in Islam. আমি এ উপদেশগুলো দিচ্ছি একজন ফার্মাসিস্ট হিসেবে। কারণ আমি সকল প্রকার ওষুধের উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণের সাথে দীর্ঘদিন জড়িত ছিলাম।

প্রশ্ন-১৪৪ : মুহতারাম, ধূমপানের কুফল ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহুল আলোচনা শুনলাম। এবার ধূমপান সম্পর্কে দেশ ও দেশের বাইরের আমাদের ইসলামী টিভির অগণিত দর্শক-শ্রোতার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলুন, যা আমাদের মনে দাগ কাটে বা রেখাপাত করে।

উত্তর : সম্মানিত দর্শক ভাই ও বোনেরা! আমাদের এই উপমহাদেশে কেউই তার পিতামাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, শিক্ষক, বড় ভাই, এমনকি তার অফিসের বড় কর্মমর্তা বা Boss-এর সামনে ধূমপান করেনা। কারণ তারা সম্মানের ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাই যে কাজ, খাদ্যদ্রব্য, পানীয় বা কোনো অভ্যাস মুরুব্বিদের সামনে করা যাবেনা, সে কাজ করা কি আদৌ সঠিক? এটা তো যুক্তির কথা।

দ্বিতীয়ত : সকলেই জানেন যে, রাষ্ট্রে যখন কোনো আইন বা বিধান রচনা করার প্রয়োজন হয়, তখন যথারীতি সার্ভে বা জরীপ চালিয়ে বা গবেষণা করে রিপোর্ট দিতে হয়। Merits বা demerits যাচাই করা হয়। জনগণের কল্যাণের বিষয়টি মাথায় রাখতে হয়। জনগণের মতামতকেও গুরুত্ব দিতে হয়। সরকার না চাইলে কোনো মিটিং-মিছিল করে আন্দোলন করে আইন পাস করানো যায়না। উদাহরণ স্বরূপ, ব্লাসফেমি আইন। অর্থাৎ ধর্মের বিরুদ্ধে, ধর্ম প্রবর্তকের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা, রটনা করা, ধর্মকে ব্যঙ্গ করে কার্টুন প্রকাশ, নবী-রসূলগণকে কটাক্ষ করা, তাঁদের চরিত্রে কলংক লেপন করা ইত্যাদি অপরাধের শাস্তির বিধান পৃথিবীর প্রায় সকল খ্রিস্টান দেশেই আছে, অথচ বাংলাদেশে নেই। আলেম সমাজ ও সুধী সমাজ অনেকবার তা চেয়েছিল। কিন্তু সরকার চায়নি বলেই সে দাবি আইনে পরিণত হয়নি। কেনো সরকার চায়নি, আমি সে আলোচনায় যাবনা। তবে বাংলাদেশে ব্লাসফেমি আইন থাকলে, মাঝে মাঝে কিছু লোক বিকৃত নাটক বা আপত্তিকর কার্টুন প্রকাশের মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে আঘাত হেনে, সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে পার পেয়ে যেতে পারতোনা। অপরদিকে সরকারও যদি জনমত উপেক্ষা করে কোনো আইন রচনা করতে চায়, তখন তা করা কঠিন হয়। উদাহরণস্বরূপ, নারী উন্নয়ন নীতিমালা। সরকার চেয়েছিল ঠিকই; কিন্তু জনগণ তা চায়নি। প্রবল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মুখে তা আর পাস করানো যায়নি।

ধূমপানের উপর যে আইন হয়েছে, সেই আইনের বিরোধিতা কেউ করেনি। অর্থাৎ সবাই তা মেনে নিয়েছে। কারণ এটি সকলের সার্বিক কল্যাণের জন্য জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে প্রণীত হয়েছে। এ আইনের পিছনে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বলিষ্ঠ সমর্থন আছে। দেশের সকল চিকিৎসা বিজ্ঞানীও এতে একমত। তাই এ আইন মেনে চলা বাধ্যতামূলক এবং সকলের ধূমপান পরিত্যাগ করা উচিত। If you say, I shall not stop smoking and I dont care, then it is you who is to be blamed for the evil consequences of smoking.

এটি সত্য যে, অনেক ডাক্তারও ধূমপান করে থাকেন এবং অভ্যাসের জন্য সহসা পরিত্যাগ করতে পারেননা। তবে এটিও সত্য যে, সকল ডাক্তারই রোগীদের ধূমপান করতে নিষেধ করে থাকেন, বিশেষ করে যারা হৃদরোগ ও ডায়বেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা ও ফুসফুসের সংক্রমণে ভোগেন।

সম্মানিত দর্শক-পাঠক! এই মুহূর্তে যারা ইসলামিক টিভির এ অনুষ্ঠান দেখছেন, তাদের মধ্যে যারা ধূমপায়ী আছেন, তাদের বলবো "আপনারা ধূমপানের সুফল বা উপকার আছে এমন একটি উদাহরণ

পেশ করুন যা গবেষণায় প্রমাণিত।" যদি উল্লেখ করতে না পারেন তবে আমি বিনীত অনুরোধ জানাবো এই মুহূর্তে ধূমপান পরিত্যাগের সঠিক ও যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। দেখবেন আপনার কোনো অসুবিধাই হবেনা। অন্তত একটি দিন ধূমপান থেকে বিরত থেকে দেখুন আপনার ভালো লাগে কি না। আমার জানামতে ধূমপান পরিত্যাগে কোনো physical withdrawal syndrome দেখা যায়নি। No abnormalities will be detected when you quit smoking. ধূমপান ছাড়ার পর মাঝে মধ্যে পুনরায় ধূমপান করার ইচ্ছে জাগতে পারে। তখন তা অন্যান্য ইচ্ছার মতোই পরিহার করুন, যা বাস্তবায়নযোগ্য নয়। যেমন, একজন গরীব মানুষ যদি আশা করে যে সে বিমানে চড়ে বিশ্ব ভ্রমণ করবে। আমার এক প্রতিবেশী একজন advocate, notary public. কয়েকদিন পূর্বে তার সাথে ধূমপান নিয়ে কথা বলছিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেন ধূমপান পরিত্যাগ করার। তিনি একজন chain smoker. বিগত ৪৩ বছর যাবত তিনি ধূমপান করেছেন। গড়ে প্রতিদিন ৪০-৫০টি সিগারেট সেবন করেছেন। অথচ তার এ সিদ্ধান্ত নেয়ায় কোনো অসুবিধা হয়নি। উনাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, তার প্রতিক্রিয়া জানতে।

তাই আপনি যদি ধূমপান পরিত্যাগের মহান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে আপনারও কোনো অসুবিধে হবেনা। অধিকন্তু আপনার প্রতিমাসে প্রায় ৩-৪ হাজার টাকা সাশ্রয় হবে। আপনার টাকা আপনার কাছেই থাকবে, কাউকে দিতে হবেনা এবং উপকার হবে এই যে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আপনার পরিবার-পরিজন তথা ছেলেমেয়েরা আরো অধিক পুষ্টিকর ও অধিক স্বাস্থ্যকর ফলমূল ও ভিটামিন মিনারেলস সমৃদ্ধ খাদ্যদ্রব্য ও আমিষ জাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের সুযোগ পাবে।

সম্মানিত দর্শক-পাঠক! বিশ্বের উৎকৃষ্ট slogan হচ্ছে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আর আমি বলবো "ধূমপান হচ্ছে সকল রোগের মূল অথবা সকল দুঃখের মূল।" কাজেই সিদ্ধান্ত আপনার।

অধ্যায়-১১

হারাম বা নিষিদ্ধ জিনিসের মাধ্যমে চিকিৎসা

প্রশ্ন-১৪৫ : আচ্ছা মুহতারাম, হারাম, অবৈধ বা নিষিদ্ধ ওষুধদ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য কী?

উত্তর : কুরআনের prescription তথা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত রোগ নিরাময়ের পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে হালাল বা বৈধ জিনিসের মাধ্যমে চিকিৎসা করা এবং কোনো হারাম, ক্ষতিকর, অপবিত্র, dirty বা খারাপ কোনো জিনিসের মাধ্যমে চিকিৎসা না করা। এ বিষয়ে আমি বেশ কয়েকটি হাদীস এখানে আলোচনায় নিয়ে আসবো ইনশা'আল্লাহ।

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশে বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা রোগ বা ব্যাধি ও তার নিরাময় উভয়ই নাযিল করেছেন এবং প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা প্রয়োজনে ওষুধ ব্যবহার করো। কিন্তু অবৈধ বা হারাম কোনো বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করো না (অর্থাৎ হারাম জিনিষ দ্বারা তৈরি ওষুধ ব্যবহার করবেনা)।" (আবূ দাঊদ ও আল-মু'জামুল কাবীর) [৪১৭]

আবূ দাঊদ শরীফে উদ্ধৃত ও হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটিতেও একই নিষেধাজ্ঞা এসেছে। [৪১৮]

এই হাদীসের অর্থ হলো, ঐসব জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করা যাবেনা যা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যেসব জিনিস ব্যবহার করতে ইসলামী শরীয়ত নিষেধ করেছে। বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা যায়, মহান আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা যখন কোনো জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, তখন তা মানুষের কল্যাণের কথা বিবেচনা করেই করেছেন। তাই আল্লাহর কোনো অনুগত বান্দার চিকিৎসার জন্য তার ব্যবহার বৈধ হতে পারেনা। যে জিনিসটি সর্বতোভাবে সকল যুগের সকল দেশের সকল মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ, তা কিভাবে বা কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার বৈধ হবে? এ হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় দিকটি হচ্ছে, "হারাম জিনিসের মধ্যে রোগমুক্তি নেই।"

দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুবক সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ঐসব জিনিসের মাধ্যমে তোমাদের আরোগ্য ও রোগমুক্তি রাখেননি যেসব জিনিস হারাম বা unlawful. অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ ও আল-মুজামুল কাবীর) [৪১৯]

উপরোক্ত হাদীসগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হালাল ওষুধ থাকাবস্থায় হারামের মধ্যে চিকিৎসা থাকে না। অতএব তখন হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয নেই। কিন্তু হালাল চিকিৎসা না থাকলে তখন এ অপারগ অবস্থায় হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা বৈধ হয়। যেমন, জীবন রক্ষার্থে ক্ষুধা অবস্থায় হালাল

কোনো খাদ্য না থাকলে মৃত প্রাণী ও শূকরের মাংস খাওয়াও বৈধ হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা হালাল খাদ্য না থাকা অবস্থায় মৃত্যুমুখী ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জন্য হারামকে বৈধ করেছেন। তেমনিভাবে হারাম বস্তুতে (হারাম থাকাবস্থায়) আমাদের জন্য চিকিৎসা থাকেনা। অপারগ অবস্থায় হারাম বস্তু আর হারাম থাকেনা, বরং হালাল হয়ে যায়। সুতরাং এ অবস্থায় তার মধ্যে চিকিৎসা থাকার কথা নিষেধ করা হয়নি।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। "একবার উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা যদি চাও, সাদাকার উটের নিকট চলে যাও (যেগুলো মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরে কুবা নামক অঞ্চলে সংরক্ষিত ছিলো) এবং সেখানে গিয়ে তোমরা উটের দুধ ও পেশাব পান করো।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৪২০]

এ হাদীস থেকে জানা গেলো যে, উটের পেশাব নাপাক ও হারাম হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওষুধ হিসেবে তা পান করার পরামর্শ দেন এবং এতে তারা আরোগ্যও লাভ করে। এতে প্রমাণিত হয় যে প্রয়োজনে ওষুধ হিসেবে হারাম বস্তু সেবন করা জায়েয আছে এবং তাতে আরোগ্যও লাভ হয়। যেমনিভাবে যুদ্ধের মাঠে রেশমি কাপড় পরিধান করা জায়েয হয়ে যায়।

প্রশ্ন-১৪৬ : 'নেশাজাতীয় দ্রব্যের সাহায্যে চিকিৎসা গ্রহণ' এ সম্পর্কে কোনো Prophetic tradition বা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস আলোচনা করবেন কী?

উত্তর : একটু আগে আমি একটি হাদীস আলোচনা করেছি, যা সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী কিতাবে উদ্ধৃত রয়েছে। ঠিক অনুরূপ একটি হাদীস এখানে বর্ণনা করবো যা আবূ নু'য়াইম লিখিত তিব্বুন নববী কিতাবে উদ্ধৃত আছে। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি হালাল ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আরোগ্যদান করেন, আর যে ব্যক্তি হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার সুস্থতা রাখেননা।" (আবূ নূ'য়াইম ও আস-সুয়ুতী) [৪২১]

ইমাম যুহ্রী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত উরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন যে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন, "যে ব্যক্তি শরাব বা মদের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে আরোগ্য দান করেন না।" (যাদুল মা'আদ, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ ও আবূ নু'য়াইম) [৪২২]

এ দু'টো হাদীস থেকেও যে দিকটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে তা হলো এই যে, "হারাম বস্তুর আরোগ্য দানের কোনো ক্ষমতা নেই এবং হারাম বস্তুকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা নিষেধ।"

এ প্রসঙ্গে আমি আরো একটি হাদীস এখানে বর্ণনায় আনবো। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত তারিক ইবনে সুয়াইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, 'আমরা কিছু আঙুর উৎপন্ন করি এবং তা থেকে রস বের করে নিয়ে আসি এবং তা fermentation

করার পর পান করি।' নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ বললেন, 'এরূপ করো না।' 'Don't do this.' তখন আমি পুনরায় তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তো এটি ওষুধ হিসেবে তৈরি করেছি। তখন তিনি বললেন, "শরাব বা মদ কোনো ওষুধ নয়, বরং এটি নিজেই একটি রোগ বা রোগের কারণ।" (সহীহ মুসলিম, আবূ দাঊদ, আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [৪২৩]

অর্থাৎ Wine is not a medicine, it is not a remedy, it is not a healing, it is a disease or cause of disease(s).

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসমিস (আঙুর), খুরমা, কাঁচা ও পাকা খেজুর থেকে তৈরি নেশাকর পানীয় (alcoholic drink / beverage) পান করতে নিষেধ করেছেন।" (সহীহ আল বুখারী) [৪২৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে "মদ সকল খারাপের মূল এবং সব গুনাহের বড় গুনাহ। যে তা পান করে সে নামায ত্যাগ করে এবং তার মা, খালা, ফুফুর সাথে মন্দকাজে লিপ্ত হয়।" (আল-মু'জামুল কাবীর ও জামে সগীর) [৪২৫]

পাকা খেজুর

ওষুধ হিসেবে মদ ও অন্যান্য নেশাযুক্ত জিনিস সম্পর্কে আরো একটি সহীহ হাদীস রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক বুদ্ধি-জ্ঞান বিনষ্টকারী বস্তু হলো শরাব। আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।" (আবূ দাঊদ) [৪২৬]

এ হাদীসটির শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে, "প্রত্যেক নেশাযুক্ত জিনিস মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর।" কারণ, it causes behaviroural disorders. It affects the CNS.

প্রশ্ন-১৪৭ : মদ ব্যতীত আরো অন্যান্য নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় সম্পর্কে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী কী?

উত্তর : হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "প্রতিটি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই শরাব (মদ) এবং প্রতিটি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই হারাম।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৪২৭]

এখানে 'নেশা সৃষ্টিকারী' জিনিস বলতে 'নেশাযুক্ত পানীয় বস্তুকে' বুঝানো হয়েছে। অপরদিকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নেশা সৃষ্টিকারী যে কোনো পানীয়ই হারাম।" (সহীহ আল বুখারী) [৪২৮]

এখানে নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় বলতে যাবতীয় তরল বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। সেটা মদ হোক আর অন্য কোনো পানীয় হোক, সবই হারাম। হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদ সম্পর্কে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে উঠলেন এবং বললেন, শরাব বা নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হয়েছে। আর এটি পাঁচটি জিনিসের দ্বারা তৈরি হয়, আঙুর (কিসমিস), খেজুর, মধু, গম ও যব থেকে। এবং শরাব এমন একটি পানীয়, যা পান করলে মানুষের আক্কেল-বুদ্ধি ও জ্ঞান বিগড়ে যায় (জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্তি করে দেয়)।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৪২৯]

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে এই ৫টি জিনিস থেকে fermentation করে যেকোনো পানীয় তৈরি করা হোক না কেন, তা হারাম বা নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন-১৪৮ : কী পরিমাণ মদ বা নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় পান করা হারাম? এর পরিমাণ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা এসেছে কী?

উত্তর : হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে জিনিস অধিক পরিমাণে নেশা সৃষ্টি করে, তার অল্প পরিমাণ পান করাও হারাম।" (মুসনাদে আহ্মাদ, আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী) [৪৩০]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিসই হারাম এবং যেটাই মানুষের বিবেককে প্রভাবিত করে ও হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত করে, তাই হারাম। তা একমুষ্ঠি পরিমাণই হোক না কেনো।" (আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী) [৪৩১]

আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। আর যে বস্তু অধিক পরিমাণ নেশার সৃষ্টি করে তার এক অঞ্জলিও পান করা হারাম।" (আবূ দাউদ) [৪৩২]

উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে "প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী এবং অলসতা আনয়নকারী বস্তু ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।" (আবূ দাউদ) [৪৩৩]

দুটো হাদীস থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, "শুধুমাত্র মদই যে হারাম তা নয়, বরং সর্বপ্রকার নেশাদার ও মাদক দ্রব্যও হারাম, তা অধিক পরিমাণে হোক অথবা অল্প হোক।" Narcotic drugs এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সম্মানিত দর্শক-পাঠক শ্রোতামণ্ডলী! যে কয়টি হাদীস আলোচনা করলাম তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম, ইয়াবা, হিরোইন, ককেইন, মরিজুয়ানা, ইয়াবা, ইণ্ডিয়ান হেমপ্, ফেনসিডিল ইত্যাদি সবকিছুই হারাম, যা সবার পরিত্যাগ করা উচিত, তা যে brand-এরই হোক না

কেনো। অন্য কোনো অজুহাত তা জায়েয করতে পারবেনা। হালাল বিয়ার বা ইসলামী মদ বলতে কিছুই নেই। আমরা আরো জানতে পারি যে, যেকোনো অবস্থায়, যেকোনো কাজে, মদের ব্যবহার নিষেধ এবং এর যেকোনো পরিমাণ সেবনই হারাম। এসবের ব্যবহারে শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি। আর এসব ক্ষতির কথা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সময় বর্ণনা করেছেন, যখন মদের ওপর কোনো গবেষণা হয়নি এবং মদের খারাপ গুণাগুণ সম্পর্কে মানুষের জানার অন্য কোনো উপায় ছিলো না। তাই সবাই তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার উপর নির্ভর করতো।

প্রশ্ন-১৪৯ : মদের ব্যবসার সাথে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, তাদের ব্যাপারে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন?

উত্তর : হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের সাথে জড়িত ১০ ধরনের মানুষকে লা'নত (অভিসম্পাত) করেছেন। তারা হচ্ছে :

১. যে উৎস থেকে মদ আহরণ করে (one who extracts wine);
২. যে মদ তৈরি করে (one who manufactures wine);
৩. যে মদ পান করে (one who drinks wine);
৪. যে মদ পান করায় (one who makes one drink wine);
৫. যে মদ আমদানি করে (one who imports wine);
৬. যার জন্য মদ আমদানি করা হয় (one for whom wine is imported);
৭. যে মদ বিক্রয় করে (one who sells wine);
৮. যে মদ ক্রয় করে (one who purchases wine);
৯. যে মদ সরবরাহ করে (one who supplies wine to others) এবং
১০. যে মদের ব্যবসার লভ্যাংশ গ্রহণ করে (one who receives profit from wine business)। (ইবনে মাজাহ) [৪৩৪]

ইবনে মাজাহ শরীফে আরেকটি হাদীস উদ্ধৃত আছে যা বর্ণনা করেছেন ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শরাবের উপর দশভাবে অভিসম্পাত করা হয়েছে। স্বয়ং শরাব (অভিশপ্ত), শরাব উৎপাদক, যে তা উৎপাদন করায়, তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, তার বহনকারী, তা পানকারী ও তা পরিবেশনকারী (এদের সকলেই অভিশপ্ত)।" (ইবনে মাজাহ) [৪৩৫]

এ হাদীস থেকে বুঝতে পারা যায় যে, যারা মদের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত, তাদের সম্পর্কে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি মদ পান করে বা মাতাল ও নেশাযুক্ত হয়, ৪০ দিন পর্যন্ত তার নামায বা দু'য়া কবূল হবে না। সে মারা গেলে দোযখে প্রবেশ করবে।" (আবূ দাঊদ, আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [৪৩৬]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো

বলেছেন, "যখন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করেনা, আর যখন চোর চুরি করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করেনা, আর যখন মদপান করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় মদপান করেনা। এরপরও তওবার সুযোগ রাখা হয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, ইবনে মাজাহ ও আন-নাসাঈ) [৪৩৭]

অর্থাৎ মদ ও ঈমান একসাথে চলতে পারেনা। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শরাব পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।" (ইবনে মাজাহ) [৪৩৮]

প্রশ্ন-১৫০ : আচ্ছা মুহতারাম, মদ ও অ্যালকোহল এ দুটো জিনিসের পার্থক্য নিয়ে আমাদের সমাজে ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। অনুগ্রহপূর্বক বিজ্ঞানের আলোকে এ দুটোর পার্থক্য বুঝিয়ে বলবেন কী?

উত্তর : এ প্রশ্নটি খুবই জনগুরুত্বপূর্ণ। আপনি যথার্থই বলেছেন, এ দুটোর মাঝে বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা যারা চিকিৎসা বিজ্ঞান বা ভেষজ বিজ্ঞানের সাথে জড়িত, তারা সবাই অবগত যে alcohol হচ্ছে generic name. আর এর chemical name হচ্ছে ethanol or ethyl alcohol. Alcohol-কে একটি group of chemicals বা solvent নামেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। বহু ধরনের alcohol আছে, যার সবই alcohol হিসেবে classified. Ethyl alcohol-এর পাশাপাশি আরেকটি alcohol আছে, যাকে আমরা methanol or methyl alcohol বলে জানি। সাধারণত এ দু'টোকেই আমরা alcohol বলে থাকি। এছাড়া butyl alcohol, propyl alcohol, isopropyl alcohol ইত্যাদি আছে।

Ethanol যদি ৯৯.৯৯% বিশুদ্ধ হয়, তাকে আমরা absolute alcohol অথবা absolute ethanol বলি। Rectified sprit বা ethyl alcohol উভয়ই edible or drinkable. পানীয়ে ব্যবহার করা হয়। Methanol হচ্ছে poisonous বা বিষাক্ত। Rectified sprit ল্যাবরেটরিতে extraction এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার হয়। Hardware-এর দোকানে যে alcohol পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় methylated sprit. Rectified sprit-এ সামান্য পরিমাণ methanol যোগ করে methylated sprit তৈরি করা হয়, যা বিষাক্ত ও পানের অযোগ্য। অর্থাৎ small amount of methyl alcohol is added to rectified sprit to make it unfit for human consumption. নতুবা খারাপ বা দুষ্ট লোকেরা হার্ডওয়্যারের দোকানে সংরক্ষিত sprit পান করে শেষ করে ফেলতো। তবুও মাঝে মাঝে পত্রিকায় খবর আসে যে বিষাক্ত মদ সেবনে মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আসলে মদ বিষাক্ত হওয়ার কারণ নেই। হয় পরিমাণের বেশি কেউ পান করেছে নতুবা methylated sprit পান করেছে যার জন্য মৃত্যু ঘটেছে।

Absolute alcohol বা absolute ethanol is water miscible. দ্রাবক হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ল্যাবরেটরির অনেক কাজে এর ব্যবহার বিদ্যমান। ল্যাবরেটরিতে গবেষণা কাজে, পানিতে অদ্রবণীয় জিনিস দ্রবণীয় করার কাজে অথবা কিছু পরিমাণ preservative হিসেবে ব্যবহার করা হয়। Alcohol আবিষ্কারের আগে মধুকে preservative হিসেবে ব্যবহার করা হতো। যাহোক, আমি যতোটুকু জানি absolute alcohol কেউ পান করতে পারে না, toxicity-এর জন্য। পান করার সাথে সাথে জিহ্বা, গলা পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। এই absolute alcohol বা rectified sprit-এর সাথে পানি মিশিয়ে মদ তৈরি করা হয়। Light wine-এ সাধারণত ১০% থেকে ১৪% alcohol থাকে,

আর desert wine-এ ১৪% থেকে ২০% alcohol থাকে, বাকি থাকে ফলের রস, flavouring essences, colouring matter and sweeting agent. যে পানীয়তে alcohol থাকে, তা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী পুরোপুরি হারাম, তা যে পরিমাণেই হোক না কেনো। এবং এর ভেতর অন্যান্য হালাল বা উপকারী উপকরণ যা-ই থাকুক না কেনো।

তবে ওষুধে যে সামান্য পরিমাণ (১% এরও নিচে) alcohol ব্যবহার করা হয়, তা দ্রাবক বা solvent হিসেবে, formulation-এ additive হিসেবে অথবা tablet-এর coating material দ্রবণীয় করার কাজে ব্যবহার হয়। অনেক সময় methanolও add করা হয়। তবে granules drying-এর সময় তা বাষ্পীভূত হয়ে যায়। ফলে কোনো alcohol অবশিষ্ট থাকেনা। ফলে toxicityও থাকেনা। যাহোক, ট্যাবলেট বা কঠিন জাতীয় ওষুধে যে সামান্য পরিমাণ alcohol formulation ও manufacturing এর কাজে ব্যবহৃত হয় (যা পরে বাষ্পীভূত হয়ে যায়), তা ওষুধকে হারাম করে না বলে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অভিমত।

তবে কোনো elixir বা syrup-এ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ alcohol add করা হয় এবং তা যদি ওষুধের কার্টুনে declared করা থাকে, তাহলে সে ওষুধ নিঃসন্দেহে হারাম। আর যদি alcohol add করার পরও লেবেল বা কার্টুনে declare করা না থাকে, তাহলে বলা যায়, ঐসব অসাধু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সরকারি আইন ভঙ্গ করেছে এবং জনগণকে প্রতারিত করছে। এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কারণ বর্তমানে ওষুধের বোতলের লেবেলে ও কার্টুনের গায়ে ওষুধের উপাদানসমূহ বা active ingredients লেখার বাধ্যতামূলক বিধান রয়েছে এবং নিয়মিত উৎপাদনের আগে সকল ওষুধের recipe সরকারের Drug Administration Autority কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়।

প্রশ্ন-১৫১ : ধন্যবাদ আপনাকে মদ ও অ্যালকোহল সম্পর্কে বিস্তারিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করার জন্য। এবার একটু বুঝিয়ে বলুন যে, এসব হাদীসের মূল শিক্ষণীয় দিকগুলো কী কী? অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর করণীয় কী?

উত্তর : হাদীসগুলোর আলোচনা থেকে দুটো বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়, যা পালন করা মুসলিম হিসেবে আমাদের সকলের দায়িত্ব। সকল মুসলিম চিকিৎসকের উপর যে দায়িত্বটি সর্বপ্রথম বর্তায় তা হচ্ছে, তারা তাদের রোগীকে এমন কোনো ব্যবস্থাপত্র প্রদান করবেননা যা হারাম, ক্ষতিকর ও নেশা উদ্রেককারী। তবে যদি কোনো alternative বা বিকল্প ওষুধ না পাওয়া যায় অথবা জীবন রক্ষার জন্য আর কোনো উপায় না থাকে, তবে তা আলাদা কথা।

দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে, মুসলিম রোগীদের। কোনো মুসলিম রোগী এমন কোনো চিকিৎসকের নিকট গমন করবেননা, যারা হালাল-হারাম, পাক-নাপাকের ধার ধারেননা। তাছাড়া কোনো রোগী নিজ ইচ্ছায় পছন্দ অনুযায়ী কোনো ওষুধ গ্রহণ করবেননা, যা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তবে কোনো হালাল ওষুধ না পাওয়া গেলে শুধুমাত্র জীবন রক্ষার জন্য ততোটুকু পরিমাণে নিষিদ্ধ ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে যতোটুকু ব্যবহারে জীবন রক্ষা পাবে।

প্রশ্ন-১৫২ : কোনো পশুর চিকিৎসায় মদ বা নেশাযুক্ত ওষুধ ব্যবহার করা যায় কি?

উত্তর : এ বিষয়ে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস আমি খুঁজে পাইনি। তবে সাহাবায়ে কেরাম কোনো পশুকেও শরাব ব্যবহারের অনুমতি দেননি। হযরত নাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম তার এক উটকে শরাব পান করালে তিনি তাকে ধমক দিয়েছিলেন এবং প্রচণ্ডভাবে তিরস্কার করেছিলেন।" (নযর আহমদ) [৪৩৯]

উক্ত হাদীসের সংকলক আব্দুর রাযযাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ শরাবের বোতলের তলানিও কোনো জানোয়ারের দেহে মালিশ করা সহ্য করেননি।" (নযর আহমদ) [৪৪০]

এ রিওয়ায়াত দুটো সংগ্রহ করেছি আমি পাকিস্তানের লাহোরের শিবলী কলেজের অধ্যক্ষ নযর আহমদ লিখিত তিব্বুন নববী বই থেকে।

প্রশ্ন-১৫৩ : নাপাক বা অপবিত্র, ক্ষতিকর, খারাপ ও অপরিষ্কার জিনিসের মাধ্যমে চিকিৎসার বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট বাণী কী?

উত্তর : আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা কুরআনের সূরা আল আ'রাফে ঘোষণা করেছেন,

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾

"তাদের জন্য পবিত্র জিনিসকে হালাল করা হয়েছে আর তাদের ওপর খবীস জিনিসকে হারাম করা হয়েছে।" (আল আ'রাফ ৭:১৫৭)

মুফাস্সিরগণ এখানে 'খবীস' বলতে সকল খারাপ ও অপবিত্র জিনিস, কাজ, বিশ্বাস, ব্যক্তি ও খাদ্যদ্রব্যকে বুঝিয়েছেন। সূরা আ'রাফ এবং সূরা নিসায় আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা 'খবীস'-কে তাইয়্যেব-এর বিপরীত বলে উল্লেখ করেছেন। (আন-নিসা ৪:২)

সংক্ষেপে বলা যায়, সকল পাক-পবিত্র জিনিস হালাল, আর নাপাক জিনিস হারাম।

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'খবীস' বা নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর ওষুধ অর্থাৎ বিষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।" (ইবনে মাজাহ) [৪৪১]

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর ওষুধ বলতে নিম্নমানের ওষুধ, মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ বা যে সকল ওষুধে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বেশি, সেসব ওষুধকে বুঝানো হয়েছে। কারণ মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং অনেক সময় তা বিপজ্জনক। তাছাড়া অনেক ওষুধে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি থাকে। তাই সেসব ওষুধ সেবন করা উচিত নয়। যাহোক, ডাক্তার বা ফার্মাসিস্ট এ বিষয়ে ভালো পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন। তাছাড়া, "যেসব জিনিসকে মানুষ সর্বদাই খারাপ হিসেবে ঘৃণা করে থাকে, এমন কোনো জিনিসের মাধ্যমে নিরাময় গ্রহণকে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।" উদাহরণস্বরূপ লোহার ময়লা, পঁচাপাতা, পঁচাবাসী খাবার, মাটি, ধুলাবালি, পুকুরের দূষিত পানি, জীবজন্তুর রক্ত, বীর্য, মূত্র ইত্যাদির কথা বলা যায়। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত

অন্য এক হাদীসে আমরা জানতে পারি যে "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম বা নাপাক জিনিস দ্বারা তৈরি ওষুধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।" (আবু দাঊদ) [৪৪২]

প্রশ্ন-১৫৪ : ব্যাঙ বা তার শরীরের অংশবিশেষ কি ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি আছে?

উত্তর : হযরত আবদূর রহমান ইবনে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "জনৈক চিকিৎসক নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওষুধ হিসেবে ব্যাঙ (frog) ব্যবহার করার অনুমতি চাইলেন। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিরস্কার করেন এবং এ উদ্দেশ্যে তাকে ব্যাঙ মেরে ফেলতে নিষেধ করেন।" (মুসনাদে আহ্মাদ, আবূ দাউদ, আন-নাসাঈ ও মুসতাদরাক) [৪৪৩]

ইবনে সীনা বলেন, "ব্যাঙের মাংস খেলে শরীর ফুলে যাবে এবং গায়ের রং বদলে যাবে। তাছাড়া এটি বীর্য বা semen-কে নিঃশেষ করে দেবে " (আস্-সুয়ূতী) [৪৪৪]

আস্-সুয়ূতী নিজেও একই ধরনের একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি ব্যাঙ খাবে, তার বীর্যপাত বন্ধ হবেনা, যে পর্যন্ত না তা নিঃশেষ হয়ে যায়। হলুদ রংয়ের ব্যাঙই বেশি ক্ষতিকর।" (আস্-সুয়ূতী) [৪৪৫]

অপরদিকে হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওষুধ হিসেবে সকল অপবিত্র জিনিসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।" (আবূ দাউদ) [৪৪৬]

এখানে অপবিত্র জিনিস বলতে খারাপ বা হারাম জিনিস বা জীব-জন্তুর মাংস বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল lizard বা গুঁইসাপ সম্পর্কে। তখন তিনি বলেন, "তোমরা এর মাংস খেয়োনা। তবে আমি এটি আমার উম্মতের জন্য নিষিদ্ধ করছিনা।" (সহীহ মুসলিম ও আবূ দাউদ) [৪৪৭]

সহীহ আল বুখারীতে হাদীসটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, "গুঁইসাপ আমি খাইনা এবং তা হারামও বলিনা।" (সহীহ আল বুখারী) [৪৪৮]

Lizard বা টিকটিকি অথবা গিরগিটিকে ইউনানি ভাষায় রেগমাহী বলা হয়। এই রেগমাহী বড় ধরনের টিকটিকি। আমাদের দেশে সচরাচর এগুলো দেখা যায়না। কয়েকটি ইউনানি কোম্পানি এই রেগমাহীর সাহায্যে ওষুধ তৈরি করে আসছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, "যদি কোনো সিরাপে শুধু সাপের মাংস (snake meat বা extract) থাকে, আমি কিছুতেই মনে করিনা যে, তা গ্রহণ করা উচিত। এমনকি সিরাপটি যদি গাধার দুধের সাথে মিশানো হয়, তাহলে তীব্র প্রয়োজনেও তা পান করা উচিত নয়। কারণ গাধার দুধপান করতে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তাই এ দুটো উপাদানই ওষুধ হিসেবে নিষিদ্ধ।" (আস্-সুয়ূতী) [৪৪৯]

প্রশ্ন-১৫৫ : মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মদপানের কুফল কি? মদপানকে কেনো হারাম ঘোষণা করা হয়েছে? অনুগ্রহপূর্বক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : একজন জার্মান ডাক্তার বলেছেন, "যারা মদে আসক্ত তারা চল্লিশ বছর বয়সে তেমনি অকার্যকর হয়ে যায়, যা অন্যরা ষাট বছর বয়সে হয়ে থাকে।" অর্থাৎ চল্লিশ বছরেই ষাট বছরের বুড়ো মানুষের

মতো হয়ে যায়। Those who are addicted to drinking wine become inactive at the age of forty like what they could have been at the age of sixty. হিপোক্রাটস্ বলেন, "মদ মানুষের শরীরে যে ক্ষতি সাধন করে তা ভয়ানক। কারণ, এটি মানুষের বুদ্ধি, বিবেক, মেধা ও প্রতিভাকে ধ্বংস করে।" (আস্-সুয়ূতী) [৪৫০]

Royal book-এর প্রখ্যাত লেখক আলী ইবনে আল-আব্বাস আল-মুজাশিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মদপানের কুফল হচ্ছে, এটি মস্তিষ্ক এবং তার শিরা-উপশিরাকে ধ্বংস করে ফেলে।" (আস্-সুয়ূতী) [৪৫১]

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বলে যে মদ বা alcohol মানুষের শরীরে absorbed হয়না। আর assimilatedও হয়না। এটি শরীরে রক্ত তৈরিতেও সাহায্য করেনা। এটি ক্ষণিকের জন্য রক্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করে মাত্র, যার ফলে কিছু সময়ের জন্য শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয়। মদপানের প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ক্ষতিকর দিকগুলোর অন্যতম হচ্ছে-

১. এটি আস্তে আস্তে মদে আসক্ত ব্যক্তির হজমশক্তিকে নষ্ট করে ফেলে ;
২. এটি ক্ষুধাহীনতা বৃদ্ধি করে ;
৩. এটি শরীরে বিকৃত পরিবর্তন আনয়ন করে ;
৪. এটি স্নায়ুবিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে ;
৫. এটি লিভার ও কিডনি ধ্বংস করে ;

যক্ষ্মারোগের আক্রমণ অত্যধিক মাদকাসক্ত থাকার অন্যতম কারণ। বিজ্ঞান আমাদেরকে আরো বলে যে মদ বা alcohol এমন একটি বিষাক্ত পানীয় যার ক্ষতিকর দিক তথা pharmacological action গুলো ধীরে ধীরে কাজ শুরু করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে মাদকাসক্ত ব্যক্তির শরীরে দৃশ্যমান হয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তির ছেলেমেয়েরা দুর্বল হয়ে জন্মলাভ করে এবং মাঝে মাঝে তারা impotent হয়ে থাকে। অতিরিক্ত মদপান করলে পানকারীর রক্তপ্রবাহের শিরা-উপশিরাগুলো শক্ত হয়ে যায়। ফলে বার্ধক্য দ্রুত ঘনিয়ে আসে। মদপান মানুষের গলা ও শ্বাস-প্রশ্বাসের শিরা-উপশিরাকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে দীর্ঘস্থায়ী 'কাশি' সৃষ্টি করে এবং এতে গলার স্বর বড় হয়ে যায়।

Drinking of alcohol leads to CNS and CVS disorders. CVS includes intracranial hemorrhage (stroke) cerebral ischaemia / infarction, HTN etc., while CNS disorders leads to intellectual debility. CVS also includes atheros which leads to HTN, IHD and finally cardiac arrest.

সম্মানিত দর্শক-পাঠক! সম্ভবত এতোসব ক্ষতিকর দিক আছে বলেই আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা মদপান হারাম করেছেন। কারণ তিনি আমাদেরকে ভালোবাসেন এবং এসব ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে চান। তিনি ইরশাদ করেন,

﴿ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ اِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ﴾

(হে রসূল!) "তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে মদ ও জুয়ার ব্যাপারে নির্দেশ কী? বলে দাও ও দুটোর মধ্যে বিরাট ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে, যদিও লোকদের জন্য তাতে কিছুটা উপকারিতাও আছে। কিন্তু এগুলোর উপকারিতার চেয়ে গুনাহ বা ক্ষতিকর বিষয় অনেক বেশি।" (আল বাকারাহ ২:২১৯)

এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে মদে যে সামান্য উপকারিতা রয়েছে, তার চেয়ে অপকারিতা অনেক অনেক বেশি। এটি সম্ভব যে, যখন আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা মদপান হারাম করলেন, তখন তা নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন। সম্ভবত তখন মদপানে যে কিঞ্চিত উপকার ছিলো তাও উঠিয়ে নিয়েছিলেন, যার ফলে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করলেন যে, "wine বা মদ কোনো ওষুধ নয়; বরং এটি নিজেই রোগ বা রোগের কারণ।" (আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ) [৪৫২]

আর তাঁর এই মন্তব্য তো আসমানী প্রত্যাদেশের উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। তাই সকল আধুনিক বিজ্ঞানী এ বিষয়ে আমার সাথে একমত হবেন যে **"ক্ষণিকের জন্য সামান্য একটু stimulating action ছাড়া মদ বা wine এর আর কোনো উপকারিতা বা benefit নেই।"** তাই আমি ইসলামিক টিভির অগনিত সম্মানিত দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনাদের ভেতর যদি কেউ যেকোনো কারণেই হোক মদপানে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক এই মুহূর্তে তা পরিত্যাগ করুন। দেখবেন আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, সুন্দর থাকবে। অপরিণত বয়সে বার্ধক্যের ধকল আপনাকে সইতে হবেনা।

প্রশ্ন-১৫৬ : গত সপ্তাহে আমরা মদ (অ্যালকোহল) ও অন্যান্য হারাম জিনিসের মাধ্যমে চিকিৎসা ও ইসলামের বিধান নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এক পর্যায়ে fermentation action নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল যে, ঐ সময়ে ৫টি খাদ্যদ্রব্য থেকে মদ তৈরি করা হতো। কতো ঘণ্টা পর fermentation শুরু হয় সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা তখনকার লোকদের মাঝে ছিলোনা। তাই আমরা জানতে চাইব, এ বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনো বক্তব্য আছে কী?

উত্তর : মূলত fermentation একটি chemical process, যার মাধ্যমে alcohol তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে এই fermentation শুরু হবার সময় খাদ্যদ্রব্যের physical characteristics-এর উপর নির্ভর করে, যা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন। যেসব খাদ্যদ্রব্য বা শস্য অপেক্ষাকৃত নরম প্রকৃতির, তা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে fermentation শুরু হয়। যেমন আঙুর। অপরদিকে কঠিন প্রকৃতির খাদ্যদ্রব্য কিংবা কাঁচা ফলমূল হলে সেগুলোর onset of fermentation process একটু delayed হয়ে থাকে। কারণ পানিতে ভেজানোর পর খাদ্যদ্রব্যের fleshy parts থেকে আস্তে আস্তে active ingredients পানিতে release হতে থাকে। যাহোক, এ বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস এখানে আলোচনায় আনবো, যেটি সহীহ মুসলিম ও আবূ দাঊদ শরীফে উদ্ধৃত রয়েছে এবং যা বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।

"সাহাবাগণ তাঁর জন্য কিছু খেজুর রাতে পানিতে ভিজিয়ে রাখতেন নাবীয তৈরি করার জন্যে। তিনি তা সেদিন, তার পরের দিন এবং তৃতীয় দিন বিকাল পর্যন্ত পান করতেন। অবশেষে তাঁর নির্দেশে কাউকে (খাদিমদের) পান করতে দেয়া হতো কিংবা ফেলে দেয়া হতো।" (সহীহ মুসলিম ও আবূ দাঊদ) [৪৫৩]

এ হাদীস থেকে আমরা 'খেজুরের fermentation হওয়ার সময়' সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। খেজুর পানিতে ভিজিয়ে রাখলে আনুমানিক ৩৬ ঘণ্টা পর fermentation ক্রিয়া শুরু হয়ে alcohol সৃষ্টি হয়। তাই তিনি ৩৬ ঘণ্টা পর সেই খেজুর নিংড়ানো পানি পান না করে ফেলে দিয়েছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে খাদিমদের পান করানোর অর্থ হলো নষ্ট হয়ে রাতে মাদকতা সৃষ্টি হওয়ার আগেই তারা তা পান করতো।

বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয়, ধরুন সাহাবাগণ রাত ১০টায় তাঁর জন্য খেজুর পানিতে ভিজাতেন। পরদিন সকাল ১০টায় অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা পর সেই নিংড়ানো পানি তিনি পান করতেন। তার পরের দিন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা পর সকালের কোনো এক সময়ে তিনি সেই নিংড়ানো পানি পান করতেন। অর্থাৎ ১২+২৪ = ৩৬ ঘণ্টা পর সে water extract আর তিনি পান করতেননা।

প্রশ্ন-১৫৭ : মুহতারাম, এতো গেল খেজুরের কথা। আঙুরের ব্যাপারে এ বিষয়ে হাদীস শরীফে কোনো বর্ণনা এসেছে কী?

উত্তর : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবীয তৈরির জন্য কিসমিস ও শুকনো খেজুর মেশাতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি এ উদ্দেশ্যে কাঁচা খেজুর ও পাকা খেজুরের সাথে মেশাতে নিষেধ করেছেন।" (সহীহ মুসলিম) [৪৫৪]

সবুজ ও গোলাপি আঙুর (Green and pink graves)

নাবীয এক প্রকার পানীয়, যা খেজুর বা আঙুর থেকে পানিতে ভিজিয়ে তৈরি করা হতো। তবে fermentation যেনো না হয়। It is a drink made by soaking grapes, raisins, dates etc. in water without their ingredients allowed to ferment.

অপরদিকে আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুরের সাথে আঙুর মিশাতে এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মেশাতে নিষেধ করেছেন।" (সহীহ মুসলিম) [৪৫৫]

অর্থাৎ তিনি এ দুই ধরনের খেজুর একত্রে মিশিয়ে কোনো কিছু তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

রক্তাভ ও বেগুনি আঙুর (Purple and violet grapes)

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে নাবীয তৈরির কথা উল্লেখ থাকলেও আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে নাবীয তৈরির কথা বলা হয়নি। সহীহ আল বুখারীতে যে উদ্ধৃতি আছে, তার বর্ণনা একটু আলাদা। এখানে উদ্ধৃত আছে যে, আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুরমা ও কাঁচা খেজুর এবং খুরমা ও কিসমিস একত্রে মিশিয়ে পানিতে ভেজাতে নিষেধ করেছেন। এর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে ভেজাতে বলেছেন।" (সহীহ আল বুখারী) [৪৫৬]

আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় জানা যায় যে "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা কাঁচা-পাকা খেজুর মিশিয়ে নাবীয তৈরি করবেনা এবং কাঁচা খেজুর ও কিসমিস দ্বারা নাবীয বানাবেনা। প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে নাবীয বানাবে।" (সহীহ মুসলিম) [৪৫৭]

এক সনদে জানা যায় যে বর্ণনাকারী আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতার সূত্রে "কাঁচা-পাকা খেজুর ও শুকনো খেজুর ও কিসমিসের কথা বলেছেন।" (সহীহ মুসলিম) [৪৫৮]

এ দুটো হাদীস থেকে বুঝতে পারা যায় যে একই নামীয় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যগত খাদ্য একত্রে মিশিয়ে কোনো কিছু তৈরি করতে তিনি নিষেধ করতেন। কারণ খেজুর পানিতে মিশানোর নির্দিষ্ট সময় পর fermentation শুরু হয়। দুই ধরনের খেজুরের onset of fermentation process আলাদা। সম্ভবত তাই তিনি তা নিষেধ করেছেন। তাছাড়া তিনি একই নামের দু'ধরনের খাদ্যদ্রব্য একত্রে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন খাসির গোশতের রোস্ট ও খাসির গোশতের তরকারি একই খাবারের বৈঠকে পরিবেশন করতে তিনি নিষেধ করেছেন। এখানে rate of digestion-এর ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

হাদীস দুটোর প্রথম অংশে তাজা আঙুরের সাথে তাজা খেজুর মেশাতে নিষেধ করেছেন। কারণ আঙুর অনেক নরম প্রকৃতির এবং এতে অনেক পানি রয়েছে। তাই এই দুটো খাদ্যদ্রব্যের fermentation-এর সময় আলাদা। তিনটি হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের fermentation time সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবহিত ছিলেন এবং সাহাবাগণ এ বিষয়টি তাঁর থেকে জেনেছেন।

সম্মানিত দর্শক-পাঠক! এটি একটি বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। It is a wonderful scientific discovery. আমার মনে হয় এটি যদি Galen বা Hippocrates অথবা অন্য কোনো পশ্চিমা বিজ্ঞানী

বলতেন, তাহলে পশ্চিমা বিশ্ব তা লুফে নিতো এবং হৈ চৈ শুরু করতো। কিন্তু যেহেতু এ উক্তি ইসলামের মহান নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, তাই তারা চোখ বুঁজে রয়েছেন।

এ ধরনের অসংখ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা scientific discovery আমি আমার লেখা "Medicine and Pharmacy in the Prophetic Traditions" নামক বইয়ে সন্নিবেশিত করেছি। বইটি বর্তমানে সউদি আরবে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। বইটি প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার। এতে ২৫টি অধ্যায় রয়েছে। এটি লিখতে আমার ৮ বছর সময় লেগেছে। আপনারা আমার জন্য দু'য়া করবেন যেনো আমার মৃত্যুর আগে বইটি প্রকাশিত হয়েছে, তা দেখে যেতে পারি।

যাহোক, আমি একটি হাদীস বর্ণনা করছি, যেটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। যেখানে আরো একটি scientific discovery-এর ইঙ্গিত মেলে। এ হাদীসটি এবং ব্যাখ্যা এর আগে কোনো এক পর্বে আলোচনা করেছিলাম। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আদম সন্তান তার পেটের চেয়ে খারাপভাবে আর কোনো পাত্রই পূর্ণ করেনা। মানুষের জন্য কোমর সোজা রাখার লক্ষ্যে কয়েক লোকমা বা সামান্য খাদ্যই যথেষ্ট। আর যদি একান্তই বেশি খাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যদ্রব্য আর এক-তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করবে। বাকি এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখতে হবে।" (মুসনাদে আহ্‌মাদে, আত-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও আন-নাসাঈতে হাদীসটি উদ্ধৃত রয়েছে) [৪৫৯]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় একটি সুন্দর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি, যা জানলে হাদীসটির শিক্ষণীয় দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার সময় পেটের $\frac{১}{৩}$ ভাগ খাদ্যদ্রব্য $\frac{১}{৩}$ অংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করতে বলেছেন। আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখতে বলেছেন শ্বাস-প্রশ্বাসের বা অক্সিজেনের জন্য। সত্যি কী সুন্দর শিক্ষা। এ শিক্ষাটিকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পুরোপুরি সমর্থন করে। এবার দেখি হাদীসটি বিজ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় কি না?

আমরা যারা শহরে থাকি তাদের প্রায় অনেকের বাসায় blender বা লিকুইডাইজার থাকে ফলমূল থেকে শরবত তৈরিতে আর পেঁয়াজ, রসুন ও আদা একত্রে মিশিয়ে আধা তরল মিশ্রণ তৈরি করার জন্য, যা তরকারিতে রান্নায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আপনি যদি blender-এ কানায় কানায় পেঁয়াজ, রসুন, আদা ইত্যাদি দিয়ে ভর্তি করেন এবং পানি না দেন, তাহলে কি blender-এর ব্লেড ঘুরবে বা blender কাজ করবে? কতোটুকু খালি রাখলে বা কতোটুকু পানি দিলে ভিতরের sharp bladeগুলো ঘুরবে, আর দ্রুতভাবে ঘুরে পেঁয়াজ-রসুনকে মিহি করে সামান্য পানির সাহায্যে মিশ্রিত করে একটি আধা তরল মিশ্রণ তৈরি করবে, তা নিশ্চয়ই আপনি blender-এর catalogue থেকে জেনে নিতে পারেন। তেমনি মানুষের পেটটি একটি blender বা reaction tank, যেখানে নানাবিধ খাবার, কঠিন ও তরল জাতীয় উপাদান একত্রে থাকে। হজমসহ অনেক ধরনের physiological process এখানে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পেট যদি শুধু খাবার দিয়ে পূর্ণ করেন আর পানি বা বাতাসের জন্য জায়গা না রাখেন, তখন হজম প্রক্রিয়া কি স্বাভাবিকভাবে চলবে? কখনোই চলবেনা। আমার বিশ্বাস, সকল জ্ঞানী ব্যক্তি আমার সাথে একমত হবেন।

প্রশ্ন-১৫৮ : আচ্ছা মুহতারাম, মদ বা অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় ছাড়া আর কী কী হারাম দ্রব্য বা ড্রাগ রয়েছে যা নেশা সৃষ্টি করে বা যাতে মানুষ আসক্ত হয়ে পড়ে এবং যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর? এ বিষয়ে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন আমাদের দর্শকবৃন্দের জন্য, বিশেষ করে যারা ওষুধ বা রোগ সম্পর্কে বেশি সচেতন অথবা যারা ডাক্তার অথবা যারা চিকিৎসাশাস্ত্র বা ফার্মেসি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করছেন তাদের জন্যে।

উত্তর : ধন্যবাদ, এটি একটি academic আলোচনা, যার যথেষ্ট সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। মদ বা alcoholic bevevage ছাড়া আর যে সকল দ্রব্য নেশা সৃষ্টি করে অথবা মানুষ যাতে আসক্ত হয়ে পড়ে তাদের মধ্যে, Heroin, Cocaine, Indian Hemp, Marijuana, Angel Dust (PCP), MDMA (estacy), China White, Amphetamine, MPTP, Caffeine-সহ আরো অনেক tranquillizers and anabolic steroids রয়েছে। খুব সংক্ষিতভাবে প্রত্যেকটির উপর আলোচনা করছি।

Indian Hemp : Indian Hemp *Cannabis sativa* plant থেকে উৎপাদিত হয়। তিনটি species আছে, যেগুলো থেকে Indian Hemp তৈরি করা হয়। *Cannabis indica* and *Canabis ruderalis* Indian species দু'টো থেকে গাঁজা তৈরি হয়।

Marijuana : এটি গাঁজার মতোই একটি addictive drug. এর active ingredient হচ্ছে Tehydrocannabiol (THC). এ drug টিও cannabis plant থেকে তৈরি হয়।

Cocaine: এই alkaloid *Erythroxylum coca* গাছ থেকে পাওয়া যায়। বর্তমানে এটিও একটি শক্তিশালী adictive drug হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ১৯০০ সালের দিকে প্রথমে এটি soft drinkএ মিশানো হতো। Cocaine এবং এটির saltগুলো মানুষকে অজ্ঞান করার কাজে ব্যবহার করা হতো অর্থাৎ as anaesthetics. তবে এর toxic এবং addictive গুণাগুণের জন্য এর ব্যবহার সীমিত হয়ে শুধু eye & ENT surgeryতে ব্যবহার হয়ে আসছে। এটি hallucination, convulsion এবং heart attack-এ ব্যবহৃত হয়।

Heroin : এটি মরফিন derivative. একটি শক্তিশালী addictive drug, powerful narcotic and it has intense withdrawal syndromes. Henbene ও heroin-এর মতোই একটি শক্তিশালী narcotic.

LSD-25 : এটি একটি powerful hallucinogenic drug. It causes phychotic reaction and mental breakdown. এটি একটি শক্তিশালী psychomimetic.

Yaba tablets : এবার ইয়াবা ট্যাবলেট সম্পর্কে বলি। বেশ কিছুদিন আগে পত্রপত্রিকায় ইয়াবা ট্যাবলেটের ব্যাপক অপব্যবহার নিয়ে প্রচারণা শুরু হয়েছিল। অনেক ধনীর দুলালী এর শিকার হয়েছিল। এটিও একটি addictive drug, যা CNSকে stimulate করে। It is a drug of abuse in the Asian communities in the United States. ইয়াবা ট্যাবলেটকে crazy medicine নামে অভিহিত করা হয়। It contains 25-30 mg methamphetamine and 45-60 mg caffeine.

ইয়াবার স্বাদ ও চেহারা candy-র মতো। তাই অনেক যুবক মনে করে যে এটি বেশ নিরাপদ। কিন্তু এটি যে মারাত্মক ও ভয়ংকর তা তারা বুঝতে পারেনা। ইয়াবা ট্যাবলেট reddish orange or greenish colour এর। এটা pencil eraser এর মতো দেখতে। ইয়াবা ট্যাবলেট সম্পর্কে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, যেসব যুবক এটি খায়নি তারা খাওয়ার জন্য অস্থির, আর যারা খেয়ে ফেলেছে বা খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তারা উদগীরণের জন্য উদগ্রীব। কিন্তু উদগীরণ করা কঠিন। এটি জীবনকে শেষ করে দেয়। এটিতে অভ্যস্ত মানুষ আর তখন স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেনা। যুবকের যৌবন আর বেশিদিন থাকেনা। তাই এসব ড্রাগ থেকে আমাদেরকে অনেক অনেক দূরে থাকতে হবে।

Morphine : এটি opium থেকে উৎপাদিত হয়ে থাকে। যা বেশ powerful analgesic agent. তীব্র ব্যথা দূর করার কাজে এর ব্যবহার অধিক। Pethidine ওষুধটি morphine-এর চাইতেও শক্তিশালী। অনেক ক্ষেত্রে এটি মরফিনের পরিবর্তে বেছে নেয়া হয়। কারণ এর duration of action কম। মহিলাদের delivery হওয়ার সময় এর ব্যবহার অনেক বেশি হয়ে থাকে।

আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, সকল নারকোটিক ড্রাগস্ই হারাম। তিনি এক রিওয়ায়াত পেশ করে বলেন, 'আদ্দাবী' নামক এক প্রকার নারকোটিক ড্রাগ রয়েছে, যা দেখতে barley seed-এর মতো এবং কালো রংয়ের। এটি হারাম। তিনি henbane-এর কথাও উল্লেখ করেছেন, যার আরবি নাম হচ্ছে 'আল্-বেন্জ'। এটি নেশা সৃষ্টি করে।

সম্মানিত দর্শক-পাঠক! আমি এতোক্ষণ যেসব ড্রাগ নিয়ে আলোচনা করলাম, এর বাইরেও অনেক ড্রাগ আবিষ্কার হয়েছে, যাদ্বারা অনেকেই নেশা করে থাকে এবং মানুষকে drug dependent করে তোলে। এবং ঐসব drugs cause bahavoural disorders. এর মধ্যে কিছু ড্রাগ হাই টেনশন দূর করতে ও ঘুম আনতে সাহায্য করে।

তবে যেহেতু ঐসব ড্রাগ মানুষকে drug addict করে ফেলে, তাই তা হারাম ও পরিত্যাজ্য। They are prohibitted. কারণ কোনো ডাক্তার ঐসব ড্রাগ ব্যবস্থাপত্রে লেখেননা। বাংলাদেশে narcotic drugs-এর আমদানি, উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ, সংরক্ষণ ইত্যাদি সবই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নতুবা দুষ্ট লোকেরা এসব pharmacologically potent ওষুধ গ্রহণ করে drug addict হয়ে যেতে পারে।

তাই আল্লামা আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহ আলাইহি ও অনেক বড় বড় হাদীসশাস্ত্রবিদের মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যেসব ড্রাগ addiction সৃষ্টি করে, তা সর্বসম্মতভাবে হারাম। এসব ড্রাগের শিকার হলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, depressed রোগী হয়ে যায়। তাই সম্মানিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো, সাধু সাবধান। আপনার আপনজনদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখুন ও নিয়ন্ত্রণে রাখুন। সারাদিন কোথায় যায়, কী করে, কাদের সাথে ঘোরাফেরা করে, কখন বাসায় ফেরে, বাসায় ফিরে কী করে ইত্যাদি খোঁজ নিন। নতুবা আপনার অজান্তেই তাদের উপর drug addiciton এর ন্যায় মরণ ছোবল আঘাত হানতে পারে।

অধ্যায়-১২

দু'য়া ও প্রার্থনার মাধ্যমে রোগ নিরাময়
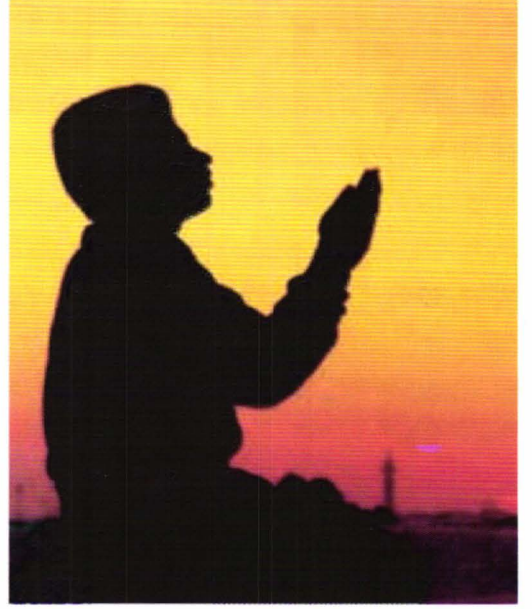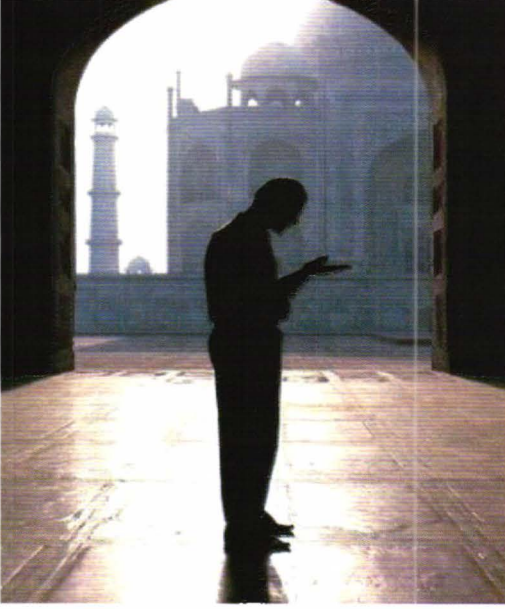
প্রশ্ন-১৫৯ : ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের কোনো অবকাশ আছে কি? ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতি কি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন করতেন? এ বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকলে তা আমাদের সম্মানিত দর্শক-শ্রোতাদের অবহিত করুন যেনো তারা উপকৃত হতে পারেন।

উত্তর : আপনাকে ধন্যবাদ। 'ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের অবকাশ আছে কি নেই'- এ প্রশ্ন দেখা দেবার কারণ হচ্ছে, বিপুলসংখ্যক সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুমাবার আগে, বিশেষ করে অসুস্থ অবস্থায় সূরা 'আল-ফালাক্ব' ও 'আন্-নাস' এবং কোনো কোনো হাদীস অনুযায়ী এ দুটি সূরার সাথে সূরা 'ইখলাস'ও তিনবার পড়ে নিজের দু'হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেখানে যেখানে তাঁর হাত পৌঁছতে পারে, ঐসব জায়গায় হাত বুলাতেন। এই দুটো সূরাকে একত্রে বলা হয় মুআব্বিযাতাইন (সূরা ফালাক ১১৩ ও সূরা নাস ১১৪)।

শেষবার রোগে আক্রান্ত হবার পর যখন তাঁর নিজের পক্ষে এমনটি করা সম্ভবপর ছিলোনা, তখন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই সূরাগুলো স্বেচ্ছাকৃতভাবে পড়তেন এবং তাঁর মুবারক হাতের বরকতের কথা চিন্তা করে তাঁর হাতে ফুঁক দিয়ে তাঁর শরীরে বুলাতেন। এ বিষয়বস্তু সংবলিত রিওয়ায়াতগুলো নির্ভুল সূত্রে সহীহ আল বুখারী, মুসলিম, আন-নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আবূ দাউদ ও মুআত্তা ইমাম

মালিকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আমি এখানে সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফের দুটো রিওয়ায়াত পেশ করছি। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

"নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অসুখে ইন্তেকাল করেন, তাতে সূরা 'ফালাক ও নাস' পড়ে নিজের দেহে ফুঁক দিতেন। তার রোগ-যাতনা অত্যধিক বেড়ে গেলে আমি তা পড়ে তাঁর উপর দম করতাম এবং বরকতের জন্য তাঁর হাতখানা তাঁর গায়ের উপর দিয়ে বুলিয়ে দিতাম। এ হাদীসের বর্ণনাকারী মা'মার বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে তিনি দম করতেন? তিনি বলেন, তিনি তাঁর দুই হাতের উপর দম করতেন, তারপর তা মুখমণ্ডলের উপর মুছে নিতেন।" (সহীহ আল বুখারী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ) [৪৬০]

সহীহ মুসলিম শরীফের উদ্ধৃত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন সুরাইজ ইবনে ইউনুস এবং ইয়াহইয়া ইবনে আইয়্যূব রহমাতুল্লাহ আলাইহি। তবে হাদীসের ভাষা একটু ভিন্ন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তিনি 'সূরা নাস' ও 'ফালাক্ব' পড়ে সে রোগীর দেহে ঝাড়-ফুঁক করতেন। অবশেষে তিনি যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলেন, তখন আমি তাঁকে ঐভাবে ফুঁক দিতে লাগলাম এবং তাঁরই পবিত্র হাতদ্বারা তাঁর দেহ মুছে দিতে শুরু করলাম। কেননা আমার হাতের তুলনায় তাঁর হাত ছিলো বহুগুণে বরকতপূর্ণ ও কল্যাণপ্রদ।" (সহীহ মুসলিম) [৪৬১]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে প্রার্থনা করতেন, "হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পাগলামী, কুষ্ঠরোগ ও শ্বেতরোগ এবং মন্দ ব্যাধি হতে।" (আন-নাসাঈ) [৪৬২]

প্রশ্ন-১৬০ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পারিবারিক জীবনে ঝাড়-ফুঁক এর বিষয়ে কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন?

উত্তর : বস্তুত রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার চেয়ে আর কারো বেশি জানার কথা নয়। এ বিষয়ে শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার জন্য কয়েকটি হাদীস এখানে বর্ণনায় আনবো। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি সুদীর্ঘ রিওয়ায়াত রয়েছে। রিওয়ায়াতটিতে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার এমন সৌভাগ্যশালী লোক রয়েছে, যারা কোনো প্রকার হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে (অর্থাৎ বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে), যারা না দাগ দেয়ার চিকিৎসা করে, না ঝাড়-ফুঁক করায়, আর না শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় করে (অর্থাৎ না ফালনামায় বিশ্বাস করে) এবং তারা স্বীয় প্রভু আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের উপর ভরসা রাখে।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৪৬৩]

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি দাগ দেয়ার চিকিৎসা করালো এবং ঝাড়-ফুঁক করালো, সে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গেলো (অর্থাৎ আল্লার উপর ভরসা ছেড়ে দিলো)।" (আত-তিরমিযী) [৪৬৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশটি জিনিস অপছন্দ করতেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ঝাড়-ফুঁক করা, তবে সূরা 'আল ফালাক্ব' ও সূরা 'আন্-নাস' অথবা এ দু'টি ও সূরা 'ইখলাসে'র মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে।" (আবূ দাউদ ও মুসতাদরাক) [৪৬৫]

সহীহ মুসলিমে আউফ ইবনে মালিক আশজাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে তিনি বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমরা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন, "তোমরা যে জিনিস দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করো তা আমার সামনে পেশ করো। তার মধ্যে যদি শিরক না থাকে, তাহলে তার সাহায্যে ঝাড়ায় কোনো ক্ষতি নেই।" (সহীহ মুসলিম) [৪৬৬]

সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহতে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়-ফুঁক নিষেধ করে দিয়েছিলেন। অতঃপর হযরত আমর ইবনে হাযমের বংশের লোকেরা এলো। তারা বললো, আমাদের কাছে কিছু আমল আছে যার সাহায্যে আমরা বিচ্ছু বা সাপে কামড়ানো রোগীকে ঝাড়তাম, কিন্তু আপনি তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তারপর তারা যা পড়তো তা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শোনালো। তিনি বললেন, এর মধ্যে তো আমি কোনো ক্ষতি দেখছি না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার কোনো ভাইয়ের উপকার করতে পারে, তাহলে তার অবশ্যই তা করা উচিত।" (সহীহ মুসলিম ও ইবনে মাজাহ) [৪৬৭]

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যা সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত আছে। তাতে বলা হয়েছে, "বনূ আমর পরিবারের লোকেরা সাপে কামড়ানো রোগীর নিরাময়ের একটি প্রক্রিয়া জানতো। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তা প্রয়োগ করার অনুমতি দেন।" (সহীহ মুসলিম ও ইবনে মাজাহ) [৪৬৮]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন যা উপরোক্ত কথাটি সমর্থন করে। এই রিওয়ায়াতটিও মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহতে উদ্ধৃত রয়েছে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের একটি পরিবারকে প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণীর কামড়ে ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন।" (সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহ্‌মাদ ও ইবনে মাজাহ) [৪৬৯]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও ঠিক একই ধরনের রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষাক্ত প্রাণীর কামড়, পিঁপড়ার দংশন ও বদ নযর থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন।" (সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহ্‌মাদ, আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [৪৭০]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসের ভাষাও একই। (সহীহ মুসলিম) [৪৭১]

ইমাম আহ্‌মাদ তাঁর মুসনাদে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "একদিন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমার কাছে শিফা নামের এক মহিলা বসেছিলেন। তিনি পিঁপড়া, মাছি প্রভৃতির দংশনে ঝাড়-ফুঁক করতেন।" নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হাফসাকেও এই আমল শিখিয়ে দাও।" (মুসনাদে আহ্‌মাদ) [৪৭২]

শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার ঝাড়-ফুঁক সংক্রান্ত একটি রিওয়ায়াত ইমাম আহমাদ, আবূ দাঊদ ও আন-নাসাঈ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি (শিফা) বলেন, একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসেন, যখন আমি হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, "তুমি হাফসাকে যেমন লেখাপড়া শিখিয়েছো, তেমনিভাবে ঝাড়-ফুঁকের আমলও শিখিয়ে দাও।" (মুসনাদে আহ্‌মাদ ও আবূ দাঊদ) [৪৭৩]

প্রশ্ন-১৬১ : কোনো কোনো হাদীস থেকে একথা জানা যায় যে প্রথমদিকে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়-ফুঁক করা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু পরে শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই শর্তগুলো সম্পর্কে বলবেন কী?

উত্তর : **ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে-**

১. এতে শিরকের কোনো আমেজ থাকতে পারবেনা।

২. আল্লাহর পবিত্র নাম বা তাঁর পবিত্র কালামের সাহায্যে ঝাড়-ফুঁক করতে হবে।

৩. কালাম অর্থাৎ যা পড়ে ঝাড়-ফুঁক করা হবে তা বোধগম্য হতে হবে এবং তার মধ্যে কোনো গুনাহের জিনিস নেই একথা জানা সম্ভব হতে হবে। কুফরী কালাম যেনো না থাকে।

৪. আর এই সঙ্গে ঝাড়-ফুঁকের উপর ভরসা করা যাবেনা এবং তাকে রোগ নিরাময়কারী মনে করা যাবেনা, বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে হবে এ মর্মে যে, আল্লাহ্ চাইলে এ ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমেই তিনি রোগ নিরাময় করবেন।

প্রশ্ন-১৬২ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ধরনের ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি প্রদান করেছেন। অনুগ্রহপূর্বক বিস্তারিত বলবেন কী?

উত্তর : **আত-তাবারানী 'আল-মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে' হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে,** "একবার নামায পড়ার সময় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচ্ছু কামড় দেয়। নামায শেষ করে তিনি বলেন, বিচ্ছুর উপর আল্লাহর লা'নত, সে না নামাযিকে রেহাই দেয়, না আর কাউকে। তারপর তিনি পানি ও লবণ আনান। যে জায়গায় বিচ্ছু কামড়িয়েছিল সেখানে লবণ মিশ্রিত পানি ডলতে থাকেন, আর 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল 'আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল 'আউযু বিরববিন নাস' পড়তে থাকেন।" (আল-মু'জামুল আওসাত, মু'জামুস সগীর ও মুসান্নাদে ইবনে আবি শায়বাহ) [৪৭৪]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বর্ণনাও হাদীস শরীফে এসেছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের ওপর এ দু'য়া পাঠ করতেন: "আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইত্বনিন ওয়াহাম্মাতিন ওয়ামিন কুল্লি আয়নিল লাম্মাতি।"

"আমি আল্লাহ্র বরকতপূর্ণ বাক্যসমূহ দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণনাশক ও বদনযরের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। **তিনি বলতেন,** আমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিস সালামকে এ দু'য়া পড়ে ঝাড়ফুঁক করতেন।" **(সহীহ আল বুখারী, মুসনাদে আহ্মাদ, আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)** [৪৭৫]

এভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর দুই পুত্র ইসহাক ও ইসমাঈলের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

হযরত উসমান ইবনে আবিল-আস আস-সাকাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সামান্য শব্দের হেরফের সহকারে মুসলিম, মুআত্তা, তাবারানী ও হাকীমে একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, "তিনি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করেন যে আমি যখন থেকে মুসলমান হয়েছি, তখন থেকেই একটি ব্যথা অনুভব করছি। এ ব্যথা আমাকে মেরে ফেলে দিয়েছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেখানে ব্যথা হচ্ছে, সেখানে তোমার ডানহাত রেখো। তারপর তিনবার বিসমিল্লাহ পড়ো এবং সাতবার এ দু'য়াটি পড়ে সেখানে হাত বুলাও।" "আউযু বিইয্যাতিল্লাহি ওয়াকুদরতিহি মিন শাররি মা'আজিদু ওয়া উহাযিরু।" "আমি আল্লাহ্ ও তাঁর কুদরাতের আশ্রয় চাচ্ছি সে জিনিসের অনিষ্ট হতে যাকে আমি অনুভব করছি এবং যার ভয়ে আমি ভীত।" **(সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ)** [৪৭৬]

তিরমিযী শরীফে হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে উসমান ইবনে আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

"রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তখন আমি ধ্বংসাত্মক ব্যথায় অস্থির ছিলাম। তিনি বলেন তোমার ডান হাত দিয়ে ব্যথার স্থানটি সাতবার মার্জন করো এবং বলো, আউযু বিইযযতিল্লাহি ওয়াকুওয়াতিহি মিন শাররি মাআজিদু।"

"আমি আল্লাহর ইজ্জত ও সম্মান, তাঁর কুদরত ও শক্তি এবং তাঁর রাজত্ব, সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বের কাছে আমার এই কষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।" রাবী বলেন, আমি তাই করলাম। "আল্লাহ আমার সকল ব্যথা দূর করে দিলেন। এরপর থেকে আমি আমার পরিবারের লোকদের ও অন্যান্যদেরকে এটি শেখাই।" **(মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও আত-তিরমিযী)** [৪৭৭]

মুসনাদে আহ্মাদ ও তাহাবী গ্রন্থে তালক ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বর্ণনা রয়েছে। তাতে তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতেই আমাকে বিচ্ছু কামড় দেয়। তিনি কিছু পড়ে আমাকে ফুঁক দেন এবং কামড়ানো জায়গায় হাত বুলান।" **(মুসনাদে আহ্মাদ)** [৪৭৮]

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনায় বলা হয়েছে, "একবার নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন, হ্যাঁ। তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলেন, আমি আল্লাহর নামে

আপনাকে ঝাড়ছি এমন প্রত্যেক জিনিস থেকে, যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেকটি নফ্স ও হিংসুকের হিংসা-দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ্ আপনাকে নিরাময় দান করুন। আমি তাঁর নামে আপনাকে ঝাড়ছি কিংবা ফুঁক দান করছি।" (সহীহ মুসলিম ও আত-তিরমিযী) [৪৭৯]

প্রায় একই ধরনের আরো একটি বর্ণনা মুসনাদে আহমাদে হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে গেলাম। তিনি এতো অসুস্থ ছিলেন যার প্রচণ্ডতা সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। অতঃপর আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন। আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনার কাছে সকালে এসেছিলাম। তখন আপনি এতো অসুস্থ ছিলেন, যার প্রচণ্ডতা সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন এবং আমি আপনার কাছে রাতে এলাম। আর আপনি সুস্থ হয়ে গেছেন। তখন তিনি বললেন, হে ইবনুস সামিত, জিবরঈল আলাইহিস সালাম আমাকে ঝাড় ফুক করায় আমি সুস্থ হয়েছি। আমি কি তোমাকে শেখাবো না? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, "বিসমিল্লাহি আরক্বীকা মিন কুল্লি শায়ঈন য়ুযীকা মিন হাসাদি কুল্লি হাসিদিন ওয়া আয়নিন বিসমিল্লাহি ইয়াশফীকা।" (মুসনাদে আহমাদ) [৪৮০]

সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহ্মাদে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকেও এমনই ধরনের রিওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রশ্ন-১৬৩ : অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভের জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো কোনো দু'য়া পাঠ করতে বলেছেন কী?

উত্তর : অসুস্থ ব্যক্তি বা তার আপনজনেরা আল্লাহ্র নিকট রোগ মুক্তির জন্য দু'য়া করতে পারে। আমি এখানে আরো তিনটি সহীহ হাদীস আলোচনা করবো, যেখানে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দু'য়াটি পাঠ করতে বলেছেন তা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর নিকট দু'য়ারত অবস্থায় দু'ভাইবোন

হযরত আব্দুল আযীয রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও সাবিত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলাম। অতঃপর সাবিত বললো, হে আবূ হামযা! আমি তো অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তখন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে সাবিত, "আমি কি তোমাকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দু'য়া দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করতেন তাদ্বারা ঝাড়-ফুঁক করবোনা? **হযরত সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই করবেন। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন এই দু'য়া পড়লেন,** "আল্লাহুম্মা রব্বান্নাস আযহিবিল বা'স, ইশফি আনতাশ শাফী, লা শাফিয়া ইল্লা আন্তা, শিফায়ান লা যুগাদিরু সাকামান।"

"হে আল্লাহ্! হে সকল মানুষের রব! কষ্ট দূর করুন। আরোগ্যদান করুন, আপনিই আরোগ্য দানকারী। আপনি ছাড়া আর কোনো আরোগ্য দানকারী (নিরাময় দানকারী) নেই। আপনি এমন আরোগ্য দান করুন, যারপর আর কোনো অসুখ থাকবেনা।" (সহীহ আল বুখারী) [৪৮১]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসটিও হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসকে সমর্থন করে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের কারো অসুখ হলে, তাকে ইয়াদাত করার সময় ডানহাত তার শরীরে ফেরাতেন এবং মুখে এ দু'য়া পাঠ করতেন, আমসিহিল বা'সা রব্বাননাস, বিইয়াদিকাশ শিফায়ূ, লা কাশিফা লাহু ইল্লা আংতা।"

"হে মানুষের মালিক! এ ব্যথাটি দূর করে দিন। আরোগ্য দান করুন। আরোগ্য দান তো একমাত্র আপনারই হাতে। আপনি ছাড়া আর কোনো আরোগ্য দানকারী নেই।" (সহীহ আল বুখারী) [৪৮২]

কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও দু'য়ার মাধ্যমে নিরাময়ের বিষয়ে অনেকে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত নিম্নের হাদীস থেকে যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। হাদীসটি সহীহ আল বুখারী, মুসলিম, আত-তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহতে উদ্ধৃত হয়েছে। সহীহ আল বুখারীতে উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনাও এটা সমর্থন করে। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে একটি অভিযানে পাঠান। তারা পথে একটি আরব গোত্রের পল্লীতে আসেন। ঐ গোত্রের লোকেরা তাঁদের কোনো মেহমানদারী করেনি। ঐ সময় উক্ত গোত্রের সরদারকে একটি বিষাক্ত প্রাণী কামড় দেয়। গোত্রের লোকেরা মুসাফির দলের কাছে এসে আবেদন জানায়, তোমাদের কোনো ওষুধ বা আমল জানা থাকলে আমাদের সরদারের চিকিৎসা করো। হযরত আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা জানি ঠিকই। কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করোনি। তাই যতোক্ষণ তোমরা আমাদের জন্য (এর বিনিময়ে) একটা কিছু নির্দিষ্ট না করবে, ততোক্ষণ আমরা এর কোনোটাই করবোনা। তখন তারা এর বিনিময়ে কয়েকটি বকরি দিতে রাজী হলো। তখন একজন সাহাবী সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিতে থাকেন এবং যে জায়গায় বিচ্ছু কামড়িয়েছে সেখানে নিজের মুখের লালা (থুথু) মলতে থাকেন। অবশেষে বিষের ক্রিয়া খতম হয়ে যায়। (সে ভালো হয়ে গেলে) গোত্রের লোকেরা কয়েকটি বকরি নিয়ে এলো। সাহাবীগণ বললেন, আমরা আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বকরিগুলো গ্রহণ করতে পারিনা। তারা এসে ঘটনাটি নবী সল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করলেন। তখন তিনি হেসে দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি করে জানলে যে সূরা ফাতিহা মন্ত্রের

মতো কাজ করে (অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁকের কাজে লাগে)? যাহোক তোমরা বকরিগুলো নিয়ে নাও এবং তাতে আমার জন্যও একভাগ রেখে দাও।" (সহীহ আল বুখারী) [৪৮৩]

সহীহ আল বুখারী শরীফের এ ঘটনা সম্পর্কিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে রিওয়ায়াত আছে, তাতে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যে বলা হয়েছে, "তোমরা অন্য কোনো আমল না করে আল্লাহ্‌র কিতাব পড়ে পারিশ্রমিক নিয়েছো, এটি তোমাদের জন্য সঠিক হয়েছে।" (সহীহ আল বুখারী) [৪৮৪]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি যদি কোনো রোগীকে দেখতে যায়, যার মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসেনি, সে তাকে সাতবার এই দু'য়া করলে তাকে রোগমুক্ত করা হবে।

"আস্‌আলুল্লহাল আযীম রব্বুল আরশিল আযীম আইঁ ইয়াশফিকা।"

"আমি মহান আরশের রব মহামহিম আল্লাহর কাছে দু'য়া করছি, তিনি তোমাকে রোগমুক্তি দান করুন।" (আত-তিরমিযী) [৪৮৫]

এবার দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা দূর করার কতিপয় দু'য়া বর্ণনা করছি, যা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন কোনো দুঃখ-বেদনা হতো বা কঠিন বিপদ আসতো তখন তিনি এ দু'য়াটি পড়তেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লহুল আলীমুল হালীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লহু রব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়া রব্বুল 'আরশিল 'আজীম।"

"মহান আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। আসমান-যমীনের প্রতিপালক ও মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই।"(সহীহ আল বুখারী) [৪৮৬]

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে যখন কোনো দুঃখ-কষ্ট আসতো তখন তিনি নিম্নোক্ত দু'য়া পড়তেন, "ইয়া হাইয়্যু, ইয়া ক্বাইয়্যুমু বিরহ্‌মাতিকা আস্‌তাগিছু।"

"হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আপনার রহমত দ্বারা দুঃখ ও চিন্তা থেকে পানাহ চাই।" (আত-তিরমিযী) [৪৮৭]

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে চিন্তা-ভাবনাযুক্ত ব্যক্তির জন্য এ দু'য়াটি পাঠ করতে বলতেন, "হে আল্লাহ্! আমি আপনার রহমত লাভের জন্য
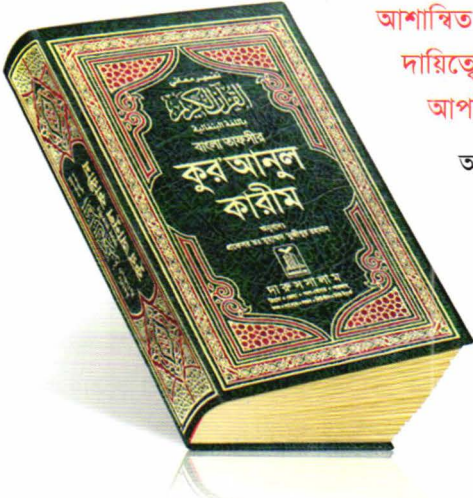
আশান্বিত। আপনি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দেবেন না। আমার অবস্থাকে সংশোধন করুন। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই।" (মুসনাদে আহ্মাদ) [৪৮৮]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি। কারণ গতরাতে একটি বিচ্ছু আমাকে দংশন করেছে। তিনি বললেন, তুমি সন্ধ্যায় যদি এ দু'য়াটি পাঠ করতে তাহলে তোমাকে কোনোরূপ কষ্ট পেতে হতোনা। দু'য়াটি হলো, 'আউযুবিকালিমাতিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক্ব।"

"আমি আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ কালাম দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি।" (সহীহ মুসলিম) [৪৮৯]

ইবনে মাজাহ শরীফে উদ্ধৃত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন খাওলা বিনতে হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ কোনো গন্তব্যে পৌঁছে যদি এ দু'য়া পড়ে : আউযু বিকালিমাতিত তাম্মাতি মিন শাররি মাখলাক্ব" (আমি আল্লাহর কল্যাণকর বাক্যবলির উসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি), তাহলে সে ঐ স্থান থেকে বিদায় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবেনা।" (ইবনে মাজাহ) [৪৯০]

সম্মানিত দর্শক-পাঠক ও শ্রোতামণ্ডলি! এসব দু'য়াই হচ্ছে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাড়-ফুঁকের নমুনা। এটিকে প্রচলিত ঝাড়-ফুঁকের নামে নামকরণ করা কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়। বস্তুত এটি কতগুলো ছোট বাক্যের সমষ্টি, যা তিনি মুখে পাঠ করতেন। আর অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্যের জন্য সকল রোগের আরোগ্যদানকারী আল্লাহর নিকট দু'য়া করতেন, এগুলোর মধ্যে কোনো শিরকী কথাবার্তা বা নিরর্থক কোনো কিছু নেই। পক্ষান্তরে জাদু'মন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে যেসব ধরনের খারাবি আছে, তাকে কখনো নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীকৃতি দেননি। আসল কথা হচ্ছে, আপনাকে মনে রাখেতেই হবে যে আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্য দানকারী, আর ডাক্তার ও ওষুধ আরোগ্য লাভের উপায় বা means of healing. অন্তরে এ বিশ্বাস রেখে শুধুমাত্র অসীলা হিসেবে শরীআত-সম্মত ঝাড়-ফুঁক করা যেতে পারে। এতে কোন রকম শিরক হবে না।

ঝাড়-ফুঁক এটা শুধু এ যুগে নতুন নয়, বরং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও ছিল। তিনি নিজেও ঝাড়-ফুঁক করেছেন। সাহাবাগণ থেকেও প্রমাণিত আছে। তবে কেউ যদি ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে এ বিশ্বাস বা ধারণা পোষণ করে যে, ঝাড়-ফুঁকের মধ্যে ক্ষমতা আছে, তা বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে পারে, তা না করলে বিরাট বিপদ হতে পারে। এ ধরনের বিশ্বাস বা ধারণা নিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা শিরক হবে। ইল্মহীন লোকেরা সাধারণত এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে ঝাড়-ফুঁক করে থাকে, এটাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা চাই এবং সহীহ আকীদা-বিশ্বাসের শিক্ষাকে ব্যাপক ছড়িয়ে দেয়া অতীব জরুরি।

অনুরূপভাবে কোনো ঝাড়-ফুঁক দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ না হলে এরূপ বলার বা ভাবার অবকাশ নেই যে কুরআন-হাদীস কি তাহলে সত্য নয়? যেহেতু ঝাড়-ফুঁকে কাজ হওয়াটা নিশ্চিত নয়, হতেও পারে নাও হতে পারে। যেমন, দু'য়া করা হলে রোগ-ব্যাধি আরোগ্য হওয়াটা নিশ্চিত নয়, আল্লাহর ইচ্ছা হলে আরোগ্য হয়, নতুবা হয় না। তদ্রূপ ঝাড়-ফুঁকও একটি দু'য়া। ঝাড়-ফুঁকে কাজ হলেও সেটা ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব ক্ষমতা নয়, বরং আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়।

সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব ঝাড়-ফুঁকই অভিজ্ঞতালব্ধ আমল। কুরআন-সুন্নাহয় যার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি যে অমুক ঝাড়-ফুঁক দ্বারা অমুক কাজ হবে। সুতরাং ঝাড়-ফুঁকে উপশম হলেও তার ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখা যাবে না যেমন, তেমনিভাবে ঝাড়-ফুঁকে কাজ না হলেও খারাপ অসমীচীন মন্তব্য করা যাবে না। তবে যারা শহরে ও গ্রামে বসে একমাত্র কোনো প্রকার বাছ-বিচার ছাড়াই ঝাড়-ফুঁকের কারবার চালায় এবং একে নিজেদের অর্থ উপার্জনের একমাত্র মাধ্যমে পরিণত করে, তাদের উপরোক্ত ঘটনাকে নযীর হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারেনা। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈ, তাবে-তাবিঈন ও প্রথম যুগের ইমামগণের মধ্যে এর নযীর পাওয়া যায়না।

প্রশ্ন-১৬৪ : ঝাড়-ফুঁক বা দু'য়া-দরূদ অসুস্থ ব্যক্তির দেহে কোনো প্রভাব ফেলে কি? অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁক বা দু'য়া উপকারী কি না এ সম্পর্কে medical science-এর আলোকে কিছু বলুন।

উত্তর : বস্তুবাদী দুনিয়ায় অনেক ডাক্তারও একথা স্বীকার করেন যে দু'য়া ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ মানসিক সংযোগ রোগীদের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে একটি কার্যকরা উপাদান। ডা. লারী ডসী একজন প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী, medical scientist. তিনি The Healing Words বা রোগ নিরাময়ের বাণীসমূহ নামে একটি বই লেখেন। বইটিতে বেশ কয়েকটি গবেষণার ফলাফল উল্লেখ করেছেন। এর একটি গবেষণার বিষয়বস্তু সম্মানিত দর্শক-পাঠক শ্রোতাদের উদ্দ্যেশ্যে পেশ করছি।

ডা. ব্রাইড নামে একজন গবেষক-ডাক্তার আমেরিকার সানফ্রানসিসকো হাসপাতালে ১৯৮৮ সালে ১০ মাসব্যাপী একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি হাসপাতালের ৩৯৩ জন জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীকে প্রথমে এ ও বি দুটি গ্রুপে ভাগ করেন। 'এ' গ্রুপের রোগীদের সবার নাম উল্লেখ করে তাদের আপনজন ও ডাক্তার দু'য়া করতে থাকেন রোগ মুক্তির জন্য। তারা এ দু'য়া করেন হাসপাতাল ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। 'বি' গ্রুপের রোগীদের কারো জন্য কোনো দু'য়া বা প্রার্থনা করা হয়নি।

গবেষণার ফলাফলে জানা যায়, যেসব রোগীর আরোগ্যের জন্য দু'য়া করা হয়েছিল, তারা অনেক আগে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করে। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে cardiac arrest বা heart failure-এর সংখ্যা অনেক কম ছিলো। তাদের মধ্যে ২.৫ গুণ কম heart failure-এর ঘটনা ঘটেছে এবং তাদেরকে ১/৫ ভাগ পরিমাণ কম এন্টিবায়োটিক ওষুধ সেবন করতে হয়েছে।

গবেষণায় বিজ্ঞানীরা আরও জানান, যাদের পতিপরায়ণা, নিষ্ঠাবতী, প্রেমময়ী সহধর্মিণী ছিলো, তারা অতি দ্রুত আরোগ্যলাভ করে হাসপাতাল ছেড়েছে। আর যেসব পুরুষ angina pectoris রোগে আক্রান্ত এবং যাদের loving and caring wife আছে, তাদের angina pectoris তাদের চেয়ে কম

হয়েছে, যারা অবিবাহিত এবং স্ত্রী পরিত্যক্তা।

এ ধরনের আরো একটি গবেষণার ফলাফল হার্ভার্ড কনফারেন্সে প্রকাশিত হয়। সেখানে ৪০৬ জন রোগীকে নির্বাচনের কথা জানানো হয়। তাদের অর্ধেকের রোগমুক্তির জন্য তাদের আপনজন তথা আত্মীয়-স্বজন তাদের প্রভুর নিকট দু'য়া করেন। বাকি অর্ধেকের জন্য কোনো দু'য়া বা প্রার্থনা করা হয়নি। গবেষণার ফলাফল মনিটরিংয়ের জন্য ১১টি parameters নির্ধারণ করা হয়। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, যেসব রোগীর জন্য দু'য়া করা হয়েছে, ১১টি parameters-এর ১০টিতেই "রোগীরা সুস্থ হয়েছে বলে" জানা যায়। আরো জানা যায় যে, যেকোনো ধরনের প্রার্থনাই কার্যকর।

প্রশ্ন-১৬৫ : ড. মুহতারাম, এ বিষয়ে আমাদের এই উপমহাদেশে আরো কোনো ঐতিহাসিক উদাহরণ আছে কি যে শুধুমাত্র দু'য়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক রোগমুক্তি প্রদান করেছেন?

উত্তর : এ বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও তাফ্হীমুল কুরআনের তাফসীরকারক মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ব্যক্তিগত জীবনের একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১৯৪৮ সালে তিনি যখন কারাগারে অন্তরীণ, তখন তার মূত্রনালিতে একটি পাথর সৃষ্টি হয়। ফলে ষোল ঘণ্টা পর্যন্ত তার প্রস্রাব আটকে থাকে। তিনি তখন আল্লাহর কাছে দু'য়া করেন, "আমি জালিমদের কাছে চিকিৎসার জন্য আবেদন করতে চাইনা। তুমিই আমার চিকিৎসা করো।" পরে প্রস্রাবের রাস্তা থেকে পাথরটি সরে যায় এবং পরবর্তী বিশ বছর যাবত তা সরে থাকে। তারপর ১৯৬৮ সালে সেটি আবার তাকে কষ্ট দিতে থাকে। তখন অপারেশন করে তা বের করে ফেলা হয়। আর একবার ১৯৫৩ সালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় তিনি দু'পায়ের গোছায় দাদে আক্রান্ত হয়ে ভীষণ কষ্ট পেতে থাকেন। কোনো রকম চিকিৎসায় তিনি আরাম পাচ্ছিলেন না। গ্রেফতার হওয়ার পর আল্লাহর কাছে ১৯৪৮ সালের মতোই আবারো সেই একই দু'য়া করেন। এরপর কোনো প্রকার চিকিৎসা ও ওষুধ ছাড়াই সব দাদ একেবারে নির্মূল হয়ে যায়। তারপর ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি আর এ রোগে আক্রান্ত হননি।

সম্মানিত দর্শক-পাঠক! ঠিক এ ধরনের আরেকটি ঐতিহাসিক উদাহরণ এখানে আমি পেশ করবো, যেখানে আল্লাহর নিকট শুধু একনিষ্ঠভাবে দু'য়া করার ফলে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হয়েছিল।

মুঘল সম্রাট বাবরের ছেলে হুমায়ূন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অনেক চিকিৎসার পরও তার আরোগ্য লাভের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না এবং তিনি মৃত্যুর দিন গুণছিলেন। অবশেষে বাবর আল্লাহর নিকট দু'হাত তুলে কায়মনোবাক্যে দু'য়া করেন, "হে আল্লাহ। আপনি আমার পুত্র হুমায়ুনকে আরোগ্য দান করুন, এমনকি আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও।" অর্থাৎ "বাবর প্রার্থনায় বলেছিলেন, আল্লাহ! আপনি আমার মৃত্যুদান করুন তথাপিও হুমায়ুনকে আরোগ্য দান করুন।" আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বাবরের প্রার্থনা কবুল করলেন। কিছুদিন পর বাবর অসুস্থ হয়ে ৪৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আর হুমায়ুন সুস্থ হয়ে ওঠে তাঁর পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এ ধরনের আরো অনেক উদাহরণ আলোচনায় আনা যেতে পারে, যেখানে ছেলেমেয়ের জন্য পিতা-মাতার দু'য়া অতি দ্রুত কবূল হয়েছে। তাই আমার অনুরোধ, কোনো অসুস্থ ব্যক্তি যদি সকল প্রকার

চিকিৎসার পরও তার রোগমুক্তির সম্ভাবনা না থাকে এবং বাঁচার আশা নেই বললেই চলে, তিনি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের prescription মোতাবেক চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন। আমার বিশ্বাস, তিনি আরোগ্যলাভ করবেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

"যে আমাকে ডাকে আমি তাঁর ডাক শুনি এবং জবাব দেই (অর্থাৎ যে আমার নিকট আবেদন করে আমি তাঁর আবেদন মঞ্জুর করি)।" (বাকারাহ ২:১৮৬)

অপরদিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যার জন্য প্রার্থনার দুয়ার খুলে দেয়া হয়েছে, তার জন্য অনুগ্রহের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।" (আত-তিরমিযী) [৪৯১]

In fact certain verses of the holy Qur'an have tremendous effects on healing.

প্রশ্ন-১৬৬ : মুহতারাম, এবার এতোক্ষণ যে আলোচনা করলেন তার মর্মার্থ বা সারাংশ সম্মানিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলুন।

উত্তর: সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা-পাঠক! এতোক্ষণ ঝাড়-ফুঁক ও দু'য়া-কালামের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্পর্কে যে আলোচনা করলাম তার উপসংহারে বলতে চাই যে বর্তমানে বিশ্বে ৫/৬ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে, আধুনিক এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক, হার্বাল, অলটারনেটিভ ও ট্রাডিশনাল বা কবিরাজি চিকিৎসা ব্যবস্থা। তবে এসব চিকিৎসা পদ্ধতির প্রত্যেকটির কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমরা জানি, কোনো একটি চিকিৎসা পদ্ধতিই সর্বপ্রকার রোগের আরোগ্য প্রদানের একচেটিয়া কৃতিত্বের দাবি করতে পারেনা। Accident জনিত এমন অনেক অসুস্থতা আছে যার জন্য আধুনিক surgical operation-এর বিকল্প নেই। আবার এমনও অনেক রোগ আছে যার জন্যে কোনো internal medicine মোটেই কার্যকর নয়। সেখানে physiotherapy এর প্রয়োজন। আবার depression জাতীয় অনেক অসুস্থতা আছে, যেখানে spiritual medicine ব্যবহার করতে হবে। আর এই spiritual medicine-ই হচ্ছে দু'য়া ও প্রার্থনার মাধ্যমে চিকিৎসা, ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা। এটি অনেক ক্ষেত্রে খুব দ্রুত ও কার্যকর।

তাই বর্তমানে integrated medical system-এর মাধ্যমে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা প্রদানের দাবি উঠছে অনেক মহল থেকে। একজন রোগী যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ ও রোগ থেকে আরোগ্যলাভ চান, তাকে সে পদ্ধতিতেই চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিত। আর এ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলেই আমাদের সমাজে সকল ধরনের অসুস্থতার নিরাময় লাভ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন-১৬৭ : তাবিয বা মাদুলির মাধ্যমে চিকিৎসা করার জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি অনুমতি দিয়েছেন? অর্থাৎ তিনি কি এটি সমর্থন করতেন?

উত্তর : হযরত হারাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং আরো কয়েকজন

মহিলার উদ্ধৃতি দিয়ে জানান যে তারা এ কাজ বা অভ্যাসটির বিরোধিতা করেননি। এখানে আমি কয়েকটি হাদীস আলোচনায় আনবো যা সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহ্‌মাদে উদ্ধৃত আছে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন স্ত্রী বলেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট গিয়ে তার নিকট (অদৃশ্য) বিষয়ের কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে, চল্লিশ রাত পর্যন্ত তার কোনো নামায কবূল হবেনা।" (সহীহ মুসলিম) [৪৯২]

সচরাচর ব্যবহৃত কতিপয় তাবিয ও মাদুলির ছবি

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "(অদৃশ্য থেকে শ্রুত) সুন্দর কথাবার্তা ও উত্তম নিদর্শনসমূহ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় ছিলো। তিনি কোনো কিছুকেই কুলক্ষণ মনে করা অপছন্দ করতেন।" (ইবনে মাজাহ) [৪৯৩]

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করা বা খারাপ শুভ-অশুভ কিছুর পূর্বলক্ষণ সূচক নিদর্শনে বিশ্বাস করা শিরকী কাজ।" (ইবনে মাজাহ) [৪৯৪]

গলায় ঝুলানোর উপযোগী মাদুলি

কাবীসা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে জেনে বর্ণনা করেন যে আমি নবী করীম সল্লাল্ল্যাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "জ্যোতিষদের মাটিতে দাগ কেটে যাত্রা শুভ-অশুভ নির্ধারণের কথায় বিশ্বাস করা ও ভালমন্দ নির্ণয়ের জন্য লটারীর ব্যবস্থা করা কুফরী কাজের অন্তর্ভুক্ত।" (আবূ দাউদ) [৪৯৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন, "পাখির দ্বারা শুভ-অশুভ নির্ণয় করা শির্‌ক।" (আবূ দাউদ) [৪৯৬]

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন কিছুতেই অমঙ্গল (শুভ-অশুভ) কিছু থাকলে তা রয়েছে অশ্বে, বাসগৃহে ও স্ত্রীলোকে (নারীতে)।" (সহীহ মুসলিম ও আবূ দাঊদ) ৪৯৭

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, যিনি তার হাতের কবজিতে bracelet (পিতলের বলয়) পরেছিলেন, 'এটি কী?' তিনি বললেন, 'এটি একটি তাবিয। এটি অবসন্নতাজনিত রোগের জন্য ধারণ করেছি।' তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "এটি খুলে ফেলো। অন্যথায় এটি তোমাকে দুর্বল করবে বা তোমার অবসন্নতা বৃদ্ধি পাবে।" (ইবনে মাজাহ) ৪৯৮

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমার স্বামী হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার শরীরে তাগার স্পর্শ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী? আমি উত্তরে বললাম, হুমরা রোগের তাবিয। এ কথাগুলো শুনে হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, "ইবনে মাসউদের গৃহিণী। তোমরা শিরকের মুখাপেক্ষী হয়োনা। কেননা আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ঝাড়-ফুঁক, পৈতা এবং জাদু-মন্ত্র শিরকের অন্তর্ভুক্ত।" (ইবনে মাজাহ) ৪৯৯

আবূ দাঊদ শরীফে উদ্ধৃত হাদীসের ভাষা কিছুটা ভিন্ন। ৫০০

হযরত যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা আরো বলেন, আমি আমার স্বামীকে বললাম, "আমার চোখে ব্যথা হলে আমি অমুক ইয়াহূদীর কাছে গিয়ে ঝাড়-ফুঁক করাতাম এবং তার মাধ্যমেই আমি সুস্থ হয়েছি। এ কথাগুলো শুনে হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "(শয়তানি আমল, যা ঐ ব্যক্তি) চোখের ব্যথা শয়তানের আঘাতের কারণে যা সে নিজের হাতে করতো। যখন মন্ত্র পড়া শুরু করতো তখন সে তোমাকে রেহাই দিতো, আর মন্ত্র পড়া বন্ধ করলে সে তোমার চোখে আঙ্গুলের খোঁচা মারতো। এ ক্ষেত্রে তুমি যদি তাই করতে যা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করেছিলেন, তবে তোমার জন্য উপকারী হতো ও আরোগ্য লাভেও অধিক সহায়ক হতো। তুমি নিম্মোক্ত দু'য়া পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে তা তোমার চোখে ছিটিয়ে দাও।

"আযহিবিল বা'সা রব্বান নাস, ইশফি আনতাশ্ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা, শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামান।"

"হে মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর করে দিন। হে রোগ আরোগ্য দানকারী! আরোগ্য দান করুন। আপনার আরোগ্য দান ছাড়া আরোগ্য লাভ করা যায়না। আপনি এমন শিফা দান করুন, যেনো এরপর আর কোনো রোগ বা কষ্ট না থাকে।" (ইবনে মাজাহ) ৫০১

আরব দেশে ঘাঁদা বাঁধা তাকে বলে যার মধ্যে বাঘের নখ ও অন্যান্য জিনিস দ্বারা তাবিয করে গলায় ঝুলানো হয়। আরবের লোকেরা বদনজর থেকে বাচ্চাদের হিফাজতের জন্য তাদের গলায় ঘাঁদা ঝুলাতো। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে শিরক বলেছেন। পৈতা হচ্ছে গিঁটযুক্ত মন্ত্রপূত সূতা বিশেষ।

উপরোক্ত হাদীসগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তাবিযকে

নিষেধ করেছেন তা হল শিরকী তাবিয, যা শয়তানের সাহায্য নিয়ে বা শয়তানি আমল দিয়ে বা মন্ত্র পড়ে তৈরি করা হতো। সুতরাং কোন তাবিয যদি কুরআনের আয়াত লিখে বা পড়ে বা আল্লাহ তা'য়ালার নাম বা সিফাতী নাম লিখে বা পড়ে বা ফুঁক দিয়ে তৈরি করা হয় এবং তা বাচ্চা কিংবা রোগীর শরীরে ঝুলিয়ে বা বেঁধে দেয়া হয় অথবা তা লিখে ভিজিয়ে তার পানি খাওয়ানো হয়, তাহলে তা বৈধ হবে। এটা অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী হতে প্রমাণিত আছে।

হযরত আমর ইবনে শুআইব রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি ঘুমের মধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে যদি বলে, "বিসমিল্লাহি আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গদাবিহি ওয়া সূয়ি ইক্বাবিহি ওয়ামিন শাররি ইবাদিহী ওয়ামিন শাররিশ শায়াত্বীনি ওয়া আইয়াহদুরূন" (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করি তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিস্ট থেকে, শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে এবং আমার কাছে যারা উপস্থিত হয় সেগুলো থেকে), তাহলে সেগুলো তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই দু'য়া তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে শিক্ষা দিতেন। উক্ত দু'য়া কাগজের টুকরায় লিখে শরীরে ঝুলিয়ে দিতেন। (আবূ দাউদ, আত-তিরমিযী, নাসাঈ ও আল-মুসান্নাফ আবূ বকর ইবনে আবী শায়বাহ) [৫০২]

হাদীসটি হাসান। হযরত আবূ ইসমাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবকে তাবিয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তদুত্তরে তিনি বলেছেন, কোনো অসুবিধা নেই, যদি তা চামড়ার ভেতরে থাকে। (আল-মুসান্নাফ আবূ বকর ইবনে আবী শায়বাহ) [৫০৩]

এক ঋতুবতি মহিলার সম্পর্কে, যার শরীরে তাবিয আছে হযরত আতা (তাবেয়ী)কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যদি তা চামড়ার মধ্যে থাকে তাহলে সে যেন তা খুলে রাখে আর যদি রূপার মাদুলীতে থাকে তাহলে সে চাইলে তা রাখতে পারে আর চাইলে খুলে রাখতে পারে। (আল-মুসান্নাফ আবূ বকর ইবনে আবী শায়বাহ) [৫০৪]

হযরত মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, তিনি মানুষদেরকে তাবিয লিখে দিতেন এবং তা তাদের শরীরে ঝুলিয়ে দিতেন। (আল-মুসান্নাফ আবূ বকর ইবনে আবী শায়বাহ) [৫০৫]

অনুরূপভাবে হযরত আবূ জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এবং দ্বাহ্হাক থেকেও বর্ণিত আছে যে, তাঁরা তাবিয লেখা, ঝুলিয়ে দেয়া বা বেঁধে দেয়া ইত্যাদিকে বৈধ মনে করতেন। ইমাম ইবনে তায়মিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বিপদ ও সমস্যাগ্রস্ত এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কুরআনে কারীমের আয়াত ও যিকিরকে বৈধ কালি দ্বারা লিখে দেয়া জায়েয আছে। তদ্রূপ তা ধৌত করে পান করানোও বৈধ। যেমন ইমাম আহ্মাদ ও অন্যরা স্পষ্ট করে বলেছেন। (ফাতাওয়ায়ে ইবনে তায়মিয়া, ১৯/৬৪)

উপরোক্ত হাদীসগুলোর দ্বারা প্রমাণ হয় যে যেসব তাবিযে শিরক নাই সে সব তাবিয বৈধ। তাছাড়া যে সব হাদীসে ব্যাপকভাবে তাবিয নিষেধ করা হয়েছে তা এজন্য যে আরবরা ধারণা পোষণ করত যে তাবিযের নিজস্ব ক্ষমতা ও কার্যকারিতা আছে। যেমন- আল্লামা শাওকানী 'নায়লুল আওতার' কিতাবে

(৮/১৭৭) লিখেছেন। সুতরাং আরবরা যে তাবিয ঝুলাতো বা ব্যবহার করতো তার সাথে কুরআনের আয়াতের বা তাসবীহাতের কোনো প্রকার সম্পর্ক ছিল না। তাই তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এসব হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত বা তাসবীহাত দ্বারা লিখিত তাবিযকে হারাম বা শির্ক বলা যাবেনা- যা বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাবিয বৈধ হওয়ার জন্য ৪টি শর্ত। যথা :

১. এতে শির্কের কোনো আমেজ থাকতে পারবেনা এবং কোনো ধরনের কুফরী কালাম বা শরীয়াহ্ বিরোধী কিছু থাকতে পারবেনা।

২. তাবিযে যা লেখা হবে তা বোধগম্য হতে হবে;

৩. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর সাহায্য নেয়া যাবে না;

৪. তাবিযকে নিজস্ব ক্ষমতা ও কার্যকারিতার অধিকারী বিশ্বাস ও ধারণা পোষণ করা যাবে না।

অতএব, যেসব তাবিযে উক্ত ৪টি শর্ত পূর্ণভাবে পাওয়া যাবে, সেসব তাবিয বৈধ হবে; অন্যথায় অবৈধ হবে।

প্রশ্ন-১৬৮ : মুহতারাম, তাবিয ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বসম্মত বা গ্রহণযোগ্য মতামত কী? আমাদের সম্মানিত দর্শকদের এ ব্যাপারে অবহিত করুন।

উত্তর : **শিরকী তাবিয এবং কুরআনের আয়াত বা তাসবীহাত ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা লিখিত তাবিয ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মতামত হচ্ছে, এটি পরিতাজ্য। এটি ব্যবহার করা বৈধ নয়। ইমাম আবূ দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সুনানে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূশরাহ (জিনের আছরের তাবিয) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,** "এটি শয়তানের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।" (আবূ দাঊদ) [৫০৬]

ইমাম আবূ দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'কিতাবুল মারাসিল বি ইশনাদিহী' গ্রন্থে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে আমি আল-হাসানকে জিজ্ঞেস করলাম, মন্ত্র ও তাবিয ব্যবহার সম্পর্কে। তিনি উত্তর দেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, "এগুলো শয়তানের কাজ।" (আস সুয়ূতী) [৫০৭]

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মন্ত্র, তাবিয ও তাওলা করা শির্ক।" (আবূ দাঊদ) [৫০৮]

তাওলা এক প্রকার যাদু, যা দিয়ে বেগানা মহিলা-পুরুষদের মধ্যে অবৈধ প্রেম সৃষ্টি করা যায়। নিঃসন্দেহে এটি হারাম কাজ। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "কুরআনের কোনো আয়াতের সাথে জাদু-মন্ত্র যোগ করলে তা শির্কে (polytheism) রূপান্তরিত হয়।" (আস্-সুয়ূতী) [৫০৯]

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা! এতোক্ষণ যে আলোচনা করা হলো তার ভিত্তিতে বলা যায়, যে সব তাবিয, তাগা ইত্যাদিতে কুরআনের আয়াত ও আল্লাহর নাম নেই, অথবা উভয়ের সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্য নামও সংযোজিত আছে, তা ব্যবহার করা জায়েয নয়। **তাই এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে শিশুদের কারো নামের**

তখতি, হাঁসুলি, বেড়ি পরান বৈধ নয়। কারণ এর ব্যবহারকারী ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে থাকে যে এ দ্রব্যসমূহের কারণে শিশু বদনজর থেকে হিফাজতে থাকবে- এটিই শিরক। এভাবেই মানুষের নিয়ত তখতি ও বেড়ির ব্যাপারেও হয়। আর এ কারণে এটিও শির্কের মধ্যে গণ্য। তবে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-১৬৯ : মুহতারাম, আমরা জানি সূরা ফাতিহা কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা এবং এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাই এ সূরা তিলাওয়াতের মাধ্যমে রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাময় পাওয়া যায় কি না এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে কোনো বর্ণনা এসেছে কি?

উত্তর : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় হযরত আবূ সাঈদ ইবনে মু'আল্লা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "সূরা ফাতিহা কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন সূরা।" (সহীহ আল বুখারী) [৫১০]

এই সূরাকে 'উম্মুল কুরআন' বা 'কুরআনের মা' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। রোগ নিরাময়ে এ সূরার গুরুত্ব অনেক বেশি। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাত দিয়ে বলেন, "সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের ফলে বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে আক্রান্ত রোগীও আরোগ্য লাভ করে।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৫১১]

পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতিহা পৃষ্ঠার ছবি

অন্যত্র নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সূরা ফাতিহা সকল রোগ নিরাময়ের উৎস।" (শু'য়াবুল ঈমান) [৫১২]

অর্থাৎ এ সূরা প্রত্যেক রোগের জন্য শিফা। It is the source of all healings.

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সূরা ফাতিহা বিষের ওষুধ, medicine for poison." (শু'য়াবুল ঈমান) [৫১৩]

যা হোক, বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের দংশনে, সাপের কামড়ে ও শিকলে বাঁধা পাগলের চিকিৎসায় সূরা ফাতিহা ব্যবহারের বর্ণনা হাদীস শরীফে এসেছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী, কোনো ব্যক্তিকে বিচ্ছু কামড় দিলে সূরা ফাতিহা পাঠ করে তার চিকিৎসা করেছিলেন। এর ফলে সেই ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে এবং এজন্য সে উক্ত সাহাবীকে কতগুলো বকরি পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করে।" (সহীহ আল বুখারী) [৫১৪]

আল আস্ওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ (সাপ বা বিচ্ছুর) দংশনের ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোনো বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের দংশনে 'রুকাইয়া' ব্যবহার বা ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।" (সহীহ আল বুখারী) [৫১৫]

বস্তুত সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত অন্যতম রুকাইয়া। কুরআনের আয়াত দ্বারা ঝাড় ফুঁক করা জায়েয। কিন্তু শির্কজনিত মন্ত্রপূত করা সম্পূর্ণ হারাম। এ দুটো রিওয়ায়াত ছাড়া আরো কয়েকটি বর্ণনা হাদীস শরীফে এসেছে যে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের দংশনে ও সাপের কামড়ের চিকিৎসা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১৭০ : একটু আগেই বললেন যে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে পাগলের চিকিৎসা করা যায়। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে আর কী কী বর্ণনা এসেছে?

উত্তর : **হযরত খারিজা ইবনুস্ সালত তামিমী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,** "আমরা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তা চলতে শুরু করলাম এবং পথিমধ্যে এক আরব গোত্রের নিকট পৌছালাম। তারা বলল, আমরা সংবাদ পেয়েছি আপনারা এই ব্যক্তি তথা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। আপনারা কি কোনো ওষুধ বা আমলবিশেষ এনেছেন? কারণ আমাদের নিকট শিকলে বাঁধা একজন উন্মাদ বা পাগল রয়েছে। আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তারা সেই শিকলে বাঁধা পাগলটিকে সামনে এনে হাজির করলো। তিনি বলেন, আমি সূরা ফাতিহা তার উপর পর পর তিনদিন সকাল ও সন্ধ্যায় পাঠ করলাম। আমি যখনই সূরা ফাতিহা পাঠ করা শেষ করতাম, তখন জিহ্বা থেকে লালা (থুথু) নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করতাম। আর তখনই মনে হচ্ছিল যে সে যেনো কোনো বন্ধন, পিঞ্জর, গোলামি বা শিকল থেকে মুক্তি পাচ্ছিল। তিনি আরো বলেন, তারা আমার জন্য কিছু পারিশ্রমিক নিয়ে এলো। কিন্তু আমি বললাম, না, যে পর্যন্ত না আমি ঘটনাটি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করি এবং তাঁর দিক-নির্দেশনা পাই। তারপর আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এলাম এবং পুরো বিষয়টি খুলে বললাম। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পারিশ্রমিক হিসেবে যে বকরি দিয়েছে তা নাও।" (মুসনাদে আহমাদ ও আবূ দাঊদ) [৫১৬]

অন্য এক হাদীস বর্ণনাকারী হযরত মুসাদ্দাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ প্রসঙ্গে বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি এছাড়া আর কিছু পড়েছিলে কি না?' অর্থাৎ তুমি সূরা ফাতিহার সাথে আরো কিছু পাঠ করেছ কি? জবাবে আমি বললাম, না। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "উক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করো। কারণ, যাঁর হাতে আমার জীবন! অনেকে আজেবাজে মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিয়ে পারিশ্রমিক আদায় করে থাকে, অথচ তুমি সঠিক পদ্ধতিতে ঝাড়-ফুঁক দিয়ে পারিশ্রমিক নিয়েছো।" (আবূ দাঊদ) [৫১৭]

আবূ লায়লা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে থাকা অবস্থায় এক বেদুঈন তাঁর নিকট এসে বললো, আমার এক অসুস্থ ভাই আছে। তিনি বলেন, তোমার ভাই কি রোগে আক্রান্ত? সে বললো, (কোন কিছুর) কুপ্রভাব (আছর)। তিনি বলেন, তুমি যাও এবং তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আবূ লায়লা (রা) বলেন, সে গিয়ে তার ভাইকে নিয়ে আসলে তিনি তাকে নিজের সামনে বসান। আমি শুনতে পেলাম, তিনি সূরা ফাতিহা (১), সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত (২:১-৪), মধ্যখানের দুই আয়াত (২:১৬৩-১৬৪), আয়াতুল কুরসী (২:২৫৫) ও বাকারার শেষ তিন আয়াত (২:২৮৪-৬) এবং আলে ইমরানের একটি আয়াত, আমার মনে হয় তিনি ১৮ নং আয়াত (৩:১৮) পড়েছিলেন এবং সূরা আ'রাফের এক আয়াত (৭:৫৪), সূরা মুমিনূনের এক আয়াত (২৩:১১৭), সূরা জিনের এক আয়াত (৭২:৩), সূরা সফ্ফাতের প্রথম দশ আয়াত (৩৭:১-১০), সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত (৫৯:২২-২৪), সূরা ইখলাস্ (১১২) এবং সূরা ফালাক্ব (১১৩) ও সূরা নাস (১১৪) পড়ে তাকে ফুঁ দিলেন। তাতে বেদুঈন এমনভাবে সুস্থ হয়ে দাঁড়ালো যে, তার কোনো রোগই অবশিষ্ট ছিল না।" (ইবনে মাজাহ) [৫১৮]

প্রশ্ন-১৭১ : সূরা ফাতিহার মাধ্যমে রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তা তিলাওয়াতের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম আছে কি?

উত্তর: **বস্তুত সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবীগণ বর্ণনা করেননি যে কতবার, কীভাবে, কোন নিয়মে, কখন তা পাঠ করতে হবে। আপনি যতো বেশি বেশি তা পাঠ করবেন ততোই মঙ্গল। ততোই আল্লাহ পাক আপনাকে সাহায্য করবেন বা আল্লাহ্ পাকের সাহায্য পাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। তবে কোনো হাক্কানী আলেম ডেকে পারিশ্রমিক দিয়ে পাঠ করানোর চেয়ে নিজে বা পরিবার-পরিজনের দ্বারা পাঠ করে দু'য়া করাই উত্তম। আর যদি নিজে সহীহভাবে পড়তে অক্ষম হন তাহলে কোনো আলেমে দীন দ্বারা পাঠ করানো যাবে।**

আমি সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা ভাই-বোনদের উদ্দেশে বলছি, আপনাদের কারো পরিবারে যদি দুর্ভাগ্য-ক্রমে কোনো শিকলে বাঁধা পাগল থাকে, যার জন্য বহু চিকিৎসা করে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা সবাই বেশি বেশি করে 'বিস্মিল্লাহ' সহকারে সূরা ফাতিহা পাঠ করে তার গায়ে ফুঁক দিন এবং আল্লাহর সাহায্য চান। ইনশা'আল্লাহ সে পাগল ভালো হয়ে যাবে। বাস্তবিকপক্ষে এই সূরা অত্যন্ত কার্যকরী ওষুধ যা উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়। আর এ চিকিৎসায় তেমন কোনো টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়না।

প্রশ্ন-১৭২ : 'সূরা ফাতিহার মাধ্যমে রোগমুক্তি' এ বিষয়ে আরো কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা তথা উদাহরণ আছে কি? থাকলে অনুগ্রহপূর্বক দর্শক-শ্রোতাদের অবহিত করুন।

উত্তর : **বস্তুত 'কুরআনের মা' হিসেবে সূরা ফাতিহার বরকতে আল্লাহ পাক দীন ও দুনিয়ার অনেক প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। অর্থ বুঝে নিয়মিত সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতে ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট ও অন্যান্য অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আল্লাহর কালামের ফযীলতের জন্যই এটি সম্ভব।**

"ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন।" অর্থাৎ 'আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য চাই," **এই শব্দ ক'টি খুবই কার্যকরী দু'য়া, যা মানুষের রোগমুক্তির জন্য উৎকৃষ্ট ওষুধ। এটি পাঠ করে রোগীর উপর দম করলে আল্লাহর ফযলে রোগী আরোগ্য হয়ে থাকে।**

বিশ্ববিখ্যাত হাদীসশাস্ত্রবিদ আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, "আমি যখন মক্কায় ছিলাম, তখন একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। সে সময় কোনো ওষুধ আমার নাগালে ছিলোনা। তখন আমি সূরা ফাতিহার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করি। যমযমের পানিতে সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে সেই পানি পান করতাম এবং এর ফলে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠি। এরপর থেকে যখনই আমি ব্যথা-বেদনা অনুভব করতাম তখনই আমি সূরা ফাতিহার আশ্রয় নিই। এভাবে রোগমুক্তিতে সূরা ফাতিহা আমাকে সর্বদা সাহায্য করে আসছে।" (ইবনুল কাইয়িম) [৫১৯]

প্রশ্ন-১৭৩ : মুহতারাম, এছাড়া সূরা ফাতিহা দ্বারা আরো কোনো সুনির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসা করা যায় কী?

উত্তর : **সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের মাধ্যমে স্মরণশক্তি লোপ পাওয়ার চিকিৎসা করা যায়। হযরত মা'মার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,** "আমি আমার স্মরণশক্তি এতোই হারিয়ে ফেলেছিলাম যে, আমাকে অনেকেই সূরা ফাতিহা নিয়মিত পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।" (আবূ দাঊদ) [৫২০]

এখানে 'অনেকেই' বলতে অন্যান্য সাহাবীদের বোঝানো হয়েছে। আর সাহাবীগণ যেহেতু সর্বদা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলেন, তাই এ prescription-টি পরোক্ষভাবে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত।

অধ্যায়-১৩

মধুর মাধ্যমে রোগ নিরাময়

প্রশ্ন-১৭৪ : আমরা সর্বদাই মধুর কথা শুনে থাকি যে মধু একটি মহৌষধ এবং এতে অনেক উপাদান রয়েছে, যা মানবদেহের জন্যে অতীব জরুরি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে কী কী বর্ণনা এসেছে? অনুগ্রহপূর্বক রেফারেন্স সহকারে বলুন।

উত্তর : মধুর আরবি নাম 'আসাল', ইউনানি নাম 'শাহদ'। কুরআনে আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা সূরা আন-নাহলে ইরশাদ করেন,

﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ﴾

"মৌমাছির উদর থেকে একটি বিবিধ রংয়ের পানীয় বা শরবত বের হয়, যার মধ্যে মানুষের জন্য রয়েছে নিরাময় বা শিফা।" (আন-নাহল ১৬:৬৯)

ফুল থেকে মধু আহরণরত মৌমাছি (Honey-bees collecting nectar from flowers)

মৌমাছির বাসা (Honey-bee nests)

বস্তুত কুরআনের এ বাণীই প্রমাণ করে যে মধু কতো উপকারী ও কতো প্রয়োজনীয়, যার উপর ভিত্তি করে বিশ্বের সর্বত্র প্রচুর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। সূরা আন-নাহলের ৬৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾

"আর দেখো, তোমার রব মৌমাছিদেরকে একথা অহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন, তোমরা পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও মাচার ওপর ছড়ানো লতাগুল্মে নিজেদের চাক নির্মাণ করো।" (আন-নাহল ১৬:৬৮)

সূরা মুহাম্মদে আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা মধুর নহর সম্পর্কে বলেন,

﴿وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى﴾

"ওয়া 'আনহারুম মিন আসালিম্ মুসাফ্ফা।"

"বেহেশতে মধুর স্বচ্ছ (পরিশোধিত) নহর প্রবাহিত হবে।" (মুহাম্মদ ৪৭:১৫)

মধু সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে যে হাদীসটি সামনে আনতে হয়, তা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, যা ইবনে মাজাহ শরীফে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের জন্যে অবশ্যই দুটো ওষুধ রয়েছে, একটি হচ্ছে কুরআন আর অপরটি মধু।" (ইবনে মাজাহ) [৫২১]

অর্থাৎ মধু ও কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত। You have, indeed two medicines, honey and the Qur'an.

বিশুদ্ধ মধু (Pure honey)

অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের ভেতর মধু, আর আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন, The Last Testament. কারণ প্রথমটি অর্থাৎ মধু মানুষের স্বাস্থ্যের ও দৈহিক রোগ-ব্যাধির নিরাময়ে এক অব্যর্থ মহৌষধ। আর দ্বিতীয়টি দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার গ্যারান্টি। এ হাদীসটি ইবনে মাজাহ ছাড়াও জামে' সগীর ও মিশকাত শরীফে উদ্ধৃত আছে।

মধু দ্বারা চিকিৎসা সম্পর্কে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস রয়েছে। প্রথমটি বর্ণনা করেন হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের চিকিৎসাগুলোর মধ্যে উত্তম (কল্যাণকর) চিকিৎসা হচ্ছে শিঙ্গা লাগানো, মধুপান কিংবা আগুন দ্বারা দাগ দেয়ার মধ্যে। তবে আগুন দ্বারা দাগ দেয়া আমি পছন্দ করিনা।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৫২২]

দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। আল্লাহ্র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তিনটি জিনিসে রোগ নিরাময় রয়েছে। মধু সেবন, শিঙ্গা লাগানো বা রক্তমোক্ষণ এবং গরম লোহা দ্বারা দাগ দিয়ে চিকিৎসা। তবে আমি আমার উম্মাহর জন্য এই দাগ দিয়ে চিকিৎসা করার পদ্ধতি প্রয়োগ করতে নিষেধ করছি।" (সহীহ্ আল বুখারী) [৫২৩]

তৃতীয় হাদীসটি উদ্ধৃত আছে ইবনে মাজাহ শরীফে যা হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। সেখানে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন সকাল বেলা মধু চেটে চেটে সেবন করবে, তার কোনো কঠিন রোগ হবেনা (সে মারাত্মক কোনো রোগে আক্রান্ত হবেনা)।" (ইবনে মাজাহ ও মু'জামুল আওসাত) [৫২৪]

চতুর্থ হাদীসটি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি ও মধু খেতে পছন্দ করতেন।" (সহীহ্ আল বুখারী) [৫২৫]

"তিনি নিয়মিতভাবে খাবার হিসেবে শুকনো আঙুর (কিসমিস) পানিতে ভিজিয়ে রেখে তার নির্যাস ও শুকনো খেজুর খেতেন।" (আস-সুয়ূতী) [৫২৬]

এ সুন্দর অভ্যাসটি স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো একটি নিয়মিত অভ্যাস ছিলো এই যে, "তিনি প্রত্যহ সকালবেলা খালি পেটে এক কাপ মধু ও পানি পান করতেন।" (আস-সুয়ূতী) [৫২৭]

প্রশ্ন-১৭৫ : মধুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রাচীনকালে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

উত্তর : **মধু পৃথিবীর সবেচেয়ে কার্যকর এবং ছোট্ট কারখানায় উৎপাদিত একটি খাদ্যদ্রব্য, যে কারখানায় একজন মানুষ শ্রমিকও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। আর এই কারখানার নাম হচ্ছে মৌমাছির বাসা। মৌমাছি নামক অতীব ছোট্ট একটি প্রাণী বা পতঙ্গ আল্লাহ্র ইচ্ছায় মধু উৎপন্ন করে থাকে।**

প্রাচীন ও আধুনিককালের সকল চিকিৎসাশাস্ত্রেই মধুর উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীনকালে গ্রিক ও মিসরীয়গণ মধু দ্বারা মৃত ব্যক্তির দেহকে যুগযুগ ধরে সংরক্ষিত করতো (embalming) এবং মধুকে preservative হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সম্প্রতি এক গবেষণায় জানা যায় যে মধু ২২ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হলেও এর গুণাগুণের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যেতোনা। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগে এক মিসরীয় রাণীর কবরের ভেতর এক জার মধু পাওয়া যায়, যার তেমন কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেনি।

ওষুধশাস্ত্রের জনক হিসেবে পরিচিত Hippocrates প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে তার রোগীর চিকিৎসায় মধু ব্যবহার করতেন এবং তিনি নিজেও মধু সেবন করতেন। অ্যারিস্টটলও "নিয়মিত মধু সেবনে স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দীর্ঘায়ু লাভ হয়" **বলে বিশেষ ধারণা পোষণ করতেন। আমাদের এই উপমহাদেশেও আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি মেডিসিনে বেশ কয়েক হাজার বছর যাবত মধু ব্যবহৃত হয়ে আসছে।**

প্রশ্ন-১৭৬ : মধুর ভেতর কী কী রাসায়নিক উপাদান রয়েছে, যা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে? অর্থাৎ গবেষণাগারের গবেষণার ফলাফল কী?

উত্তর : **গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায় যে মধুতে ২৮টি** minerals, **২২টি** amino acids, **১১টি** carbohydrates, **১৪টি** fatty acids, **১১টি** enzymes এবং vitamins এ, বি, সি সহ মোট **১১টি ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ রয়েছে। মধুর ক্যালরিক** value 319. মধুতে যে চিনি আছে তা শুধু sucrose নয়, এগুলো হচ্ছে glucose, fructose, arabinose, saccharose, galactose, dextrin, maltose, xylose ইত্যাদি বহু উপাদান।

প্রশ্ন-১৭৭ : মধুর মাধ্যমে কী কী রোগের চিকিৎসা করা যায়? অর্থাৎ কোন্ কোন্ রোগে মধু ব্যবহার করা যায়?

উত্তর : **বিখ্যাত রোমান চিকিৎসক গ্যালেন (হাকীম জালিনুস) মধুকে সকল রোগের সর্বপ্রকার মেডিসিন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মধুকে** "খাদ্যসমূহের খাদ্য, পানীয়সমূহের পানীয় এবং ওষুধসমূহের ওষুধ" **হিসেবে উল্লেখ করেছেন।** He says, "honey is the food of the foods, drink of the drinks and medicine of the medicines." **তাই মধুকে খাদ্য ও পানীয় উভয় বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। হাফিয ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন,** "খাদ্য হিসেবে, ওষুধ হিসেবে, ওষুধের সংরক্ষণে এবং পাকস্থলির শক্তিবৃদ্ধিতে মধুর চেয়ে উপকারী আর কিছু নেই।"

সম্প্রতি উন্নত বিশ্বে মধু ও দারুচিনির সমন্বয়ে বেশ ক'টি বিশেষ রেসিপি অনুযায়ী ২৫টি জটিল রোগের চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ রোগগুলো হচ্ছে ব্যথা, গিটব্যথা, চুলপড়া, শরীরের ওজন কমে যাওয়া, দাঁতব্যথা, ঠান্ডা লাগা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পেটের পীড়া, রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য, হজমহীনতা, মুখের ব্রন, মুখের দুর্গন্ধ, শারীরিক দুর্বলতা, ক্যান্সার, অকালে চুল পাকা ইত্যাদি।

Modern science আমাদের বলে যে honey is one of the finest sources of heat energy due to the presence of glucose, fructose and saccharose. It enters directly into the blood stream because of its dextrin content. This provides almost instant energy. আর এ জন্যই sportsmen-এর জন্য sport activity-এর আগে ও পরে মধু খেতে সুপারিশ করা হয়। শুধু তা-ই নয়, honey supports the production of new blood and it helps in the purification of blood. Blood circulation is regulated and nourished with honey. It has positive effect on the capillary problem.

ডায়রিয়া রোগীর best medicine হচ্ছে মধু, যা স্যালাইনের মতোই কার্যকর। Honey is the friend of the stomach. It does not result in acidosis or alcohol fermentation. The free radicals in honey make it easier for the fats to the digested. It also covers up the absence of iron in breast milk and cow milk. It increases intestinal action and appetite.

বিখ্যাত রোমান চিকিৎসক গ্যালেন মধুকে সকল রোগের নিরাময়ের জন্য all purpose medicine

হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বর্তমানে acidity, gastric and duodenal ulcer, asthenia, anorexia and malnutrition বা পুষ্টিহীনতার চিকিৎসায় মধু ব্যবহৃত হচ্ছে। মধুর মধ্যে antibacterial activity আছে, যার ফলে এটি ENT infections, বিশেষ করে laryngitis, intestinal kidney diseases-এ ব্যবহার করে বেশ সুফল পাওয়া গেছে বলে জানা যায়।

Honey is bactericidal. That is, it kills bacteria. This bactericidal property of honey is known as inhibition effects. আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, honey is beneficial for the treatment of pulmonary diseases, skin diseases, irritating cough, insomnia, oral diseases, eye diseases, diseases of the stomach, old age complications and sexual debility.

Honey is spermatogenic and sexual stimulant. Many Asian's regard it as an aphrodisiac. That is, medicines that stimulate the sexual activity. They also believe that it possesses a magical substance which influences the fertility of women and virility of men. For anemic, dyspeptic, convulascent and the aged, honey is excellent remedy and tonic. Its laxative properties are well-known. Its fatty acids content stimulates the peristalsis.

জনৈক মিসরীয় বিজ্ঞানী Dr. El' Awady তার গবেষণার ফলাফলে বলেন যে due to its dynamogenic and stimulant action on the heart, honey increases stamina and fervour body's power of recuperation and prolonged activity.

প্রশ্ন-১৭৮ : আচ্ছা মুহতারাম! চোখের অসুস্থতায় মধু ব্যবহার করা যায় কি?

উত্তর : অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ আমাবাহ্ নামে আরেকজন মিসরীয় বিজ্ঞানী সম্প্রতি চোখের অসুখে মধু নিয়ে বেশ গবেষণা করেছেন। গবেষণার ফলাফলে জানা যায় যে মধু চোখের corneal infection-এর চিকিৎসায় বেশ কার্যকর। তিনি ৩০ বছর বয়সী একজন যুবকের চোখে মধু topically apply করে বিস্ময়কর ফলাফল পেয়েছেন। ফলাফলে তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে এভাবে মধু ব্যবহার করে চোখের উপরিভাগের বেশ কিছু রোগের চিকিৎসার জন্য একটি research project হাতে নিয়েছেন, যার ফলাফলও খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এসব গবেষণার ফলাফল কুরআনের আয়াতের সত্যতার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ।

فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

"ফীহি শিফাউল্ লিন্নাস।"

"মধুর মধ্যে মানুষের জন্য শিফা বা রোগ নিরাময় রয়েছে।" (আন-নাহল ১৬:৬৯)

সম্ভবত কুরআনের এবং হাদীসের এদুটো শক্তিশালী বক্তব্যের উপর নির্ভর করে কুয়েতের বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. আহমাদ শাওয়াকী ইব্রাহীম পোড়া ঘা ও ক্ষতস্থানের চিকিৎসায় মধুকে antibiotic

হিসেবে ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পেয়েছেন। তার অনেক রোগীরা চিকিৎসায় মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভে সফল হয়েছেন। তাই পাতলা মধু (৫০% ও ৩৫%) নিয়ে urinary tract infections-এর উপর গবেষণা করেন। ফলাফলে জানা যায় যে পাতলা মধু বা dilute honey antibiotic gentamycin-এর চেয়ে বেশি কার্যকর। It can be used as an antiseptic in dressing of chronic ulcer (infected). Honey creates an impermeable membrane for bacteria and prevents bacterial spreading. মধুর আরো অনেক উপকার আছে। মধুর উপর লিখিত বিভিন্ন বইয়ে তা পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন-১৭৯ : ডায়াবেটিস রোগী কি মধু সেবন করতে পারবে?

উত্তর : মধুর মাধ্যমে চিকিৎসার কথা আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বেশ কয়েকটি সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন মধুর উপকারিতা সম্পর্কে ও রোগ নিরাময়ে এর ব্যবহার সম্পর্কে। এসব থেকে এটি স্পষ্ট যে, মধুর মধ্যে মানুষের জন্য রোগ নিরাময় রয়েছে। Diabetes বা বহুমূত্র একটি রোগ। তাই অন্যান্য রোগের ন্যায় এ রোগেরও নিরাময় এ মধুতে রয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বলে যে কেউ যদি diabetes রোগে আক্রান্ত হয়, তার চিনি জাতীয় খাবার পরিত্যাগ করা উচিত। বর্তমানে মিষ্টি ও অধিকাংশ চিনি জাতীয় খাবারে sucrose বা saccharin দেয়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশে যতো মিষ্টি তৈরি করা হয় তার প্রায় ৯৯ ভাগই saccharin বা চিনি দিয়ে তৈরি হয়। আর চিনি মানেই sucrose, যেটা প্রধানত আখ বা sugar cane থেকে তৈরি করা হয়ে থাকে।

অপরদিকে আমরা জানি যে মধুতে sucrose ছাড়াও আরো অনেক sugars বা carbohydrates রয়েছে। যেমন glucose, fructose, arabinose, xylose, gluco-uronic acid, galacto-uronic acid ইত্যাদি। তাই ডায়াবেটিক রোগীও নির্দিষ্ট মাত্রায় মধু সেবন করতে পারে। প্রতিদিন যদি কেউ ১ চা চামচ মধু সেবন করে, তবে তার ডায়াবেটিসের সমস্যা হবার কথা নয়। তবে এ ব্যাপারে diabetes বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। মূলকথা, মধুতে minerals, amino acids, fatty acids, carbohydrates, enzymes ও vitamins রয়েছে এবং এসব অসংখ্য উপাদানের synergistic effects-এর জন্যই মধুর গুণাগুণ এতো বেশি। আর এজন্যই আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা পবিত্র কুরআনে একে মানুষের জন্য রোগ নিরাময়কারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন-১৮০ : AIDS রোগের চিকিৎসায় মধুর ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর : AIDS একটি ভয়ানক ব্যাধি যা মহামারীর ন্যায় এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। AIDS জাতীয় রোগ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"যখন কোনো জাতি প্রকাশ্যে বেহায়াপনা, নগ্নতা, অশ্লীলতা ও অন্যান্য লজ্জাহীনতার পাপকার্যে লিপ্ত হয় এবং এসব পাপকার্য মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের জন্য আকাশ থেকে নতুন নতুন ঘাতক ব্যাধি পাঠানো হবে, যাদের নাম তারা কিংবা তাদের পূর্বপুরুষের কেউ শোনেনি।" (ইবনে মাজাহ) [৫২৮]

এ হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো জাতির মধ্যে যখন প্রকাশ্যে পাপাচার হতে থাকে এবং তাদের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঐসব পাপাচারীকে বাধা দেয়না, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের উপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠান।" (ইবনে মাজাহ) [৫২৯]

বর্তমানে AIDS নামটি ৪টি ইংরেজি শব্দের প্রথম অক্ষরগুলোর একত্রীকরণ। অর্থাৎ Acquired Immunity Deficiency Syndrome-এর রোগটির কোনো vernacular নাম তথা বাংলা, আরবি, উর্দু বা ফারসি নাম নেই। AIDS is not a single English word, but it is the combination of four letters. আমাদের বাপ-দাদারাও এ রোগের নাম শোনেনি। তাই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসটি দ্বারা যে AIDS নামক ঘাতক ব্যাধিকে বোঝায়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো ভবিষ্যতে এ ধরনের আরো রোগ আসতে পারে, যার নাম কেউ জানবে না।

এবার আলোচনায় আসি, AIDS রোগের চিকিৎসায় মধুর ব্যবহার সম্পর্কে। মধু সম্পর্কে এতো গবেষণা হয়েছে তার সারমর্ম একত্র করলে জানা যাবে যে মধু immunity system develop করতে সাহায্য করে। মধুতে anti-aging principles বা বার্ধক্য প্রতিরোধের উপাদান রয়েছে।

অপরদিকে "কালিজিরা মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের ঔষধ" এ বিষয়ে হাদীস শরীফে অনেক বর্ণনা এসেছে। আর আধুনিক বিশ্বে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য কালিজিরার উপর গবেষণাগারে প্রায় কয়েক হাজার গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণার ফলাফল এটাই প্রমাণ করে যে "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালিজিরা সম্পর্কে যা বলেছেন তা সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত।" তাই আমার বিশ্বাস, কালিজিরা ও মধুর সমন্বয়ে কোনো recipe যদি AIDS রোগীদের তিন মাস নিয়মিত সেবনের জন্য দেয়া হয়, তাহলে উক্ত রোগী আরোগ্য লাভ করবে ইনশা'আল্লাহ। সাথে সাথে AIDS ও AIDS জাতীয় রোগ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা মেনে চলতে হবে। নতুবা দুষ্ট লোকেরা AIDS-এ আক্রান্ত হতেই থাকবে আর মৃত্যুবরণ করতেই থাকবে। তাদের জন্য মায়াকান্নার কী আছে? সুন্দর এই পৃথিবী নামক গ্রহটি দুষ্টু লোকের জন্য নয়। AIDS এক প্রকার divine punishment. এর শাস্তি যে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়, তা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেই দিয়েছেন। AIDS রোগের উৎপত্তির ইতিহাস যারা জানেন, তারা এ রোগের জন্য সমাজের পাপাচারকেই দায়ী করে থাকেন।

অধ্যায়-১৪

পানির মাধ্যমে রোগ নিরাময়

প্রশ্ন-১৮১ : মুহতারাম, প্রথমেই আমি জানতে চাইবো যে পানি সম্পর্কে কুরআন পাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা কী ইরশাদ করেছেন?

উত্তর : আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা পবিত্র কুরআনে তিন ধরনের পানির কথা উল্লেখ করেছেন। এক, যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয়, যাকে আমরা বলি বৃষ্টির পানি। দুই, যা ভূপৃষ্ঠ থেকে বের হয়, যেমন ঝরণার পানি। আর তৃতীয়টি হচ্ছে সমুদ্র বা নদ-নদীর পানি।

তবে পানি সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাটি এসেছে সূরা আম্বিয়ার ৩০ নম্বর আয়াতে।

۞ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۞

"আমরা প্রাণবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।" (আম্বিয়া ২১:৩০)

অর্থাৎ "And We have made every living thing from water." (Al-Anbiya 21:30)

In fact this statement of the Holy Quran is an established scientific fact. এ আয়াত আমাদের বলে যে মানুষসহ সকল জীবজন্তুকে আল্লাহ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সূরা ফুরকানের ৫৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

۞ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا ۞

"তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে।" (ফুরকান ২৫:৫৪)

বৃষ্টির পানি সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন,

۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۞

"আকাশ থেকে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি।" (ক্বফ ৫০:৯)

সূরা ক্বফ-এর ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন,

۞ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۞

"বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এইভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।" (ক্বফ ৫০:১১)

পঞ্চম বর্ণনাটি হচ্ছে সূরা হা-মীম আস-সাজদায়। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

"আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, ঊষর। অতঃপর আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। যিনি ভূমিকে জীবিত করেন, তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (হা-মীম আস-সাজদাহ ৪১:৩৯)

৬ষ্ঠ বর্ণনাটি এসেছে সূরা জাছিয়ার ৩ থেকে ৫ নম্বর আয়াতে।

﴿اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ﴾

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য। তোমাদের সৃজনে ও জীবজন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য। রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশ থেকে যে বারি বর্ষণ করেন, তদ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (জাছিয়াহ ৪৫:৩-৫)

সূরা ইবরাহীমের ৩২ নম্বর আয়াতে (১৪:৩২) বারি বর্ষণের সাথে জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে। মূলত এই সবগুলো আয়াতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বৃষ্টির পানি দিয়ে কৃষিকাজ ও ফসল জন্মানোর কথা বলেছেন।

দ্বিতীয় যে পানির কথা বলা হয়েছে তা হলো ঝরণা বা প্রস্রবণের পানি, যা ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্গত হয়ে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ﴾

"স্মরণ করো, যখন মূসা আলাইহিস সাল্লাম তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য পানির প্রার্থনা করলো, আমি বললাম, তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো। ফলে তা হতে ১২টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান স্থান চিনে নিলো। বললাম, আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হতে তোমরা পানাহার করো এবং পৃথিবীতে দুষ্কৃতকারীরূপে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়িওনা।" (আল বাকারাহ ২:৬০)

তৃতীয় প্রকারের পানি হচ্ছে নদ-নদী ও সমুদ্রের পানি। এই সমুদ্রের পানি আবার দুই প্রকার, মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানি। নদী, প্রস্রবণ, নলকূপের পানি ও কূপের পানি সাধারণত মিষ্টি, স্বচ্ছ ও সুস্বাদু হয়ে থাকে।

সমুদ্রের পানি সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

﴿وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا﴾

"তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট ও সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত ও বিস্বাদ এবং উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।" (ফুরকান ২৫:৫৩)

সূরা আর-রাহমানেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা একই ধরনের ইরশাদ করেন,

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ﴾

"তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা ওরা অতিক্রম করতে পারেনা।" (আর রহমান ৫৫:১৯-২০)

প্রশ্ন-১৮২ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা পকমন পানি পান করতেন?

উত্তর : হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় পানীয় হচ্ছে ঠাণ্ডা ও মিষ্ট।" (মুসনাদে আহমাদ ও আত-তিরমিযী) [৫৩০]

এ হাদীসটি একাধিক রাবী ইবনে উয়াইনা-মা'মার-যুহরী-উরওয়া- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহ্‌রী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, 'কোন্ ধরনের পানীয় উত্তম'? তিনি বলেন, 'ঠাণ্ডা, মিষ্টি শরবত।' (আত-তিরমিযী) [৫৩১]

বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবেমাত্র সংগৃহিত পানি এবং পাত্রে বা কলসে সংরক্ষিত পানি উভয়ই পান করতেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীসে আছে। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসার সাহাবীর নিকট গেলেন তাঁর সঙ্গে একজন সাহাবীও ছিলেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ আনসারকে বললেন, "তোমার নিকট রাতে মশকে সংরক্ষিত (বাসী) পানি আছে কি? নতুবা আমি অন্যত্র গিয়ে পান করবো।" রাবী বলেন, ঐ আনসার ব্যক্তি তার বাগানে পানি সিঞ্চন করছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার নিকট রাতে রক্ষিত পানি আছে। অনুগ্রহপূর্বক আমার গৃহে চলুন। অতঃপর আনসার ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীকে গৃহে নিয়ে গেলেন। একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাতে বকরীর দুধ দোহন করলেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন। তারপর সঙ্গী ব্যক্তিও পান করলেন।" (সহীহ আল বুখারী ও ইবনে মাজাহ) [৫৩২]

প্রশ্ন-১৮৩ : বিশুদ্ধ পানির বৈশিষ্ট্য কী? এ বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো বাণী আছে কি?

উত্তর : সত্যি বিস্ময়কর, ভাবতে অবাক লাগে যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো

প্রকার ল্যাবরেটরিতে গবেষণা ছাড়াই আমাদের উপদেশ দিলেন যে It is not good to drink water whose colour, odour or taste have changed. অর্থাৎ যে পানির বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তন হয়েছে, তা অপবিত্র। উহা পান করা উচিত নয়।

পানির বিশুদ্ধতা ও ব্যবহার সম্পর্কে আবূ উমামা আল-বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীসে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় পানি পবিত্র, তাকে কোন জিনিস অপবিত্র করে না যতক্ষণ না তার ঘ্রাণ, স্বাদ ও রংয়ে পরিবর্তন আসে।" (ইবনে মাজাহ) [৫৩৩]

বস্তুত এই হাদীস থেকেই আমরা বিশুদ্ধ পানির সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারি। অর্থাৎ পানি সর্বদা পবিত্র থাকে। যদি তার গন্ধ, স্বাদ ও রং পরিবর্তন হয় তবে তা আর পবিত্র থাকে না। আধুনিক বিজ্ঞান নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথারই প্রতিধ্বনি করেছে মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বিশুদ্ধ পানির সংজ্ঞা হচ্ছে, pure water is tasteless, odourless, colourless liquid which does not contain any dissolved or insoluble substances as impurities. অর্থাৎ বিশুদ্ধ পানি হচ্ছে স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল পদার্থ, যার ভেতরে দ্রবীভূত কোনো পদার্থ বা অদ্রবণীয় কোনো ময়লা নেই। বিশুদ্ধ পানির pH or acidity (অম্লত্ব) ৭ বা ৭-এর নিকট।

অধিকন্তু, পানি বিশুদ্ধ কি না তা পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা দিয়েছেন সহজ সুন্দর নিয়ম, উযূর বিধান। উযূ করার সময় পানি হাতে নিয়ে নাক ধৌত করার সময় পানির বর্ণ, গন্ধ, ও স্বচ্ছতা অতি সহজেই পরীক্ষা করা যায়। আর পানির রংয়ের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না তা খালি চোখেই দেখা যায়।

প্রশ্ন-১৮৪ : পানির মাধ্যমে রোগ নিরাময় এ বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো বাণী আছে কি?

উত্তর : বৃষ্টির পানি বা সমুদ্রের পানির মাধ্যমে রোগ নিরাময় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো হাদীস আমি খুঁজে পাইনি। তবে বৃষ্টির পানি সম্পর্কে একটি বর্ণনা এসেছে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। তিনি বলেন, "একদা আমরা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম যখন বৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র দেহ মুবারক থেকে বাইরের পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেললেন ততোক্ষণ পর্যন্ত, যতোক্ষণ তাঁর পবিত্র শরীরে বৃষ্টির পানি না পড়েছিল। তখন তিনি ইরশাদ করেন, "এটি একমাত্র এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে।" (আবূ দাউদ) [৫৩৪]

সহীহ আল বুখারী শরীফে একটি হাদীস উদ্ধৃত আছে যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হে আল্লাহ। আমার পাপরাশি বৃষ্টির পানি ও বরফ পানিতে ধুয়ে মুছে ফেলো।" (সহীহ আল বুখারী) [৫৩৫]

সমুদ্রের পানিতে রোগ উপশম হয় এ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য আমি খুঁজে পাইনি। মুগীরা ইবনে আবূ বুরদাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন যে তিনি আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বলতে শুনেছেন, একদা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়, "আমরা কি সমুদ্রের পানিতে উযূ করতে পারি? তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সমুদ্রের পানি

বিশুদ্ধ ও পবিত্র আর মৃত মাছ হালাল।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী) [৫৩৬]

তবে আমরা বিভিন্ন বিজ্ঞানের গবেষণা থেকে জানতে পারি যে বৃষ্টির পানি ও সমুদ্রের পানি উভয়টি বেশ উপকারী। বিভিন্ন ধর্মীয় বইয়ে বৃষ্টির পানির নানাবিধ উপকারিতা বিদ্যমান আছে বলে অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, বৃষ্টির পানিতে গোসল করলে চামড়ার উপরিভাগের ক্ষত তথা external skin infection দূর হয়। বিজ্ঞানের বইয়ে এ তথ্যও এসেছে যে, সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে নিয়মিত গোসল করলে অনেক অসুস্থ রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

প্রশ্ন-১৮৫ : আচ্ছা মুহতারাম! যমযমের পানি ব্যবহারে রোগী আরোগ্য লাভ করে, এ বিষয়ে হাদীস শরীফে কী কী বর্ণনা এসেছে?

উত্তর : যমযমের পানি সারা বিশ্বের মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট মহান আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ নিয়ামত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এখানে আমি যমযমের পানি সম্পর্কিত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস আলোচনায় আনবো যা থেকে আমরা জানতে পারবো, যমযমের পানির রোগ নিরাময়সহ অন্যান্য উপকারিতার কথা।

সহীহ মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হাদীসটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু কা'বা শরীফ ও তার আশপাশের এলাকায় যমযমের পানি ব্যতীত অন্য কোনো পানীয় গ্রহণ বা খাদ্যদ্রব্য না খেয়ে ত্রিশদিন অবস্থান করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কতোদিন সেখানে অবস্থান করেছিলে?" হযরত আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন, "ত্রিশ দিন ও রাত।" নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "এই দীর্ঘ সময় কে তোমাকে খাইয়েছে?" তিনি উত্তর দেন, "যমযমের পানি ছাড়া আমার নিকট আর কোনো পানীয় বা খাদ্যদ্রব্য ছিলোনা এবং আমি অনেক মোটা হয়ে গেছি এবং পেটে চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। আমি কোনো ক্লান্তিবোধ করিনি, ক্ষুধায় দুর্বল হইনি এবং জীর্ণশীর্ণও হইনি।" তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই এটি বরকতময় পুষ্টি এবং এটি এমন একটি খাদ্যদ্রব্য, যা পুষ্টিকর।" (সহীহ মুসলিম) [৫৩৭]

হাজী সাহেবগণ হেরেম শরীফে স্থাপিত যমযমের পানির সরবরাহ লাইন থেকে পানি পান করছেন।
(Pilgrims drinking Zamzam water in the Baitullahil Haram)

হাদীস গ্রন্থে আরো একটি হাদীস লিপিবদ্ধ আছে, যা হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যমযমের পানিতে রোগ নিরাময় রয়েছে।" (মু'জামুল কাবীর) [৫৩৮]

That is, a cure from ailment, a cure from sickness. বস্তুত এই হাদীস দুটোর উপর ভিত্তি করে যমযমের পানি মুসলিম জাহানে এতো প্রিয় এবং এর ব্যবহার এতো বেশি ব্যাপক। প্রতিবছর হাজী সাহেবগণ এজন্যই এ পানি কষ্ট করে দেশে নিয়ে আসেন। অপরদিকে আত-তাবারানী আল-মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে যমযমের পানির গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আবূ যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যমযমের পানি সুস্বাদু খাবার এবং এতে রোগ নিরাময় বা রোগ নিরাময়ের উপাদান রয়েছে।" (মুসনাদে আল বাযযার ও আল-মু'জামুল আওসাত) [৫৩৯]

হাজী সাহেবগণ প্লাস্টিকের পাত্রে জমজমের পানি নিয়ে দেশে আসেন।
(Pilgrims carry Zamzam water home in plastic containers)

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যমযমের পানি যে উপকার লাভের আশায় পান করা হবে, তা অর্জিত হবে।" (ইবনে মাজাহ) [৫৪০]

অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যেই পান করা হোক না কেন, যমযমের পানি খুব কার্যকর। That is, Zamzam water is effective for whatever was intended behind drinking it.

সুপ্রিয় দর্শক-পাঠক! মনে করুন, আপনার মূত্রথলিতে পাথর রয়েছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে যদি আপনি নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে যমযমের পানি পান করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ সে পাথর আস্তে আস্তে মূত্রের সাথে বের হয়ে যেতে পারে। আপনি একাধারে ৩ মাস এ পানি পান করুন। এ প্রসঙ্গে আমি যমযমের পানির সাহায্যে রোগ নিরাময়ের দুটো ঘটনা উল্লেখ করবো।

যমযমের পানির সাহায্যে মূত্রথলির পাথর অপসারণ

ঘটনা বর্ণনাকারী ও রোগী ডাঃ ফারুক অন্তরের ureter এ পাথর হলে তার চিকিৎসক তাকে সার্জারী করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি তার জন্য নির্ধারিত সার্জিক্যাল অপারেশনের সময় পিছিয়ে দিয়ে হেরেম শরীফে চলে যান। সেখানে ওমরাহ হজ্জ সম্পন্ন করেন। তারপর প্রচুর পরিমাণে যমযমের পানি পান করেন। তারপর হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন এবং দুই রাকায়াত নামায আদায় করেন। এর পরপরই তার ureter এ তীব্র ব্যথা অনুভব করেন এবং wash room এ ছুটে যান। সেখানে গিয়েই তিনি লক্ষ্য করেন যে বেশ বড় একটি পাথর প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে এসেছে। কোন প্রকার সার্জারী ছাড়াই তার পাথর অপসারণ হওয়ায় তার চিকিৎসকরা অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করেন।

যমযমের পানির সাহায্যে চোখের ulcer নিরাময়

যমযমের পানির সাহায্যে রোগ নিরাময়ের আরেকটি ঘটনা উদ্ধৃত করছি। ইউশ্বরিয়া আব্দুর রহমান হাররাজ নামে জনৈকা ভদ্র মহিলা তার বামচোখে ulcerative keratitis রোগে ভুগছিলেন। দীর্ঘদিন corneal ulcer রোগে আক্রান্ত থাকায় তার চোখে migraine শুরু হয়, যা তাকে অনবরত কষ্ট দিতে থাকে। কোনো ব্যথানাশক ওষুধে তার নিরাময় হচ্ছিলনা। তার চোখের ওপর একটি পাতলা আবরণ পড়ায় তিনি তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার চিকিৎসক চোখের ব্যথা নিরাময়ের জন্য একটি ইনজেকশন দেয়ার পরামর্শ দেন। তবে আশংকা প্রকাশ করেন যে এতে আক্রান্ত চোখের দৃষ্টিশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এ সংবাদে ভদ্রমহিলা ভেঙ্গে পড়েন। তিনি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেন যে ওমরাহ হজ্জে গিয়ে পবিত্র গৃহে আল্লাহর নিকট নিরাময়ের জন্য দু'য়া করবেন। পরে তিনি মক্কায় গিয়ে কাবাঘরে তওয়াফ শেষে কালো পাথর চুম্বন করেন। যেহেতু ঐ সময়ে অল্প সংখ্যক লোক তওয়াফ করছিলেন, তাই তারপক্ষে পাথরটি চুম্বন করা সহজ হয়েছিলো এবং তিনি তার চোখটি কালো পাথরের সাথে ঘষে নেন। পরে তিনি যমযমের পানি একটি কাপে নিয়ে উক্ত চোখ ভালভাবে ধুয়ে নেন। এরপর সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করার পর হোটেলে ফিরে যান। তারপরই তিনি লক্ষ্য করেন যে তার চোখের আর কোন ব্যথা নেই এবং তার দৃষ্টিশক্তিও স্বাভাবিক হয়েছে। কীভাবে সার্জারী ছাড়া তার চোখের ulcer দুর হলো? কীভাবে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন? উত্তর সহজ। ভদ্রমহিলা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহকে ডেকে ছিলেন। যার ওপর এ দুনিয়ার কোনো ওষুধ কাজ করেনি, তার চিকিৎসা করলেন এ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক আল্লাহ রব্বুল আলামীন। তাই তিনি সুস্থ। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

"যখন আমার বান্দা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই থাকি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই। কাজেই তাদের আমার আহবানে সাড়া

দেয়া এবং আমার ওপর ঈমান আনা উচিত, হয়তো তারা সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে।" (বাকারাহ ২ঃ১৮৬)

উপরোক্ত ঘটনা দুটোই "আল ইজায্ আল ইলমি ফিল্ ইসলাম ওয়াস্ সুন্নাহ আন নব্বীয়াহ" **গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।**

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বাক্‌র রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর নিকট বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথা থেকে এসেছো? সে বললো, যমযমের নিকট থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তা থেকে প্রয়োজনমতো পানি পান করেছো? সে বললো, তা কিরূপে? তিনি বলেন, তুমি তা থেকে পান করার সময় কিবলামুখী হবে, আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করবে, তিনবার নিঃশ্বাস নিবে এবং তৃপ্তি সহকারে পান করবে। পানি পানশেষে তুমি মহামহিম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে। কারণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে নিদর্শন এই যে, তারা তৃপ্তি সহকারে যমযমের পানি পান করেনা।" (ইবনে মাজাহ) [৫৪১]

যমযমের পানি পান করার মাধ্যমে ক্যান্সার থেকে নিরাময় লাভ

আমি এখানে প্রচুর পরিমাণে যমযমের পানি পান করার মাধ্যমে ক্যান্সার থেকে নিরাময় লাভের একটি ঘটনা বর্ণনা করবো :

বিস্ময়কর এই ঘটনাটি ঘটে লায়লা আল হেলু নামে জনৈকা মরোক্কান ভদ্রমহিলার জীবনে। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ায় তার পুরো chest এ তা ছড়িয়ে পড়ে। তার চিকিৎসক তাকে বললেন যে তিন মাসের বেশি তিনি আর বাঁচবেননা, কারণ ক্যান্সার তার শরীরে metastasized. তার স্বামী তাকে পবিত্র মক্কা শরীফে গিয়ে ওমরাহ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি হেরেম শরীফে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত নামাযের স্থানে এক কোণায় নিজেকে আলাদা করে নিয়ে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে যমযমের পানি পান করতে থাকেন। আর খাদ্য হিসাবে শুধুমাত্র এক টুকরা রুটি ও একটি ডিম প্রতিদিন খেতেন। নামাযের সময় ছাড়া বাকী সব সময় তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনায় কান্নাকাটি করতেন এবং কুরআন পড়তেন।

চারদিন তিনি বলতে পারেন নি যে কখন দিন বা রাত হয়েছে। এ সময়ের মাঝে তিনি বেশ কয়েকবার কুরআন খতম দিয়েছেন। তিনি তার সিজদার সময়কে দীর্ঘায়িত করতেন এবং জীবনে যে সমস্ত ইবাদত করতে পারেননি তার জন্য কাঁদতে থাকেন। আর তিনি সর্বদা যিকির ও দু'য়ায় লিপ্ত থাকতেন। এর কয়েকদিন পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে তার সারা শরীরে যে লালচে স্পট ছিলো তা দূর হয়ে গেছে এবং তিনি অন্তরে অনুভব করলেন যে তার কোন কিছু ঘটেছে। তিনি তখন প্যারিসে ফিরে গিয়ে চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করতে মনস্থ করলেন। তার চিকিৎসকরা কয়েকবার পরীক্ষা করার পর বললেন তার বুকে ক্যান্সারের কোনো লেশ নেই। আমি তখন তাদেরকে সেই বিস্ময়কর অবস্থার মাঝে রেখে আমার নিজ দেশে চলে যাই, আমার এই বিস্ময়কর নিরাময়ের ঘটনা বর্ণনা করতে।

[সূত্র ঃ সৌদি আরবের দারুসসালাম কর্তৃক ২০১০ সালে প্রকাশিত, ইউসুফ আলহাজ্ব আহমাদ কর্তৃক সংকলিত এবং হুদা খাত্তাব সম্পাদিত ইসলামিক মেডিসিন, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫]

একটি বালক যমযমের পানি পান করছে (A cute boy drinking Zamzam water)।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পানি হচ্ছে যমযমের পানি। এতে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্যের উপকরণ আর রোগ থেকে আরোগ্য লাভের উপাদান রয়েছে।" (আল-মু'জামুল কাবীর ও আল-মু'জামুল আওসাত) [৫৪২]

That is, the best water on the surface of the earth is the water of Zamzam. It contains food to satisfy hunger and a healing from sickness." (Al-Mu`zamul Kabir and Al-Mu`zamul Awzat) [542]

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমরা যমযমের পানিকে পরিতৃপ্তিকর বলে থাকি এবং এটি আমাদের পরিবারের যত্নে অনেক উপকারী (অর্থাৎ এটি অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ছাড়াই আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে এবং তা শিশুদের জন্যে পুষ্টি বিধান করে।)" (আল-মু'জামুল কাবীর ও মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক) [৫৪৩]

এই হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে যমযমের পানি তৃপ্তিদায়ক ও পুষ্টিকর। আমি এখানে আরো একটি রিওয়ায়াত পেশ করছি, যা বর্ণনা করেছেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযমের পানি কাঁচের বোতলে বহন করতেন,

অসুস্থ ব্যক্তির গায়ে ঢেলে দিতেন এবং (রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্যে) তাকে পান করাতেন।" (সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ও শু'আবুল ঈমান) [৫৪৪]

এই রিওয়ায়াতটি থেকেও আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে যমযমের পানি রোগ নিরাময়ে উপকারী ও কার্যকর। যাদের skin diseases রয়েছে, তারা এ পানিতে নিয়মিত গোসল করলে চর্মরোগ ভাল হয়ে যাবে ইনশা'আল্লাহ। অপরদিকে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি রিওয়ায়াত পেশ করেন যে আবদুল্লাহ ইবনে আল-মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি হজ্জব্রত পালন করার সময় যমযমের কুয়ার নিকটে গিয়ে বলেন, যেহেতু হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যেই পান করা হোক না কেনো তা কার্যকর ও উপকারী", তাই আমি এ পানি কিয়ামত দিবসে তৃষ্ণা নিবারণে পান করি।" (যাদুল মা'আদ, শু'আবুল ঈমান ও ইবনুল কাইয়িম) [৫৪৫]

কিয়ামতের দিন মানুষ তৃষ্ণায় পাগলপ্রায় থাকবে। পানির জন্যে বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি করবে। তাই এ পানি সেদিনের জন্যও উপকারে আসবে। যাহোক, এতোক্ষণ যেসব হাদীস আলোচনা করা হলো, এসবের উপর ভিত্তি করে অনেক ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তি যমযমের পানির অনেক উপকার ও ব্যবহার বর্ণনা করেছেন, যা এখানে আলোচনার অবকাশ নেই। কারণ রোগ নিরাময়ে যমযমের পানির ব্যবহার নিয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যই আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু।

প্রশ্ন-১৮৬ : বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যমযমের পানিতে কী কী উপাদান আছে বলে প্রমাণিত হয়েছে?

উত্তর : আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের জানায় যে যমযমের পানি তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যে অনন্য। এ পানিতে প্রতি লিটারে প্রায় ২০০০ মিঃগ্রাঃ পরিমাণ উপকারী এলিমেন্টস রয়েছে। এ পানিতে প্রতি লিটারে ২৫০ মিঃগ্রাঃ সোডিয়াম, ২০০ মিঃগ্রাঃ ক্যালসিয়াম, ২০ মিঃগ্রাঃ পটাসিয়াম এবং ৫০ মিঃগ্রাঃ ম্যাগনেসিয়াম আয়ন আছে, যা অন্যান্য পানির তুলনায় অনেক বেশি। নেগেটিভ আয়নগুলোর মধ্যে সালফেট, বাইকারবনেট, নাইট্রেট, ফসফেট ও অ্যামোনিয়া পরিমাণমতো রয়েছে। যমযম পানিতে উপরোক্ত যেসব মিনারেল আছে তা মানুষের পাকস্থলী, লিভার, কিডনি ও ইনটেস্টিনের জন্যে খুবই উপকারী। গবেষণায় আরো প্রমাণিত হয়েছে যে যমযমের পানিতে কোনো জীবাণু বা ক্ষতিকর কোন পদার্থ নেই। যে সমস্ত microbes আশপাশের মাটিতে বিদ্যমান, তা যমযমের পানিতে অনুপস্থিত। তাছাড়া এ পানিতে প্রচুর পরিমাণে ফ্লোরাইড বিদ্যমান। এসবের জন্য দীর্ঘদিন এ পানি সংরক্ষণ করলেও এতে কোনো শেওলা বা জলজ জীবাণু জন্মাতে পারেনা।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে আজ অবধি বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এ পানি ব্যবহার করে আসছে এবং স্বদেশে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ এ পানির পরিমাণ কূপের উৎসে একটুও কমেনি। এ পানি কখনো নিঃশেষ হবার নয়। বর্তমানে যমযমের পানির প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে ১১-২০ লিটার পর্যন্ত। এ পানির উৎস কোথায় তা এখন জানা কঠিন। আনুমানিক তিন হাজার বছর যাবৎ এভাবে পানি প্রবাহিত হয়ে আসছে। আল্লাহই জানেন কত বছর এ পানির প্রবাহ থাকবে।

অধ্যায়-১৫

দুধের মাধ্যমে রোগ নিরাময়

প্রশ্ন-১৮৭ : পবিত্র কুরআনে দুধ সম্পর্কে কি কোনো বর্ণনা এসেছে? রেফারেন্স সহকারে বলুন।

উত্তর : মানব জাতিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা যতগুলো নিয়ামত দান করেছেন, দুধ তার মধ্যে অন্যতম। জান্নাতে যেসব নিয়ামতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে দুধের নহর। আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ﴾

"বেহেশতে দুধের এমন নহর প্রবাহিত হবে, যার স্বাদ বা গন্ধ কখনো পরিবর্তন হবেনা।" (মুহাম্মদ ৪৭:১৫)

'সব ধরনের দুধ কিছু সময় fresh বা সতেজ থাকে। তারপর এর স্বাদ পরিবর্তন হতে থাকে এবং পরে তা টক হয়ে যায়। কিন্তু জান্নাতের দুধ এর ব্যতিক্রম। জান্নাতের দুধের স্বাদ কখনো পরিবর্তন হবেনা।

অপরদিকে সূরা নাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা দুধকে স্বচ্ছ, নির্মল ও সুস্বাদু বস্তু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

﴿لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّٰرِبِينَ﴾

"স্বচ্ছ, নির্মল, নির্ভেজাল ও খাঁটি দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও উপাদেয়।" (নাহল ১৬:৬৬)

অপরদিকে শিশুদের মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾

"মায়েরা পুরো দু'বছর তাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করাবে।" (আল বাকারাহ ২:২৩৩)

দুগ্ধবতী মায়েদের অর্থাৎ দুই বছর সময়ের ভেতর পুনরায় সন্তান সম্ভাব্য হওয়ার বিষয়ে কিছু বিধি-নিষেধ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অরোপ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে আর তিনি তা করেননি। যুদাম বিনতে ওয়াহহাব রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন যে আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি- "আমি দুগ্ধবতী মায়েদের সাথে তাদের স্বামীদের মিলনকে নিষেধ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমি রোম ও পারস্যের অধিবাসীদেরকে দেখলাম যে তাদের ছেলেমেয়েরা 'আল-গাইলা' (দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকাকালীন সময়ে সংগম) অভ্যাসের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি, তখন আমি আর সে অভ্যাসটি নিষেধ করিনি।" (সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাঊদ, আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [৫৪৬]

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিন্তার পিছনে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কারণ ছিলো। এ হাদীসের ব্যাখ্যা বিবরণীতে আল্লামা আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে কোনো মহিলা যখন গর্ভবতী

হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মাসিক রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। গর্ভধারণের সময় রক্তের উত্তম উপাদনগুলো খাদ্যে পরিণত হয়, যা ভ্রূণের পুষ্টিবিধানের জন্য প্রয়োজন। অবশিষ্ট অংশ যা দূষিত রক্ত, তা মায়ের স্তনে গিয়ে জমা হয়। অনুরূপভাবে যখন কোনো দুগ্ধবতী মহিলা গর্ভবতী হন, তখন মাসিক রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে বুকের স্তনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং পরে তা দুধে রূপান্তরিত হয়, ভ্রূণের পুষ্টিবিধানের জন্য। তবে এ ব্যাখার সাথে কতিপয় ডাক্তার ভিন্নমত পোষণ করেন। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ আনসারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল গাইলা অভ্যাস কার্যকর করলে তা শিশুকে যখন সে বড় হবে, ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে ফেলে দেবে।" (আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী) [৫৪৭]

That is, practicing 'al-gayla' catches the rider and throws him down from the horse. In other words, the boy would not be strong and stout. He may fall down from the horse back.

আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনুস সাকান রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "তোমরা গোপনে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ। দুধপানের মেয়াদে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে আরোহীকে ঘোড়া তার পিঠ থেকে ভূলুণ্ঠিত করে।" (আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ) [৫৪৮]

প্রশ্ন-১৮৮ : দুধ বা গরুর দুধ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী বক্তব্য রেখেছেন? রোগ নিরাময়ে দুধের ব্যবহার সম্পর্কে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো বাণী আছে কি?

উত্তর : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাভীর দুধের উপকারিতার কথা গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "গরুর দুধ আরোগ্যদানকারী অর্থাৎ শিফাদানকারী। এর ঘি হলো ওষুধ এবং এর গোশত হলো রোগ।" (শু'আবুল ঈমান ও সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী) [৫৪৯]

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে গোশতে রোগ সৃষ্টিকারী উপাদান রয়েছে। For example, mad cow disease.

শিশুকে গাভীর দুধ খাওয়ানো হচ্ছে।
Cow milk given to infant

এ হাদীসের ব্যাখায় হযরত হালীমী বলেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি এজন্য বলেছেন যে গরুর গোশতে উষ্ণতা ও আর্দ্রতা উভয়টি প্রবল থাকে। আর হিজাযের দেশগুলোর আবহাওয়া অতিরিক্ত উষ্ণ। ফলে তাদের আবহাওয়াতে গরুর গোশতের মিশ্রণ ঘটলে তারা সুস্থ থাকবেনা। কারণ তাদের উষ্ণতা আরো বৃদ্ধি করে দিবে, ফলে তারা

কষ্টে নিপতিত হবে। পক্ষান্তারে তার দুধ ও ঘিতে রয়েছে আর্দ্রতা, যাতে আবহাওয়ার ক্ষতির তুলনায় আরোগ্যতা রয়েছে।" (ফায়যুল কাদীর লিল মুনাভী, ৪/৩৪৯)

যদি গরু বা ছাগলের গোশতে প্যারাসাইটিস ইনফেসটেশন (Liverfluke) হলে hydatid cyst বা এ জাতীয় অসুখ হতে পারে। তাছাড়া কেহ red meat খেলে uric acid এর কারণে সে gout রোগে আক্রান্ত হতে পারে। রোগী বেশি পরিমাণে গোশত খেলে renal stone ও constipation হতে পারে। গোশত যদি infected cow থেকে সংগ্রহ করা হয় তাহলে Bovine TB (Animal TB) হতে পারে। Mad cow diseaseও অন্যতম রোগ।

হযরত তারিক ইবনে শিহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার জন্য তিনি ওষুধ পাঠাননি। সুতরাং গাভীর দুধ পান করো। কারণ গাভী সকল প্রকার ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকে।" (আন নাসাঈ ও আস-সুয়ূতী) [৫৫০]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাভীর দুধ পছন্দ করতেন।" (আস-সুয়ূতী) [৫৫১]

একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সবেমাত্র দোহন করা কিছু দুধ এবং কিছু বাসী দুধ পানির সাথে মিশিয়ে আনা হলে তিনি fresh বা সতেজ দুধ গ্রহণ করলেন এবং বললেন, "এতে সৌভাগ্য ও নিরাপত্তা রয়েছে।" (আম-সূয়ুতী) [৫৫২]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে মি'রাজের রাতে 'ঈলিয়া' নামক স্থানে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টো কাপ প্রদান করা হলো। দুটোর একটিতে ছিলো দুধ আর অপরটিতে ছিলো মদ। তিনি দুটো কাপের দিকে তাকালেন এবং পরে দুধের কাপটি গ্রহণ করলেন। তখন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আপনাকে স্বাভাবিক জিনিসের দিকে পরিচালিত করেছেন (অর্থাৎ সত্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন)। যদি আপনি মদের কাপটি বা মদ গ্রহণ করতেন, তাহলে আপনার অনুসারীগণ পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী হতো।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৫৫৩]

Female black and white cow

Fresh cow milk

Pure milk itself is an ideal food having all the essential components. It is not contra-indicated except in persons suffering from milk allergy.

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা কিছু দুধ পান করার পর পানি চাইলেন। পরে মুখের ভেতর নিয়ে কুলি করেন এবং বলেন, এতে তৈলাক্ত পদার্থ বা চর্বি আছে।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৫৫৪]

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধপান করার পর মুখের অভ্যন্তর পানিদ্বারা ধুয়ে ফেলতেন এবং বলতেন, যারা জ্বরে আক্রান্ত বা মাথা ব্যথায় ভুগছে, তাদের জন্য দুধের চর্বি অনুপকারী।" (আস-সুয়ুতী) [৫৫৫]

সম্মানিত দর্শক! দুধে যে চর্বি আছে তা আমরা জেনেছি বেশ কিছুদিন আগে। অর্থাৎ কয়েক দশক আগে। অথচ ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গবেষণাগারে কোনো প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে বলেছেন যে দুধে চর্বি বা চর্বি জাতীয় পদার্থ আছে এবং চর্বি জাতীয় পদার্থ মুখের অভ্যন্তরে থাকা ঠিক নয়। তাই তিনি পানির সাহায্যে কুলি করে তা ফেলে দিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেন দুধ সম্পর্কে। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি কোনো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে, তখন সে যেনো বলে, "আল্লহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়াযিদনা মিনহু (হে আল্লাহ্! এতে আমাদের জন্য বরকত দান করুন এবং এর চেয়ে উত্তম খাদ্য আহার করান)। আর যদি তোমাদের কাউকে দুধপান করার জন্য দেয়া হয়, তখন সে যেন বলে, "হে আল্লাহ্! এতে আমাদের জন্য বরকত দান করুন এবং আমাদের এটি আরো অধিক পরিমাণে প্রদান করুন।" (আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী) [৫৫৬]

অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বলতে আর কিছুই নেই যা দুধের বিকল্প হতে পারে।

প্রশ্ন-১৮৯ : গরুর দুধ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর দুধ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো বক্তব্য আছে কি? ছাগল বা উটের দুধ সম্পর্কে হাদীস শরীফে কি কোনো বর্ণনা এসেছে?
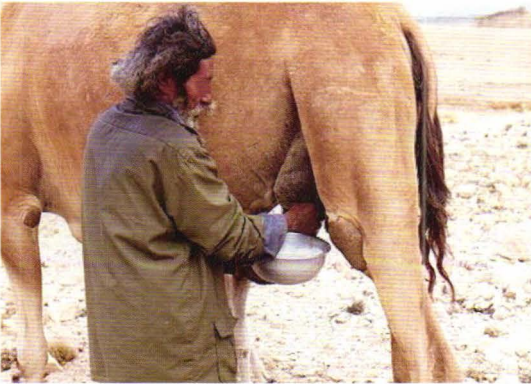
Camel milking

Baby camel drinking milk

উত্তর : গরুর দুধ ছাড়া আর দুটো প্রাণীর দুধ আরোগ্যকারী হিসেবে হাদীস শরীফে বর্ণনা এসেছে। এর একটি ছাগল আরেকটি উট। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "উত্তম সাদ্‌কাহ বা দান হচ্ছে অতিশয় দুগ্ধবতী এমন উটনী (She-camel) অথবা অতিশয় দুগ্ধবতী একটি বকরি (She goat) দান করা যা প্রত্যুষে এক পাত্র দুধ আর বিকেলে এক পাত্র দুধ সরবরাহ করে থাকে।" (সহীহ আল বুখারী) [৫৫৭]

তিনি আরো বলেন, 'তোমরা ছাগলের শ্লেষা মুছে দাও, তার চারণভূমি পরিষ্কার রাখো এবং তোমরা (রাখালরা) তার চারণভূমির পাশে নামায আদায় করো। কেননা, ছাগল জান্নাতের পশুদের অন্তর্ভুক্ত।" (কানযুল উম্মাল) [৫৫৮]

ইবনে জহর একটি রিওয়ায়াত পেশ করেন যে ছাগলের দুধ যক্ষা রোগের চিকিৎসায় উপকারী। এটি বার্ধক্য রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ goat milk is beneficial for the treatment of tuberculosis and it can be used as an antidote for retarding the aging process.

বস্তুত নবী ইউনুস আলাইহিস সালামকে যখন তিমিমাছ বালুকাময় নদীর তীরে ফেলে দিলো, তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ, ক্লান্ত। মাছের পেটে থাকা অবস্থায় তাঁর গায়ের চামড়া উঠে গিয়েছিল। তিনি আল্লাহর নিকট তখন দু'য়া করেছিলেন তাঁকে সাহায্য করার জন্যে। তখন সেখানে কোনো ডাক্তার বা নার্স ছিলোনা। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা তাঁর চিকিৎসা ও সুস্থতার দায়িত্ব নিলেন।

﴿ وَأَنۢبَتۡنَا عَلَيۡهِ شَجَرَةٗ مِّن يَقۡطِينٖ ﴾

"পরে আমি তার ওপর একটি লাউগাছ উদ্গত করলাম।" (আস-সাফফাত ৩৭:১৪৬)
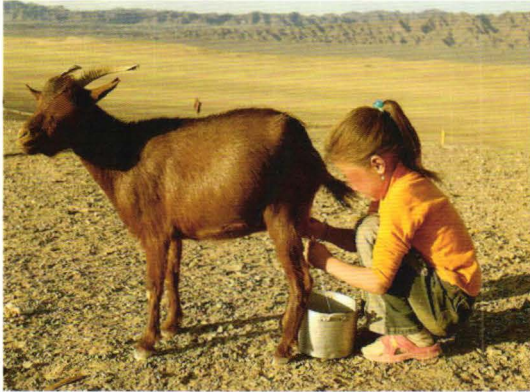
Baby milking goat milk

Goat milk products

গাছটির বড় বড় পাতা তাঁকে ছায়াদান করে প্রখর রোদ থেকে রক্ষা করলো। আর সম্ভবত ফল হিসেবে লাউ সরবরাহ করে মহান আল্লাহ তাঁর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয়ই নিবারণের ব্যবস্থা করেন। কারণ সেখানে

কোনো খাবার কিংবা পানি ছিলোনা। যা ছিলো, তা লবণাক্ত পানি। লাউয়ে ৯০% পানি থাকে। একই সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা একটি ছাগী পাঠালেন। ইউনুস আলাইহিস সালাম উক্ত ছাগীর দুধপান করে এবং খাদ্য হিসেবে লাউ খেয়ে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠেন।

তখন তিনি ছাগীটির জন্য দু'য়া করেন যেহেতু এটি তাকে দুধ প্রদান করেছিল। উটের দুধ দ্বারা চিকিৎসা সম্পর্কে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, "ড্রপসি রোগে আক্রান্ত কতিপয় অসুস্থ ব্যক্তি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করে। তখন তিনি তাদের আল-হেরা এলাকায় পাঠিয়ে দেন নিজের কয়েকটি উটনীসহ। তখন তারা উটের দুধপান করে সুস্থ হয়ে ওঠে।" (সহীহ আল বুখারী) [৫৫৯]

অধ্যায়-১৬

রোগ ও চিকিৎসা (Diseases and treatment)

জ্বর, দুশ্চিন্তা ও দুঃখ বেদনা (Fever, sorrows and grief)

প্রশ্ন-১৯০: মুহতারাম, 'জ্বর' একটি সাধারণ অসুখ, যা অহরহ লক্ষ করা যায়। আমরা জানি, এই 'জ্বর' নামক ব্যাধিটি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ও ছিলো। তাই জ্বরের চিকিৎসায় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো উপদেশ সংবলিত বাণী বা ব্যবস্থাপত্র আছে কি?

উত্তর : আপনাকে ধন্যবাদ। জ্বর অনেক রোগের উপসর্গ। পৃথিবীর সকল দেশের প্রত্যেক এলাকায়ই এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়। ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ সব বয়সের মানুষই এ রোগের শিকার হয়ে থাকে। এমন কোনো ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যিনি জীবনে জ্বরে ভোগেননি। জ্বর অনেক প্রকারের হতে পারে এবং এর উপসর্গও অনেক। অনেক কারণেই জ্বর হতে পারে, যা আমরা জ্বরে আক্রান্ত রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে জানতে পারি।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এ রোগের প্রকোপ খুব বেশি। প্রায় ১০৫°-১০৬° ফা. পর্যন্ত। যাহোক, বর্তমানে এ ধরনের রোগীকে বরফের সেলে ঠাণ্ডা করা হয়। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বরের চিকিৎসায় ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন। এই ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারের বিষয়ে বেশ কয়েকটি সহীহ হাদীস রয়েছে, যা একাধিক সাহাবায়ে কিরাম বর্ণনা করেছেন।

১. প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জ্বর জাহান্নামের হাঁপরসমূহের মধ্যকার একটি হাঁপর, এক উত্তপ্ত পাত্রবিশেষ। তোমরা ঠাণ্ডা পানি ঢেলে একে দূর করো।" (ইবনে মাজাহ) [৫৬০]

২. রাফি ইবনে খাদীজ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পৃথকভাবে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্ট। সুতরাং তোমরা পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা করো।" (সহীহ আল বুখারী ও ইবনে মাজাহ) [৫৬১]

৩. ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ থেকে। অতএব এর তাপ পানি দ্বারা কমিয়ে দাও।" (সহীহ আল বুখারী) [৫৬২]

৪. আবূ জামরাহ জুবাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বসতাম। (একদিন) আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমার (শরীরের) জ্বর যমযমের পানি দ্বারা শীতল করো। কেননা, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "জ্বর জাহান্নামের তেজ হতেই (হয়ে থাকে)। তাই তা পানি দ্বারা কিংবা যমযমের পানি দ্বারা শীতল করো।" (সহীহ আল বুখারী) [৫৬৩]

৫. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি জ্বরে আক্রান্ত হও, তখন পরপর তিনদিন প্রত্যুষে সূর্য ওঠার আগে কিছু ঠাণ্ডা পানি শরীরে ছিঁটিয়ে দাও।" (মুসতাদরাক, আবূ নু'য়াইম, আল-মু'জামুল আওসাত ও মুসনাদে আবূ ইয়ালা) [৫৬৪]

৬. আসমা বিনতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। জ্বরাক্রান্ত কোনো নারীকে তার নিকট আনা হলে তিনি পানি চেয়ে নিয়ে তার গলদেশে (বা বুকে) ঢালতেন আর বলতেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একে পানি ঢেলে ঠাণ্ডা করো।" তিনি আরো বলেছেন, "এটি হলো জাহান্নামের উত্তাপ থেকে।" (ইবনে মাজাহ) [৫৬৫]

৭. ঠিক একই ধরনের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত ফাতিমা বিনতে মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেন, "যখনই জ্বরে আক্রান্ত কোনো মহিলাকে হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট আনা হতো, তখন তিনি তার জন্য দু'য়া করতেন এবং তার শরীরে ও বুকে কিছু পানি ছিঁটিয়ে দিতেন বা গা মুছে দিতেন এবং বলতেন, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পানি দ্বারা জ্বর নিরাময় করতে আদেশ করতেন।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৫৬৬]

৮. হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জ্বর হলো দোযখের একটি টুকরা। তোমাদের কারো জ্বর হলে সে যেনো তা পানি ঢেলে নিভায়।" (আত-তিরমিযী) [৫৬৭]

এর নিয়ম হচ্ছে, ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রবহমান ঝর্ণায় নেমে স্রোত প্রবাহের দিকে মুখ করে সে বলবে, "আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আপনার বান্দাকে রোগমুক্ত করে দিন এবং আপনার রসূলকে সত্যবাদী প্রমাণ করুন।" অতঃপর ঝর্ণার পানিতে তিনবার ডুব দিবে। তিনদিন এরূপ করবে। তিনদিনেও যদি জ্বর না ছাড়ে তবে পাঁচদিন এরূপ করবে। পাঁচদিনেও নিরাময় না হলে সাত দিন এরূপ করবে। সাতদিনেও ভাল না হলে নয়দিন এরূপ করবে। আল্লাহর হুকুমে জ্বর নয়দিনের বেশি অতিক্রম করতে পারবে না। (আত-তিরমিযী) [৫৬৮]

যারা দু'সপ্তাহের বেশি সময় ধরে জ্বর নিবারণে ব্যর্থ, তারা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করতে পারেন। অন্যত্র নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন যমযমের পানি পান করা হয়, তখন অতিশয় কৃশতাপ্রাপ্ত বা ক্ষয়প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং জ্বরে আক্রান্ত রোগীও আরোগ্যলাভ করে।" (আস-সুয়ূতী) [৫৬৯]

উপরে যে ৮টি হাদীস আমি আলোচনা করলাম, তার প্রায় প্রত্যেকটিতে জ্বরের চিকিৎসায় ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারের উপদেশ বা পরামর্শ দেয়া হয়েছে। প্রখ্যাত হাকীম জালিনুস, যাঁকে আমরা বিজ্ঞানী গ্যালেন নামে জানি, তিনি তার লিখিত 'কিতাবুল বারী' নামক বইয়ে জ্বরের চিকিৎসার জন্য পানিকে সর্বোত্তম ও উপকারী বলে উল্লেখ করেছেন। যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ ইমাম রাযী রহমাতুল্লাহ আলাইহিও তার 'কাবীর' গ্রন্থে জ্বরের চিকিৎসায় ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বলে যে সূর্যই সকল তাপের উৎস। বেহেশ্‌ত-দোযখ সম্পর্কে বিজ্ঞান গবেষণা করে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। তাই এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের সাথে বিরোধ-অবিরোধের কোন প্রশ্নই উঠেনা। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্বরের উৎপত্তি (source of fever) জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। কারণ, জাগতিক সকল তাপের উৎস জাহান্নাম। জাহান্নামের উত্তাপ পৃথিবীর আগুনের তাপের চেয়ে ৭০গুণ বেশি। জাহান্নামের আগুনের ভয়াবহ চিত্র আমরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অনেক হাদীস থেকে জানতে পারি। তাই সেখান থেকেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এ পৃথিবীতে সকল রকম গরম ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়। তাই আমরা বলতে পারি সূর্যের উৎসও জাহান্নাম। কারণ, সূর্যকে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সকল মানুষ, জীব-জন্তু এবং সকল সৃষ্ট জীবের জীবন-ধারণ ও কল্যাণের জন্য, আর জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন দুষ্কর্মশীল লোকদের শাস্তির জন্য।

জ্বরের চিকিৎসায় ঠাণ্ডা পানির ব্যবহার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। জ্বরে পানির ব্যবহার বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত এবং এটি একটি অতি সাধারণ ব্যবস্থা। প্রত্যেক আধুনিক ডাক্তারই এ ব্যাপারে একমত যে পানিই সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজলভ্য, যা জ্বর নিবারণে কার্যকর। জ্বর বেড়ে গেলে শরীরে বা মাথায় পানি ঢেলে তাপ নিবারণ করা প্রাচীনকাল থেকে চলে আশা একটি ডাক্তারি বিধান। এমনকি জ্বরের তাপ অতি মাত্রায় বেড়ে গেলে রোগীর সারা শরীর পানির সাহায্যে ঠান্ডা করা হয়। প্রয়োজনে গোসল করানো হয়। Heat stroke-এ যারা ভোগেন, তাদের জন্য এবং বিশেষ করে tropical countries এ পানির সাহায্যে শরীরের তাপমাত্রা কমিয়ে আনা খুবই সাধারণ একটা বিষয়। তাই জ্বর সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ সবই চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বর্তমানে জ্বর কমাতে আধুনিক ডাক্তারগণ প্রথমে যে ব্যবস্থাপত্র দেন, তাহলো Antipyretic drug, যা হচ্ছে paracetamol বা aspirin বা অন্যান্য analgesic এবং সাথে সাথে মাথায় পানি ঢালা ও শরীর ভেজা কাপড়ে মুছে দেয়া হয়। বস্তুত প্যারাসিটামল নামীয় ওষুধ শরীরের তাপমাত্রা কমাতে সবচেয়ে সাধারণ এবং সস্তা এক প্রকার ওষুধ। এ ওষুধ সেবনের সাথে সাথে ঠান্ডা পানির সাহায্যে সারা শরীর ঘন ঘন মুছে দেয়া উচিত। In fact paracetamel is the safest drug of choice for reducing body temperature, followed by the use of cold water to wipe out the body as frequently as possible. বস্তুত পানির সাহায্যে শরীরের তাপমাত্রা কমানো সবচেয়ে সহজ ও inexpensive উপায়। এ ব্যবস্থাপত্রে কোনো টাকা-পয়সা খরচ হয়না। অনেক ডাক্তার অতি দ্রুত শরীরের তাপমাত্রা কমানোর জন্য গোসল করতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। পরে জ্বর কমে গেলে রক্ত পরীক্ষা করে কারণ নির্ণয় করত সঠিক antibiotic দেয়া হয় সম্পূর্ণ নিরাময়ের জন্য। তাই আমরা দেখতে পাই, জ্বরের চিকিৎসায় ঠাণ্ডা পানির ব্যবহার পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত।

পানির সাহায্যে জ্বরের সাময়িক উপশম হয়। পুরাপুরি নিরাময়ের জন্য জীবাণুনাশক প্রয়োজন হয়। যেমন টাইফয়েড জ্বর। ভাইরাল জ্বরে কোন এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া কার্যকর কোন এন্টিভাইরাল ওষুধ এখনও বাজারে নেই।

এ প্রসঙ্গে আমি আরো একটি হাদীস বর্ণনা করছি, যা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা

করেছেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, "আমি অসুস্থ হলে আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করো এবং ৭ মশক পানি আমার শরীরে ঢেলে দিও।" (সহীহ আল বুখারী) [৫৭০]

ইংরেজি অনুবাদটি এভাবে এসেছে, "Be generous to me in my illness and pour seven water-skins of water over me." (Sahih Al Bukhari) [570]

এখানে অসুস্থতা বলতে 'জ্বরকেই' বুঝানো হয়েছে। কারণ জ্বরই একমাত্র অসুস্থতা, যাতে তিনি প্রায়ই ভুগতেন এবং তাঁর জ্বরের তীব্রতা অন্য সকল মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি ছিলো। তাই জ্বর হলে মাথায় পানি ঢালা ও ঠাণ্ডা পানিতে কাপড় ভিজিয়ে শরীর মুছে দেয়ার ব্যবস্থাপত্র কোনো আধুনিক ডাক্তারের আবিষ্কার নয়। এটি দু'জাহানের নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবস্থাপত্র বা উপদেশ মাত্র। এ প্রসঙ্গে দুটো হাদীস আমি আলোচনা করবো। প্রথমটি বর্ণনা করেছেন হযরত ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, "আমি একবার নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুগ্নাবস্থায় তাঁর খেদমতে গেলাম। তখন তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর শরীরে হাত দিলাম এবং বললাম, আপনার জ্বরের তীব্রতা তো ভীষণ! নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তোমাদের দু'জন লোকের সমপরিমাণ জ্বর আমার একার। ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনার তো দ্বিগুণ সওয়াব (সম্ভবত তাই)। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো মুসলমান যদি কষ্ট পায়, তা রোগ যন্ত্রণাই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক, তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার গুনাহসমূহ দূর করে দেন, যেমনভাবে বৃক্ষের পাতাগুলো ঝরে যায়।" (সহীহ আল বুখারী) [৫৭১]

দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেন, "আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হতে বেশি রোগ যাতনা ভোগ করতে আর কাউকে দেখিনি।" (সহীহ আল বুখারী) [৫৭২]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাথে নিয়ে জ্বরাক্রান্ত এক রোগীকে দেখতে গেলেন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীকে বললেন, "সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন, এটা আমার আগুন যা আমি দুনিয়াতে আমার মুমিন বান্দার ওপর চাপিয়ে দেই, যাতে আখিরাতে তার প্রাপ্য আগুনের বিকল্প হয়ে যায়।" (ইবনে মাজাহ) [৫৭৩]

প্রশ্ন-১৯১ : মুহতারাম, গত একটি পর্বে আপনি জ্বরের চিকিৎসায় ঠাণ্ডা পানির ব্যবহার সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এবার মেহেরবানী করে বলুন, কারো জ্বর হলে বা কেউ অসুস্থ হলে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী পথ্য বা খাদ্য পরিবেশনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন? আধুনিক বিজ্ঞান কি তা সমর্থন করে?

উত্তর : **হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, যখন কেউ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ নিয়ে আসতো যে অমুক ব্যক্তি পেটের অসুস্থতার জন্য খানাপিনা গ্রহণ করছেনা, তখন তিনি উপদেশ দিতেন,** "তার জন্যে কিছু তালবিনা স্যুপ তৈরি করো এবং তাকে

খাওয়াও।" **তিনি আরো বলতেন,** "আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন, তালবিনা তোমাদের পেটকে এমনভাবে পরিষ্কার করে, যেমনভাবে কোনো ব্যক্তি স্বীয় চেহারা হতে ময়লা পরিষ্কার করে থাকে।" (মুসনাদে আহমাদ ও মুসতাদরাকে হাকিম) [৫৭৪]

তিরমিযী শরীফে যে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে সেখানে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনার শেষের অংশটি একটু ভিন্ন। সেখানে তিনি বর্ণনা করেন, "যখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কেউ অথবা তাঁর পরিবারের কোনো ব্যক্তি যদি অসুস্থ থাকতেন, তখন তিনি তাদের জন্যে তালবিনা স্যুপ পাকানোর নির্দেশ দিতেন। সেমতে তাদেরকে স্যুপ পান করাতেন এবং বলতেন, এটি অসুস্থ রোগীর দেহ ও মন তথা অন্তরাত্মায় প্রশান্তি আনয়ন করে এবং তার শরীরের ভেতরের সকল অংশ তথা পাকস্থলী ও নাড়িভুঁড়িকে সহজতর করবে এবং তার দুঃখ-কষ্ট এমনভাবে দূর করবে যেমন মুখ ধৌত করে ময়লা দূর করা হয়।" (আত-তিরমিযী) [৫৭৫]

প্রখ্যাত হাদীসশাস্ত্র বিশারদ আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেন, এখানে 'অসুস্থতা' বলতে 'জ্বরকে' বোঝানো হয়েছে। আর স্যুপ (তালবিনা) বলতে ময়দা, পানি ও চর্বির সংমিশ্রণে তৈরি তরল জাতীয় খাবারকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, "তিনি রোগী ও কারো মৃত্যুতে শোকাকুল ব্যক্তিকে 'তালবিনা' খেতে নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'তালবিনা' রোগীর প্রাণে শক্তি সঞ্চার করে, প্রশান্তি আনয়ন করে ও দুশ্চিন্তা দূর করে।" (সহীহ আল বুখারী) [৫৭৬]

তালবিনা সম্পর্কে আরো ৩টি সহীহ হাদীস আছে। হযরত উরওয়াহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অসুস্থ ও চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে তালবিনা খেতে নির্দেশ দিতেন আর বলতেন, তালবিনা খেতে কষ্টকর বা অতৃপ্তিকর হলেও শরীরের জন্য উপকারী বা পুষ্টিকর।" (সহীহ আল বুখারী) [৫৭৭]

তালবিনা হচ্ছে দুধ ও ময়দা সহযোগে প্রস্তুত এক প্রকার তরল পথ্য জাতীয় খাদ্য। যাহোক, আলোচিত হাদীসগুলো থেকে আমরা জানতে পারি যে Talbina is the best Prophetic medicine for the treatment of sorrows and grief, which modern science supports.

ইউনানি চিকিৎসা ব্যবস্থায় তালবিনা বা যবের গুড়ার মর্যাদা অনেক। প্রখ্যাত হাকীম জালিনুস (Galen) বলেন, যবের সমতুল্য আর কোনো খাদ্য সৃষ্টি করা হয়নি। কারণ এ খাদ্য সুস্থ-অসুস্থ দুই অবস্থায় কাজ করে। এজন্য রোগীকে যবের গুড়া খাওয়ানো হয়, গমের গুড়া খাওয়ানো হয়না। কারণ যবের গুড়া পিপাসা দূর করে, রক্তের চাপ কমায়, পিত্তাধিক্য দূর করে ও পাকস্থলী পরিষ্কার করে। চিনির সাথে মেশালে এটি উত্তম খাদ্যে পরিণত হয়। মূলত সকল নবী-রসূল আলাহিমুস সালামের খাদ্য ছিলো যব বা বার্লি। আর এ জন্যই মুসলমানদের জন্য তা উত্তম খাদ্য। বর্তমানে বাজারে শিশুদের জন্য যেসব solid food **পাওয়া যায় তাতে যবের গুড়া অন্যতম উপাদান হিসেবে থাকে।**

প্রশ্ন-১৯২: তালবিনা স্যুপ কী? এটি কীভাবে তৈরি করা হয়, একটু বুঝিয়ে বলবেন কী?

উত্তর : **তালবিনা স্যুপ যব বা বার্লির ময়দা বা ময়দার ভূষি থেকে তৈরি করা হয়, যার ভিতর সামান্য**

কিছু পরিমাণ দুধ যোগ করা হয়। এতে কিছু মধু মিশিয়ে সুস্বাদুও করা যায়। তালবিনা শব্দটি 'লাবন' থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ দুধ। Barley-এর আরবি নাম তালবিনা। হিন্দি, উর্দু ও ফারসি নাম জাউ। বাংলা যব, ইউনানি নাম Shair। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Hordeum vulgare* (Family-Gramineae)। তালবিনা স্যুপের সাথে অনেক সময় chard, spinach বা leafy vegetables মেশানো হয়ে থাকে একে অধিক রুচিকর (palatable) এবং সুস্বাদু করার জন্য। আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, তালবিনা স্যুপ হচ্ছে পরিপূর্ণ একটি স্যুপ। It is a complete soup. এটি অসুস্থ ব্যক্তির দুঃখ-কষ্ট ও শোক দূর করে, তার সকল প্রকার ব্যথা উপশম করে। অনেকেই বলেন, এটি এক প্রকার laxative, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূরকারী বা পেট স্বাভাবিককারী রেচক ওষুধ। এটি দুঃখ-কষ্ট দূর করে কর্মশক্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। অর্থাৎ It relieves grief and sorrows and fortifies inner energy. বস্তুত যাদের stomach দুর্বল, হজম প্রক্রিয়া অপ্রতুল, অর্থাৎ যাদের digestive insufficiency আছে, তাদের জন্য এটি খুবই উপকারী পথ্য।

সবুজ বার্লি উদ্ভিদ

পাকা বার্লি উদ্ভিদ

প্রশ্ন-১৯৩ : পবিত্র হাদীস শরীফে অসুস্থ রোগীর জন্য তালবিনার সাথে ডালিয়া ও সারিদ-এর বর্ণনা এসেছে। এ দুটো পথ্য জাতীয় খাদ্য সম্পর্কে একটু আলোকপাত করুন। কোন্ কোন্ রোগী এ ধরনের পথ্য জাতীয় ওষুধ খাবে?

উত্তর : হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের কারো জ্বর হলে তিনি দুধ ও ময়দা সহযোগে তরল পথ্য 'ডালিয়া' পাকানোর নির্দেশ দিতেন। সে অনুযায়ী তা তৈরি করা হলে তিনি পরিবারের লোকদের বলতেন অসুস্থ রোগীকে পরিবেশন করতে। তিনি বলতেন, এটি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তির মনে শক্তি যোগায় এবং রোগীর মনের ক্লেশ ও দুঃখ দূর করে, যেমন তোমাদের কোনো মহিলা পানি দিয়ে তার চেহারার ময়লা দূর করে থাকে।" (আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [৫৭৮]

সম্ভবত ডালিয়া ও তালবিনা একই ধরনের পথ্য জাতীয় খাদ্য। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এই ডালিয়া পছন্দ করতেন। তিনি যবকে একটি উত্তম পথ্য, পেটের পীড়ার জন্য উপকারী ওষুধ ও দুর্বলতায় বিশেষ শক্তিবর্ধক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এটি এক ভাগ ভালোভাবে চূর্ণ করা বার্লি ও পাঁচ ভাগ পানি একত্রে জ্বাল করে ২/৫ ভাগে কমিয়ে এনে ছেঁকে নিয়ে চিনি মিশ্রিত করে সেবন করা হয়।

বার্লি (Barley seeds)

বস্তুত তালবিনা বা ডালিয়া সেসব লোকের জন্য, যারা সবেমাত্র অসুস্থতা থেকে আরোগ্যলাভ করেছে অথবা যারা আরোগ্য লাভের পথে রয়েছে। রান্না করা বা সিদ্ধ বার্লি সবই পুষ্টিকর ও যন্ত্রণা প্রশমনকারী। তালবিনা, জাউ বা বার্লি যে নামেই আখ্যায়িত করি না কেনো, যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশেও চিকিৎসকগণ জ্বরে আক্রান্ত ও অন্যান্য অসুস্থ ব্যক্তির জন্য জাউ বা বার্লি জাতীয় খাবার খাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে আসছেন। মূলত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন এ ব্যবস্থাপত্র তারই হুবহু অনুসরণ। আমি সম্মানিত চিকিৎসকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই, জেনে হোক না জেনে হোক, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য।

প্রশ্ন-১৯৪ : তালবিনা বা বার্লিতে কী কী উপাদান আছে? আধুনিক বিজ্ঞান এ পথ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে কী বলে?

উত্তর : বার্লি এক প্রকার তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত। বার্লি শীষে গরুর দুধে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম আছে তার ১১ গুণ ক্যালসিয়াম, spinach যে পরিমাণ iron আছে তার ৫ গুণ iron এবং কমলা লেবুতে যে পরিমাণ ভিটামিন 'সি' আছে তার ৭ গুণ বেশি, অর্থাৎ প্রতি ১০০ গ্রাম কমলালেবুতে ৩৭০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' রয়েছে। Spinach এ প্রতি ১০০ গ্রামে ১.৫ মিলিগ্রাম আয়রণ আছে। তাছাড়া প্রতি ১০০ মিলি গরুর দুধে ১২০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ০.০২ মিলিগ্রাম আয়রণ রয়েছে। প্রতি ১০০ গ্রাম বার্লি শীষে ৮০ মিঃ গ্রাঃ ভিটামিন বি ১২ রয়েছে। সম্ভবত বার্লির এসব পুষ্টিকর গুণাগুণের জন্যই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ ব্যক্তির জন্য বার্লিসমৃদ্ধ পথ্য পরিবেশনের উপদেশ দিতেন। তদুপরি বার্লি শীষে যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ nutrients আছে, যা রোগীর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ও পুষ্টিকর। এ বার্লি সম্পর্কে উম্মে আল-মুনযির বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহা একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যার আলোচনা আমি কোনো পরবর্তী পর্বে করবো ইন্শা'আল্লাহ। যেখানে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম barley and spinach or chard একত্রে মিশিয়ে স্যুপ তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, "হে আলী! এ খাবারটি তোমার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।" বস্তুত আধুনিক বিজ্ঞান বার্লির আরো ওষধি গুণাগুণ আছে বলে গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছে।

It relaxes the bowels and strengthens the body. It helps against coughing and sore throat. The soup is also diuretic. It cleanses the stomach contents, quenches thirst and extinguishes heat.

Chard stem and leaf

প্রশ্ন-১৯৫ : কোনো বাড়িতে কারো আকস্মিক মৃত্যু হলে তার আপনজন তথা নিকটতম আত্মীয়-স্বজন সবাই শোকাহত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকে। এ সময়ে তাদের দুঃখ ও শোক দূর করতে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উপদেশ দিতেন?

উত্তর : হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "যখনই হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কোনো আত্মীয় মৃত্যুবরণ করতেন, তখন অনেক মহিলা তাদের বাড়িতে তশরীফ আনতেন। পরে তাদের প্রায় সবাই চলে গেলে নিকটতম আত্মীয়গণের মধ্যে যারা অধিক দুঃখ ভারাক্রান্ত ও বেশি শোকাহত, তারা আরো কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। তিনি তাদের জন্য তালবিনা বা মিল্ক স্যুপ পাকানোর নির্দেশ দিতেন। তারপর সারিদ তৈরি করে তার উপর তালবিনা ঢেলে দেয়া হতো। অতঃপর তালবিনা সবাইকে পরিবেশন করা হতো। তখন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাদেরকে বলতেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তালবিনা স্যুপ অসুস্থ ব্যক্তির হৃদয়ে প্রশান্তি আনয়ন করে এবং অন্যান্য লোকদের দুঃখ-শোক, যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তা দূর করে।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৫৭৯]

আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তির জন্য শোক পালনকালে খিচুড়ি, রুটি বা সেমাই পাকানোর প্রচলন রয়েছে। এটি সাধারণত মাইয়্যেতের কোনো নিকটতম আত্মীয়-স্বজন নিজেদের পক্ষ থেকে নিয়ে আসে। তবে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত খাদ্য হলো তালবিনা ও সারিদ। এটি একদিকে যেমন খাদ্য, অপরদিকে শোকের প্রতিষেধকও বটে।

প্রশ্ন-১৯৬ : অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তালবিনা ছাড়া আর কী খাদ্য পরিবেশনের জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন? অসুস্থ ব্যক্তিকে জোর করে কোনো পথ্য খাওয়ানো কি সঠিক?

উত্তর : অসুস্থ ব্যক্তির জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালবিনা ছাড়া যবের রুটি খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার জন্য তার বাসায় তশরীফ আনলেন এবং তাকে বললেন, "তোমার কী খেতে ইচ্ছে হয়?" তখন লোকটি বললেন, আমার যবের রুটি খেতে ইচ্ছে হয়। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমাদের ভেতর কারো নিকট যদি যবের তৈরি রুটি থাকে, সে যেনো তার ভাইয়ের জন্য কিছু পাঠিয়ে দেয়।" (ইবনে মাজাহ্) [৫৮০]

গম (Wheat)

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, "তুমি কি কিছু খেতে চাও?" যে বললো, আমি কেক খেতে চাই। তখন তিনি বলেন, "আচ্ছা! তারা তখন তার জন্য সেটা তালাশ করে জোগাড় করলো।" (ইবনে মাজাহ) [৫৮১]

উদাহরণস্বরূপ পিঠা, মিষ্টি, ফলমূল, পোলাও-কোর্মা ইত্যাদি। এ হাদীসটিও ইবনে মাজাহ শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রখ্যাত গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও ওষুধশাস্ত্রের জনক হিপোক্র্যটসও নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশের মতো উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, preference should be given to whatever food or drink appears pleasant, even if it is not good - over whatever is more nutritious. অর্থাৎ তিনি বলেন, "কোন খাদ্য কতটুকু পুষ্টিকর তার চেয়ে গুরুত্ব দেয়া উচিত, কোন খাদ্য বা পানীয় রোগীর কাছে বেশি মনোরম ও সুপ্রিয়। খাদ্য স্বাস্থ্যকর না হলেও রোগীর পছন্দনীয় হলে তাকে তা দেয়া উচিত।"

উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রোগী যা খেতে চায় বা খেতে পারে, তা তার স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী না হলেও তার জন্য তাই পরিবেশন করা উচিত। আমার মনে হয় ঠিক একই ধরনের medical concept আমাদের দেশের সম্মানিত চিকিৎসকগণ পোষণ করে থাকেন। কারণ রোগী যদি

কোনো পথ্য বা খাবার খেতে অপছন্দ করে, তখন তাকে জোরপূর্বক খাওয়ানো সমীচীন নয়, সে খাবার যতো উপকারীই হোক না কেনো। কারণ সে খাবারের প্রতি আগ্রহ বা রুচি না থাকলে সে তা বমি করে ফেলে দিতে পারে। বরং পথ্য জাতীয় হালাল খাবারের মধ্যে যা খেতে রোগীর মন চায়, তাই তাকে দেয়া উচিত। তা নাহলে রোগী না খেয়ে খেয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হবে এবং সে ওঠা-বসা ও চলাচলের শক্তি হারিয়ে ফেলবে।

সুপ্রিয় দর্শক-শ্রোতা ভাই-বোনেরা! আগামী কোনো এক পর্বে আমরা contra-indications in sickness নিয়ে আলোচনা করবো ইনশা'আল্লাহ। যেখানে আমি সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতিসহ প্রমাণ করবো যে ইসলামের মহান নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই drug-drug and drug-food interaction নামক বিস্ময়কর medical concept-এর প্রথম আবিষ্কারক। Adverse effects of medicine, contra-indications in sickness, self-medication ইত্যাদি medical concept-গুলো সম্পর্কেও তাঁর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আপনাদের সে আলোচনা শোনার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাই।

স্মরণশক্তি লোপ পাওয়া (Loss of Memory)

প্রশ্ন-১৯৭ : সহসা ভুলে যাওয়া এক প্রকার অসুস্থতা। একে আমরা স্মরণশক্তি হ্রাস ও স্মৃতিশক্তি লোপ বলে অভিহিত করে থাকি। স্মরণশক্তি বা স্মৃতিশক্তি কমে গেলে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ব্যবস্থাপত্র দিতেন? এ ব্যাপারে কোনো হার্বাল মেডিসিন আছে কি, যা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত?

উত্তর : হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "একদা জনৈক ব্যক্তি তার নিকট এসে স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়ার বিষয়ে অভিযোগ করলো। তিনি তাকে বললেন, Luban বা frankincense গ্রহণ করো। এটা রাতে পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে নিংড়ানো পানি বা water decoction খালি পেটে সেবন করবে। কারণ এটা স্মৃতিশক্তির জন্য উপকারী।" (ইবনুল কাইয়িম) [৫৮২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রহমাতুল্লাহ আলাইহিও একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের নিকট এসে তাকে তার নিজের স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়ার বিষয়ে অভিযোগ করলেন। তখন তিনি উত্তরে বললেন, frankincense বা কুন্দুরখুটি ব্যবহার করো। কারণ, এটা সত্যিকারভাবে হৃদয় বা অন্তরকে শক্তিশালী করে এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়া দূর করে।" [৫৮৩] অর্থাৎ স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে।

ইমাম আবূ নু'য়াইম ও ইমাম আস্-সুয়ূতী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইহা কানযুল উম্মাল কিতাবেও উদ্ধৃত আছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "কোনো ব্যক্তি যদি এক মিসকাল (৪.৩৭৪ গ্রাম) পরিমাণ কুন্দুরখুটির সাথে এক মিসকাল পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করে চূর্ণ করে উক্ত গুড়ো পাউডার খালি পেটে সেবন করে বা গিলে খায়, তাহলে তার প্রস্রাব সংক্রান্ত সমস্যা দূর হবে ও 'স্মৃতিশক্তি হ্রাস' রোগের জন্য উপকারী হবে।" [৫৮৪]

কুন্দুরখুটি গাছ (Frankinsence plant)

এ বর্ণনাটি আবূ নু'য়াইম, ইমাম আস-সুয়ূতী ও ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাদের 'তিব্বুন নববী' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমি দুটো কথা সম্মানিত দর্শক-শ্রোতাবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলছি। আপনাদের মাঝে যাদের স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছে, তারা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের এ ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করতে পারেন। এ রোগের উৎপত্তি যদি আলঝেইমার্স রোগের কারণে না হয়ে অন্য কোনো কারণে হয়ে থাকে, তাহলে আমার বিশ্বাস উক্ত রোগীর স্মরণশক্তি ফিরে আসবে। আপনাকে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের এ ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য দু'য়াও করতে হবে।

এ বিষয়ে আমি আরো একটি হাদীস আলোচনা করব, যা উম্মু জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তবে রোগ নিরাময়ে রসূল সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা পড়ে রোগীকে পান করতে দেন তার বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে নেই। তবে হাদীসের বর্ণনায় জানা যায় যে শিশু রোগীটি সুস্থ হয়েছিল এবং তার মেধাশক্তি সাধারণ মানুষের মেধাশক্তির তুলনায় অধিক বেড়ে গিয়েছিলো। (ইবনে মাজাহ) [৫৮৫]

প্রশ্ন-১৯৮ : ঘর-বাড়ি জীবাণুমুক্ত করার কাজে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন?

উত্তর : হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমার ঘর কুন্দুরখুটি (frankincense), শিহ্ বা কিরমালা (wormwood), মুরর্ (myrrh) ও সা'তার (thyme) এর ধোঁয়ায় ভরে দাও।" (শু'য়াবুল ঈমান) [৫৮৬]

এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী তার শু'আবুল ঈমান কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসটির মান নির্ণয় করা হয়নি।

ইমাম আস-সুয়ূতী বলেন যে ঠিক একই ধরনের আরেকটি হাদীস আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে "তারা তাদের ঘর thyme (সা'তার) এবং frankincense (কুন্দুরখুটি)-এর সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করেছেন।" (ইবনুল কাইয়িম ও আস-সুয়ূতী) [৫৮৭]

কুন্দুরখুটি রেজিন (Frankinsence resin)

সা'তার গাছ (Thyme plant)

হাদীসের এ বর্ণনাটিও আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার তিব্বে নববী গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়া ঘর-বাড়ি জীবাণুমুক্ত করার বিষয়ে আরো কয়েকটি হাদীস রয়েছে, যেখানে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম frankincense (লুবান), wormwood (শিহ্, কিরমালা), myrrh (মুর) এবং thyme (সা'তার) নামক গাছ-গাছড়ার কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমি অন্য কোনো পর্বে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন-১৯৯ : কুন্দুরখুটি ব্যবহার সম্পর্কে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো কোনো বক্তব্য আছে কি?

উত্তর : আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের নারী সম্প্রদায় যখন পেটে সন্তান ধারণ করে, তখন তাদের frankincense বা লুবান খাওয়াও, কারণ নিঃসন্দেহে এর ফলে যে শিশুর আগমন ঘটতে যাচ্ছে, সে শক্তিশালী হৃদয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। আর যদি শিশুটি কন্যা সন্তান হয়, তাহলে তার গঠন আকৃতি

খুবই সুন্দর হবে এবং তার নিতম্ব প্রশস্ত হবে।" ইমাম আবূ নু'য়াইম ও ইমাম আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহির তিব্বুন নববী গ্রন্থে এর উদ্ধৃতি রয়েছে। [৫৮৮]

গন্ধরাশ গাছ ও রেজিন (Myrrh tree and resin)

প্রশ্ন-২০০ : কুন্দুরখুটির ব্যবহার সম্পর্কে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : এতোক্ষণ যে আলোচনা করলাম, তার সারাংশ হচ্ছে, 'কুন্দুরখুটি' একটি উৎকৃষ্ট হার্বাল ওষুধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যা মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পেলে তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। তাছাড়া urinary troubles-এও এর ব্যবহার চলবে। সম্মানিত দর্শক-শ্রোতাবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলছি, যেহেতু ভুলে যাওয়া এক প্রকার অসুস্থতা, তাই প্রয়োজনবোধে আপনারা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদিত ওষুধটি ব্যবহার করুন। আমরা জানি আলঝেইমার্স রোগ হলে মানুষের স্মরণশক্তি কমে যায়। Alzheimer's disease is caused due to deficiency of neurotransmitter in the nervous system. কাজেই ঐ রোগের ভাল চিকিৎসা হলে স্মরণশক্তি লোপ হ্রাস পাবে। এই স্মরণশক্তি কমে যাওয়াকে ডাক্তারি ভাষায় dementia বলা হয়। সাধারণত বার্ধক্যজনিত কারণে রক্তনালী সরু হয়ে গেলে রক্ত সঞ্চালন কমে গিয়ে স্মরণশক্তির ওপর প্রভাব ফেলে যাকে আমরা progressive atherosclerotic dementia বলে থাকি। আজকাল এ রোগের চিকিৎসায় তেমন কোনো কার্যকরী allopathic ওষুধ নেই। তাই হার্বাল মেডিসিনের উপর নির্ভর করতে হয়। সময়াভাবে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। Pharmaceutical scientists বা ভেষজ বিজ্ঞানীদের অনুরোধ জানাবো আপনারা এ

গন্ধরাশ রেজিন (Myrrh resin)

গাছের water extract নিয়ে pharmacological screening করুন। আমার বিশ্বাস আপনারা bioactive compound isolate করতে সক্ষম হবেন যে (যেসব) active constituent(s) গুলো loss of memory রোগে কার্যকরী।

প্রশ্ন-২০১: ইমাম মুহতারাম, আপনি গুরুত্বপূর্ণ একটি হার্বাল মেডিসিনের কথা বললেন, যা স্মরণশক্তি হ্রাসের চিকিৎসায় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। অনুগ্রহপূর্বক এবার তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলবেন, যাতে দর্শকবৃন্দ গাছটি খুঁজে পেয়ে এর নিংড়ানো পানি পান করে উপকৃত হতে পারেন।

উত্তর : Frankincense বা olibanam ওষধি গাছটির ইংরেজী নাম। বাংলা নাম 'সালাই' বা 'কুন্দুরখুটি'। ইউনানি নাম কুন্দুর। আর আরবি নাম হচ্ছে লুবান, কুন্দুর বা লাবান। এই গাছটির বোটানিক্যাল নাম হচ্ছে Boswellia serrata Roxb, যা Burseraceae প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। গাছটির ব্যাপারে একটি গল্প আছে। কথিত আছে, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে যখন বেহেশত থেকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়, তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে gold (স্বর্ণ), myrrh (গন্ধরাশ) ও frankincense (কুন্দুরখুটি) দেয়া হয়। অপরদিকে বাইবেলে Gospel of Mathew (2:11)-এ উল্লেখ আছে যে, Biblical magi যিশুখ্রিস্টকে gold, myrrh ও frankinsence প্রদান করেন।

গাছটি থেকে arromatic resin পাওয়া যায়। এই গাছটি যুগ যুগ ধরে ওষুধি ও প্রসাধনীর কাজে প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই গাছটি মানুষের দীর্ঘায়ু লাভ ও স্মরণশক্তি হ্রাসের চিকিৎসায় এবং এর ধোঁয়া দুষ্ট আত্মা বা বদনযর তাড়িয়ে দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হতো।

ডায়রিয়া, আমাশয় ও পেটের পীড়া (Diarrhoea / Dysentery)

প্রশ্ন-২০২ : ডায়রিয়া, আমাশয় বা পেটের রোগ-ব্যাধিতে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ধরনের ব্যবস্থাপত্র দিতেন?

উত্তর : ডায়রিয়া, আমাশয় বা পেটের পীড়ায় আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু সেবনের উপদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে যে বিখ্যাত হাদীসটি reference হিসেবে আলোচনা করছি, তা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো, 'আমার ভাইয়ের পেটে ব্যথা অথবা সে আমাশয় বা ডায়রিয়ায় ভুগছে।' নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে মধু পান করিয়ে দাও।' সে ব্যক্তি চলে গেলো তবে আবার ফিরে এসে বলল, 'আমি তাকে মধু পান করিয়েছি, কিন্তু মধুতে কোনো উপকার হয়নি।' তখন তিনি পুনরায় তাকে মধু পান করাতে বললেন। এভাবে আরো দুবার এসে একই কথা বললো, আমাশয় বা পায়খানা বেড়ে গেছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থবার বললেন, 'আল্লাহই সত্য বলেছেন, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যে বলছে। তাকে মধু পান করাও।' সুতরাং সে ব্যক্তি তার ভাইকে পুনরায় মধু পান করালো এবং সে সুস্থ হয়ে গেলো।" [৫৮৯]

বিশুদ্ধ মধু (Pure honey)

সহীহ আল বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও আত-তিরমিযীতে হাদীসটি উল্লেখ আছে। হাদীসটির শেষ কথা হলো "সে মধু পান করালো এবং সুস্থ হয়ে গেলো।" অন্যত্র এক বর্ণনায় আছে যে "সে ব্যক্তিটি তিনবার মধু সেবন করলো এবং সুস্থ হয়ে উঠলো।"
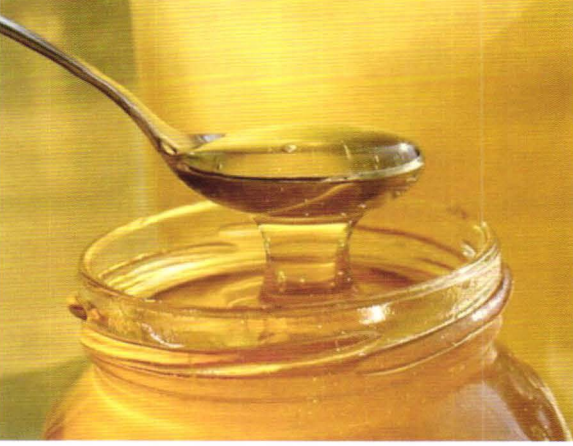
এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে হঠাৎ ডায়রিয়া, আমাশয় বা এ ধরনের রোগের চিকিৎসায় প্রথমে চিকিৎসকগণ একটু বেশি ওষুধ অর্থাৎ Loading dose দিয়ে থাকেন এবং ২/৩ ঘণ্টা অন্তর উক্ত ওষুধ সেবন করতে বলেন। তাই ৩/৪ বার ওষুধ সেবনে ডায়রিয়া না থামলে এর অর্থ এ নয় যে ওষুধটি কার্যকর নয়। বরং পরিমাণ মতো নির্দিষ্ট dose মোতাবেক ওষুধ সেবন করলেই রোগ নিরাময় হয়ে থাকে। উক্ত ব্যক্তির বেলায়ও একই অবস্থা ঘটেছিল। "Allah has said the Truth and your brother's stomach lied." এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে মধু ডায়রিয়া বা আমাশয় রোগে সত্যি কার্যকর। তাই বর্তমানে মধুকে 'পাকস্থলীর বন্ধু' বা 'friend of the stomach' বলা হয়ে থাকে। Honey is also bactericidal অর্থাৎ 'রোগজীবাণু ধ্বংসকারী।'

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদিত এই prescription-এর সাথে আমি বর্তমান সময়ের খাবার স্যালাইনের তুলনা করতে চাই। স্যালাইন প্রথমদিকে কয়েক ঘণ্টা পরপর পান করতে হয়। কারণ শরীর থেকে যে পানি বের হয়ে যায় তা স্বাভাবিক করা প্রথম কাজ। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট পরিমাণ স্যালাইন শরীরে না প্রবেশ করালে এর সুফল পাওয়া যায়না। পরে ৫/৬ ঘণ্টা পরপর পান করতে হয়। তদ্রূপ উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে অসুস্থ বক্তির আমাশয় প্রথমদিকে না থামার কারণ যথেষ্ট পরিমাণ মধু সেবন করা হয়নি। পরে যখন বেশ কয়েক dose মধু সেবন করা হয়, তখন রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।

শোথরোগ বা দেহে পানি আসা (Oedema)

প্রশ্ন-২০৩ : ইডিমা বা ড্রপসি অর্থাৎ দেহে পানি আসা রোগের চিকিৎসায় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন?

উত্তর : সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত আছে বেশ বড় একটি হাদীস। বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। হাদীসটির প্রথম অংশ আমি এখানে আলোচনা করবো।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "মদীনার আবহাওয়া (উকল ও উরাইনা গোত্রের) কতিপয় লোকের জন্য প্রতিকূল হলে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাঁর উটের রাখালের সাথে বাস করার নির্দেশ দিলেন এবং তারা উটপালের রাখালের সাথে গিয়ে থাকতে লাগলো। তিনি তাদের ঐসব উটের দুধ ও মূত্র ওষুধ হিসেবে সেবন করতে বললেন। তারা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক উটের দুধ ও মূত্র পান করে সুস্থ হয়ে ওঠে।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও আত-তিরমিযী) [৫৯০]

হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফেও উদ্ধৃত আছে। ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহ আলাইহির বর্ণনা অনুযায়ী তাদের রোগটি ছিলো ড্রপসি বা শোথরোগ। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "উরায়নার কয়েকজন বেদুঈন লোক নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তাদের রং হলদে হয়ে গেলো এবং পেট ফুলে গেলো।" (আন-নাসাঈ) [৫৯১]

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিসকা বা শোথরোগগ্রস্ত এক ব্যক্তির চিকিৎসককে তার পেটে সেগাফ বা incision করতে বললেন। তখন জনৈক ব্যক্তি আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! চিকিৎসা কি কোনো উপকারে আসে? নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যিনি রোগ দিয়েছেন তিনিই প্রতিষেধক বা নিরাময় দিয়েছেন। তিনি যে কোনো উপায়ে রোগ মুক্তি দিয়ে থাকেন।" (যাদুল মা'আদ ও আবূ দাউদ) [৫৯২]

হাদীসটি হুবহু উপরোক্ত ভাষ্যে কোনো হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়নি। তবে মুসতাদরাকে হাকীমে নিম্নবর্ণিত ভাষ্যে উল্লেখ আছে যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা রোগ সৃষ্টি করেছেন এবং চিকিৎসা পাঠিয়েছেন।" (মুসতাদরাকে হাকিম) [৫৯৩]

ইডিমা বা শোথ রোগ is an accumulation of fluid in the subcutaneous layers. এটা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। তন্মধ্যে এক প্রকার হলো ইসতিকায়ে ঝাকি। এই ধরনের শোথ রোগীর জন্য operation-এর প্রয়োজন হতে পারে। যাহোক, এই হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত রোগের বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিলো। তাছাড়া কোন্ রোগে কী ধরনের চিকিৎসা দেয়া উচিত, সে বিষয়টি তিনি জানতেন।

প্রশ্ন-২০৪ : উটের দুধ ও মূত্র পান করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে বলুন।

উত্তর : **সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা! এবার চলুন আলোচনা করি উটের মূত্র পান করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে।**

হযরত সালেহ, আহমদ ইবনে হাম্বল, আব্দুল্লাহ আল আখরাম ও ইব্রাহীম ইবনে আল-হারাহ একটি হাদীস বর্ণনা করেন, "অতীব প্রয়োজনে উটের মূত্র পান করার অনুমতি আছে।" [৫৯৪]

হাদীসটি আল বুখারী উদ্ধৃত করেছেন।

আমরা যে কয়টি হাদীস আলোচনা করলাম সেখান থেকে এটি পরিষ্কার যে, dropsy রোগের চিকিৎসায় অন্যতম ওষুধ হলো উটের মূত্র ও দুধপান করা। এটা hormonal therapy. আর এ therapyই নবী

করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদন দিয়েছেন। এছাড়া অন্য উপায়েও এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। বর্তমানে এ রোগের চিকিৎসায় বাজারে অনেক কার্যকর ওষুধ পাওয়া যায়।

বিশ্বের সকল মুসলমানই এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষ বা অন্য কোনো চতুষ্পদ প্রাণীর মূত্র নাপাক এবং তা পান করা হারাম বা নিষেধ। আর ইসলাম নাপাক, অপবিত্র ও অবৈধ কোনো বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতি অনুমোদন করেনা। তবে বিশেষ জরুরি মুহূর্তে যদি হালাল বা বৈধ কোনো ওষুধ না পাওয়া যায় এবং রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়, তখন তা ব্যবহারের অনুমতি আছে। আমাদের এই উপমহাদেশে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ডায়াবেটিস রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য নিয়মিত তার নিজের মূত্র সেবন করতেন। যাহোক, মুসলমানদের জন্য এ ধরনের নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। কারণ diabetes is a controllable disease এবং অনেক বৈধ allopathic এবং herbal medicine আছে, যার মাধ্যমে ডায়াবেটিস রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

যাহোক, আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করছিলাম, তা হচ্ছে চতুষ্পদ প্রাণীর মূত্রের গুণাগুণ সম্পর্কে। আমরা জানি, pregnant mare's urine-এ estrogen নামক hormone পাওয়া গেছে এবং লক্ষ লক্ষ লিটার urine সংগ্রহ করে খুব অল্প পরিমাণে estrogen hormone isolate করা হয়। আজকাল Premarim নামক estrogen product post-menoposal মহিলাদের দেয়া হয়। আমার সামনে এই মুহূর্তে কোনো গবেষণাগারের তথ্য নেই যে, উটের মূত্রে কী কী estrogen জাতীয় পদার্থ আছে। আমরা জানি না what was the actual diagnosis of the disease those people were suffering from. সম্ভবত উরাইনা গোত্রের লোকগুলো male hormonal deficiency diseases-এ ভুগছিল, যার জন্য ঐরূপ hormonal therapy প্রয়োজন ছিলো। আর এ জন্যই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য উটের দুধ ও মূত্র সেবনের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন এবং এই বিকল্প ওষুধ সেবনে তারা সুস্থ হয়ে ওঠে।

শিঙ্গা লাগানো (Cupping / Hijamah)
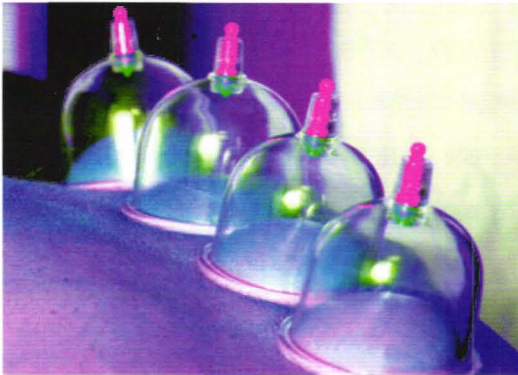
Cupping (Hijamah) on the back

প্রশ্ন-২০৫ : আচ্ছা মুহতারাম, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নত ছিলোনা। তবে উচ্চ রক্তচাপ বা high blood pressure নামক ব্যাধিটি তখনো ছিলো। তখন তিনি কোন্ পদ্ধতিতে উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা করতেন? বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান কি তা সমর্থন করে?

উত্তর : সাধারণ প্রচলিত ওষুধ ছাড়াও নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতিতে রোগ নিরাময়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ইংরেজিতে বা আধুনিক ভাষায় তাকে আমরা alternative medicine বলে অভিহিত করে থাকি। অত্যধিক রক্তচাপে শিঙ্গা লাগানো এর মধ্যে অন্যতম। According to the Prophet (SWAS), cupping treatment is a cure for every disease, pain and ailment. এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি সহীহ হাদীস রয়েছে।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যেসব পদ্ধতিতে রোগের চিকিৎসা করছো তন্মধ্যে শিঙ্গা লাগানো এবং কুসতে বাহারী (চন্দন কাঠ) অতি উত্তম ব্যবস্থা।" (সহীহ আল বুখারী) [৫৯৫]

কুসতে বাহারী এক প্রকার সাদা বর্ণের কাঠবিশেষ। বাংলায় এটি চন্দন কাঠ নামে অভিহিত। এটি রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমাদের চিকিৎসাসমূহের মধ্যে উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে শিঙ্গা লাগানো, মধুপান ও আগুন দিয়ে দাগ দেয়ার মধ্যে। তবে আমি আগুন দিয়ে দাগ দেয়া পছন্দ করিনা।" (সহীহ আল বুখারী) [৫৯৬]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন যা সহীহ আল বুখারীতে উদ্ধৃত আছে। [৫৯৭]

আব্দুর রহমান ইবনে আবূ নু'য়াইম রহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানিয়েছেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, মানুষ যেসকল জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করে, তন্মধ্যে উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে শিঙ্গা লাগানো।" (মুসতাদরাক) [৫৯৮]

হযরত আবূ তায়বা রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'শিঙ্গা লাগানো ও কুসতে বাহ্‌রী ব্যবহার সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা ব্যবস্থা।' (সহীহ আল বুখারী) [৫৯৯]

হযরত নাফে রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা বললেন, হে নাফে! আমার রক্তের মধ্যে বিশেষ চাপ উত্তেজনা বা স্ফূটন সৃষ্টি হচ্ছে। তাই একজন হাজ্জাম বা শিঙ্গা লাগানেওয়ালাকে ডাকো। সে যেনো যুবক হয়, বৃদ্ধ বা অল্প বয়সী না হয়। অতঃপর ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "খালি পেটে শিঙ্গা লাগানো খুবই উত্তম। এতে রোগমুক্তি ও বরকত রয়েছে। এতে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং স্মৃতি ও মেধাশক্তি প্রখর হয়।" (ইবনে মাজাহ ও মুসতাদরাক) [৬০০]

Wet cupping therapy in Iraq

Glass on the back in Shivago Thai Clinic, Edinburgh

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোনো ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ করাতে চাইলে সে যেন মাসের সতের, উনিশ বা একুশ তারিখকে বেছে নেয়। তোমাদের কারো যেন উচ্চ রক্তচাপ না হয়। কারণ তাতে তার জীবননাশের আশংকা থাকে।" (ইবনে মাজাহ) [৬০১]

উচ্চ রক্তচাপের কারণে বর্তমান মানুষ যে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করে এ হাদীসটি তার দিকেই ইংগিত করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছে।

পূর্বের আলোচিত হাদীসগুলো ছাড়াও এখানে আমি আরো কয়েকটি সহীহ হাদীস আলোচনায় আনবো যে কখন, কীভাবে কোন্ কোন্ স্থানে শিঙ্গা লাগানো উত্তম।

Glass cupping (Hijamah) on the back for treating every disease, pain and ailment

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মি'রাজের রাতে যখন আমি প্রতিটি ফেরেশতাদের দল অতিক্রম করি, তখন তারা আমাকে বলেন, 'হে মুহাম্মদ! তোমার জাতিকে শিঙ্গা লাগাতে (রক্তমোক্ষণ করাতে) নির্দেশ দাও।" (ইবনে মাজাহ) [৬০২]

জামে তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। [৬০৩]

ইবনে মাজাহ শরীফে উদ্ধৃত হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছে। হাদীসের ভাষা একই। [৬০৪]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা মুবারকে যে ব্যথা ছিলো তার জন্য ইহরাম অবস্থায় তিনি শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন।" (আন-নাসাঈ) [৬০৫]

Cupping on the knees

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় কাঁধের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের ফোলা অংশে রক্তমোক্ষণ করাতেন (শিঙ্গা লাগাতেন)।" (আবূ দাউদ, আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [৬০৬]
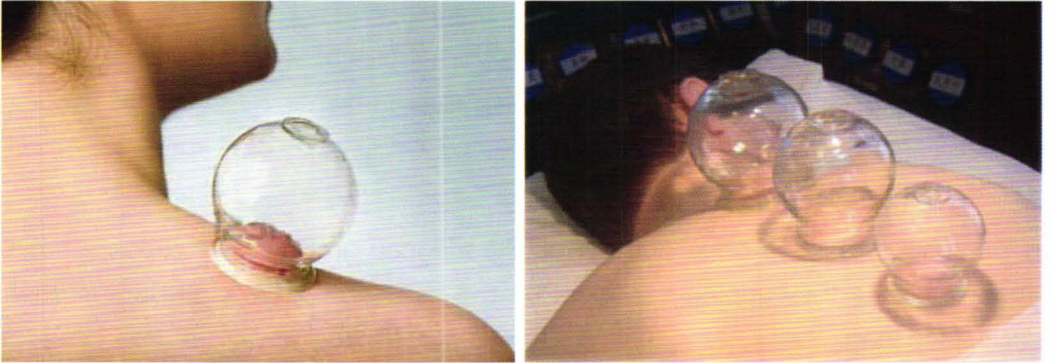
Patient receiving Chinese cupping treatment to shoulder and back

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ব্যথার কারণে মাথায় এবং ক্লান্তি ও অবসন্নতার কারণে স্বীয় রানে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন।" (আবূ দাউদ) [৬০৭]

ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ। তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘোড়া থেকে একটি খেজুরগাছের ওপর ছিটকে

পড়ে গেলে তাঁর পা মচকে যায়। ওয়াকী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ব্যথার কারণে তিনি মচকে যাওয়া স্থানে রক্তমোক্ষণ করান।" (ইবনে মাজাহ) [৬০৮]
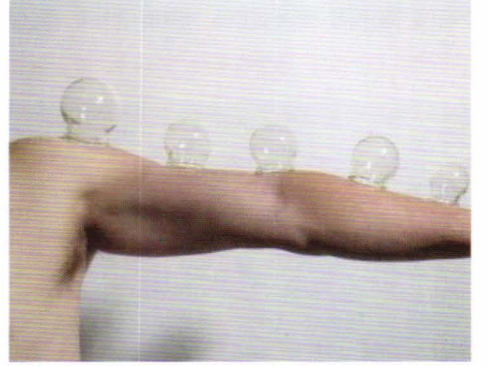
Glass cupping on the arm is done at an acupuncture clinic in Torbay, England

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ব্যথার জন্য ইহরাম বাধা অবস্থায় তাঁর মাথায় শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। সে সময় তিনি 'লাহইয়ে জামাল' নামক পানির কূপের নিকট ছিলেন।" (সহীহ আল বুখারী ও আন-নাসাঈ) [৬০৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনা রাদিয়াল্লাহু আনহুও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "মক্কার পথে লাহইয়ে জামাল নামক স্থানে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার মধ্যখানে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৬১০]

ইমাম আবূ দাউদ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত স্থানেই শিঙ্গা লাগিয়েছেন। আর মা'মার রহমাতুল্লাহি আলাইহি ভুল করে মাথায় লাগিয়েছিলেন। ফলে তাঁর জ্ঞানশক্তি এতোই লোপ পায় যে তাকে নামাযে সূরা ফাতিহা স্মরণ করিয়ে দিতে হতো।

In Damascus, Syria a good number of experienced and efficient cuppers have been practising the cupping treatment on the head, lower back and areas near waist since long.

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন।" (সহীহ আল বুখারী) [৬১১]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "শিঙ্গা লাগানোর ফলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পিঠ হালকা হয়।" (মুসতাদরাক) [৬১২]

ইবনে মাজাহ শরীফে উদ্ধৃত হাদীসের বর্ণনা নিম্নরূপ। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রক্তমোক্ষনকারী বান্দা কতই না উত্তম! সে খারাপ বা দূষিত রক্ত বের করে দিয়ে (উপার্জনের মাধ্যমে) পিঠের বোঝা হালকা করে এবং চোখের ময়লা দূর করে। (ইবনে মাজাহ) [৬১৩]

অনুরূপভাবে হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শিঙ্গা লাগালে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং স্মৃতি ও মেধাশক্তি প্রখর হয়।" (মুসতাদরাক) [৬১৪]

Cupping done on the back side of head

Cupping on the head in Lahore (Pakistan)

আছেম রহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে বর্ণিত। "জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু 'মুকান্না' নামে এক ব্যক্তিকে সেবা শুশ্রূষা করতে গেলেন। অতঃপর বললেন, তুমি রক্তমোক্ষণ না করানো পর্যন্ত আমি যাবো না। কেননা আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এতে রোগের নিরাময় রয়েছে।" (সহীহ আল বুখারী) [৬১৫]

আমি যেসব হাদীস আলোচনা করলাম, এগুলো ছাড়াও আরো বেশকিছু হাদীস আমরা হাদীস গ্রন্থসমূহে দেখতে পাই, যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন অসুস্থতায় নিজে শিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং শিঙ্গা লাগাতে তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছেন। Modern science tells us that cupping on the head improves eye function, relieves migraine, prevents strokes and promotes upper sensory functions.

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বলে যে মাথায় শিংগা লাগালে চোখের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-২০৬ : শিঙ্গা লাগানো বিষয়টি কী? এই medical conceptটি বুঝিয়ে বলুন। শিঙ্গা লাগানোর ফলে কী কী রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়?

উত্তর : শিঙ্গা লাগানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীরের অস্বাভাবিক ধাতু রসসমূহ অর্থাৎ abnormal body fluid দূর করা। শিঙ্গা লাগানোকে ইংরেজিতে cupping বলা হয়। অর্থাৎ কাপের মাধ্যমে শিঙ্গা লাগানো হয়। এই শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন স্থানে চামড়ার নিচ থেকে দূষিত রক্ত টেনে বের করে ফেলে দেয়া হয়। বাংলায় এ পদ্ধতিকে রক্তমোক্ষণও বলা হয়।

Cupping is a simple method of pulling 'stuck', stagnant and congealed blood and fluids out from the infected area. Plastic, glass or bamboo cups are placed on the skin and then applied using suction. Cups are kept for three to fifteen minutes according to the judgement of the acupuncturist / cupper. This Chinese cupping technique releases tight, painful muscles and increases blood circulation. After the first cups are removed, small incisions are made on the skin to release dead blood cells drawn from the body.

এ শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতি চীন দেশে প্রচলিত আছে এবং এরই উন্নত সংস্করণ হচ্ছে অ্যাকুপাংচার (acupuncture). এখনও আমেরিকার অনেক হাসপাতালে এ পদ্ধতির চিকিৎসা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা (alternative medicine) হিসেবে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানে এ পদ্ধতিতে চিকিৎসার প্রচলন আছে। এ শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতি আনুমানিক ৩৫০০ বছর আগে থেকে চলে আসছে। বর্তমানে এটি এশিয়া ও মুসলিম দেশসমূহ যথা চীন, পাকিস্তান, ভারত, ইরান, মালয়েশিয়া ও আরব দেশসমূহে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। ইরাকের বেশ কিছু ক্লিনিকে wet cupping এর মাধ্যমে চিকিৎসা দেয়া হয়। থাইল্যাণ্ডে এ পদ্ধতির চিকিৎসা প্রায় ২৫০০ বছরের পুরনো।
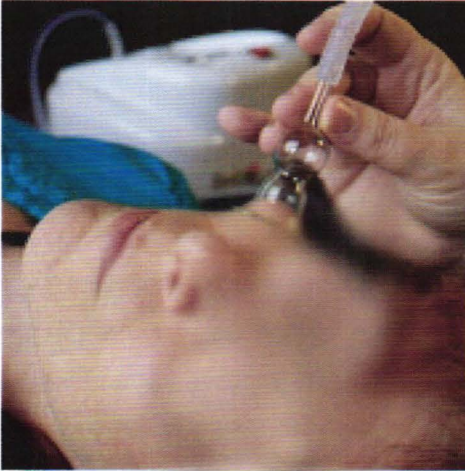
Facial cupping in the USA for wellness and anti-aging

এবার আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর দিচ্ছি যে কোন্ কোন্ রোগে শিঙ্গা লাগানো যায় এবং শিঙ্গা লাগালে কী কী উপকার হয়?

Modern science tells us that cupping can be used for respiratory diseases, as well as digestive and gynaecological disorder, headaches and dizziness, and lymphatic blockages. The common cold can be tackled with cupping, as well as insomnia and soft tissue injuries. The bruises resulting from cupping are not

painful and only last a couple of days.

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহ আলাইহি ও আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বিভিন্ন রিওয়ায়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থায় শরীরের অত্যধিক রক্তচাপ কমায়, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় এবং পাগলামি দূর করে। এছাড়া এ পদ্ধতির চিকিৎসায় leprosy ও epilepsy রোগ দূর হয়।

পাকিস্তানে ও বাংলাদেশের অনেক প্রাচীন ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, চিবুকের নিচে শিঙ্গা লাগালে গলা ও দাঁতের ব্যথা উপশম হয়। মাথায় আরাম বোধ হয়। পায়ের গোড়ালিতে শিঙ্গা লাগালে রান ও পায়ের গোছার ব্যথা নিরাময় হয় এবং খোস-পাঁচড়া জাতীয় চর্মরোগ ভালো হয়। সিনার নিচে শিঙ্গা লাগালে ফোঁড়া, পাঁচড়া, খুজলি, দুম্বল, চর্মরোগ ও অর্শ্বরোগ দূর হয়। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগল, কুষ্ঠরোগী ও মৃগী রোগের জন্য শিঙ্গা লাগানোকে চিকিৎসা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে তদানীন্তন আরব সমাজে যখন উচ্চ রক্তচাপের কোনো সুনির্দিষ্ট ওষুধ ছিলোনা, তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যবস্থাপত্র দিতেন, যা আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থন করে।

টনসিলাইটিস ও ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহ (Tonsilytis and pleurisy)

প্রশ্ন-২০৭ : টনসিলাইটিসের চিকিৎসার জন্য রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস আছে কি?

উত্তর : **হযরত উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,** "তোমরা এই উদে হিন্দী (কুসত) ব্যবহার করবে। কেননা, এতে সাত প্রকার রোগের নিরাময় আছে। (শিশুদের) আলজিব ফুলে ব্যথা হলে তা ঘষে পানির সাথে ফোঁটা ফোঁটা করে তাদের নাকে দিবে। ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহ হলে ঐরূপে (তৈরি করে) পান করাবে।" (সহীহ আল বুখারী) [৬১৬]

উদে হিন্দী বা ভারতীয় কাঠ হলো গিরি মল্লিকা ফুলগাছের কাঠ। ইউনানি শাস্ত্রমতে এর নাম কুসতে হিন্দী বা কুসতে শিরীন। আরবীতে উদ মানে কাঠ। উম্মে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহা আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেন যার ভাষা বেশ আলাদা। তিনি বলেন, "আমি আমার ছেলেকে নিয়ে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হলাম। ছেলেটির আলজিহ্বা ফোলার অসুখ ছিলো। আমি তার জিহ্বায় সজোরে চাপ দিয়ে তালু দাবিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি বললেন, এভাবে নিজ সন্তানদের গলা চেপে দিয়ে কেনো কষ্ট দিচ্ছো? তোমরা এই কুসতে হিন্দী ব্যবহার করো। কেননা তাতে সাতটি রোগের নিরাময় আছে। ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহ (পাঁজরের ব্যথা)ও এর অন্তর্ভুক্ত। আলজিহ্বা ফোলার ব্যথা হলে তা (কুসতে হিন্দী) গুড়া করে ঘসে পানির সাথে মিশিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে নাকের ভিতর দিবে। আর ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহ (পাঁজরের ব্যথা) হলে মুখ দিয়ে তা খাওয়াতে হবে।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৬১৭]

এ হাদীসটি অন্যত্র একটু আলাদা ভাষায় বর্ণিত করেছেন হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু

আনহু। তিনি বলেন যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাচ্ছো, রক্ষমোক্ষণ করানো এবং কুসতে বাহ্‌রী ব্যবহার করা তার মধ্যে অতি উত্তম ব্যবস্থা। তিনি আরো বলেছেন, (গলগ্রহ হলে) তোমাদের শিশুদের জিহ্বার তালু দাবিয়ে তাদের কষ্ট দিওনা। (বরং) তোমরা কুস্‌ত ব্যবহার করো।" (সহীহ আল বুখারী) [৬১৮]

কুসতে বাহ্‌রী এক জাতীয় সাদা বর্ণের কাঠবিশেষ। এটি রোগে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হাদীসের শব্দাবলী কিছুটা ভিন্ন । [৬১৯]

মুসনাদে আহমাদ-এ অনুরূপ একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যা হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির ভাষা উপরোক্ত হাদীসের ভাষা থেকে আলাদা। তিনি বলেছেন, "একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট এলে একটি বালক দেখতে পান, যার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। তিনি বলেন, 'ওর কী হয়েছে?' আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'বালকটি টনসিলাইটিসে ভুগছে।' তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের জন্য আফ্‌সোস! তোমাদের ছেলেমেয়েদের এভাবে তোমরা মেরে ফেলোনা। অর্থাৎ শিশুদের নালিতে এভাবে চাপ দিওনা, যাতে শিশুরা এ অবস্থার শিকার হয়। যে মায়ের শিশু এ রোগে ভুগছে সে যেনো ইণ্ডিয়ান কুসতা গুঁড়া করে পানির সাথে মিশিয়ে বা পানিতে ভিজিয়ে রস নিংড়িয়ে তার শিশুর নাকে প্রবেশ করায়।' হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ ব্যবস্থাপত্র মেনে চলার জন্য মহিলাটিকে উপদেশ দেন। ফলে ওষুধটি ব্যবহারে বালকটির টন্‌সিলাইটিস ভালো হয়ে যায়।" (মুসনাদে আহমাদ ও মুসতাদরাক) [৬২০]

অপরদিকে মুসতাদরাকে হাকীম হাদীস গ্রন্থে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসটি এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে, "এক মহিলা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার এই ছেলেটি গলনালির আবদ্ধতাজনিত রোগে (কণ্ঠনালীর ব্যথা) ভুগছে। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, " তোমরা তোমাদের সন্তানদের গলনালি পুরিয়ে দিওনা। তোমাদের জন্য জরুরি হলো 'কুস্‌তে হিন্দি ও 'ওয়ারস্‌'। অতঃপর ছেলেটির নাকে ওষুধটি প্রবেশ করানো হলো।" (মুসতাদরাকে হাকিম) [৬২১]

ইবনে মাজাহ শরীফে উদ্ধৃত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, উম্মে কায়স বিনতে মিহসান। হাদীসের ভাষ্য বেশ আলাদা। তিনি বলেন, "আমি আমার এক পুত্রসহ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম। তার আলজিহবায় ব্যথার দরুন তা আমি জোরে চাপ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "কেন তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের আলজিহবার ব্যথায় এভাবে চাপ দিয়ে কষ্ট দাও? এই চন্দন কাঠ অবশ্য তোমাদের ব্যবহার করা উচিত। কেননা তাতে সাত ধরনের নিরাময় রয়েছে। আলজিহবার ব্যথায় নাকের ছিদ্রপথে তা প্রবেশ করাতে হবে এবং ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহে তা মুখের ভিতর ঢেলে দিতে হবে।" (ইবনে মাজাহ) [৬২২]

'ওয়ারস্‌' হচ্ছে এক প্রকার রঙ্গের গাছ। এর ইংরেজী নাম Pseudo-saffron. আর বাংলা নাম হচ্ছে সালপান বা বান জাফরান। ইউনানী, পারস্যীয়, হিন্দি ও উর্দু নাম হচ্ছে ওয়ার্‌স্‌ বা ওয়ারুস।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুখের সময় আমরা তাঁর মুখে ওষুধ ঢেলে দেই। কিন্তু তিনি আমাদেরকে ইশারায় তাঁর মুখে ওষুধ দিতে নিষেধ করেন। আমরা মনে করলাম, রোগী ওষুধ খেতে অনীহা প্রকাশ করেই থাকে (অর্থাৎ ওষুধের প্রতি বিতৃষ্ণার কারণে তিনি এরূপ বলেছেন)। অতঃপর চেতনা লাভ করে তিনি বললেন, তোমাদের সকলেরই মুখে ওষুধ ঢেলে দেয়া হবে, একমাত্র আব্বাস ব্যতীত। কারণ তিনি তোমাদের সাথে (আমাকে ওষুধ সেবনে) জড়িত ছিলেননা।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৬২৩]

প্রশ্ন-২০৮ : মুহতারাম! এই কুসতে হিন্দি বা ইন্ডিয়ান কুসতার পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলবেন?

উত্তর : Plant-টির English নাম : Costus, Indian costus

Costus (Saussaurea costus plant)

Arabic	: Kust, Qust al-Hindi, Ud al-Hindi, Qust al-Bahri
Bangla	: Kusta Pachuk, Kut/Agar Kath
Urdu/Hindi	: Goth
Persian	: Kusht-shirin
Botanical names	: Two varieties, Saussaurea costus and Saussaurea lappa

এ দুটো species-ই Asteraceae family-এর অন্তর্ভুক্ত। Qust-al-Bahri হচ্ছে সাদা কুস্ত আর Qust-al-Hindi হচ্ছে কালো কুস্ত।

স্বাদের দিক থেকেও কুস্ত দুই প্রকার : একটি 'কুশ্তে হালুয়ে' বা মিষ্টি কুস্ত, আর অপরটি 'কুশ্তে মুররা' বা তিক্ত কুস্ত। ইউনানি চিকিৎসকগণ বর্ণনা করেন যে কুসতে বাহ্রী প্রস্রাব ও ঋতুবন্ধতা নিরসন করে শরীরের দূষিত পদার্থ চুষে নেয়। প্লীহার সংকোচনতা দূর করে, বুক ও গর্ভস্থলির বেদনায় উপকার হয়। হজমশক্তি বৃদ্ধি করে এবং মস্তিষ্ক ও সন্ধিস্থানের বেদনা দূর করে। যাহোক, বিস্তারিত আলোচনার এখানে সুযোগ নেই। বিস্তারিত আমার লিখা Medicine and Pharmacy in the Prophetic Traditions (Sunnah) নামক বইতে পাবেন, যা এখন সৌদি আরবের রিয়াদে একটি প্রেসে মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে।

Costus (Saussaurea lappa plant)

কুসতা পাচুক মূল (Saussaurea costus root)

এর আগের পর্বে এবং আজকের আলোচনায় আমরা আরো একটি বিষয় জানতে পেরেছি, তাহলো নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গলনালীর আবদ্ধতা, গলগণ্ড রোগ ও নিউমোনিয়া এ কয়েকটি রোগেই কুস্‌ত ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন।

নিউমোনিয়া ও ফুসফুসের প্রদাহ (Pneumonia and pleurisy)

প্রশ্ন-২৯৮ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসায় কী কী ব্যবস্থাপত্র দিতেন? হাদীস শরীফে এর উপর কী কী বর্ণনা এসেছে?

উত্তর : বিখ্যাত সাহাবী হযরত যায়িদ ইবনে আকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুসতে বাহ্‌রী (চন্দন কাঠ) এবং যয়তুন তেল দ্বারা নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসা করার নির্দেশ দিয়েছেন।" (আত-তিরমিযী ও মুসতাদরাকে হাকিম) [৬২৪]

কুসতে বাহ্‌রী হচ্ছে Indian costus-এর বাংলা নাম কুঠ, আগর কাঠ, কুশতা পাচুক ইত্যাদি। আরবি নাম হচ্ছে উদ আল-হিন্দ বা কুস্‌ত আল-হিন্দী। কুসতে বাহরীর বাংলা নাম গোঠ। আর যয়তুন তেল হচ্ছে জলপাইয়ের তেল বা olive oil. এটি আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

প্রশ্ন-২১০ : নিউমোনিয়া রোগের কোনো প্রতিষেধক আছে কি?

উত্তর : হযরত যায়িদ ইবনে আকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিউমোনিয়া রোগের প্রতিষেধক হিসেবে জলপাই ও বান জাফরান বা সালপান (ওয়ার্‌স) এর খুব প্রশংসা করতেন।" (আত-তিরমিযী) [৬২৫]

ইবনে মাজাহ শরীফে উদ্ধৃত হাদীসের বর্ণনা একটু আলাদা। যায়িদ ইবনে আকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহে ওয়ার্‌স ঘাস, চন্দন কাঠ ও যয়তুন তেল (পিষে একত্রে) মিশিয়ে প্রলেপ দেয়ার ব্যবস্থাপত্রের প্রশংসা করতেন।" (ইবনে মাজাহ) [৬২৬]

বান জাফরান বা সালপান হচ্ছে এক প্রকার হলুদ রং, যা 'ফ্লেমিংগিয়া গ্রাহামিয়ানা' নামক লেগুমিনাস জাতীয় উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। এটি ইয়েমেনে উৎপন্ন হতো। এর আরবি নাম 'ওয়ারস'। এতে সামান্য সুঘ্রাণ ও তিক্ততা আছে। এটি কাপড় রঞ্জিত করার কাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যয়তুন (জলপাই) ও যয়তুন থেকে আহরিত তেল (Olive and olive oil)

যাহোক, যয়তুন তেল অনেক উপকারী এবং প্রাচীন ও আধুনিক চিকিৎসকগণ একে অনেক রোগ নিরাময়ের উপাদান হিসেবে নির্বাচন করে থাকেন। এই যয়তুন তেলের মাধ্যমে কী কী রোগের চিকিৎসা করা যায় তা অন্য কোনো পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশা'আল্লাহ।

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা! উপরে উল্লিখিত হাদীস ও যায়িদ ইবনে আকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় কুস্‌তে বাহ্‌রী (গোঠ) ও যয়তুন (জলপাই)-এর তেল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। রসূল সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "তোমরা যয়তুন (জলপাই) ফল খাও এবং এর তেল মালিশ করো। কেননা, এটা বরকতময় ও প্রাচুর্যময় গাছের ফল।" (আত-তিরমিযী) ৬২৭

হাদীসটি বর্ণনা করেন আবূ উসাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। যায়িদ ইবনে আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতার সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে জানা যায়। (আত-তিরমিযী) ৬২৮

নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় যয়তুন তেল অর্থাৎ জলপাইয়ের তেল অনেক উপকারী। একে ত্বক সিক্ত ও সতেজকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন প্রাচীন এবং আধুনিক অনেক চিকিৎসক। উম্মে কায়স বিনতে মিহসান রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা ইণ্ডিয়ান উদ (চন্দন কাঠ, Ud-al-Hindi) ব্যবহার করো। কারণ এতে ৭ ধরনের রোগ নিরাময় রয়েছে, যার মধ্যে pleurisy বা ফুসফুসের বহিরাবরণের প্রদাহ অন্যতম।" (মুসনাদে আহমাদ) ৬২৯

ফুসফুসের আবরক ঝিল্লির প্রদাহ সম্পর্কিত রোগে মিহসান-কন্যা উম্মে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই উদে হিন্দী (চন্দন কাঠ) ব্যবহার করবে। কেননা তাতে সাতটি রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহ। অপরদিকে ইবনে সামআনের বর্ণনায় জানা যায়, "কেননা তাতে সাতটি প্রতিষেধক আছে, যার একটি হলো ফুসফুস ঝিল্লির প্রদাহ।" (ইবনে মাজাহ) ৬৩০

That is, it contains seven types of cures. In other words it heals seven complaints, among them one is pleurisy.

তাই আমাদের উচিত এ তিনটি উদ্ভিদের extracts নিয়ে pharmacological screening করা। ফলে আমরা নিউমোনিয়ার রোগের জীবাণুতে উক্ত extract গুলোর জীবাণু নষ্টকারী গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে পারবো।

রক্তক্ষরণ, প্রদাহ ও জখম (Bleeding, inflammation and injury)

প্রশ্ন-২১১ : প্রদাহ ও যখমের চিকিৎসায় অথবা রক্তপড়া বন্ধে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উপদেশ দিতেন?

উত্তর : **সাহল ইবনে সা'দ আস্-সায়িদী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে আহতদের চিকিৎসা করাতেন অথবা রক্তক্ষরণ বন্ধ করতেন? তিনি উত্তরে বলেন,** "(উহুদের ময়দানে) যখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ চূর্ণ হয়ে গেলো, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো এবং দাঁত ভেঙ্গে গেলো, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঢাল ভর্তি করে পানি এনে তা ঢালতে লাগলেন এবং ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর মুখমণ্ডলে রক্ত ধুইতে লাগলেন। কিন্তু ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন দেখলেন যে পানির তুলনায় রক্ত বেশি (অর্থাৎ রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছিলনা) তখন তিনি (খেজুর পাতার) একটি চাটাই-এর কিছু অংশ পোড়ালেন এবং নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষতস্থানে

(ছাই) লাগিয়ে দিলেন। ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলো।” (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) ৬৩১

খেজুরগাছের সবুজ পাতা (Green date plant leaves)

সহীহ আল বুখারীতে আরো একটি হাদীস আছে যা হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়িদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, “নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখমের বা আহত স্থানের চিকিৎসা কী দিয়ে করা হয়েছিল?” তিনি জবাবে বললেন, এ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক পরিজ্ঞাত আর কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট নেই। অতঃপর তিনি বলতে লাগলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঢাল ভরে পানি আনছিলেন, আর ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর চেহারা হতে রক্ত ধুচ্ছিলেন। তারপর খেজুর পাতার একটা চাটাই এনে জ্বালিয়ে তার ছাই তাঁর যখমে ভরে দেয়া হলো”। অর্থাৎ ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয়া হলে রক্ত পড়া বন্ধ হয় (সহীহ আল বুখারী) ৬৩২
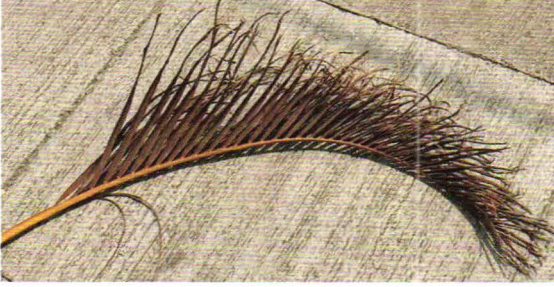
চাটাই তৈরির উপযোগী খেজুরপাতা

ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হাদীসটির ভাষাও অনুরূপ। (ইবনে মাজাহ) ৬৩৩

এ দুটো হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে খেজুরপাতার ছাই রক্ত পড়া বন্ধে (রক্ত নিরোধক) কার্যকর। কারণ এর মধ্যে রক্তের প্রবাহ বন্ধ করার গুণাবলি রয়েছে। যে সমস্ত chemicals রক্তক্ষরণ বা bleeding বন্ধ করে থাকে, সে সমস্ত পদার্থের antihaemorrhagic principles থাকতে হবে। পোড়া খেজুর গাছের পাতা রক্ত নিরোধক হিসেবে কার্যকর। কারণ এর মধ্যে রক্তের প্রবাহ বন্ধ করার গুণাবলি রয়েছে। ইহা রক্তের প্রবাহ থামাতে সাহায্য করে। ইহা তরল রক্তকে শুকিয়ে দেয় এবং চামড়ার আহত জায়গায় এটা ব্যবহার করলেও জ্বালা-পোড়া খুবই কম থাকে। Burnt leaves of date palm act as a styptic agent. A styptic is an agent that stops the flow of blood. It dries up the liquid blood easily. It has least burning effect on the exposed skin. That is,

it has anti-haemorrhagic principle.

খেজুর গাছের শুকনো পাতার ছাই রক্ত নিরোধক হিসেবে কার্যকর। তাই যদি কারো হাত-পা কেটে গিয়ে রক্তপড়া শুরু হয়, তখন এ ছাই ক্ষতস্থানে লাগালে রক্তপড়া বন্ধ হবে। খেজুর পাতার ছাইয়ের ভেতরে drying property সম্পন্ন উপাদান রয়েছে। আপনারা এই ছাই শুকিয়ে বোতলে রেখে দিন। হঠাৎ করে কোনো শিশু আছাড় খেয়ে পড়ে আহত হলে বা কেটে গেলে হাতের কাছে কোনো ওষুধ না থাকলে এই ছাই ব্যবহার করুন। দেখবেন রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

পোকা-মাকড়ের কামড় ও বিচ্ছুর দংশন (Insect bite)

প্রশ্ন-২১২ : পোকা-মাকড়ের কামড়ে বা বিচ্ছুর দংশনে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ব্যবস্থা নিতেন?

উত্তর : বিচ্ছুর দংশনে আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাৎক্ষণিকভাবে লবণ-পানি ব্যবহার করতেন। এ ব্যবস্থাটি আমরা একটি হাদীস থেকে জানতে পারি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "এক রাতে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায়কালে হাত মাটিতে রাখলে অন্ধকারে একটি বিচ্ছু তাঁকে দংশন করে। তৎক্ষণাৎ তিনি একটু লবণ চেয়ে নিয়ে পানিতে মেশান। অতঃপর ঐ লবণ মিশ্রিত পানি বিচ্ছুর দংশিত স্থানে ঢালছিলেন, আর অন্য হাত দ্বারা ক্ষতস্থান বা আক্রান্ত স্থান মালিশরত অবস্থায় পবিত্র কুরআনের সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করছিলেন।" হাদীসটি শু'আবুল ঈমান ও মিশকাত শরীফে উল্লেখ আছে।[৬৩৪]

সাধারণ খাওয়ার লবণ (Common salt)

সুধীবৃন্দ! সাধারণ লবণ বা sodium chloride দ্বারা চিকিৎসা সর্বপ্রথম আল্লাহর নবী বর্ণনা করেছেন। এটা আমাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে, লবণ দিয়ে চিকিৎসার জনক হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বর্তমানে লবণ দিয়ে চিকিৎসাকে halotherapy বা salt therapy বলা হয়ে থাকে।

ইউরোপে halotherapy একটি প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা ব্যবস্থা। এটা আক্রমণধর্মী চিকিৎসা নয়।

এই লবণ দিয়ে চিকিৎসার ধারণা মানুষ পায় ১৮০০ শতকের গোড়ার দিকে। ১৮০০ শতকের মধ্যভাগে পোল্যান্ডের জনৈক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা লক্ষ্য করেন যে, লবণ খনির শ্রমিকরা কখনও ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয় না। ১৮৪৩ সালে মানবদেহের ওপর লবণ কণার প্রভাব নিয়ে তিনি একটি বই লেখেন। তার সহকর্মী পোল্যান্ডের ক্রাকাউ শহরের নিকটবর্তী স্থানে ওষুধসম্পন্ন একটি খনিজ পানির ঝরণা খুঁজে পান। ঐ ঝরণায় অসুস্থ ব্যক্তি গোসল করলে রোগ ভালো হয়ে যেত। যাহোক, আমাদের আলোচনার বিষয় এই যে, লবণ যে বিষক্রিয়া নিরাময়ে কাজ করে তা সর্বপ্রথম আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়েছেন।

আঙুল ও গায়ে ফোঁড়া (Pimple and abscess)

প্রশ্ন-২১৩ : আঙুলে ফোঁড়া হলে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উপদেশ দিতেন?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর আমি একটি হাদীস থেকেই দিতে পারি। ইবনুস সুন্নী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে "একবার রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মহীয়সী স্ত্রীর আঙুলে একটি ফোঁড়া (pimple) বের হয়। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কি জারিরাহ আছে? আমি বললাম জি হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, "ফোঁড়ার উপর জারিরাহ লাগিয়ে দাও, আর পাঠ করো, হে আল্লাহ! আপনি বড়কে ছোট এবং ছোটকে বড় করে থাকেন। মেহেরবানী করে যা থেকে আমি ভুগছি তা ছোট করুন।" [৬৩৫]

হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ও মুসতাদরাকে হাকিমে উল্লেখ আছে। ইহা এটি সহীহ হাদীস।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইহরাম পরিধান করেন এবং যখন তা খুলে ফেলেন তখন আমি তাঁর দেহ জারিরাহ (sweet flag)-এর সাহায্যে সুগন্ধিযুক্ত করতাম।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৬৩৬]

ইংরেজিতে এই ওষুধের নাম হচ্ছে sweet rush or sweet flag. আরবি নাম হচ্ছে জারিরাহ (Dhareerah) বা আল-ভাজ।

বচ, শ্বেত বচ (Sweet flag, Sweet rush)

জারিরাহ বীজ (Sweet flag seeds)

ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জারিরাহ হচ্ছে এক প্রকার ভারতীয় ওষুধ যা sweet flag-এর reed থেকে তৈরি করা হয়। এটি পাকস্থলী ও লিভারের জন্য বেশ উপকারী। এট হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী করে। কারণ, এতে সুগন্ধি আছে। ইবনে সীনা বলেন, কোনো স্থান পুড়ে গেলে গোলাপ পানি ও ভিনেগার মিশ্রিত sweet flag-এর চেয়ে আর কোনো উত্তম ওষুধ নেই। sweet flag-এর reed হচ্ছে নরম, হালকা এবং কিছুটা সঙ্কোচক বা astringent গুণাগুণ বিদ্যমান। এর drying effect আছে, যার ফলে ফুলে যাওয়া বা স্ফীত হওয়া pimple দূরীভূত হয়।

প্রশ্ন-২১৪ : কারো গায়ে ফোঁড়া দেখা দিলে অথবা ফোঁড়া বড় হয়ে পেকে সেখানে পুঁজ সৃষ্টি হলে আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ব্যবস্থাপত্র দিতেন?

উত্তর: এ প্রশ্নের উত্তর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস থেকে দেবার চেষ্টা করবো ইনশা'আল্লাহ। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক আনসার ব্যক্তিকে দেখতে গেলাম। তার (শরীরে) ফোঁড়া হয়েছিলো। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা তাঁর (শরীর) থেকে উহাকে বের করোনা কেনো?" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর অস্ত্রোপচার (incision) করে তা বের করা হলো। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন।" (মুসনাদে আবি ইয়া'লা আল মাউসিলী ও মাজমাউয যাওয়াইদ) [৬৩৭]

রিওয়ায়াতটি যাদুল মা'আদ গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এ ভাষ্যে রিওয়ায়াতটি কোনো হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়নি।

"একদা জনৈক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার জন্য আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। উক্ত ব্যক্তির কোমরে ফোঁড়ার কারণে ফোলা ছিলো। লোকেরা বলতে লাগলো, এতে পুঁজ রয়েছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উক্ত ফোঁড়া operation (incision) বা সেগাফ করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে সেগাফ বা অপারেশন করে ফেললাম।" (যাদুল মা'আদ) [৬৩৮]

এই হাদীস আলোচনা করলে আমরা জানতে পারি যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মতো আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ ফোঁড়াটির ইনসিশন করেছিলেন। হাদীসটি থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইনসিশন বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। অন্যথায় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এমন জটিল কাজ করার জন্য নির্দেশ দিতেন না। কারণ অস্ত্রোপচার বা surgical operation তো বাচ্চাদের খেলনা নয় যে প্রত্যেকে এটি করতে পারবে বা যে কোনো লোকের দ্বারা এ কাজটি সম্পন্ন করা যাবে। এ হাদীসের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি

যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু সাধারণ বা প্রাকৃতিক অর্থাৎ natural medicine-ই prescribe করেননি, প্রয়োজনবোধে surgical operation-এর বিষয়েও প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেন। এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির উপরও অগাধ জ্ঞান রাখতেন। কোন্ ধরনের অসুস্থতায় কী ধরনের ওষুধ বা কোন্ পদ্ধতির ওষুধ সেবন করা উচিত, তা তিনি জানতেন। তিনি সাধারণত হার্বাল মেডিসিন তথা natural medicine দ্বারা চিকিৎসা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন।

হাদীসটির শিক্ষা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ আমাদের দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও ফোঁড়া পেকে গিয়ে ভেতরে pus formation হলে তখন incision করে থাকেন। এটিই সর্বোত্তম চিকিৎসা। পরে কাটা অংশ দ্রুত শুকানোর জন্য antibiotic prescription দিয়ে থাকেন।

নিতম্বের বেদনা (Sciatic pain)

প্রশ্ন-২১৫ : Sciatic pain বা নিতম্বের বেদনা, বাংলায় যাকে আমরা গৃধ্রশী রোগ বলি। এ রোগের চিকিৎসায় আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন? একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

উত্তর : হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "দুম্বার লেজে নিতম্বের বেদনা রোগের (পাছার বাত রোগের) শিফা রয়েছে। এটাকে দ্রবণ করে অর্থাৎ পিষে বা গুলিয়ে তিনভাগ করবে এবং তা খালি পেটে তিনদিন সেবন করবে।" [৬৩৯]

হাদীসটি ইবনে মাজাহ হাদীস গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। অপর হাদীসটিও বর্ণনা করেন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, যা মুসতাদরাকে উদ্ধৃত রয়েছে। এখানে হাদীসের বর্ণনার ভাষা একটু ভিন্ন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যাযাবর রাখালদের পালিত ভেড়ির লেজ (ewe's tail) থেকে প্রাপ্ত চর্বিতে নিতম্বের বেদনা রোগের নিরাময় রয়েছে। চর্বিকে জ্বাল দিয়ে গলিয়ে দ্রবণ সৃষ্টি করে তিনভাগে ভাগ করে পরপর তিনদিন তা খালি পেটে সেবন করবে।" (মুসতাদরাকে হাকিম) [৬৪০]

Sciatic pain একটি জটিল রোগ, যা পুরুষ বা মহিলা উভয়েরই হতে পারে। এটাকে Sciatic nerve এর বেদনাও বলা হয়। এ বেদনা এতো তীব্র যে কষ্ট ছাড়া মানুষ সবকিছু ভুলে যায়। সাধারণত এ রোগের বেদনা মেরুদণ্ডের হাড্ডি থেকে আরম্ভ করে রগের মধ্য দিয়ে পায়ের গিট পর্যন্ত নিম্নভাগে অসহনীয় উপায়ে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। দুর্বলতা, বার্ধক্য ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শুষ্কতা (dryness of body organs) এ রোগের সাধারণ কারণ। তাছাড়া বার্ধক্যজনিত অথবা আঘাতজনিত কারণে মেরুদন্ডের vertebra prolapse or collapse হয়ে থাকে। It is caused due to PLID (Prolapse Intervertebral Disc). তাই রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী দুম্বার চাক্কি এ রোগের উৎকৃষ্ট ওষুধ।

ভেড়ির লেজ (Fat tailed Bedouin sheep)

আল-কাহ্হান ইবনে তারখান বলেন, "সায়াটিক রোগের এ চিকিৎসা বেদুঈন আরবদের জন্য এবং যারা এ রোগে ভোগে, তাদের জন্য উৎকৃষ্ট। যেহেতু বেদুঈনদের ভেড়ার fat tail-এ যে চর্বি আছে, তা thick এবং viscous. তাই এটিকে জ্বাল দিয়ে গলিয়ে তরল পদার্থে রূপান্তরিত করলে তা সহজে নরম হবে।"

ইবনুল কাইয়্যিম রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস হিজায ও তার আশপাশের এলাকার লোকজন ও বেদুঈন আরবদের জন্য প্রযোজ্য এবং এটা তাদের জন্য এ রোগের উৎকৃষ্ট ওষুধ। কারণ এ রোগের উত্তম নিরাময়ই হচ্ছে laxative ব্যবহার করা।" (ইবনুল কাইয়িম) [৬৪১]

মুসতাদরাকে হাকিম গ্রন্থে আরো কয়েকটি রিওয়ায়াতের উল্লেখ আছে, যেখানে একথা অতিরিক্ত উল্লেখ আছে যে, "চাক্কি অতি বড় বা ছোট না হওয়া উত্তম এবং দুম্বার চাক্কির কথা বলা হয়েছে।"

যাযাবর বেদুঈনদের পালিত ভেড়ির লেজের চর্বি নিতম্বের বেদনার ওষুধ।
Fat tailed Bedouin sheep show the fat on their back sides.

মরুভূমির আরবরা তাদের ভেড়ীর স্বাস্থ্যকে wormwood এবং artemisia ঘাস খাওয়ায়ে সবল ও সতেজ করে থাকে। কারণ এ দুটো ঘাস সায়াটিক বেদনা নিরাময়ে কাজ করে। ইমাম আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি রিওয়ায়াত পেশ করেন। জনৈক ইয়াহূদী সায়াটিক বেদনায় আক্রান্ত হয়ে উটের দুধ ও মাংস নিজের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সে আরোগ্য লাভ করলে তখন সে তার নিজের ছেলে-মেয়েদের জন্য তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। (আস-সুয়ূতী) [৬৪২]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম নিতম্বের বেদনা রোগের চিকিৎসায় আরবি মাঝারি ধরনের দুম্বার লেজ গলিয়ে তিনদিন সেবন করার চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, "আমি তিনশত জনেরও অধিক লোককে এ চিকিৎসা প্রদান করেছি এবং তারা সবাই এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন।" (মুসতাদরাকে হাকিম ও আবু নু'য়াইম) [৬৪৩]

এ হাদীসটি আস্-সুয়ূতীর Prophetic medicine গ্রন্থে উল্লেখ আছে। আমি সম্মানিত medical scientistsদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দুম্বার লেজে যে fat আছে, তার analgesic activity নির্ণয় করার জন্য pharmacological screening করা উচিত। কিছু ইঁদুর নিয়ে সহজেই এ পরীক্ষা করা যেতে পারে। This can be a M.Phil student's project work in clinical pharmacology, and the finding of this research may be the researcher's original contribution to the development of Prophetic medicine.

এই প্রসঙ্গে পিঠের বেদনা নিরাময়ের জন্য আমি একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা মুসনাদে আহমাদ কিতাবে উল্লেখিত আছে। আবূ রিমসা আত-তামিনী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতাকে নিয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠে বেদনা বা ক্ষত ছিলো। তিনি বললেন, "আপনার পিঠের ব্যথা দূর করতে দিন, কারণ আমি একজন চিকিৎসক। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনি আমার বন্ধু, আল্লাহ হচ্ছেন চিকিৎসক।" (মুসনাদে আহমাদ) [৬৪৪]

আবূ দাঊদ শরীফে যে বর্ণনা এসেছে, তা হচ্ছে আবূ রিমস্া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমার পিতা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আপনার পিঠে কী হয়েছে তা আমাকে দেখান। কারণ আমি একজন চিকিৎসক। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, চিকিৎসক তো আল্লাহই! তুমি বরং রোগীর (আমার) বন্ধু। তিনি আরো বলেন, আসল চিকিৎসক তো তিনিই, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন (এটা পাঠিয়েছেন)।" (আবূ দাঊদ) [৬৪৫]

ত্বকের প্রদাহ ও চুলকানি (Skin inflammation and itching)

প্রশ্ন-২১৬ : আচ্ছা মুহতারাম, ত্বকের প্রদাহ বা চুলকানি রোগের চিকিৎসায় আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উপদেশ দিয়েছেন?

উত্তর : **এ প্রশ্নের উত্তর হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত একটি হাদীস থেকে দেয়ার চেষ্টা করবো ইনশা'আল্লাহ। তিনি বলেন,** "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারেশ বা চুলকানির কারণে হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রেশমের কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিলেন।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৬৪৬]

আমরা জানি যে পুরুষের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য ও মোটা ও মিহি রেশমী কাপড় ব্যবহারের অনুমতি নেই। (সহীহ আল বুখারী) [৬৪৭]

তবে মহিলারা তা ব্যবহার করতে পারেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম (রেশমী কাপড়) পরিধান করবে, সে আখিরাতে কখনো তা পরিধান করবেনা (বা করতে পারবেনা)।" (সহীহ আল বুখারী) ৬৪৮

হযরত সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুও একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। (সহীহ আল বুখারী) ৬৪৯

যাহোক, অসুস্থতার কারণে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতিক্রম অনুমতিও দিয়েছিলেন। কারণ রেশম কোমল ও ঠাণ্ডা প্রকৃতির। এই prescription-এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, অন্যান্য কাপড়ের ন্যায় সিল্কের বা রেশমী পোশাক শুষ্কও নয়, আবার পুরুও নয়। যেহেতু skin rash শুষ্ক ও পুরু জিনিসের কারণে হয়ে থাকে, রেশমী কাপড় এক্ষেত্রে উপকারী বলে বিবেচিত হতে পারে। Medically রেশম এক প্রকার পোকা বা গুটি পোকা থেকে উৎপন্ন হয়। এতে রোগ নিরাময়ের গুণাবলি আছে এবং এটা যন্ত্রণাদি উপশমকারী। আল-রাযী বলেছেন, "রেশম লিনেনের চেয়ে গরম, আবার cotton বা সুতার চেয়ে ঠাণ্ডা। সম্ভবত এসব কারণেই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুলকানি ও চামড়ার ফুস্‌কুড়িতে রেশমি কাপড় ব্যবহারের জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

ঘুম রোগ (Narcolepsy / paralysis)

প্রশ্ন-২১৭ : আচ্ছা মুহতারাম, নিদ্রালুতাজনিত রোগ তথা ঘুমরোগকে আমরা narcolepsy বলে থাকি। অনেকে paralysis নামেও অভিহিত করে থাকে। এ রোগের চিকিৎসায় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাথমিক ব্যবস্থাপত্র কী ছিলো?

উত্তর : ঘুমরোগের আবির্ভাব বর্তমান সউদি আরবের হিজায প্রদেশে। ঘুমরোগ ঐ ব্যাধিকে বলে যার কারণে মানুষের শরীরে কোনো অনুভূতি-নড়াচড়া, গরম-ঠাণ্ডা কিছুরই বোধশক্তি থাকেনা। হযরত আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবূ উসমান আন-নাহদী থেকে জেনে বর্ণনা করেছেন, "একদল লোক একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং তারা সে গাছের ফল খেয়ে নেয়। তখন তারা হঠাৎ paralysed হয়ে যায় (অর্থাৎ তারা অনুভূতিহীন ও নির্বাক হয়ে যায়)। মনে হয় যে তাদের ওপর কোনো বিশেষ বাতাস প্রবাহিত হওয়ার ফলে তারা জমে বরফে পরিণত হয়েছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রে বলেন, "পানির মশকে কিছু পরিমাণ পানি ঠাণ্ডা করো এবং তারপর সে পানি প্রত্যুষে অর্থাৎ ফজরের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে তাদের উপর ঢেলে দাও বা ঝাপটা মার।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, কানযুল উম্মাল ও ইবনুল কাইয়িম) ৬৫০

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলে সউদি আরবে সাধারণ তাপমাত্রা অনেক বেশি। তবে প্রত্যুষে অর্থাৎ সকালের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে পানির তাপমাত্রা অনেক কম থাকে। তাই ঐ সময়ে কোনো অচেতন ব্যক্তির শরীরে পানি ছিঁটিয়ে দিলে তার জ্ঞান ফিরে আসতে পারে। এ চিকিৎসা ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতির অনুরূপ। কারণ কোনো ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন হলে ইউনানি চিকিৎসামতে তার মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দেয়া হয়ে থাকে।

এ বক্তব্যের সমর্থনে একটি হাদীস এখানে আলোচনায় আনবো যা সহীহ আল বুখারীতে উদ্ধৃত আছে। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে দেখতে আসলেন। তারা আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করলেন এবং উদ্বৃত্ত পানি আমার গায়ে ছিঁটিয়ে দিলেন। ফলে আমার সংজ্ঞা ফিরে আসলে দেখলাম যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার সম্পত্তির ব্যাপারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবো? আমার ধন-সম্পদের ব্যাপারে কী ফয়সালা করে যাবো? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথার কোনো জবাব দিলেন না। ইতিমধ্যে মীরাস সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো।" (সহীহ আল বুখারী) [৬৫১]

সউদি আরবের হিজায একটি তাপপ্রধান ও গরম এলাকা বিধায় সর্বত্র দুর্বল ও সহজ প্রবৃত্তিজাত উত্তাপ বিদ্যমান থাকে। তাই যারা ঘুম রোগে আক্রান্ত, তাদের গায়ে প্রত্যুষে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিলে সহজ-প্রকৃতিগত উত্তাপ সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, তাকে প্রবলভাবে সক্রিয় করে এবং শরীরের ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহে তা ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, অনেক আধুনিক ডাক্তারের মতে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই রোগ নিরাময় পদ্ধতি একটি বিস্ময়কর remedy. তবে গ্যালেন বা হিপোক্রাটস্ যদি নারকোলেপসির এই remedy আবিষ্কার করতেন তবে মানুষ আশ্চর্য হতো এবং এ remedy রোগ নিরাময়ে এ ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার শুরু করতো।

হৃদরোগ ও বুক ব্যথা (Heart diseases and chest pain)

প্রশ্ন-২৭৮ : আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হৃদরোগে বা heart disease (cardiac pain)-এর জন্য কী ব্যবস্থাপত্র দিতেন?

উত্তর : **Heart disease বা হৃদরোগে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজওয়া খেজুর খাবার ব্যবস্থাপত্র দিতেন। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,** "একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে তশরীফ আনেন। তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক আমার বুকের উপর রাখলেন। তাঁর পবিত্র হস্তের শীতলতা আমার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। অতঃপর নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি অন্তরে কষ্ট অনুভব করছো। (তুমি হার্টের রোগী) কাজেই তুমি সাকীফ গোত্রের অধিবাসী হারিস ইবনে কালাদাহর নিকট যাও। কারণ সে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। আর সে যেন মদীনার ৭টি আজওয়া খেজুর নিয়ে বিচিসহ পিষে তোমার জন্য তা দিয়ে সাতটি ট্যাবলেট তৈরি করে দেয়।" (আবূ দাঊদ) [৬৫২]

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে সাতটি উৎকৃষ্ট মানের (আজওয়া) খেজুর খাবে, সেদিন বিষ বা যাদু তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৬৫৩]
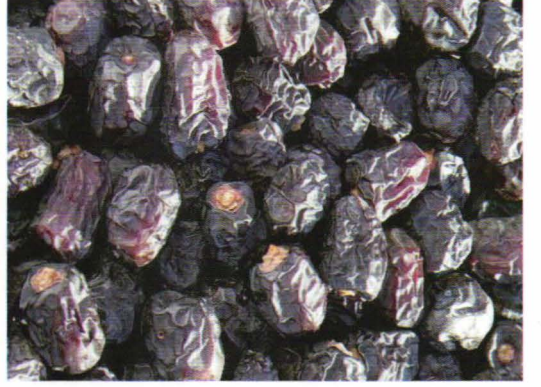
আজওয়া খেজুর গাছ ও খেজুর

আজওয়া খেজুর (Medicine for poison and chest pain)

হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদও উদ্ধৃত করেছেন। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনোদিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর দিয়ে নাস্তা করবে, সেদিন তার ওপর বিষ এবং যাদু কোন কাজ করবে না।" (আবূ দাঊদ) [৬৫৪]

অপরদিকে হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমরা ছত্রাকের উল্লেখ করলে কতক সাহাবী বলেন, ছত্রাক যমীনের বসন্ত রোগ। কথাটি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ণগোচর হলে তিনি বলেন, ছত্রাক হলো মান্না-এর অন্তর্ভুক্ত। আজওয়া খেজুর জান্নাতের ফল। এর মধ্যে বিষের নিরাময় রয়েছে।" (ইবনে মাজাহ ও আন-নাসাঈ) [৬৫৫]

আজওয়া খেজুর একটি উন্নতমানের খেজুর, যা তৃপ্তিদায়ক। পাকিস্তানের প্রখ্যাত Heart Specialist Prof. Dr. Gaznavi Khalid বলেন, সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী ৭টি খেজুর ও তার বিচির গুঁড়ার মাধ্যমে cardiac pain (বুকের ব্যথা) দূর করা বর্তমানের modern bypass surgery-এর চেয়ে উত্তম। যাহোক, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন, তা নিতান্তই সাময়িক। তা না হলে তিনি Heart Specialist Harith ibn Kaladah-এর নিকট

পাঠাতেন না। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের advice was for temporary relief, not for permanent cure.

দর্শক-পাঠকবৃন্দ! আমি আশা করব Ajwah খেজুরের বিচি নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানাগারে গবেষণা হওয়া উচিত যে whether it has any chest pain (angina pectoris) killing property or not.

বরনি খেজুর সর্বোত্তম

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হিজর এলাকার আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দল আগমন করলে তিনি বলেন, "তোমাদের খেজুরগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে বরনি খেজুর। এটা অসুস্থতা দূর করে এবং এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।" (আল-মু'জামুল আওসাত, মুসতাদরাক ও আবূ নু'য়াইম)। ৬৫৬ হাদীসটি হাসান।

উকুনের চিকিৎসা (Treatment of lice)

প্রশ্ন-২১৯ : আমাদের এই উপমহাদেশে নারী-পুরুষ সবার মাথার চুলেই কম-বেশি উকুন দেখা যায়। চুলে উকুনের সৃষ্টি অনেক কারণে হতে পারে। তবে চুলে উকুনকে বাসা বাঁধতে দেয়া উচিত নয়। এটা সুস্বাস্থ্যের পরিপন্থি। তাই কারো মাথায় উকুনের বিস্তার রোধে ও একজনের মাথার চুল থেকে উকুন অন্যজনের মাথায় যাওয়া থেকে বিরত রাখতে, তদুপরি উকুনের বংশ নির্মূল করতে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উপদেশ দিয়েছেন?

উত্তর : কা'ব ইবনে উজরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা আমি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলাম। আমি যখন একটি পাত্রের নিচে আগুন জ্বালাচ্ছিলাম, তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার মাথার উকুন কি তোমার জন্য সমস্যার সৃষ্টি করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমার মাথার চুল কামিয়ে ফেলার জন্য একজন নাপিতকে ডাকলেন। পরে আমাকে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় চুল কামানোর জন্য একটি প্রাণী 'দম' দিতে নির্দেশ দিলেন।" হাদীসটি সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে উদ্ধৃত আছে। ৬৫৭

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়, যে হাদীসটি সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত আছে। তিনি বলেন, "হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আমি যখন একটি পাত্রের নিচে আগুন জ্বালাচ্ছিলাম, তখন মাথা থেকে উকুন পড়ছিল। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমার মাথার চুল কামিয়ে ফেলো। তারপর তিনদিন রোযা রাখো অথবা ৬ জন গরীব মানুষকে আহার করাও অথবা একটি পশু কুরবানী (দম) দাও।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৬৫৮]

হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এই উকুন থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বেশ কতগুলো রিওয়ায়াত পেশ করেছেন এবং সবগুলো হাদীসের ভাষা প্রায় একই। তিনি বলেন, "আমার সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবে অথবা তার মাথায় কোনো ব্যাধি দেখা দিবে তার জন্য সে যদি মাথা মুণ্ডন করে ফেলে এবং তার জন্য তাকে ফিদিয়া দিতে হয়, তবে তাকে ফিদিয়া হিসেবে রোযা রাখতে হবে অথবা সদকাহ দিতে হবে কিংবা কুররানী করতে হবে'।" (সহীহ মুসলিম) [৬৫৯]

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, "আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, আমার আরও নিকটে এসো। আমি তাঁর নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন, পোকাগুলো (উকুনগুলো) কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? ইবনে আওন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে সম্ভবত তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রোযা কিংবা সদকাহ অথবা সহজসাধ্য হলে কুরবানী দ্বারা ফিদিয়া আদায় করতে আদেশ দিলেন।" (সহীহ মুসলিম) [৬৬০]

উপরোক্ত দুটো হাদীসের বিষয়বস্তু একত্র করলে আমরা জানতে পারি যে পুরুষের মাথার চুলে অসংখ্য উকুন হলে, তার সর্বোত্তম চিকিৎসা হচ্ছে মাথার চুল কামিয়ে ফেলা। নিয়মিত সাবান ব্যবহার বা অন্য কোনো উপায়ে উকুন দূর করা সম্ভব হলেও আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি মাথা shave করার কথা বলেছেন। কারণ shaving the head is the most effective, fastest and best treatment for getting rid of lice. That means, you are removing the root cause of the problem of lice growth.

আমরা জানি চুল সর্বদা অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকলে এবং মাথার চামড়ায় যদি দীর্ঘদিন ময়লা লেগে থাকে, তাহলে উকুন সৃষ্টি হয়। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বিভিন্ন খারাপ পদার্থ (waste materials) সর্বদা শরীর থেকে নির্গত হয়, যা শরীরের বিভিন্ন organ-এ চামড়ার লোমকূপ বা স্পোরস-এর মাধ্যমে নির্গত হয়ে থাকে। মাথার খুলির চামড়ায় যে অসংখ্য spore আছে তার মাধ্যমেও waste materials নির্গত হয়ে থাকে। এসব পদার্থ চুলের আর্দ্রতার কারণে পচে গিয়ে উকুন সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। এছাড়া যখন কেউ বিভিন্ন অসুস্থতায় ভোগে তখন নিয়মিত চুল পরিষ্কার রাখা সম্ভব হয়না এবং সর্বদা চুলের যত্ন নেয়াও হয়না। তাই ঐসব চুলে সহজেই উকুন বাসা বাঁধে। যেহেতু মাথা কামানো উকুন দূর করার বা উকুন থেকে নিষ্কৃতিলাভের সর্বোত্তম উপায়, তাই হযরত জাফর

রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ছেলের জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উৎকৃষ্ট উপায়টিই বেছে নিয়েছিলেন বা recommend করেছিলেন। আর এভাবেই কারো মাথার উকুনের বংশ নির্মূল করা সম্ভব।

মাথার চুল থেকে উকুন দূর করার এ ধরনের prescription বর্তমানে আধুনিক ডাক্তারগণও দিয়ে থাকেন। কারণ সেভিংয়ের পর মাথার চামড়া সরাসরি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আসে। ফলে ক্ষতিকর আর্দ্র জাতীয় পদার্থ শুকিয়ে যায়। তখন কোনো ওষুধি গুণাগুণসম্পন্ন তৈল মাথায় লাগিয়ে দেয়া যেতে পারে। যার ফলে উকুন আর কখনো সৃষ্টি হতে পারবেনা। উপরোক্ত তিনটি হাদীসের মধ্যে দুটো হাদীসে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় রয়েছে। তা হচ্ছে, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মাথা কামিয়ে ফেলার বিষয়। এমতাবস্থায় দুম্বা বা অন্য কোনো প্রাণী কুরবানী দেয়া বা ৬ জন মিসকিনকে খাওয়ানো অথবা তিনদিন রোযা রাখা। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ ছিলো শুধু ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করার কাফ্ফারা স্বরূপ। অন্য কোনো সময়ের জন্য হলে হাদীসের প্রথম অংশই শুধু প্রযোজ্য বা যথেষ্ট হতো।

চক্ষু রোগের চিকিৎসা (Treatment of eye diseases)

প্রশ্ন-২২০ : চোখের অসুস্থতায় রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ব্যবস্থাপত্র দিতেন? হাদীস শরীফে চক্ষু রোগের চিকিৎসায় কোনো গাছ-গাছড়ার বর্ণনা এসেছে কি?

উত্তর : চক্ষু রোগের চিকিৎসায় কুম্বীর ব্যবহার সম্পর্কে বেশ কয়েকটি সহীহ হাদীস রয়েছে, যা ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি উদ্ধৃত করেছেন। সা'দ ইবনে যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "কুম্বী মান্নার মতোই অথবা এক প্রকার মান্না এবং এর নিংড়ানো পানি বা রস চক্ষু রোগের ওষুধ।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৬৬১]

সা'দ ইবনে যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কুম্বী এক প্রকার মান্না, যা আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা বনী ইসরাঈলের জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং এর রস চোখের ওষুধ।" (সহীহ মুসলিম ও ইবনে মাজাহ) [৬৬২]

এ হাদীসটি পুনরায় মুসলিম শরীফে একটু অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। সা'দ ইবনে যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কুম্বী হচ্ছে মান্না জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ, যা আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর পাঠিয়েছিলেন। আর এর রসে চোখের নিরাময় রয়েছে।" (সহীহ মুসলিম) [৬৬৩]

মুসলিম শরীফের আরেকটি হাদীস রয়েছে, যার ভাষা একটু আলাদা। তবে বর্ণনাকারী একই ব্যক্তি। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কুম্বীই হচ্ছে মান্না এবং এর রসে চোখের ওষুধ রয়েছে।" (সহীহ মুসলিম) [৬৬৪]

কুম্বী এক জাতীয় উদ্ভিদের নাম। এটি সাধারণত স্যাঁতস্যাতে স্থানে জন্মে থাকে। বাংলাদেশে এটা ব্যাঙের ছাতা নামে অভিহিত। এরদ্বারা সুস্বাদু খাবার তৈরি করা যায়। তবে এতে বিষাক্ত উপাদানও রয়েছে।

তাই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন, "বেহেশত হেসেছিলো যখন কুম্বী বা truffles এসেছিল, আর পৃথিবী হেসেছিলো যখন কাব্‌রা বা কাবের (capers) এসেছিলেন।" (আস্‌-সুয়ূতী) ৬৬৫

শু'আইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কুম্বীর পানি তোমাদের জন্য জরুরী (উপকারী)। এটা মান্না থেকে উৎপন্ন হয়। এর পানি চক্ষু রোগের ওষুধ।" (কানজুল উম্মাল ও আবু নু'য়াইম) ৬৬৬

কুম্বী সম্পর্কে সর্বশেষ হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বর্ণনা করেন, "একদা আমরা কতিপয় সাহাবী নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে ছত্রাক সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। কতিপয় সাহাবী বলেন, ছত্রাক যমীনের বসন্ত রোগ। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ছত্রাক হলো মান্নার অন্তর্ভুক্ত এবং এর পানি চক্ষু রোগের ওষুধ। আর আজওয়া হলো বেহেশতের খেজুর এবং এটা বিষের প্রতিষেধক।" (আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) ৬৬৭

আত-তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত সা'দ ইবনে যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ছত্রাক মান্নার অন্তর্ভুক্ত, এর পানি চোখের জন্য নিরাময়।" (ইবনে মাজাহ) ৬৬৮

ইবনে মাজাহ শরীফে উদ্ধৃত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের ভাষাও অনুরূপ। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ছত্রাক হলো 'মান্না' নামক আসমানী খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং তার পানি চক্ষু রোগের নিরাময়। 'আজওয়া' হলো জান্নাতের খেজুর এবং তা উন্মাদনার প্রতিষেধক।" (আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) ৬৬৯

ইমাম ইবনে মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরেকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে কতিপয় অতিরিক্ত শব্দ রয়েছে। সা'দ ইবনে যায়িদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ছত্রাক হলো মান্নার অন্তর্ভুক্ত যা বনী ইসরাঈলের আহারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এর নির্যাস চক্ষু রোগের প্রতিষেধক।" (ইবনে মাজাহ) ৬৭০

এ প্রসঙ্গে দৃষ্টিশক্তির সুরক্ষায় দু'মুখো এবং লেজবিহীন সাপ মেরে ফেলার জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এধরনের সাপ মহিলাদের গর্ভপাতও ঘটিয়ে থাকে। এ বিষয়ে ইবনে মাজাহ শরীফে দু'টো হাদীস রয়েছে। (ইবনে মাজাহ) ৬৭১ আমি আজওয়া খেজুর সম্পর্কে এর আগে আলোচনা করেছি। এ খেজুরটি মদীনায় উৎপন্ন হয়। এর দাম অন্যান্য খেজুরের চেয়ে বেশি।

প্রশ্ন-২২১ : কুম্বী কীভাবে ব্যবহার করা যায়? কুম্বীর পরিচয় ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : **এ প্রশ্নের উত্তর আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বর্ণনা থেকে দিতে পারি। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,** "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে আমি কয়েকটি (৩/৫/৭) কুম্বী সংগ্রহ করে চিপে রস করে একটি শিশিতে জমা করলাম। পরে তা আমার দাসীর চোখে প্রয়োগ করলাম। এতে তার চোখের ব্যথা দূর হয়ে গেলো এবং তার চোখের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হয়ে

আসলো এবং সে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলো।" (আত-তিরমিযী ও আস-সুয়ূতী) [৬৭২]

এ হাদীসটি ইমাম আত-তিরমিযী ও আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাজের মেয়ে চোখে ঝাপসা দেখতো, চোখ ব্যথা করতো এবং মাঝে মাঝে চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে পানি পড়তো। এ রোগ হলে দীর্ঘক্ষণ কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হতো।

কুম্বী এক প্রকার ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ যা মানুষের যত্ন ছাড়াই বেড়ে উঠে। এর ইংরেজি নাম truffles. Family-Ascomycetes. Mushroom, Meadow mushroom বা common field mushroom নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাংলায় এটাকে ব্যাঙের ছাতাও বলা হয়। আরবি নাম কামা, ফাগিয়া বা কামি। বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Agaricus campestris, family নাম হচ্ছে Agaricaceae. এটিকে যমীনের বসন্ত রোগ হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। কুম্বী মান্নার মতো বা মান্না জাতীয় আসমানী খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। অপর এক বর্ণনায় জানা যায় যে Tirmania, Terfezia এবং Phaeangium-এর কতিপয় speciesও truffles নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

যাহোক, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কুম্বী সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন তা উপরে বর্ণিত যেকোনো ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ হতে পারে।

Truffles (Family Ascomycetes)

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস আমি বর্ণনায় আনবো যা হযরত আবূ নু'য়াইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার তিব্বুন নববী গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। হযরত উম্মে সালমাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো স্ত্রী ophthalmia (conjunctivitis) রোগে আক্রান্ত হলে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তার সাথে রাত যাপন করতেন না।" (ইবনুল কাইয়িম ও আস-সুয়ূতী) [৬৭৩]

প্রশ্ন-২২২ : কুম্বীর ওপর কোনো গবেষণা হয়েছে কি? হয়ে থাকলে সংক্ষেপে তার ফলাফল বলবেন কি?

উত্তর : উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে প্রায় সবক'টি হাদীসেই কুম্বীর রস বা পানির কথা বলা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এই রস বা decoction-এ antibiotic, antibacterial বা antiinflammatory properties রয়েছে। কুম্বীর উপর বেশ গবেষণা হয়েছে। এই মুহূর্তে আমার নিকট কুম্বীর রসের ফার্মাকোলজিক্যাল গুণাগুণ সম্পর্কে কোনো গবেষণার ফলাফল নেই। তবে আমার নিকট যে electronic library আছে, সেখানে এ বিষয়ে অনেক তথ্য রয়েছে।

Mushroom (Agaricus campestris)

সুরমার মাধ্যমে চক্ষু রোগের চিকিৎসা

প্রশ্ন-২২৩ : মুহতারাম ড. মুশাররফ, আমরা অনেকে সুরমা ব্যবহার করে থাকি। আমরা শুনে এসেছি যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সুরমা ব্যবহার করতেন এবং এর ব্যবহারের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কী কী হাদীস আছে, মেহেরবানী করে তা বর্ণনা করুন।

উত্তর : সুরমা সম্পর্কে বেশ ক'টি সহীহ হাদীস রয়েছে, যা আত-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবূ দাউদ, মুসতাদরাকে হাকিম ও আত-তাবারানী হাদীস গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে। সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা অবশ্যই ইছমিদ নামক সুরমা ব্যবহার করবে। কারণ এটা চোখকে পরিষ্কার করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় এবং চোখের পাতার চুল গজায়।" (ইবনে মাজাহ ও মুসতাদরাকে হাকিম) [৬৭৪]

আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী শরীফে সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সকল প্রকার সুরমার মধ্যে ইছমিদ সুরমা উত্তম। এটা চোখের দৃষ্টিশক্তিকে বৃদ্ধি করে এবং চোখের পাতার পশম উৎপন্ন করে।" (আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী) [৬৭৫]

এখানে ইছমিদ সুরমাকে চোখের ওষুধ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ হাদীসের অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যার ভাষা একটু আলাদা। তবে এ হাদীসটির বর্ণনার শেষাংশ জামে আত-তিরমিযী শরীফে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ হাদীসের দ্বিতীয় অংশটি তিরমিযী শরীফে নেই। ইমাম তিরমিযীর বরাত দিয়ে ইমাম আস-সুয়ূতী তার তিব্বুন নববী কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির ভাষা হচ্ছে, "সকল প্রকার চোখের ওষুধের মধ্যে এন্টিমনী উত্তম। এটা সুস্থ চোখকে রক্ষা করে, তবে অসুস্থ চোখকে নয়।" (আত-তিরমিয়ী ও আস-সুয়ূতী) [৬৭৬]

"It protects the healthy eye, not the diseased eye." (At-Tirmizi and As-Suyuti) [676]

Antimony metal

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা ইছমিদ সুরমা ব্যবহার করো। এটা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে এবং চোখের পাতার লোম গজায়।" তিনি আরও বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুরমাদানি ছিলো। প্রতি রাতে তিনি তা থেকে ডান চোখে তিনবার এবং বাম চোখে তিনবার সুরমা লাগাতেন। (আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [৬৭৭]

ইমাম আবূ নু'য়াইমও তার তিব্বুন নববী কিতাবে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যে হাদীসের প্রথমাংশে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা কাপড় পরিধান করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, "সাদা কাপড় তোমাদের জন্য উত্তম এবং সাদা কাপড় দিয়ে তোমরা মৃতদের দাফন করো।" (আবূ দাউদ) [৬৭৮]

সুরমাদানি (Surma vessel with stick)

অপরদিকে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের যারা সুরমা ব্যবহার করে, তারা যেনো চোখে বেজোড় বার সুরমা লাগায়।" (আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ) [৬৭৯]

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে কথা বলতে শুনেছি, "তোমরা শোয়ার আগে অবশ্যই ইছমিদ সুরমা লাগাও।

কারণ, নিশ্চয়ই সুরমা দৃষ্টিকে পরিষ্কার করে এবং চোখের পাতার পশম গজায়।" (ইবনে মাজাহ) [৬৮০]

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। "তিনি রোযা থাকাবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন।" (আবূ দাঊদ) [৬৮১]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বক্তব্যের সমর্থনে আল আ'মাশ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি আমাদের সাথীদের মধ্যে কাউকেও রোযা থাকাবস্থায় সুরমা ব্যবহারে আপত্তি করতে দেখিনি। এবং রাবী ইবরাহীম রোযাদারের জন্য বিশেষভাবে 'সিবর' জাতীয় সুরমা ব্যবহারের অনুমতি দিতেন।" (আবূ দাঊদ) [৬৮২]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যার ভাষা পূর্বে বর্ণিত হাদীসের ভাষা থেকে আলাদা, তবে বিষয়বস্তুতে বেশ মিল রয়েছে। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যেসব ওষুধ ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম হচ্ছে লাদু (মুখ দিয়ে সেবন করার ওষুধ), নস্য (নাক দিয়ে সেবন করা ওষুধ), রক্তমোক্ষণ (শিঙ্গা লাগানো) এবং জোলাপ (বিরোচক ওষুধ)। তোমরা যে সুরমা ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম হচ্ছে 'ইছমিদ' নামক সুরমা। কেননা এটা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে এবং চোখের পাতার পশম গজায়। রাবী আরো বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুরমাদানি ছিলো। তিনি ঘুমানোর পূর্বে তা থেকে উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।" (মুসনাদে আহমাদ ও আত-তিরমিযী) [৬৮৩]

প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত বিভিন্ন সুরমাদানির ছবি

নাকে ওষুধ প্রয়োগের বিষয়ে আরো একটি হাদীস রয়েছে, যা বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে, "একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাকের মধ্যে ওষুধ প্রয়োগ করেছেন।" (আবূ দাঊদ) [৬৮৪]

এ হাদীস দুটোর ভেতর স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বেশ শিক্ষণীয় দিক রয়েছে যা সুপ্ত অবস্থায় আছে। এটি আলোচনা করলে আমরা জানতে পারি যে অসুস্থ ব্যক্তি কোন্ পদ্ধতিতে ওষুধ সেবন করতে পারবে সে সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো। ওষুধ সেবনের এ পদ্ধতিসমূহকে আমরা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় oral route, nasal route and rectal route বলে থাকি। Rectal route-এ suppositories and purgatives দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া ফোঁড়া বড় হয়ে পুঁজ হলে তিনি সেগাফ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, যাকে আধুনিক ভাষায় incision or minor surgical operation বলা হয়। Blood letting technique and ophthalmological medicines সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো।

প্রশ্ন-২২৪ : ডাক্তারি মতে সুরমার ব্যবহারে কী কী উপকার বর্ণনা করা হয়েছে? সুরমার উল্লেখযোগ্য উপাদান কী কী?

উত্তর : বস্তুত সুরমা ভেষজ উপাদানে প্রস্তুত (উদ্ভিদ ও খনিজ উপাদান) একান্ত মিহি চূর্ণ ওষুধ, যা চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি অথবা চক্ষুরোগ নিরাময়ের জন্য অথবা চোখের প্রসাধনী হিসেবে যুগ যুগ ধরে এশিয়া মহাদেশের পুরুষ ও মহিলা সবাই ব্যবহার করে আসছে। তদানীন্তন আরব সমাজে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় যে সুরমা পাওয়া যেতো, তাতে কী কী উপাদান ছিলো তা আমরা জানিনা বা জানার উপায় নেই। তবে এন্টিমনি নামক পদার্থ সুরমাতে ব্যবহৃত হতো বলে বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়। বর্তমানে যে সুরমা হাজী সাহেবগণ হজ্জে গিয়ে মক্কা ও মদীনা থেকে নিয়ে আসেন, তার উপাদান সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়।

প্রশ্ন-২২৫ : সুরমা কি চোখের জন্য নিরাপদ কোনো ওষুধ না প্রসাধনী? আমাদের দর্শকমণ্ডলীর জন্য এই প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর : Martindale Extra Pharmacopoeia-তে সুরমার উপাদান সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কোনো কোনো সুরমাতে শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক পরিমাণে সীসা জাতীয় পদার্থ আছে বলে গবেষণাগারে পরীক্ষায় জানা যায়। কোনো কোনো recipe-তে অনেক বেশি পরিমাণে lead sulfide বিদ্যমান বলে প্রকাশ। এই সীসা জাতীয় পদার্থ সম্বলিত সুরমা কিছুতেই উপকারী নয়, বরং তা ক্ষতিকর। কারণ এটা চোখের অভ্যন্তরীণ টিস্যুগুলোকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাই এসব সুরমা ব্যবহার করা অনুচিত বা নিষেধ। এসব সুরমাকে আমি 'বিপজ্জনক উপহার' হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি, যা হাজী সাহেবগণ হজ্জ শেষে এ দেশে উপহার হিসেবে নিয়ে আসেন। আমি নিশ্চিত যে, যেসব সুরমায় সীসা জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান, তা কোনোক্রমেই শিশু ও ছোটদের দেয়া উচিত নয়। এমনকি বয়স্ক ব্যক্তিদেরও এসব সুরমা ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ সীসা জাতীয় পদার্থ চোখের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। It can destroy the vital internal tissues of the eye and other organs of the body.

প্রশ্ন-২২৬ : মুহতারাম বাংলাদেশে সুরমা কী কী কাজে ব্যবহৃত হয়? কোনো recipe আছে কি?

উত্তর: সম্মানিত দর্শক-শ্রোতামণ্ডলি! যদিও সুরমা মূলত প্রসাধনী হিসেবে বিভিন্ন সমাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, এর ওষুধি গুণাগুণও রয়েছে প্রচুর, যা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে জানা যায়। বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানি ফর্মুলারিতে বেশ ক'টি সুরমার ফর্মুলা বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর ব্যবহার ও নির্দেশনা সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তার সাথে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত তথ্যের বেশ মিল আছে। ইউনানি মেডিসিন মতে এসব recipe চোখের ক্ষত, ছানির প্রাথমিক অবস্থায়, দৃষ্টিহীনতা, কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা, নেত্রনালির সমস্যায়, চক্ষুপ্রদাহ, অঞ্জলি ও দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা বা প্রদাহে ব্যবহার করা হয়। সুরমার উপাদানসমূহের সঙ্গে চোখের টিস্যু ক্রিয়া বা বিক্রিয়ার কারণে কিছু কিছু সুরমা শিশু ও ছোটদের জন্য নিষেধ। এসবের ব্যবহারে চোখ জ্বালা করতে পারে। বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানি ফর্মুলারিতে যে সুরমাকে শিশুদের জন্য নিষেধ করা হয়েছে, তার নাম সুরমা চিকনি। এটা চোখের ছানি বা cataract, কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা (corneal opacity), নেত্রনালির প্রদাহ (keratitis) ও অন্যান্য চোখের সমস্যায় ব্যবহার করা হয়।

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতামণ্ডলি! এখানে বিষয়টি জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যে সুরমার কথা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে বর্ণনা করেছেন, বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদে সেগুলো antimony সুরমা বলে জানা যায়। কারণ তিনি ইছমিদের কথা বলেছেন। ঐ সময়েও যে বেশ কয়েকটি সুরমার recipe ছিলো, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস তারই ইঙ্গিত প্রদান করে। আর যেসব উপাদান ঐ সুরমায় থাকতে পারে, তা বর্তমানে জানা সম্ভব নয়। জার্মানিতে এক ধরনের সুরমা পাওয়া যায়, যাকে বলা হয় কোহল। It is a kind of eye liner. Antimony চোখের অভ্যন্তরীণ টিস্যুগুলোতে কী ধরনের প্রভাব ফেলে সে বিষয়ে গবেষণা হয়েছে।

ইবনে হাজার বলেন, এন্টিমনি হচ্ছে একটি সুপরিচিত লালচে-কালো রং-এর পাথর যা হিজাযে পাওয়া যেতো। আর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এন্টিমনি আসত ইস্পাহান থেকে। উদ্ধৃত হাদীসগুলোর বর্ণনামতে, ইছ্মিদ সুরমা পুরুষ-মহিলা সবার চোখে লাগানো মুস্তাহাব। আল-রহিম ইবনে সীনা বলেন, এন্টিমনি চোখের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষা করে এবং ক্ষতস্থানের ময়লা দূর করে। অপরদিকে আল্লামা আল-বাগাদী বলেন, এন্টিমনি চোখের ভ্রু গজায়, চোখকে সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং আকর্ষণীয় করে তোলে। তবে এ মুহূর্তে আমার কাছে কোনো গবেষণার ফলাফল নেই যা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি।
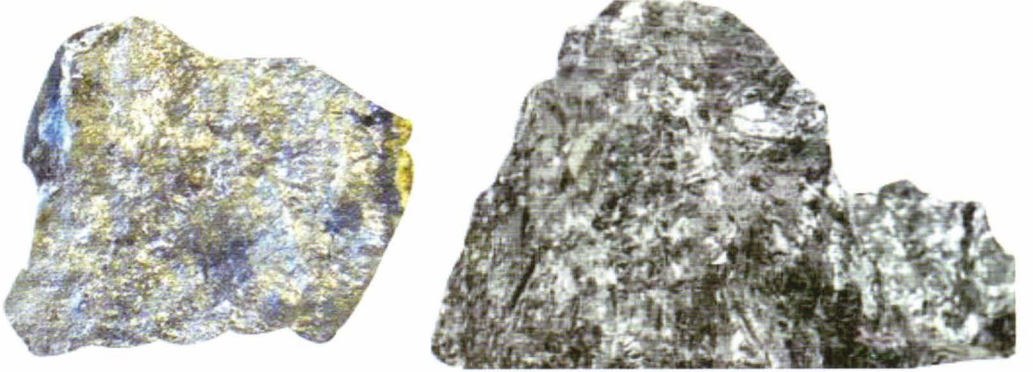
Pure antimony

I shall urge the health ministry officials of the Royal Saudi Arabian government to control the production and quality of surma in the holy land. Please implement strict quality control measures to ensure that it does not contain traces of any harmful ingredients like lead, arsenic and other heavy metals. Let it be a safe gift, not an unsafe or dangerous gift.

আমি রাজকীয় সৌদি আরব সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে অনুরোধ জানাবো, অনুগ্রহপূর্বক পবিত্র ভূমিতে সুরমার উৎপাদন ও মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন। অনুগ্রহপূর্বক উৎপাদন কারখানায় কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন, যাতে কোনো সুরমায় সামান্য পরিমাণ ক্ষতিকর কোন উপাদান তথা সীসা, আরসেনিক এবং অন্যান্য heavy metals না থাকে। সুরমাকে নিরাপদ একটি উপহার হিসেবে নিশ্চিত করুন। এটি যেনো কিছুতেই 'বিপদজ্জনক উপহার' হিসেবে চিহ্নিত না হয়।

অধ্যায়-১৭

গাছ-গাছড়া ও ফলমূলের মাধ্যমে চিকিৎসা

কালিজিরা (Black seed/black cumin)

প্রশ্ন-২২৭ : কালিজিরা সম্পর্কে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী বলেছেন? সহীহ হাদীসে কী বর্ণনা এসেছে এ বিষয়ে? কী কী রোগে এটি ব্যবহার করা যায়, মেহেরবানী করে হাদীসের আলোকে বলবেন কি?

উত্তর : Black seed বা black cumin হচ্ছে কালিজিরা। Botanical name হচ্ছে *Nigella sativa* এর ইউনানি নাম কালোনজি, আরবি নাম 'হাব আল-সাউদা, হাব আল-বারাকা। ফারসি নাম শুনিজ।

ফুলসহ কালিজিরা গাছ

কালিজিরা সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "কালিজিরার মধ্যে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের চিকিৎসা (নিরাময়) নিহিত।" [৬৮৫]

এ হাদীসটি সহীহ আল বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ শরীফে উল্লেখ আছে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কালিজিরায় একমাত্র সা'ম ছাড়া সকল রোগের নিরাময় রয়েছে। আর সা'ম মানে মৃত্যু।" (সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ) [৬৮৬]

জামে আত-তিরমিযী শরীফে হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "তোমরা নিজেদের জন্য এই কালিজিরার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে নাও। কেননা এর মধ্যে সা'ম ব্যতীত সকল রোগের নিরাময় রয়েছে। আর সা'ম মানে মৃত্যু।" (আত-তিরমিযী) [৬৮৭]

অপরদিকে খালিদ ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমরা গালিব ইবনে আবযার-এর সাথে বের

হলাম, পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন আমরা মদীনায় ফিরে আসি তখনও তিনি অসুস্থ ছিলেন। তখন ইবনে আবি আতিক তাকে দেখতে এসে বলেন, তাকে কালিজিরার সাহায্যে চিকিৎসা প্রদান করো এবং ৫/৭ টি কালিজিরার বীজ গুঁড়ো করে তেলে মিশিয়ে উভয় নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাও। কারণ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমাকে বলেছেন, তিনি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন যে কালিজিরা একমাত্র সা'ম ব্যতীত সকল রোগের ওষুধ। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করেন, সা'ম কি? তিনি উত্তর দেন : সা'ম অর্থ মৃত্যু।" (সহীহ আল বুখারী ও ইবনে মাজাহ) [৬৮৮]

কালিজিরা (Black cumin seed)

হযরত বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুও একই হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা মুসনাদে আহ্‌মাদে লিপিবদ্ধ আছে। [৬৮৯]

অপরদিকে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে "রোগ-যন্ত্রণায় যখন খুব বেশি কষ্ট হতো তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক চিমটি কালিজিরা শুকনো খেতেন। অতঃপর পানি ও মধু সেবন করতেন।" [৬৯০]

হাদীসটি আল-মু'জামুল আওসাত হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তবে মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে মওযু বা জাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যাহোক, আপনারা কালিজিরার তৈল খাদ্যে ব্যবহার করতে পারেন বা মধুর সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন বা চিবিয়ে খেতে পারেন। ভর্তা করে তাতে তেল দিয়ে ভাতের সাথেও খাওয়া যায়।

প্রশ্ন-২২৮ : কী কী রোগে কালিজিরা ব্যবহার করা যায়?

উত্তর : আল-আকিলি তার তিব্বে নববী বা Prophetic Medicine বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে "আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাক বন্ধ ও ঠাণ্ডা লাগা থেকে আরোগ্য লাভের জন্য ২০টি কালিজিরার বীজ একটি লিনেন কাপড়ে জড়িয়ে সামান্য পানিতে সারারাত ভিজিয়ে রাখতেন এবং পরদিন সকালে সেই কালিজিরা মিশ্রিত পানি ছেঁকে নিয়ে উভয় নাসারন্ধ্রে ফোঁটা ফোঁটা করে প্রবেশ করাতেন। ফলে নাক বন্ধ ও ঠাণ্ডালাগা সেরে যেতো।" (মু'জামুল আওসাত) [৬৯১]

এ হাদীসটিকে মুহাদ্দিসগণ শাদীদ যয়ীফ বলে চিহ্নিত করেছেন।

প্রশ্ন-২২৯ : কালিজিরার উপর আধুনিক গবেষণার ফলাফলের উপর কিছু বলবেন কি? বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলের সাথে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় কি?

উত্তর : কালিজিরা সম্পর্কে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহা মূল্যবান বাণীর উপর ভিত্তি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আধুনিক বিজ্ঞানাগারে কালিজিরার ওপর ব্যাপক গবেষণা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

কতিপয় বিজ্ঞানী কালিজিরায় antibacterial principle (জীবাণুনাশক গুণ), antitumour activity, modulatory effect on toxicity in rats আছে বলে প্রমাণ করেছেন। অনেকে chemical carcinogenosis রোগ নিরাময়ে কালিজিরার inhibitory effects আবিষ্কার করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাণীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা গেছে যে কালিজিরা নিম্ন রক্তচাপের চিকিৎসায় ও দুর্বল শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করতে অত্যন্ত কার্যকর। বাত ও ব্যথা-বেদনার চিকিৎসায় কালিজিরা বেশ উপকারী বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। কালিজিরায় অনেক sterols রয়েছে, যা ক্যান্সার প্রতিরোধে সক্ষম। আধুনিক medical science কালিজিরায় antihistaminic, antioxidant, antibiotic, antimiotic, analgesic এবং respiratory stimulating ও bronchodilating effects আবিষ্কার করেছেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যায় যে কালিজিরা ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় খুবই কার্যকর। এসব গবেষণার তথ্য আমার নিকট রয়েছে। উৎসাহী কোনো বিজ্ঞানী তা দেখতে পারেন। কোনো কোনো বিজ্ঞানী কালিজিরাকে কৃমিনাশক, বাতবেদনানাশক ও প্রদাহনাশক হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

কথিত আছে যে "একমাত্র কালিজিরা ছাড়া পেটে যাকিছু প্রবেশ করে, তার সবই রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।" প্রাচীনকালে কালিজিরাকে 'আশীর্বাদের বীজ' বা seed of blessing বলে আখ্যায়িত করা হতো। প্রকাশ থাকে যে, মিসরের রাজা তোতেন খামেনের স্মৃতিসৌধে কালিজিরা পাওয়া গিয়েছিলো। গবেষণায় আরো জানা যায় যে কালিজিরায় আমিষ জাতীয় পদার্থ ও amino acids যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। এতে ১০টি essential amino acids রয়েছে। তাছাড়া carbohydrates, vitamins এবং কতগুলো terpenoid acid রয়েছে। Minerals-এর মধ্যে Ca, K, Na এবং Fe অন্যতম।

১৯৫৯ সালে জনৈক বিজ্ঞানী কালিজিরায় nigellone নামে একটি দানাদার পদার্থ isolate করেন যার বহুবিধ উপকারিতা বিদ্যমান। তাই কালিজিরাকে 'tonic herb' বা 'cure all herb' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এক গবেষণায় জানা যায় যে কালিজিরার ভেতর এমন সব nutrients আছে, যা রোগ প্রতিরোধে ও বার্ধক্য রোধে অত্যন্ত কার্যকর। এই তথ্য US FDA সম্প্রতি এক সমীক্ষায় উল্লেখ করেছে। In other words, black cumin retards or slows down the aging process. কারণ এতে antioxidant property রয়েছে। তাই এটি অকাল বার্ধক্য রোধ করে থাকে। এসব তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে কালিজিরা সম্পর্কে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত।

খেজুর (Date)

প্রশ্ন-২৩০ : খেজুরের মাধ্যমে রোগ নিরাময় সম্পর্কে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী বলেছেন, অনুগ্রহপূর্বক বিস্তারিত বলবেন কি?

উত্তর : খেজুরের আরবি নামসমূহ হচ্ছে নাখল, রুতাব, বালহ, তামর। Botanical নাম হচ্ছে *Phoenix dactylifera* L. খেজুরের বর্ণনা আল কুরআনের সূরা নাহল, সূরা আন'য়াম ও সূরা মারিয়ামে রয়েছে। সমগ্র কুরআনে ২০ বার খেজুর কথাটি বর্ণনা করা হয়েছে। আনুমানিক ৩০০০ বছর আগে এর চাষবাদ হতো মধ্যপ্রাচ্যে।

খেজুর সম্পর্কে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বক্তব্য রেখেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমাকে বলো যে কোন্ গাছটি একজন মুসলমানের সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ? তখন সাহাবীগণ মরুভূমিতে জন্মে এমন বেশ ক'টি গাছের কথা উল্লেখ করেন। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটি হচ্ছে খেজুর গাছ।" [৬৯২]

হাদীসটি সহীহ আল বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এমন একটি বৃক্ষ আছে, যা মুসলমানদের ন্যায় বরকতপূর্ণ ও কল্যাণময়। সেটি হলো খেজুর বৃক্ষ।" (সহীহ আল বুখারী) [৬৯৩]

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে খেজুর গাছের চারা রোপণ করতেন। আর এ জন্যই বরকতের জন্য মৃত ব্যক্তির কবরের চারপাশে খেজুর গাছের কচি ডাল মাটিতে রোপণ করতে হয়। কেননা এর মাধ্যমে কবরবাসী কবরের আযাব থেকে কিছু সময়ের জন্য হলেও মুক্তি পাবে।

গাছসহ তাজা খেজুর (Plant with fresh dates)

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খেজুরকে কাকি, ফুপা বা খালার সাথে তুলনা করে সম্মান করতে বলেছেন। কারণ খেজুরকে সেই মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে যে মাটি থেকে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। (আস-সূয়ুতী) [৬৯৪]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেন খেজুর দিয়ে নাবীয তৈরি সম্পর্কে। তিনি বর্ণনা করেন যে, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সাহাবীগণ রাতে খেজুর পানিতে ভিজিয়ে রাখতেন। তিনি সেদিন ও তার পরের দিন সকালে সেই পানি পান করতেন। তার পরদিন বিকেলেও তিনি সেই খেজুর-পানি পান করতেন এবং অপরকেও তা পান করতে দিতেন। অবশিষ্ট পানি ফেলে দিতেন।" (সহীহ মুসলিম) [৬৯৫]

পাকা ও শুকনো খেজুর (Ripe and dried dates)

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে সাতটি করে আজওয়া খেজুর (মদীনায় উৎপন্ন এক প্রকার উন্নতমানের খেজুর) ভক্ষণ করে, সেদিন তার ওপর কোনো বিষ বা যাদু কোনোরূপ ক্ষতি করতে পারবেনা।" (সহীহ আল বুখারী) [৬৯৬]

অপরদিকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মদীনার উঁচু এলাকার আজওয়া খেজুরে রোগ মুক্তির উপাদান রয়েছে।" (সহীহ মুসলিম) [৬৯৭]

খেজুর একটি উপাদেয় ও জনপ্রিয় খাদ্য। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ঘরে খেজুর আছে, সে ঘরের লোকেরা কখনো ক্ষুধার্ত থাকবেনা।" (সহীহ মুসলিম) [৬৯৮]

খেজুর সম্পর্কে আরেকটি হাদীস আছে যা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোযা রেখে থাকে, সে যেনো খেজুর দিয়ে ইফতার করে। যদি খেজুর পাওয়া না যায় তাহলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কারণ পানি পবিত্র বা পবিত্রতা সৃষ্টিকারী।" (আন-নাসাঈ ও আত-তিরমিযী) [৬৯৯]

প্রশ্ন-২৩১ : খেজুর নিয়ে কোনো গবেষণা হয়েছে কি? খাদ্য ছাড়া আর কী কাজে এর ব্যবহার হয়?

উত্তর : হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে "তারা (অর্থাৎ তার মা ও অন্যান্যরা) আমাকে মোটা করার জন্য সব কিছুই করেছেন। কিন্তু আমি মোটা হইনি (অর্থাৎ আমি হালকা-পাতলাই থাকি)। তখন তারা (মা ও অন্যান্যরা) আমাকে শসা ও পাকা (তাজা) খেজুর একত্রে খেতে বলেন। ফলে আমার শরীরের ওজন বেড়ে যায়। আমি হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে উঠি (অর্থাৎ আমি মোটা হয়ে যাই)।" [৭০০]

হাদীসটি আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও আন-নাসাঈ শরীফে উল্লেখ আছে। এটি ছিলো আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের আগের ঘটনাসমূহের অন্যতম। এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে শসা ও পাকা খেজুর একত্রে খেলে শরীর মোটা হয়ে যাবে। পাতলা ও ছিপছিপে মানুষের জন্য এটি একটি আদর্শ চিকিৎসা। যে সব ইউনানি চিকিৎসক শরীর মোটা করার জন্য গ্যারান্টি দিয়ে চিকিৎসা করে থাকেন তারা এ ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করতে রোগীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

শসা গাছ ও শসা (Cucumber plant and cucumber)

হজরত আবূ মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমার একটি সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু ছিলো। আমি তাকে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। এরপর একটি খেজুর চিবিয়ে রস নিয়ে তা শিশুটির মুখের ভেতর লাগিয়ে দেন। অতঃপর তার বরকতের জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'য়া করলেন। তারপর তাকে আমার নিকট ফেরত দিলেন। এ ছিলো আবূ মূসা আশ- আরীর জ্যেষ্ঠ সন্তান।" [৭০১]

হাদীসটি সহীহ আল বুখারী ও মুসলিমে আছে। অন্যত্র উল্লেখ আছে যে শিশুটি যখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দেয়া হলো তখন সে কাঁদতে ছিলো। যখন তিনি খেজুর চিবিয়ে রস তার মুখে দিলেন তখন তার কান্না থেমে যায়। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নবজাতক শিশুদেরকে নিয়ে আসা হতো। তিনি তাদের বরকতের জন্য দু'য়া করতেন এবং খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে পুরে দিতেন।" (সহীহ মুসলিম) [৭০২]

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুও অনুরূপ দুইটি হাদীস বর্ণনা করেন। (সহীহ মুসলিম) [৭০৩]

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসটির গুরুত্ব অনুধাবন করে যুক্তরাজ্যের বেশ ক'টি হাসপাতালে গবেষণা শুরু হয়। ফলাফলে জানতে পারা যায় যে চিনি বা গুড় শিশুদের ব্যথা দূর করে কান্নার সময় কমিয়ে দেয়। দেখা যায়, চিনির পরিমাণ যতো বেশি, তাদের কান্না ততো দ্রুত থেমে যায়। গবেষণায় বিভিন্ন পরিমাণের চিনির দ্রবণ তৈরি করে শিশুদের মুখের ভেতর দেয়া হতো। এর পরপরই তাদের আঙ্গুল থেকে রক্ত নেয়া হাতো। শিশুরা কান্না শুরু করতো ঠিকই, তবে শীঘ্রই তা থেমে যেতো চিনির দ্রবণের ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে। এই গবেষণাটির নাম ছিলো, "The analgesic effects (pain killing effects) of sucrose in full term infants; a randomized controlled trial."

এ গবেষণার ফলাফল British Medical Journal, 1995 and Independent Newspaper-এ প্রকাশিত হয়। ইনটারনেট Search দিয়ে এ তথ্য সহজেই বের করা যেতে পারে। গবেষণায় আরো প্রমাণিত হয় যে, "১২% চিনির দ্রবণ শিশুদের খাওয়ানোর পর তাদের আঙুল থেকে রক্ত নেয়া হলে অথবা মুসলমানি করানো হলে তাদের যে কান্না হতো, তা শীঘ্রই থেমে যেতো।"

এই গবেষণা থেকে আমরা আরো জানতে পারি, শিশুদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ বেদনানাশক হচ্ছে চিনি বা গুড়। সম্ভবত এ কারণেই দীর্ঘদিন যাবত আমাদের দেশে ঐতিহ্য চলে আসছে যে ছোট শিশুদের মুসলমানির সময় মুখে বেশি পরিমাণে গুড় বা চিনি দেয়া হয়। সত্যি, ভাবতে অবাক লাগে! নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এসব কথা বলেননি বা এ ব্যবস্থাপত্র দেননি যে "খেজুরে প্রায় শতকরা ৬০-৭০ ভাগ চিনি রয়েছে, যা শিশুদের কান্না থামাতে কার্যকর।"

প্রিয় দর্শক-শ্রোতা-পাঠক! নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব মূল্যবান বাণীর গুরুত্ব অনুধাবন করে খেজুর নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে আমরা জানতে পারি যে খেজুর ব্যথা-বেদনা দূর করতে, শরীরের ওজন বাড়াতে, ক্যান্সার ও হৃৎপিণ্ডের অসুখের চিকিৎসায় বেশ উপকারী।

প্রশ্ন-২৩২ : আর কী কী রোগে খেজুর ব্যবহার করা যায়?

উত্তর : হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট giddiness (মাথাঘোরা, মাথাব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করা)-এ আক্রান্ত ব্যক্তি আসলে তিনি তাকে খেজুর খাবার উপদেশ দিতেন। কারণ রক্তে চিনির পরিমাণ কমে গেলে বা নিম্ন রক্তচাপ এ রোগের অন্যতম কারণ।

এসব উপকার ছাড়াও খেজুরের ওপর গবেষণায় জানা যায় যে খেজুর vitamins ও minerals সমৃদ্ধ। It is a vitamin and mineral supplement. It is a muscle relaxant. এটি রাতকানা প্রতিরোধ করে। It stops night-blindness. খেজুরে ভিটামিন এ, বি-সহ nicotinic acid বিদ্যমান, যা pellegra প্রতিরোধ করতে সক্ষম। সন্তানসম্ভাবা মেয়েদের জন্য খেজুর অত্যন্ত উপকারী। It is also an ideal food duing confinement. হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালামের জন্য বেহেশ্ত থেকে খেজুর আসতো খাদ্য হিসেবে।

আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একদা খেজুর খেতে

নিষেধ করেছিলেন। কারণ ঐ সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ophthalmia বা চোখের রোগে ভুগছিলেন। কারণ ophthalmia রোগে আক্রান্ত রোগী খেজুর খেলে মাথাব্যথা হতে পারে এবং অন্যান্য খারাপ উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে date is contraindicated in eye sickness. আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "খেজুর ও pine kernel একত্রে খেলে সঙ্গমশক্তি বৃদ্ধি পায়।" (আস্-সুয়ূতী) [৭০৪]

ঘৃতকুমারী (Aloe vera)

প্রশ্ন-২৩৩ : হাদীস শরীফে ঘৃতকুমারী সম্পর্কে কী কী বর্ণনা এসেছে? অনুগ্রহপূর্বক ঘৃতকুমারীর পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা-পাঠক! প্রথমেই একটি কথা আপনাদের বলে রাখি, তা হচ্ছে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন চিকিৎসক বা ফার্মাসিস্ট হিসেবে ছিলোনা তবুও তিনি তাঁর সাহাবী বা অনুসারীদের চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। তিনি natural বা herbal medicine ব্যবহার করা পছন্দ করতেন এবং তাঁর চিকিৎসা সম্পর্কিত বর্ণনায় তিনি বিভিন্ন herbs, shrubs ও গাছ-গাছড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় herb-গুলোর অন্যতম হচ্ছে ঘৃতকুমারী। এর অন্য নাম হচ্ছে ঘৃতকমল বা ঘৃতকাঞ্চন। আরবি নাম মুসাব্বর, সিবর বা সাবির। ইউনানি, উর্দু ও ফারসি নামও মুসাব্বর। ইংরেজি নাম Aloe বা Aloe vera. বৈজ্ঞানিক নাম *Aloe vera* Linn. or *Aloe barbadensis* Mill. এর ফ্যামিলি নাম হচ্ছে Liliaceae. উৎকৃষ্ট ঘৃতকুমারী ইয়েমেনের উপকূল অঞ্চল সোকত্র নামক স্থানে পাওয়া যায়।

ঘৃতকুমারী গাছের বাগান (Aloe vera plant garden)

ঘৃতকুমারী গাছ (Aloe vera plant)

প্রশ্ন-২৩৪ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় এর ব্যবহার কোথায় কীভাবে হয়েছে?

উত্তর : ঘৃতকুমারী সর্ম্পকে হাদীসে প্রথম যে বর্ণনা এসেছে, তা প্রসাধনী হিসেবে বা রূপচর্চায় এর ব্যবহার। উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "হযরত আবূ সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে তশরীফ নিয়ে আসেন। ঐ সময় আমার চোখে মুসাব্বর লাগিয়ে রেখেছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী? আমি বললাম, এটি মুসাব্বর। এতে কোনো সুগন্ধি নেই। তিনি বললেন, এটি মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে অথবা এটি চেহারাকে রঞ্জিত করে (It brightens the face)। সুতরাং তুমি এটি দিনে মুছে ফেলবে। তুমি এটি রাতে ব্যবহার করবে।" ৭০৫

হাদীসটি মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও আবূ দাউদ শরীফে উল্লেখ আছে। এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে একজন আদর্শ মুসলিম মহিলা কেমন ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করবে বা কখন করবে, এসবের প্রতি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তীক্ষ্ণ নজর ছিলো। তিনি দৃষ্টিকটু ও দুর্গন্ধযুক্ত কোনো প্রসাধনী পছন্দ করতেন না।

ঘৃতকুমারী গাছের পাতার অংশবিশেষ

হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি যে ইহরাম অবস্থায় ছিলো রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার চোখের অসুস্থতার কথা বললো। তখন তিনি তাকে বললেন, "ঘৃতকুমারীর প্রলেপ লাগিয়ে দাও।" (সহীহ মুসলিম) [৭০৬]

That is, cover them with aloes. হাদীসটি সহীহ মুসলিম শরীফ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। হাদীসটি হযরত সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহুও বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে ইমাম আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে "রোগ নিরাময়ের জন্য দু'টি নির্দেশনা বিদ্যমান, একটি হচ্ছে ঘৃতকুমারী আর অন্যটি হচ্ছে গরম লোহা দ্বারা দাগ দেয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা।" (আস-সুয়ূতী) [৭০৭]

কিন্তু হাদীসটি জামে আত-তিরমিযীতে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত দু'টো হাদীস তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত আছে, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরে উত্তপ্ত লোহা দ্বারা দাগাতে নিষেধ করেছেন। (আত-তিরমিযী) [৭০৮]

নুবাইর ইবনে ওয়াহাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে "ওবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মার-এর পুত্র উমরের চোখ ফুলে উঠলে তিনি তাতে সুরমা লাগাতে মনস্থ করলেন। কিন্তু আব্বাস ইবনে উসমান রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে সুরমা লাগাতে নিষেধ করে মুসাব্বর (ঘৃতকুমারী)-এর প্রলেপ দিতে বললেন। তিনি উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহি আনহুর সূত্রে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এও রিওয়ায়াত করেছেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন।" (সহীহ মুসলিম) [৭০৯]

Aloe vera মিসরীয় মমিতে মৃতদেহকে anoint করতে ব্যবহৃত হতো। ইউনানি চিকিৎসকগণ একে বিরোচক এবং পাকস্থলী ও হার্টের শক্তিবর্ধক বলে থাকেন।

প্রশ্ন-২৩৫ : বর্তমানে ঘৃতকুমারীর ব্যবহার কোথায় কীভাবে হচ্ছে সে সম্পর্কে একটু আলোকপাত করুন।

উত্তর : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখে ঘৃতকুমারী লাগিয়ে দিনের বেলায় মেয়েদের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। কারণ এটি চেহারাকে পরিষ্কার ও সজীব করে। সম্ভবত এতে পরপুরুষ আকৃষ্ট হতে পারে। তাই মেয়েদের তিনি এটি দিনে ব্যবহার না করে রাতে ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন। সত্যি কী সুন্দর উপদেশ! ITV তে সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে, "আপনার সাজসজ্জা আপনার স্বামীর জন্যই।" যাহোক, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মর্মার্থের উপর ভিত্তি করেই আজকাল রূপচর্চায় এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইদানীং বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী বা Cosmetics-এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি সেদিন একটি বিজ্ঞাপনে দেখতে পেলাম যে Baby oil-এ aloe vera মেশানো হয়েছে। তাছাড়া face cream-এ এর ব্যবহার হচ্ছে, এই বলে যে এটি aloe

এলোভেরা জুস

vera সমৃদ্ধ একটি face cream. এসব ব্যবস্থা সবই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের উপর ভিত্তি করে নেয়া হচ্ছে। ইদানীং বিভিন্ন দেশে এলোভেরা জুস এবং জেলও পাওয়া যাচ্ছে। এ জুস সেবনে বিভিন্ন জটিল রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়।

হালিম (Cress)

প্রশ্ন-২৩৬ : হালিমের পরিচয় কী? হাদীস শরীফে হালিম সম্পর্কে কী কী বর্ণনা এসেছে?

Cress-এর বাংলা, উর্দু ও হিন্দি নাম 'হালিম'। ইউনানি নাম হচ্ছে 'হাব্বুর রাশাদ'। সিরিয়ায় এটি 'আল-কাক দূনীস' নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক নাম *Lepidium sativum* L. এর আরবি নাম 'আছ-ছাফ্‌ফা'। Persian নাম হচ্ছে 'তুখমে রিশাদ'। এটি এক প্রকার বারোমেসে গাছ যা Brassicaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর উৎপত্তি মধ্যপ্রাচ্যের হিজায ও নাজদ প্রদেশে। এর ফুলগুলো সাদা।

হালিম গাছ (Lepidium sativum plant)

কায়েস ইবনে রাফি রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে জেনে বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা হালিম ব্যবহার করো। কারণ আল্লাহ এর মধ্যে সকল রোগের নিরাময় রেখেছেন।" (আবূ নু'য়াইম) [৭১০]

নিম্নোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে একে ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। কায়েস ইবনে রাফে আল-কায়সী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোন্ দুটো তিক্ত জিনিসে রোগ নিরাময় হয়ে থাকে? তিনি নিজেই প্রশ্ন করে আবার নিজেই উত্তর দেন। তিনি বলেন, এ দুটো জিনিস হচ্ছে ঘৃতকুমারী ও হালিম।" [৭১১]

What are the too bitter means of healing, aloes and cress? হাদীসটি আবূ নু'য়াইম ও বায়হাকীর সুনানুল কুবরায় উল্লেখ আছে। ইমাম আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তিব্বুন নববী কিতাবে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমান আবূ দাউদের কিতাবুল মারাসিলে উদ্ধৃত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।

হালিম বীজ

প্রশ্ন-২৩৭ : হালিম কী কী কাজে ব্যবহার করা যায়? এর গুনাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

আল কাহ্হাল ইবনে তারখান বলেন, Cress heats, acts as a laxative, expels worms and stimulates libido. এটি শরীর গরম করে, জোলাপ হিসেবে কাজ করে, কৃমি নাশ করে এবং কাম বাসনা বা কামেচ্ছা জাগিয়ে তোলে। স্যুপের সাথে রান্না করে খেলে এটি বুক পরিষ্কার করে এবং চুলপড়া বন্ধ করে। It is beneficial in cases of asthma and difficult breathing. It cleanses the lungs and regulates the menstrual cycle. এটি হাঁপানি এবং কষ্টকর স্বাসপ্রশ্বাসে উপকারী। এটি ফুসফুস পরিষ্কার রাখে এবং মেয়েদের মাসিক রক্তস্রাব নিয়ন্ত্রণে রাখে।

ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে হাকীম জালীনুস (গ্যালেন) বলেছেন, হালিমের কার্যকারিতা সরিষার দানার মতো। আর তাই এটি উরুর ব্যথা বা sciatic pain এবং headache এর নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। গ্যালেন আরো বলেন, হালিম অন্যান্য ওষুধের সাথে মিশিয়ে হাঁপানি রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো কিছু traditional uses তার তিব্বুন নববী বইয়ে উল্লেখ করেছেন। মধুর সাথে মিশিয়ে bandage হিসেবে ব্যবহার করলে এটি spleen tumous decompose করে থাকে। It also relaxes the stomach, removes worms and heals the ulcers of mange and herpes. It is an effective stimulant.

হালিম কাঁচা খাওয়া যেতে পারে। এর সতেজ পাতা সালাদ এবং স্যুপে দেয়া যায়। আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেন যে cress seed আগুনে পোড়ালে যে ধোঁয়া সৃষ্টি হয়, তা কীটপতঙ্গ দূর করতে ও colic-এর চিকিৎসায় উপকারী। আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে 'hurf' means 'unripe grapes'. হালিম থেকে তৈরি infusion আমাশয় ও বমি দূর করতে কার্যকর।

হালিমে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন আছে, যার কারণে এটি খেলে খাবার অতি দ্রুত হজম হয়। এ ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং সামান্য পরিমাণে ভিটামিন এ, বি এবং carotene আছে। Sulphur, calcium and phosphatesও এতে বিদ্যমান। সম্প্রতি এক গবেষণায় জানা যায় যে, cress-এ antibiotic property সম্পন্ন উপাদান রয়েছে। আর এসব গুণাগুণের জন্যই সম্ভবত মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালিমে সকল রোগের নিরাময় আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

ডুমুর (Fig)

প্রশ্ন-২৩৮ : পবিত্র কুরআনে 'সূরা ত্বীনে' ডুমুরের কথা এসেছে। এই ডুমুরের পরিচয় সম্পর্কে বলুন।

উত্তর : পবিত্র কুরআনে ত্বীন নামক সূরা আছে, যার অর্থ ডুমুর বা বিলেতি ডুমুর। এই সূরায় আল্লাহ সুবহানুহু ওয়াতা'য়ালা ডুমুর, জলপাই, সিনাই পাহাড় ও পবিত্র মক্কা শহরের নামে শপথ করে কিছু বলেছেন।

﴿ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ﴾

"ওয়াত ত্বীন ওয়ায যাইতূনি ওয়াত্বুরি সীনীনা ওয়াহাযাল বালাদিল আমীন।" (আত-তীন ৯৫:১-৩)

এ ছাড়া বাইবেলের জেরিমিয়া ও ম্যাথু বইয়েও ডুমুরের বর্ণনা এসেছে। ডুমুরকে ইংরেজিতে fig বলা হয়। ইউনানি ভাষায় এটি আনজীর নামে পরিচিত। উর্দু, হিন্দি ও ফারসি ভাষাতেও এটি আনজীর হিসেবে পরিচিত। এর Botanical নাম *Ficus carica* এটি Moraceae family-এর প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। আরবি নাম ত্বীন।

ডুমুর গাছ

সবুজ ফলসহ ডুমুর গাছ

প্রশ্ন-২৩৯ : হাদীস শরীফে ডুমুরের উপর কী বর্ণনা এসেছে অনুগ্রহপূর্বক বিস্তারিত বলুন?

উত্তর : পবিত্র হাদীস শরীফে আমরা ডুমুরের দুটো বর্ণনা পাই। হযরত আবূ যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে "একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক পাত্র ডুমুর হাদিয়া হিসেবে আনা হলে তিনি তাঁর সাহাবীদের খেতে বলেন এবং তিনি নিজেও খান এবং বলেন, "আমি যদি কোনো ফল সম্বন্ধে বলতাম যে, তা জান্নাত থেকে এসেছে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই বলতাম, এটি ডুমুর, ত্বীন ডুমুর বা আনজীর।" (জামে সগীর ও আবূ নু'য়াইম) [৭১২]

ডুমুরের ফালি

এ হাদীসটি আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

তার জামে সাগীর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। হযরত আবূ যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন, যাঁর নামে ঢাকার মালিবাগে আবুজর গিফারী ডিগ্রি কলেজ আছে। তিনি বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা ডুমুর খাও। এটি অর্শ্ব রোগ দূর করে এবং গিঁটবাতে উপকারী।" [৭১৩]

এ হাদীসটি ইমাম আস-সুয়ূতী ও আবূ নু'য়াইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।

পাকা ও শুষ্ক ডুমুর ফল

গ্যালেন বলেন, "যদি ডুমুর, আখরোট (walnut) ও রূ (তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট চিরহরিৎ এক প্রকার উদ্ভিদ)-এর সাথে একত্রে খাওয়া যায়, তাহলে বিষক্রিয়া দূর হয় এবং বিষক্রিয়ার ক্ষতিকর দিক থেকে নিরাপদে থাকা যায়। হাফিয ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ডুমুরের সাথে আখরোট (walnut) ও কাঠবাদাম (almond) খেতে বলেছেন।

আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ডুমুরকে nourishing এবং উপকারী বলেছেন। এটি nerve-কে শক্তিশালী করে।

প্রশ্ন-২৪০ : বাংলাদেশে ডুমুর কোথায় পাওয়া যায়? ডুমুর আর কী কাজে উপকারে আসে?

উত্তর : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি ডুমুরকে 'জান্নাতের ফল' হিসেবে অভিহিত করেছেন। জান্নাতের ফলসমূহের সাধারণত বিচি থাকেনা। ডুমুর ফলটি বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এটি খাদ্য ও ওষুধ উভয় হিসেবেই ব্যবহার করা যায়। এটি একটি অর্থকরী ফসল যা প্রধানত সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রায় ৫০০০ বছর যাবত চাষাবাদ হয়ে আসছে। বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো ডুমুর খাওয়া খুব পছন্দ করতেন। আরবীয়রা এটিকে খাদ্য ও ওষুধ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতো। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম ব্যবহার হচ্ছে কিডনি ও মূত্রথলির পাথর দূরীকরণে এটি একটি নির্ভরযোগ্য laxative ওষুধ। Asthma ও sexual debility-তেও এটি বেশ কার্যকর।

প্রশ্ন-২৪১ : ডুমুরের ওপর যে গবেষণা হয়েছে তার ফলাফল কী? মেহেরবানী করে আলোচনা করুন।

উত্তর : গবেষণায় জানা যায়, ডুমুরে প্রচুর পরিমাণে শর্করা জাতীয় পদার্থ অর্থাৎ sugar বিদ্যমান। ডুমুরে ৬৪ ভাগেরও বেশি চিনি জাতীয় পদার্থ আছে। এছাড়া ডুমুরে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রণ, ফসফরাস ও কপার রয়েছে। Citric acid, malic acid-সহ বেশ কতগুলো inorganic acids রয়েছে। এই ডুমুরে ficisin নামীয় একটি enzyme রয়েছে। এ উপাদানগুলোর জন্য ডুমুর খেলে তা অতি সহজেই হজম হয় এবং একে wholesome বা স্বাস্থ্যকর ফল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে যারা গিঁটবাত বা অর্শরোগে ভুগছেন, তারা যেন এই ডুমুর ফল নিয়মিত খান। ইনশা'আল্লাহ্ তাদের অসুস্থতা দূর হয়ে যাবে। খাওয়ার পরিমাণ বা dosage হচ্ছে প্রতিদিন ১টি-২টি ডুমুর সকালে বা সন্ধ্যায় অথবা যেকোনো সময় খাওয়া যাবে।

মেহেদি (Henna)

প্রশ্ন-২৪২ : আমাদের দেশে হেনা বা মেহেদি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আমরা অনেকেই মেহেদি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি। এই মেহেদির ওষুধী গুণাগুণ সম্পর্কে কী বর্ণনা এসেছে তা আলোচনা করুন।

উত্তর : ধন্যবাদ ডা. আজহার। মেহেদি বা হেনার আরবি নাম হচ্ছে হিন্না বা ফাগিয়া। Persian ও ইউনানি নাম হিনা, মেহেদি। হিন্দি ও উর্দূ নাম মেন্দি বা মেহেনদি। বৈজ্ঞানিক নাম *Lawsonia inermis.* এটি এক প্রকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এটি Lythraceae family-এর অন্তর্ভুক্ত।

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহেদি পাতাকে ওষুধ হিসেবে প্রায়ই ব্যবহার করতেন। যেমন, শরীরে বা পায়ে কাঁটা বা অন্য কিছু বিঁধলে, ব্যথা পেলে বা কোনো ফোঁড়া হলে, তা পাকানোর জন্য মেহেদি ব্যবহার করতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা থেকে শুনে বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সুগন্ধি গাছ-গাছড়ার মধ্যে উত্তম হচ্ছে মেহেদি।" [৭১৪]

হাদীসটি বায়হাকীর শু'য়াবুল ঈমান হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। ঠিক একই ধরনের আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, "মেহেদি একটি সুগন্ধি গাছ, যা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অত্যধিক প্রিয়।" [৭১৫]

ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসটি বর্ণনা করেন। Henna was the a herb most beloved to the Messenger (SAWS) of Allah. [715]

এ দু'টো হাদীসের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ভাল জানেন। হাদীস দুটোর সত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। আস-সুসূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে হেনার চেয়ে আর কোনো উদ্ভিদ নেই যা আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয়। (আস-সুয়ূতী) [৭১৬]

মেহেদী গাছ (Henna plant)

ফুল ও পাতাসহ মেহেদি গাছ (Henna plant with flowers)

প্রশ্ন-২৪৩ : মেহেদির ব্যবহার সম্পর্কে হাদীস পাকে কী কী বর্ণনা এসেছে?

উত্তর : সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচারিকা ছিলেন। তিনি বলেন, "যখন কেউ রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মাথা ব্যথার কথা বলতেন, তখন তিনি তাকে বলতেন, তুমি শিঙ্গা লাগাও। আর যখন কেউ তার পায়ের ব্যথার কথা বলতেন, তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলতেন, "দু'পায়ে মেহেদির রং লাগিয়ে দাও।" (আবূ দাউদ) [৭১৭] অর্থাৎ Dye them with Henna.

এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম আস্-সুয়ূতী বর্ণনা করেন। এসব হাদীসের বর্ণনা ও পরবর্তীতে

চুলে রং দেয়া (Dyeing hair)

প্রশ্ন-২৪৬ : আমাদের দেশে অনেকেই চুলে রং দিয়ে সাদা চুল কালো করে থাকে। এই চুলে রং দেয়া বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট বক্তব্য কী?

উত্তর : ধন্যবাদ ডা. আজহার। চুলে রং দেয়া সম্পর্কে বেশ ক'টি হাদীস রয়েছে। হযরত উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাওহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "আমি একদা উম্মে সালমাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট গমন করলাম। তিনি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি চুল আনলেন যাতে মেহেদির রং মেশানো ছিলো। (সহীহ আল বুখারী) [৭২৫]

হেনা পেস্ট (Henna paste)

কাতাম পেস্ট (Katam paste)

অপর একসূত্রে জানা যায় যে ইবনে মাওহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "উম্মে সালমাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ইবনে মাওহাবকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকগাছি চুল দেখিয়েছিলেন, যার রং ছিলো লাল।" (সহীহ আল বুখারী) [৭২৬]

ঠিক এ ধরনের আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন বাশির ইবনে খাসাসিয়া-এর স্ত্রী জাহযামা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেন, "আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাড়ির ভিতর থেকে বের হতে দেখলাম। তিনি গোসল সেরে আসছিলেন। তাই তিনি চুল নাড়ছিলেন এবং তাঁর মাথায় মেহেদির রং দেখা যাচ্ছিল।" (আত তিরমিযী) [৭২৭]

এ দুটো হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুলে ও দাড়িতে মেহেদি ব্যবহার করতেন। এছাড়া আরো কয়েকটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুলে মেহেদি ব্যবহার করতেন।

আবূ দাঊদ, আত-তিরিমিযী, ইবনে মাজাহ ও আন-নাসাঈ হাদীস গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মেহেদি ও কাতাম রংয়ের সাহায্যে সাদা বা পাকা চুলের রং পরিবর্তন করা উৎকৃষ্ট।" [৭২৮]

অর্থাৎ মেহেদী ও কাতাম, এ দুই রংয়ের সংমিশ্রণে যে রং তৈরি হয় তার সাহায্যে। হাদীসটির বর্ণনাকারী হলেন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু। হাদীস শরীফের ইংরেজি অনুবাদটি এভাবে এসেছে, "Henna and indigo (katam) are the best of what you can use to change the grey (white) colour of your hair." (Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibn Majah and An-Nasai) [728]

হাদীসটির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আগের পর্বেই তা আলোচনা করেছি।

এ বিষয়ে ইমাম আন-নাসাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো কয়েকজন হাদীস বর্ণনাকারীর হাদীস তার বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সুনানে আন-নাসাঈ শরীফে লিপিবদ্ধ করেছেন। কাতাম কালো রংয়ের মতো রস নিঃসারী এক প্রকার ঘাস, যেটা খয়েরী রংয়ের মতো হয়ে থাকে।

কাতাম (নীল) গাছ (Indigo plant)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলাকে বলেছেন, "যদি তুমি মহিলা হতে তাহলে অন্তত তুমি তোমার নখে (nail) মেহেদির রং লাগাতে।" (আবূ দাউদ ও আন-নাসাঈ) [৭২৯]

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার চুলে মেহেদির খিযাব ছিলো। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বাহ, কি সুন্দর"! এরপর অন্য এক ব্যক্তি, যিনি তার চুলে মেহেদি ও কাতাম রং একত্রে লাগিয়েছিলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেন, "এটি বরং আরো অধিক সুন্দর।" অতঃপর অপর এক ব্যক্তি হলুদ রংয়ের খেযাব ব্যবহার করে তাঁর সামনে দিয়ে গেলে তিনি বললেন, "এটি সবগুলোর চেয়ে উত্তম।" (আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ) [৭৩০]

হাদীসটি আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ শরীফে উল্লেখ আছে। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের জাফরান রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।" (আবূ দাউদ) [৭৩১]

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে আমরা মেহেদিকে মৃদু ব্যথানাশক বলতে পারি।

সালমা উম্মে রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আঘাত পেলে বা তাঁর শরীরে কাঁটা বিদ্ধ হলে তিনি আহত স্থানে মেহেদি লাগাতেন।" [৭১৮]

এ হাদীসটি ইবনে মাজাহ ও ইমাম আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহির তিব্বুন নববী কিতাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ ধরনের কয়েকটি হাদীস জামে আত-তিরমিযী ও আল বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তিরমিযী শরীফের উদ্ধৃত হাদীসের ভাষা একটু আলাদা। আলী ইবনে ওবায়দুল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর দাদীর সূত্র হতে এটি বর্ণনা করেছেন।

তিনি (সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেমা ছিলেন। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে যখনই তরবারি বা দা-এর আঘাতে যখম হতো তখন তিনি তাতে মেহেদি লাগিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিতেন।" (আত-তিরমিযী) [৭১৯]

হাদীসটি হাসান ও গরীব। এটি অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও আছে।

প্রশ্ন-২৪৪ : মেহেদির ব্যথানাশক গুণাগুণ ছাড়া আরো কী কী গুণের বর্ণনা হাদীস শরীফে এসেছে?

উত্তর : মেহেদি সম্পর্কে যেসব হাদীস আলোচনা করলাম তাছাড়া আরো বেশ ক'টি সহীহ হাদীস রয়েছে যা আমি সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে সংগ্রহ করেছি। এ হাদীসগুলো থেকে জানতে পারি যে মেহেদি খুবই নিরাপদ ও সহজলভ্য ওষুধ। আবূ রাফে' রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মেহেদি ব্যবহার করো। তা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রং।" [৭২০]

আবূ রাফে' রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন যে একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দিয়ে দাঁড়ি নাড়া-চাড়া করলেন এবং আমাকে বললেন, "তোমরা মেহেদি ব্যবহার করো। এটি হচ্ছে সকল প্রকার রংয়ের রাজা যা মানুষের ত্বককে সুন্দর করে আর সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধি করে।" [৭২১]

শুকনো মেহেদির গুড়া (Dry powdered Henna)

হাদীস দুটোই ইমাম আন-নাসাঈ, আবূ নু'য়াইম ও আস-সুয়ূতী উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে, "To you belongs the prince of dyes, which benefits the eyesight and increases sexual energy." (An-Nasai, Abu Nu'aim and As-Suyuti) [721]

আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো দুটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, প্রথমটি বর্ণনা করেছেন আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম একদা বলেছেন, "তোমাদের সাদা চুল পরিবর্তন করার উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে মেহেদি এবং কাতামের রং লাগানো।" (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও আন-নাসাঈ) ৭২২

দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেন, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা চুলে মেহেদির খিযাব ব্যবহার করো। এটি তোমাদের যৌবন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে এবং সঙ্গম ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে।" (আবূ নু'য়াইম, মুসনাদে বাযযার ও আস-সুয়ূতী) ৭২৩

কিছু অসাধু ব্যবসায়ী মেহেদি গুড়ার সাথে মিহি বালি মিশিয়ে তার ওজন বাড়িয়ে থাকে। এটি সহজেই বের করা যেতে পারে। কেননা বালি ওজনে ভারী। আর মেহেদির গুড়া হালকা। পানিতে ভিজালে মেহেদির গুড়া পানির ওপরে ভাসতে দেখা যায়, আর বালি নিচে জমে থাকে।

ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যা বর্ণনা করেছেন আবূ আইয়ূব আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নবী আলাইহিমুস সালামের জীবনযাত্রায় চারটি ঐতিহ্য সর্বদা বিদ্যমান থাকে। এগুলো হচ্ছে, বিয়ে করা, মিসওয়াক করা, সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা এবং লজ্জাশীলতা বা লজ্জা-শরম।" (আত-তিরমিযী ও ইবনুল কাইয়িম) ৭২৪

অন্যত্র হাদীসে 'ح' হরফটিতে যের দিয়ে তাশদীদ বিশিষ্ট 'নুন' যোগ করে শব্দটি হিন্না নামে বর্ণিত হয়েছে। হিন্না শব্দটির অর্থ 'হেনার খিযাব ব্যবহার করা'। তবে অধিকাংশ হাদীস বিশারদের মতে হাদীসে 'লজ্জাশীলতা' হওয়াটাই সঠিক।

প্রশ্ন-২৪৫ : হাদীস শরীফে কীভাবে মেহেদি ব্যবহার করার বর্ণনা আছে? মেহেরবানী করে বলবেন যে কীভাবে আমরা মেহেদি ব্যবহার করতে পারি?

উত্তর : হাদীস শরীফে মেহেদি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তার কোনো বিস্তারিত বর্ণনা নেই। আমরা মেহেদি পাতা পিষে নিয়ে (smash) করে ব্যথাযুক্ত স্থানে লাগিয়ে, পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতে পারি। ইনশা'আল্লাহ ব্যথা দূর হয়ে যাবে।

সম্মানিত দর্শক-পাঠকমণ্ডলি! যদি কারো পায়ে কোনো কারণে আঘাত লাগে, কোনো কাঁটা বা লোহা বিঁধে, সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করুন। মেহেদি শরীরের দূষিত রক্তকে শুষ্ক করে। মেহেদির ব্যথানাশক গুণাগুণের কারণ হচ্ছে মেহেদি পাতায় lawosone নামক এক প্রকার naphthoquinone আছে, যার জীবাণু নাশকারী গুণ রয়েছে এবং এই পদার্থটিই পাতার লালচে রংয়ের জন্য মূলত দায়ী। তাই মেহেদির একস্ট্রাকট বা paste যদি আহত স্থানে লাগিয়ে রাখা যায়, তাহলে এই জীবাণুনাশকারী গুণের কারণে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে।

এ ব্যাপারে আমি দর্শক-শ্রোতা-পাঠকমণ্ডলীকে একটি উপদেশ দিচ্ছি বা নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা মেহেদির পাতা সংগ্রহ করে ধুয়ে নিয়ে পাটায় পিষে নিন। তারপর বাজার থেকে sodium benzoate কিনে সামান্য পানিতে মিশিয়ে (০.৫-১% দ্রবণ করে) তা হেনা paste এর সাথে মিশ্রিত করে রাখলে উক্ত paste অনেকদিন ব্যবহার করা যাবে।

আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশ্তা আসেনা- ১. কাফির মুর্দার নিকট, ২. জাফরান রং ব্যবহারকারী ব্যক্তির নিকট এবং ৩. অপবিত্র ব্যক্তির নিকট (তবে অসুস্থতাবশত গোসলের পরিবর্তে উযূ করলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই)।" (আবূ দাউদ) [৭৩২]

এ বিষয়ে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা জাবির রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একদা হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা আবূ কুহাফাকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হলো। তার মাথার ও দাড়ির সকল চুলই সাদা ছিলো।" **নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন,** "এই চুলের রং পরিবর্তন করো, তবে কালো রং পরিহার করো।"(সহীহ মুসলিম ও ইবনে মাজাহ) [৭৩৩]

"Change this white colour, but avoid the black colour." **এই হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও ইবনে মাজাহ শরীফ থেকে নেয়া হয়েছে। কালো রংয়ের খিযাব ব্যবহার প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেছেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,** "শেষ যামানায় কিছু লোক এমন হবে, যারা কবুতরের সিনার মতো কালো রংয়ের খিযাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের খুশবু পাবেনা।" (আবূ দাউদ) [৭৩৪]

এ সকল হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চুলে, দাড়িতে, গোঁফে খেযাব বা কালো রং ব্যবহার করা বৈধ নয়। অবশ্য কোনো কোনো উলামায়ে কিরাম কারো রোগের কারণে বা অন্য কারণে অপরিণত বয়সে চুল সাদা হয়ে গেলে স্ত্রীকে খুশি করানোর উদ্দেশ্যে কালো খেযাব ব্যবহার করা বৈধ বলেন। তদুপরি যারা ব্যাপকভাবে কালো খিযাবের ব্যবহার নাজায়েয বলেন তাদের মতের স্বপক্ষে পেশকৃত দলীল-প্রমাণগুলো শক্তিশালী বলে গণ্য। তবে চুল পাকার পরিণত বয়সে সর্বসম্মতিক্রমে কালো খেযাব ব্যবহার বৈধ হবে না। হ্যাঁ, জিহাদের ময়দানের বিধান ব্যতিক্রম, যেহেতু সেক্ষেত্রে কালো খেযাব ব্যবহার বৈধ। সাহাবায়ে কিরামের একটা বৃহৎ অংশ জিহাদের উদ্দেশ্যে চুলে কালো খেযাব ব্যবহার করতেন। (যাদুল মা'আদ ও আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ লিল লাখনাবী)

অবশ্য সাদা চুল রাখার তুলনায় কালো ব্যতীত অন্য কোনো খেযাব ব্যবহার করা মুস্তাহাব, যা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। উল্লেখ্য যে, খেযাব যদি চুলে আবরণ সৃষ্টি করে যে, নখ দিয়ে ঘষলে আবরণ উঠে আসে সেক্ষেত্রে খেযাব লাগানো অবস্থায় উযূ-গোসল সহীহ হবেনা, পবিত্রতা অর্জন হবেনা। তখন নামায আদায়ও সহীহ হবেনা। এখানে আরেকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তাহলো, আমাদের সমাজে অনেক পুরুষকে হাতে-পায়ে মেহেদি লাগাতে দেখা যায়। এ কাজটি বৈধ নয়। যেহেতু হাদীসে শুধুমাত্র মহিলাদেরকে হাতে-পায়ে মেহেদি লাগানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে, পুরুষদের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অপরদিকে আমর ইবনে শুয়াইব রহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা চুল উপড়াতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এটা মুমিনের নূর।" (আত-তিরমিযী) [৭৩৫]

প্রশ্ন-২৪৭ : খ্রিস্টান বা ইয়াহূদিরা চুলে মেহেদি ব্যবহার করে কি?

উত্তর : হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে আমি এর উত্তর দিচ্ছি। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ইয়াহূদি ও খ্রিস্টানগণ (চুলে) মেহেদি রং ও খিযাব ব্যবহার করেনা। অতএব তোমরা (খিযাব লাগিয়ে) তাদের বিপরীত (কাজ) করো।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ) [৭৩৬]

প্রশ্ন-২৪৮ : মুহ্তারাম, আপনি যে দুটো রংয়ের কথা বললেন তার সাথে আমাদের সম্মানিত দর্শক-শ্রোতামণ্ডলীকে পরিচয় করিয়ে দেবেন কি?

উত্তর : হেনা হচ্ছে মেহেদি, যা আমরা সবাই চিনি। বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। অনেকে বাড়ির আঙিনায় এ গাছ লাগিয়ে থাকেন। এর ব্যবহার আপনারা সবাই জানেন। বাজারেও কিনতে পাওয়া যায় হাতে বা পায়ে দেয়ার জন্য। আরবি নাম ফাগিয়া, আর হিন্দি ও উর্দু নাম মেহেনদি বা মেন্দি। বৈজ্ঞানিক নাম *Lawsonia inermis.* এটি Lythraceae family-এর গাছ।

নীলের ইংরেজি নাম হচ্ছে Indigo। আরবি নাম কাতাম, কুতম বা ওয়াস্‌মাহ। বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে *Indigofera tinctoria* L. এটি Papilinoceae প্রজাতির গাছ। এ গাছটিও বাংলাদেশে পাওয়া যায়। যারা botanist বা ইউনানি হাকিম, তারা এ গাছটি আপনাকে চিনিয়ে দিতে পারবেন।

ফুল ও পাতাসহ নীল গাছের ডাল (Indigo plant leaves and flowers)

প্রশ্ন-২৪৯ : মুহতারাম, এবার সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা-পাঠকমণ্ডলীর উদ্দ্যেশে কিছু বলুন যে এসব হাদীস থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করি? বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ বলুন।

উত্তর : প্রথম শিক্ষা হচ্ছে, মেহেদি ও কাতাম এ দুটো রংই প্রাকৃতিক বা natural dye, যা সম্পূর্ণ নিরাপদ, চুলের কোনো ক্ষতি করেনা। কিছুদিন পর নিয়মিত গোসলে ও অন্যান্য পরিচ্ছন্নতায় সাবান ব্যবহার করলে এমনিতেই এ রং চলে যায়। এগুলো বাজারের কৃত্রিম চুলের রংগুলোর চেয়ে অনেক উত্তম।

মেহেদীর বিকল্প কৃত্রিম বা রাসায়নিক রংগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহার করার পর এর ব্যবহার বন্ধ করলে দেখা যাবে যে, চুল আগের চেয়ে অনেক বেশি সাদা হয়ে গেছে। কারণ চুলের সাথে এসব রংয়ের কিছু ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে থাকে। এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে মেহেদি চুলের রং লালচে বা বাদামি করে, আর নীল বা ওয়াসমাহ্ সাদা চুল কালো করে থাকে। আর এ দুইয়ের সংমিশ্রণে যে রং তৈরি হয় তা এ দুটি রংয়ের মাঝামাঝি একটি রং।

হাদীসগুলোর আরো একটি শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুলে কালো রং দেয়া পছন্দ করতেন না। কিন্তু যদি কালো ও লাল অথবা কালো ও বাদামি রং একত্রে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়, তাতে আপত্তি নেই। He disallowed dyeing the hair black, but if the black colour is mixed with henna or katam, then there is no harm in it.

ইমাম আন-নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে পুরুষদের জন্য চুলে হলুদ ও লাল রং দেয়া মুস্তাহাব। আর কালো রং দেয়া হারাম অথবা মাকরূহ। তবে হাদীস বিশারদগণ শুধুমাত্র জিহাদের জন্য চুলে কালো রং ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে তারা দলিল হিসেবে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যা বর্ণনা করেছেন সুহাইব আল-খায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যা দিয়ে চুল রঙিন করো তার মধ্যে এই কালো খিযাব খুবই উত্তম। তাতে তোমাদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ আছে এবং জিহাদে তা তোমাদের শত্রুদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টিকারী।" (ইবনে মাজাহ) [৭৩৭]

বিশ্ববিখ্যাত লেখক ও হাদীস বিশারদ হাফিয ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আমাদের সমাজে মাঝে মাঝে অন্যকে ধোঁকা দেয়ার জন্য চুলে কালো খিযাব দেয়া হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনো বয়স্কা মহিলা তার চুল খিযাবের সাহায্যে কালো করেন, তিনি তখন তার স্বামী বা অন্য লোককে ধোঁকাই দিয়ে থাকেন। অপরদিকে কোনো বয়স্ক পুরুষ যদি চুল কালো করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি অন্য মহিলা বা নিজের স্ত্রীকে ধোঁকা দেন। এটি এক প্রকার প্রতারণা বা cheating বিধায় তা নিষেধ। এটি বন্ধ হওয়া উচিত। It should be stopped. তিনি আরও বলেন, যদি চুল কালো করার পেছনে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য বা ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্য না থাকে, তবে তা জায়েয।

ইবনে জারির রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বর্ণনা মতে আমরা জানতে পারি যে "হযরত ইমাম হুসাইন এবং ইমাম হাসান তাঁদের চুলে কালো রং দিয়েছিলেন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ) [৭৩৮]

তবে মূলত তাঁরা জিহাদের উদ্দেশ্যে কালো খিযাব ব্যবহার করতেন। তাছাড়া অনেকে বলেছেন যে, তাঁরা কাতাম বা খয়েরী রংও ব্যবহার করতেন।

সোনামুখী (Senna)

প্রশ্ন-২৫০ : ইউনানি মেডিসিনে সিনা বা বর্গে সিনার ব্যবহার দীর্ঘদিন যাবত চলে আসছে। এই সিনা সম্পর্কে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য কী? সোনামুখীর পরিচয় সম্পর্কে আমাদের

অগণিত দর্শক-শ্রোতাদের কিছু বলুন।

উত্তর : In Arabic Sanna, Unani Sunut বা Barge sana বা Sanai Makki. বাংলা সোনামুখী English নাম হচ্ছে Tinnevelly senna or Alexandrian senna. Family Caesalpiniaceae.

এই সিনা সম্পর্কে বিখ্যাত হাদীসটি হযরত আবূ উবাই ইবনে উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "অবশ্যই তোমাদের সিনা (সানা) ও শুলফা (সান্নুত) ব্যবহার করা উচিত। এ দু'টোতে সা'ম ছাড়া সকল রোগের নিরাময় রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! 'সা'ম' কি? তিনি বললেন, 'মৃত্যু'।" (ইবনে মাজাহ) [৭৩৯]

Tinnevelly senna

Cassia senna

আমর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "ইবনে আবূ আবলা বলেছেন, সান্নুত হলো এক ধরনের উদ্ভিজ্জ। কেউ কেউ বলেন, এটি ঘি রাখার চামড়ার পাত্রে রক্ষিত মধু।" (ইবনে মাজাহ) [৭৪০]

প্রশ্ন-২৫১ : কোষ্ঠকাঠিন্যের চিকিৎসায় রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উপদেশ দিয়েছেন?

উত্তর : একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কীভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের চিকিৎসা করো? অর্থাৎ তুমি কিসের জোলাপ নাও?" তিনি বলেন, Euphorbia বা শুবরুম (ছোলা সদৃশ এক প্রকার দানা)-এর সাহায্যে। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "এটি বেশ গরম ও শক্তিশালী জোলাপ।" অর্থাৎ very hot and strong laxative. তখন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, অতঃপর আমি সিনাও ব্যবহার করে থাকি (অর্থাৎ সোনামুখী গাছের পাতা দিয়েও জোলাপ নিই)। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "এমন কোনো প্রতিষেধক যদি থাকতো, যা মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারতো, তাহলে তা হতো সিনা।" (আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [৭৪১]

ঠিক একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে জুসাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবূ উবাই ইবনে উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহু।
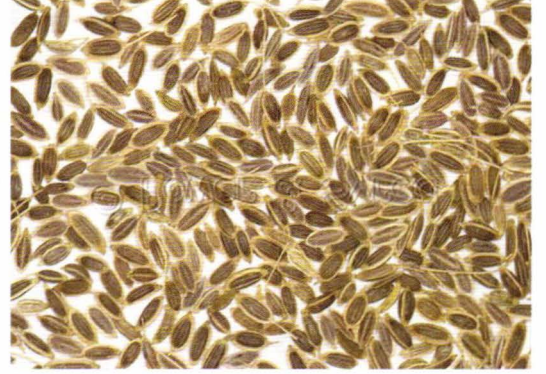
Euphorbia species

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তিনটি জিনিসে সকল রোগের নিরাময় রয়েছে– একমাত্র ক্যান্সার ব্যতীত। এগুলো হচ্ছে সিনা ও শুলফা (senna and dill). তারা বললো, আমরা সিনা সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু শুলফা (ল্যাটিন নাম Anethum) কী? রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইনশা'আল্লাহ তোমরা সত্যি জানতে পারবে। তারপর বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বলেন, তৃতীয় জিনিসটির নাম আমি ভুলে গেছি।" (আন-নাসাঈ, আস-সুয়ূতী ও আবূ নু'য়াইম) [৭৪২]

শুলফা গাছ ও বীজ (Dill plant and seeds)

Flowering dill plant

প্রশ্ন-২৫২ : সিনার উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা-পাঠক! নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে কালিজিরার ন্যায় সিনাও সর্বরোগের প্রতিষেধক। সিনা জোলাপ সৃষ্টিকারী। অর্থাৎ কোষ্ঠকাঠিন্য দূরকারী। এর কারণ, গবেষণায় জানা যায় যে সিনাতে anthraquinone derivatives, sennosides A, B, C and D রয়েছে, যা পানিতে সহজেই দ্রবণীয়। গবেষণায় আরো জানা যায়, সোনাপাতা ও সোনামূল একটি মৃদু ওষুধ যার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। এটি রক্ত পরিষ্কারক ও শ্বাস-প্রশ্বাসে উপকারী। সিনার ব্যাপক উপকার ও গুণাগুণ বিবেচনা করে চিকিৎসকগণ একে মহিমান্বিত ওষুধ (glorious medicine) হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। সিনাপাতা ও এর বাকলের ব্যবহার নবম হিজরী থেকেই প্রচলিত ছিলো। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সিনা ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন। আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সিনা চরম বুদ্ধিহীনতা (idiocy) এবং গিঁটবাত (arthritis)-এর চিকিৎসায় বেশ উপকারী। Senna is one of the effective medicines recommended by the Prophet (SAWS) for the treatment of constipation.

বিহিদানা (Quince)

প্রশ্ন-২৫৩ : মুহতারাম, এবার বিহিদানা সম্পর্কে কিছু বলুন। এটি সম্পর্কে হাদীস শরীফে কী বর্ণনা এসেছে?

উত্তর : বিহিদানার আরবি নাম Safarzal, ইউনানি নাম বিহি বা বিহিদানা, বাংলা নাম বিহিদানা, Persian/হিন্দি/উর্দু নাম বিহি/বাহি, ফারসি নাম বাহ। ইংরেজি নাম Quince. বৈজ্ঞানিক নাম *Cydonia oblonga.* প্রজাতি Rosaceae.

ফুলসহ বিহিদানা গাছ (Quince shrub with flowers)

এটি বহুল প্রচলিত টক-মিষ্টি একটি ফল। এটি ভারতীয় উপমহাদেশে পাওয়া যায়। এটি সম্পর্কে ছয়টি বর্ণনা এসেছে হাদীস শরীফে। হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, **"একদা আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। ঐ সময় নবী**

করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি অম্ল জাতীয় ফল ছিলো। তিনি দানাটি আমাকে দেখিয়ে বললেন, হে তালহা! এটি নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে এটি heart stimulant বা চিত্ত সতেজকারী।" (ইবনে মাজাহ) [৭৪৩]

এখানে অম্লজাতীয় ফল বলতে বিহিদানাকে বুঝানো হয়েছে, যা পরবর্তী হাদীস থেকে জানা যায়। এই হাদীসটি আল মু'জামুল কাবীর হাদীস গ্রন্থে অন্যভাবে এসেছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "হে তালহা! এটি নিয়ে নাও! বিহিদানা কলব বা অন্তরকে শক্তিশালী করে, মনকে প্রশান্ত বা সতেজ করে এবং বুকের ভার ভার ভাব দূর করে (অর্থাৎ দমবন্ধ হয়ে যাওয়া শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে)।" (আল মু'জামুল কাবীর) [৭৪৪]

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা খালি পেটে বিহিদানা খাও।" [৭৪৫]

হাদীসটি ইমাম আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আবূ নু'য়াইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি উদ্ধৃত করেছেন।

পাকা ফলসহ বিহিদানা গাছ

আল মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিহিদানাকে "মন প্রশান্তিকারক ও সতেজকারী বলে উল্লেখ করেছেন।" (আল-মু'জামুল কাবীর) [৭৪৬]

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা বিহিদানা খাও। এটি অন্তরকে শক্তিশালী ও সতেজ করে।" (জামে সগীর) [৭৪৭]

তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা বিহিদানা খাও। কারণ, এটি চিত্তকে প্রশান্ত ও শক্তিশালী করে। আল্লাহর এমন কোনো নবী বা রসূল আলাইহিমুস্ সালাম নেই যিনি বেহেশতের বিহিদানা খাননি। কারণ সেই বিহিদানা কমপক্ষে চল্লিশজন মানুষের দৈহিক শক্তি জোগায়।" (আস-সুয়ূতী) [৭৪৮]

ইমাম আস সুয়ূতী উদ্ধৃত এ হাদীসটি ইবনে মাজাহ ও অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

যাহোক, বর্ণিত এই হাদীসটিতে বিহিদানাকে 'বেহেশতের ফল' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একে দেহের শক্তিবর্ধক ও চিত্তের জন্য আনন্দদায়ক বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভবতী মহিলাদের বিহিদানা খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা বিহিদানা খাও, কারণ এটি চিত্তকে কোমল করে এবং অন্তরকে শক্তিশালী করে এবং সন্তানের গঠন সুন্দর করে।" (আস্-সুয়ূতী ও জামে সগীর) [৭৪৯]

ইমাম আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার তিববুন নববী গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা তার সূত্রভাষ্য অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থে খুঁজে পাইনি।
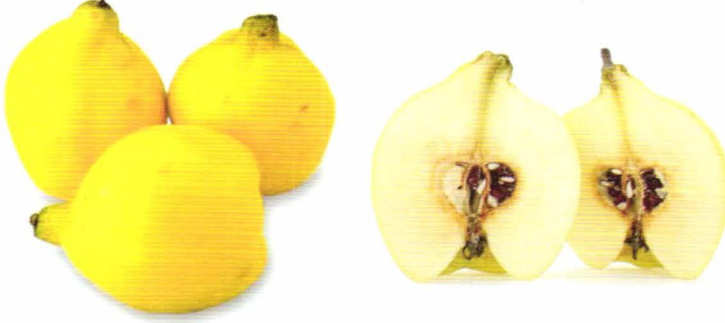
পাকা বিহিদানা ফল (Ripe quince fruits)

প্রশ্ন-২৫৪ : বিহিদানার গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবার আলোকপাত করুন।

উত্তর : বিহিদানা এক প্রকার অম্ল জাতীয় ফল। এটি ঠাণ্ডা ও গরম উভয় প্রকৃতির হয়ে থাকে। বৈশিষ্ট্য ভেদে এর স্বাদ আলাদা হয়ে থাকে। মিষ্টি ও টক উভয় ধরনের বিহিদানাই তৃষ্ণা নিবারণ করে, বমিবমি ভাব দূর করে এবং এটি মুত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে (diuretic)। মধুর সাথে খেলে অথবা ভেজে খেলে তা খুবই উপকারী বলে ইবনুল কাইয়িম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন। বিহিদানার বীজ থেকে সংগৃহীত তেল শরীরের ঘাম দূর করে এবং পাকস্থলীকে শক্তিশালী করে। এর ঘন নির্যাস লিভার শক্তিশালী করে এবং চিত্ত ও আত্মাকে সতেজ ও শক্তিশালী করে।

প্রশ্ন-২৫৫ : বিহিদানা কীভাবে খাওয়া যায়? হাদীস শরীফে এ বিষয়ে কী বর্ণনা এসেছে?

উত্তর : বিহিদানা খেতে টক ও মিষ্টি উভয়ই। আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বিহিদানাকে উত্তপ্ত বা গরম করে অথবা হালকা আধা সিদ্ধ করে মধুর সাথে মিশিয়ে খাওয়া উত্তম বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, নানা প্রকারের শরবত বা সিরাপ এই বিহিদানা থেকে তৈরি করা যায়। এছাড়া রস বা মোরব্বা তৈরি করা যায়। যে সমস্ত syrup এই বিহিদানা থেকে তৈরি করা হয় সেগুলো হচ্ছে, Astringent syrup, lime syrup, simple syrup ইত্যাদি। এটি কফ প্রশমিত করে, গলাব্যথা ও স্বরভঙ্গ দূর করে এবং অন্যান্য রোগে উপকারী। তবে হাদীস শরীফে কীভাবে এটি খাওয়া যায়, সে বিষয়ে কোনো বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

লাউ (Gourd / pumpkin)

প্রশ্ন-২৫৬ : হাদীস শরীফে রোগ নিরাময়ে লাউ সম্পর্কিত কী বর্ণনা এসেছে? খাদ্য না ওষুধ হিসেবে? অনুগ্রহপূর্বক বিস্তারিত বলবেন কি?

উত্তর : লাউকে কদুও বলা হয়ে থাকে। এর ইংরেজি নাম gourd বা pumpkin. Botanical নাম *Lagenaria sicerana*. Syn. *Lagenaria vulgaris* (Curcubita sp). আরবি নাম Yaqtin, dubba or qar. হাদীস শরীফে লাউ সম্পর্কে ৪টি প্রসিদ্ধ হাদীস আছে। এগুলোর ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "লাউ বা কদু মানুষের বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি করে এবং মস্তিষ্ক সতেজ রাখে।" (আল-মু'জামুল কাবীর) [৭৫০]

এই হাদীসের সনদে আমর ইবনুল হুসাইন নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি হাদীস বিশারদগণের নিকট মাতরূক বা পরিত্যাজ্য। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হিশাম ইবনে উরওয়া এবং তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তরকারিতে প্রচুর পরিমাণ লাউ দাও। কারণ এটি বিষণ্ণ অন্তরকে উজ্জীবিত করে।" (ইবনুল কাইয়িম ও আস-সুয়ূতী) [৭৫১]

লাউ গাছ

সবুজ লাউ

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত আছে। তিনি বলেন, "জনৈক দর্জি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খানা খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমন্ত্রণকারী যবের রুটি ও স্যুপ পরিবেশন করেন, যার মধ্যে লাউ ও শুকনো গোশত ছিলো। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরকারি পাত্রের কিনারা থেকে লাউ-এর টুকরা খুঁজে খুঁজে বের করে খাচ্ছিলেন। ঐ দিন থেকে আমিও সর্বদা লাউ খাওয়া পছন্দ করতাম।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৭৫২]

লাউ সম্পর্কে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন হযরত আবূ তালুত রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে আমি হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দেখতে গেলাম। তখন তাকে লাউ খেতে খেতে বলতে

শুনেছি, "হে লাউগাছ! আমি তোমাকে কতো পছন্দ করি, কারণ আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তোমাকে পছন্দ করতেন। যেহেতু তিনি তোমায় খাওয়া পছন্দ করতেন, তাই আমিও তোমায় খেতে ভালোবাসি।" (আত-তিরমিযী) [৭৫৩]

Bottle gourd

Gourd

হাদীসটির ইংরেজি translation হচ্ছে, "O Yaqtin! You are a plant more dearer to me because the Messenger (SAWS) of Allah used to like eating you." (At -Tirmizi) [753]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "এক ব্যক্তি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করলো। ঐ দাওয়াতে আমিও শরীক হলাম। কদুসহ তরকারি পরিবেশন করা হলো। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেছে বেছে কদু খেতে লাগলেন যা তাঁর নিকট পছন্দীয় তরকারি ছিলো। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নিজে কদু না খেয়ে তা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এগিয়ে দিতে লাগলাম। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, এর পর থেকেই আমার নিকট কদু তরকারি পছন্দনীয় ছিলো।" (সহীহ মুসলিম) [৭৫৪]

Green pumpkin

Ripe orange pumpkin

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "যে কেউ লাউ ও ডাল (lentil) একত্রে খাবে, তার বর্ধিত হৃৎপিণ্ড (enlarged heart) স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং তার সঙ্গমশক্তি বৃদ্ধি পাবে।" [৭৫৫]

হাদীসটি ইমাম আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন।
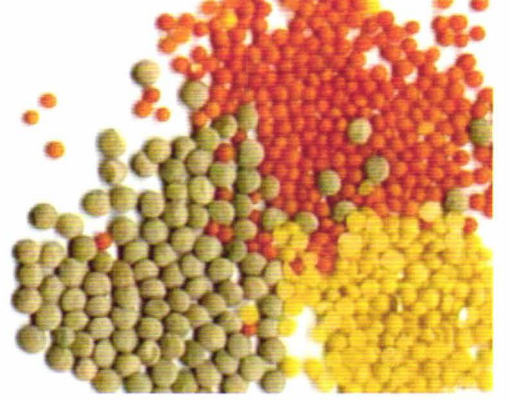
ডাল গাছ ও ডাল (Lentil plant and crops)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একবার রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক গোলামের গৃহে প্রবেশ করলেন। সে দর্জি ছিল। সে খাবার ভর্তি একটি পেয়ালা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাযির করলো। এর মধ্যে কদুও ছিলো। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেছে বেছে কদু বের করে খেতে লাগলেন। বর্ণনাকারী (রাবী) বলেন, আমি এটা দেখে তাঁর সামনে কদু জমা করতে লাগলাম। আর খাদেমটি নিজ কাজে মশগুল হয়ে গেলো। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, যেদিন হতে আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কদু খেতে দেখেছি, সেদিন হতে আমিও কদু পছন্দ করতে লাগলাম।" (সহীহ আল বুখারী) [৭৫৬]

প্রশ্ন-২৫৭ : লাউয়ের উপর কোনো গবেষণা হয়েছে কি? হয়ে থাকলে সংক্ষেপে বলুন।

উত্তর : লাউয়ের উপর বেশ গবেষণা হয়েছে। লাউয়ে ৯৬% পানি, ০.২% আমিষ জাতীয় পদার্থ (protein), ০.১% চর্বি জাতীয় পদার্থ এবং শর্করা জাতীয় পদার্থ ২.৫% আছে। এছাড়া ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, লৌহ, কিছু পরিমাণ ভিটামিন বি এবং বেশ পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে।

লাউ একটি হজমকারক (digestant). এর tender leaves শাক-সবজি হিসেবে খুবই জনপ্রিয় ও উপকারী খাদ্য। ইউনানী মেডিসিনে লাউয়ের বিচির যথেষ্ট গুণাগুণ বর্ণনা করা রয়েছে। বাংলাদেশে এটি কদুর তেল হিসেবে পরিচিত। এটি চুলকে সতেজ রাখে, মাথাকে ঠাণ্ডা রাখে এবং অকাল চুলপাকা বন্ধ করে। তাছাড়া নিদ্রাহীনতা, মাথাব্যথা উপশমে এবং কৃমিনাশক হিসেবে লাউ বেশ উপকারী। পিপাসা দূরীকরণে, প্রস্রাব বৃদ্ধিতে এবং শোথরোগ দূর করতে লাউ উপকারী।

মেথি (Fenugreek)

প্রশ্ন-২৫৮ : আচ্ছা মুহতারাম, মেথি আমরা সবাই চিনি এবং এটি রান্নার কাজে ব্যবহার করে থাকি। এ গাছ বা গাছের বীজ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী বক্তব্য আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, আছে। কাসিম ইবনে আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা রোগ নিরাময়ে মেথি ব্যবহার করো।" (ইবনুল কাইয়িম ও তানযীহুশ শরীয়াতীল মারফুআহ) [৭৫৭] হাদীসটির সনদ অন্য কোনো কিতাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মেথি গাছ (Fenugreek plant)

অপরদিকে আল-ওয়াছিলা গ্রন্থের লেখকের বর্ণনা উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি হাদীস বর্ণনা করেন। অন্য এক সূত্রে জানা যায় যে রিওয়ায়াতটির বর্ণনাকারী হলেন মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার community বা লোকজন যদি জানতো যে, মেথিতে কী আছে, তাহলে তারা এটি কিনত এবং স্বর্ণের ওজনের মাধ্যমে এর মূল্য পরিশোধ করতো।" (আল মুজামুল কাবীর, আবূ নূ'য়াইম ও আস-সুয়ূতী) [৭৫৮]

এই রিওয়ায়াতটি অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সম্ভবত এটি জাল হাদীস। কেননা ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে এ বাণীটি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়। এটি হচ্ছে তদানীন্তন আরব সমাজের কতিপয় চিকিৎসকের বক্তব্য। [৭৫৯]

যাহোক, হাদীস না হলেও এ রিওয়ায়াত থেকে আমরা মেথির ওষুধি গুণাগুণ ও গুরুত্ব বুঝতে পারি যে এটি রোগ নিরাময়ে উপকারী। একদা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নামে একজন প্রখ্যাত সাহাবীকে দেখতে যান। তখন তিনি মক্কায় ছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে একজন চিকিৎসক ডাকার পরামর্শ দিলেন। হারিস ইবনে কালাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি বলেন, "তার তেমন কিছু হয়নি বা তার কোন সমস্যা নেই। শুধুমাত্র কিছু মেথি, বার্লি ও নরম আজওয়া খেজুর একত্রে মিশিয়ে স্যুপ তৈরি করে তাকে খাওয়াও।" (ইবনুল কাইয়িম) [৭৬০]

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রতিদিন সকালে সামান্য মধুর সাথে মেথি সেবনের জন্য বলা হয়। স্যুপের এ recipeটি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অনুমোদন করেছিলেন এবং উক্ত স্যুপ সেবনে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহ আনহু সুস্থ হয়ে উঠেন। (আল ওয়াছিলা গ্রন্থের লেখক, ইবনুল কাইয়িম) ৭৬১

মেথি বীজ (Fenugreek seeds)

মেথি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী হার্বাল উপাদান। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে পছন্দ করতেন। এটি 'cure alls herb' নামে অভিহিত। হাজার হাজার বছর ধরে herbalist গণ এটি ব্যবহার করে আসছেন। মেথির ইউনানি, আরবি ও পারস্যীয় নাম Hulbah. এর Scientific নাম *Trigonella foenum-graecum* Linn. এটি Fabaceae family-এর অন্তর্ভুক্ত।

মেথি বীজে nutrient এবং fixed oils আছে, যা প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও choline সমৃদ্ধ cod liver oil-এর সাথে তুলনা করা যায়। আর এ কারণেই এটি প্রায়ই blood cholesterol কমাতে এবং হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ও পরিপাকতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেহেতু বীজে trigonelline আছে, যার জন্য ইঁদুরের উপর পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় যে মেথিতে hypoglycemic effect বিদ্যমান। আর তাই যেসব রোগী hypoglycemia, diabetes and fatigue রোগে আক্রান্ত তারা মেথি সেবনে উপকৃত হন। মেথি মূত্রনালি সংক্রান্ত রোগ ও পেটব্যথা দূরীকরণে খুবই উপকারী। মেথির আরো অনেক traditional uses আছে, যা সময়ের অভাবে আলোচনা করতে পারছি না। Herbal ওষুধ হিসেবে মেথির এতো ব্যাপক উপকারের জন্যই সম্ভবত বলা হতো যে "এর মূল্য বা দাম সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণের সমান।" আপনারা আমার লেখা "Medicine and Pharmacy in the Prophetic Traditions" বইয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন। বইটি শ্রীঘ্রই বাজারে আসছে। এটি সউদি আরবের রিয়াদ থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

কাসনী (Chicory)

প্রশ্ন-২৫৯ : এবার কাসনী সম্পর্কে জানতে চাই। এই গাছ বা এর বীজ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী বাণী আছে?

উত্তর : Chicory-এর ইউনানি, হিন্দি, উর্দু ও Persian নাম হচ্ছে কাস্নী। আরবি নাম হান্দাবা। বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Cichorium intybus L. এটি Wild Endive নামেও পরিচিত। এটি একটি বারোমেসে গাছ (perennial herb) এবং এটি Asteraceae family-এর অন্তর্ভুক্ত।

কাসনী গাছ ও ফুল (Chicory plant and flower)

কাসনী সম্পর্কে তিনটি হাদীস রয়েছে। কিন্তু এগুলো যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত তা সঠিকভাবে জানা যায় না, যদিও সবগুলো হাদীসই নিরবচ্ছিন্ন সনদের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। কাস্নী সম্পর্কে প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা কাসনী খাও। এটা শক্তভাবে ঝাঁকি দিওনা বা ধুয়ে ফেলো না। কারণ এমন কোনো দিন নেই যেদিন বেহেশতের পানি এ গাছের ওপর পতিত হয় না।" (আবূ নু'য়াইম) [৭৬২]

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "তোমরা কাসনী খাও। এটাকে ফেলে দিবেনা। কেননা প্রত্যেকটি কাসনী পাতার ওপর বেহেশত থেকে পানির ফোঁটা পতিত হয়ে থাকে।" (আবূ নু'য়াইম) [৭৬৩]

কাসনী বীজ (Chicory seeds)

এ হাদীস দু'টো ছাড়া নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সম্পর্কিত আর কোনো বক্তব্য আমি খুঁজে পাইনি। যাহোক, কাসনী মানুষের নিকট খুবই প্রিয়। ইউরোপীয় বাজারে এটি wild cherry syrup হিসেবে সুপরিচিত।

প্রাচীনকাল থেকে তা খাদ্য ও ওষুধ উভয় হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইউনানি চিকিৎসকগণ কাসনীর উপর বেশ গবেষণা করেছেন। Laboratory-তে গবেষণায় জানা যায় যে শিশুদের কফ নিরাময়ে এটি বেশ কার্যকর। It has been reported that aqueous extract of roots is a good remedy for eye troubles. তাছাড়া এটি GIT infammation এবং digestive problems-এ বেশ উপকারী। গাছটির প্রায় সকল অংশই বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে ফলপ্রদ। গাছটির ব্যাপক রোগ নিরাময় গুণাগুণের জন্য একে 'plant of life' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। গাছটির এসব গুণাগুণই প্রমাণ করে যে হাদীসসমূহের বক্তব্য যে 'এ গাছের ওপর প্রতিদিন জান্নাত থেকে পানি ঝরে থাকে', তা সঠিক।

মুর্‌রু (Marjoram)

প্রশ্ন-২৬০ : মুর্‌রুকে ইংরেজিতে আমরা Marjoram বলে থাকি। এই গাছটি সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী কী? এ গাছটির পরিচয় উল্লেখ করুন।

উত্তর : প্রথমে গাছটিকে পরিচয় করিয়ে দিই। গাছটির আরবি নাম মারজানজুশ বা মারদ্‌কুশ। ইউনানি নাম দুনা মারওয়া বা মারজানজুশ। হিন্দি ও উর্দুতে এটি মুরওয়া বা মারজানজুশ নামে পরিচিত। বাংলা নাম মুর্‌রু। Botanical name হচ্ছে *Majorana hortensis* Moench. এটি একটি বারমেসে herb যা Lamiaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

এই মারজানজুশ বা মুর্‌রু সম্পর্কে দুটি হাদীস রয়েছে। দুটো হাদীসই বর্ণনা করেন হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মুর্‌রু ব্যবহার করো এবং এর ঘ্রাণ গ্রহণ করো। কারণ এটি ঠাণ্ডা লাগা, সর্দি বা শ্লেষ্মা অর্থাৎ catarrah রোগে খুবই কার্যকর।" (আবূ নু'য়াইম, ইবনুল কাইয়িম ও জামে সগীর) [৭৬৪]

মুর্‌রু গাছ ও ফুল (Marjoram plant and flower)

হাদীসটির শুদ্ধতা নিরূপণ করা হয়নি। দ্বিতীয় হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন আনাস রাদিয়াল্লাহু

আনহু। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মিষ্টি মুর্‌রু ব্যবহার করতে পারো। কারণ যারা কোনো বস্তুর ঘ্রাণ নির্ণয় করার ইন্দ্রিয়শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তাদের জন্য এটি খুবই উপকারী।" (আস-সুয়ূতী) [৭৬৫]

প্রশ্ন-২৬১ : মারজানজুশের ব্যবহার কখন থেকে শুরু হয়েছে?

উত্তর : মারজানজুশ-এর উৎপত্তি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায়। একে sweet majoram নামেও অভিহিত করা হয়। হিপ্পোক্র্যাটস্ এবং গ্যালেন (হাকিম জালিনুস) একে গুরুত্বপূর্ণ ওযুধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ herbটির উপর ইবনে সিনার গবেষণার জন্য এটি ইরানে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং এর চাষাবাদ শুরু হয়। এটি আনুমানিক ১০ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং herbটির ফুল সাদা বা গোলাপি রংয়ের হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২৬২ : মুর্‌রুর উপর কোনো গবেষণা হয়ে থাকলে তার ফলাফল সংক্ষেপে বলবেন কি?

উত্তর : এ herbটি প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন প্রকার রোগের চিকিৎসায় ওষুধি গাছ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গ্রীসের লোকজন এটিকে বিষের প্রতিষেধক হিসেবে এবং মাংসপেশীর সংকোচনের চিকিৎসায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতো। ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, মুর্‌রুর সৌরভ যদি নাকে প্রবেশ করানো হয় তাহলে ঠাণ্ডাজনিত মাথাব্যথা থাকবেনা। তাছাড়া এটি নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সহজতর করে। অর্থাৎ It is a very effective remedy for cold. ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন যে, মুর্‌রুর suppository মহিলাদের menstruation হবার সময় রক্ত প্রবাহ বাড়ায় এবং তাদের conceive করতে সাহায্য করে। গাছটিতে প্রধানত flavonides রয়েছে। এ মূল্যবান herbটির আরো অনেক গুণাগুণ আছে। সুযোগ হলে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশা'আল্লাহ।

অধ্যায়-১৮

পানি, বায়ু, মাছি ও ইঁদুর বাহিত রোগ প্রতিরোধ

প্রশ্ন-২৬৩ : আমরা জানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে নবী করীম সল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশ কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। এবার বলুন, পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধে তিনি কী উপদেশ দিয়েছেন?

উত্তর : নবী করীম সল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খুবই ভালোবাসতেন। তিনি পাক-পবিত্রতার প্রতি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতা শুধু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই জরুরী তা নয়, বরং এটি আত্মার উৎকর্ষলাভের জন্যও প্রয়োজন। তাই এসবের প্রতি তাঁর রুচিবোধ ছিলো প্রশংসনীয়। Water-borne illness তথা পানিবাহিত রোগ থেকে উম্মাহকে রক্ষার জন্য তিনি দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা অভিসম্পাতের দুটো কাজ থেকে বেঁচে থেকো বা দূরে থেকো। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে কাজ দুটো কী?" তিনি বললেন, তা হচ্ছে মানুষের চলাচলের পথে অর্থাৎ রাস্তা-ঘাট-সড়কে বা ছায়াযুক্ত স্থানে যেখানে লোকজন গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়, মলমূত্র ত্যাগ করা।'' (সহীহ মুসলিম) [৭৬৬]

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''তোমরা বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করোনা, যা প্রবাহিত হয়না এবং সে পানিতে গোসল করোনা।'' (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৭৬৭]

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা! হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ধ ও স্রোতহীন পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৭৬৮]

আমরা সবাই জানি, প্রবাহিত পানি পাক থাকে। কারণ সেখানে ময়লা বা অপবিত্র জিনিস এক জায়গায় আটকে থাকেনা। নদী, সমুদ্র, নহর ও ঝরণার পানি তাই সর্বদা পাক থাকে। তবে বদ্ধ পানিও পাক থাকে। যেমন, পুকুর, বিল বা হাউযের পানি। তবে অল্প পানিতে, যা প্রবাহিত হয়না, কেউ সেখানে প্রস্রাব করলে তা নাপাক হয়ে যায় এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। তাই তিনি বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন, যা আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পুরোপুরি সমর্থন করে। কারণ বদ্ধ পানিতে অনেক pathogenic bacteria যেমন vibrio chokrae, salmonella, shigella এবং leptospera জাতীয় species survive করে বা বেঁচে থাকে। তাই বদ্ধ পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করলে এসব পানি দূষিত হয়ে জনসাধারণের অসুখ-বিসুখ সৃষ্টি করতে পারে। আর সম্ভবত এ কারণেই ইসলামের মহান নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব পানিবাহিত রোগ থেকে দূরে থাকার জন্য উপদেশ দিয়ে গেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা ইরশাদ করেন,

۞ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۞

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা অসৎকাজ কাজ থেকে দূরে থাকে (তাওবাকারী) এবং নিজেদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখে।" (আল বাকারাহ ২:২২২)

প্রশ্ন-২৬৪ : মহামারীর মতো কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব হলে নবী করীম সল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন?

উত্তর : যখন কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব হতো, তখন নবী করীম সল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে রোগের কারণ নির্ণয় করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতেন। অধ্যাপক আব্দুর রহমান জাবিরি ৪টি মাযহাবের উপর লিখিত একটি বইয়ে উল্লেখ করেন যে মুসলমানগণ যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন বেশ কয়েকজন সাহাবী একসাথে জ্বরে আক্রান্ত হন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পানিবাহিত রোগের উৎস খোঁজার নির্দেশ দিলেন। পরে একটি বদ্ধ পানির পুকুরের সন্ধান পাওয়া গেলো যার পানি দূষিত ছিলো। তিনি সেই পুকুরটি ভরাট করার নির্দেশ দেন। ভরাট করা হলে সেই রোগ নির্মূল হয়ে যায়।

প্রশ্ন-২৬৫ : আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাছিবাহিত রোগের চিকিৎসা কীভাবে করার পরামর্শ দিয়েছেন? কোনো তরল খাদ্যদ্রব্যে মাছি পড়লে সে খাদ্য কি ফেলে দিতে হবে?

উত্তর : কোনো তরল খাদ্যদ্রব্য বা পানিতে মশা বা মাছি পড়লে সে খাদ্য ফেলে দেয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটো হাদীস লক্ষ্য করুন, যা সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত আছে। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের পানীয়ের পাত্রে মাছি (মক্ষিকা) পতিত হলে এটিকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে উঠিয়ে ফেলে দাও। কেননা মাছির এক পাখায় রোগ আর অন্য পাখায় সে রোগের প্রতিষেধক রয়েছে।" (সহীহ আল বুখারী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ) [৭৬৯]

আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এক রিওয়ায়াতে নবী করীম সল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মাছির এক পাখায় বিষ থাকে অপর পাখায় বিষের নিরাময় থাকে। যখন এটি কোনো খাদ্যদ্রব্যে বসে, তখন এটিকে ডুবিয়ে উঠাও। কারণ, সেটি বিষের পাখাকে আগে রাখে, এরপর বিষ নিরাময়ের পাখা রাখে।" (মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ) [৭৭০]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসটিতে শেষের অংশটি নেই। এ হাদীস দুটোর ব্যাখ্যায় হযরত আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মাছিটিকে পানীয়দ্রব্যে ডুবিয়ে উঠানোর অর্থ তার অপর পাখায় থাকা ওষুধ extraction করা বা বের করে আনা, যেমন পানীয়তে মাছিটি পড়ার পর তার এক পাখা থেকে বিষটি পানীয়তে extracted হয়ে যায়। একইভাবে আল্লাহ্র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাছির অপর পাখায় থাকা ওষুধের মাধ্যমে মাছিবাহিত রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ মাছির এক পাখায় আনীত বিষের ক্রিয়াকে অন্য পাখায় থাকা বিষের প্রতিষেধক দ্বারা neutralize করতেন।

House flies carrying over 100 different kinds of disease-causing germs

হাদীস বিশারদ ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে এ আবিষ্কারটি সত্যি বিস্ময়কর। বিশ্বের অন্য কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষে ল্যাবরেটরিতে গবেষণা ছাড়া এ ধরনের বিস্ময়কর ওষুধের আবিষ্কার করা সম্ভবপর ছিলোনা। তদুপরি এ হাদীস দুটো এমন এক সময় বর্ণিত হয়েছে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্নত ছিলোনা। সম্প্রতি মিসরের কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের microbiology department এ হাদীস দুটো নিয়ে গবেষণা হয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য সম্পূর্ণ আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। এই হাদীসটির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল আমার লেখা Medicine and Pharmacy in the Prophetic Traditions বইয়ের পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করেছি।

মাছি ছাড়া ইঁদুর কর্তৃক খাদ্যদ্রব্য দূষিত হওয়ার ব্যাপারেও নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্য রেখেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু আনহা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, "একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে মরে গেলো। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইঁদুর ও তার আশপাশের ঘি তুলে ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট ঘি খেয়ে নাও।" (সহীহ আল বুখারী) [৭৭১]

ইমাম যুহরী আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হ'তে বর্ণনা করেছেন, "যায়তুন তেল ও ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর বা অন্য কোনো প্রাণী পড়ে মরে গেলে, তেল ও ঘি জমে থাকুক বা তরল থাকুক। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ খবর পৌছেছে যে ঘিয়ের মধ্যে পড়ে ইঁদুর মরে গেলে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ইঁদুর ও তার আশপাশের ঘি তুলে ফেলে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তদনুযায়ী ইঁদুর ফেলে দেয়া হয়েছে এবং তারপর সেই ঘি খাওয়া হয়েছে।" (সহীহ আল বুখারী) [৭৭২]

এ দুটো নির্দেশ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পুরোপুরি সমর্থন করে। কারণ মরা ইঁদুর খাদ্যদ্রব্যের ভিতর যেখানে পড়ে থাকে তার নিকটবর্তী অংশ দূষিত হয়ে থাকে; পুরো অংশ নয়। পাত্রের বিভিন্ন অংশের খাদ্যদ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করে microbiological পরীক্ষা করলেই খাদ্যদ্রব্য দূষিত হওয়ার মাত্রা জানা যাবে।

প্রশ্ন-২৬৬ : বায়ু বা বাতাসবাহিত রোগ থেকে দূরে থাকার জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী পরামর্শ দিয়েছেন?

উত্তর : হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার পানির মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।" (মুসতাদরাক) [৭৭৩]
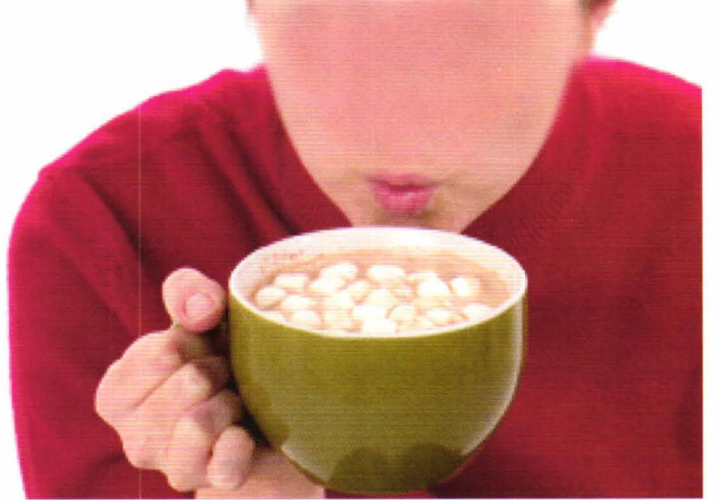
গরম পানীয়তে বা খাবার পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা ও ফুঁক দেয়া নিষেধ।

অপর দিকে হযরত আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ পানি পান করার সময় পানপাত্রে নিশ্বাস ফেলবেনা।" (সহীহ আল বুখারী) [৭৭৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও এ একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং কোনো খাবার পাত্রে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।" (আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী) [৭৭৫]

তখন জনৈক সাহাবী আরয করলেন, "যদি পানির পাত্রের ভেতর কোনো ময়লা দেখি, তখন কি করবো? নবী করীম সল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সে পানি ফেলে দাও। সাহাবী পুনরায় যখন বললেন, আমি এক নিঃশ্বাসে পরিমাণমতো পানি পান করতে পারিনা। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি শ্বাস নেয়ার প্রয়োজন হয় তখন পাত্র সরিয়ে নাও যাতে তুমি বাইরে প্রশ্বাস ফেলতে পারো। পরে পুনরায় পানি পান করো। প্রয়োজন হলে পুনরায় পাত্রটি সরিয়ে আবার তৃতীয় চুমুকে পানি পান শেষ করবে।" (আত-তিরমিযী) [৭৭৬]

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যাহোক, এই হাদীস তিনটি থেকে আমরা জানতে পারি যে পানীয়তে ফুঁক দিলে তা দূষিত হয়ে যায়। কারণ exhaled air contains

CO_2 যা মানুষ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বের করে দেয়। তাই কেউ পাত্রে নিঃশ্বাস ফেললে বা ফুঁক দিলে সে খাবার বা পানি কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের মাধ্যমে দূষিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে পানীয়তে নিঃশ্বাস ফেললে নিঃশ্বাসের সাথে water droplet বা বাষ্পকণা পানিতে প্রবেশ করে তা দূষিত করে। যাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা, ঠাণ্ডালাগা, Herpes Simplex, Rubela polymyetitis এবং Streptococcal infections থাকে, তাদের বেলায় উক্ত নিঃশ্বাসযুক্ত পানীয় কিছুতেই পান করা উচিত নয়। তৃতীয়ত, পানীয়তে কোনো ভাসমান খড়-কুটো বা ময়লা থাকলে তা ফেলে দেয়া উচিত। তাই নবী করীম সল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ফেলে দিতে বলেছেন। তবুও ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়-১৯

দন্তরোগের চিকিৎসা ও দাঁতের যত্নে করণীয়

প্রশ্ন-২৬৭ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁতের যত্নে বেশ কিছু উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন, যা মানা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই মঙ্গলজনক। এসব উপদেশ ও নির্দেশনা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

উত্তর : যদিও মিসওয়াক বা মিসওয়াকের বর্ণনা পবিত্র কুরআনে নেই, তথাপিও আমরা জানতে পারি যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বক্তব্যের মাধ্যমে মিসওয়াক সম্পর্কে বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়ে গেছেন ।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদেরকে বেশি বেশি (পুনঃপুনঃ) মিসওয়াক করার নির্দেশ দিচ্ছি।" অর্থাৎ আমি মিসওয়াক করার ব্যাপারে তোমাদেরকে অত্যধিক উৎসাহিত করছি। (সহীহ আল বুখারী ও আন-নাসাঈ) [৭৭৭]

"I have instructed you to cleanse your teeth using tooth stick (miswak), that is, traditional root." In other words, the Prophet (SAWS) has put great emphasis on the frequent use of tooth stick (miswak).

অপরদিকে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যদি আমার এরূপ ধারণা না হতো যে এ বিষয়টি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বা আমার লোকদের উপর কঠিন হয়ে যাবে, তাহলে আমি তোমাদের প্রত্যেক ফরয নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৭৭৮]

বস্তুত মিসওয়াক করার মাধ্যমে দাঁতের মাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়না এবং দাঁত সম্পূর্ণ পরিষ্কার, সুন্দর ও ঝক্‌ঝকে থাকে।

প্রশ্ন-২৬৮ : মিসওয়াকের ব্যবহার সম্পর্কে নবীজির উপদেশ সম্পর্কে জানলাম। এবার বলুন তাঁর মিসওয়াক সম্পর্কিত ব্যক্তিগত আমল সম্পর্কে, যা জানা ও অনুসরণ করা আমাদের জন্য সর্বোত্তম কাজ ও কল্যাণকর। অর্থাৎ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন কখন বা কয়বার মিসওয়াক করতেন?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বেশ ক'টি সহীহ হাদীস আলোচনায় আনবো, যা থেকে বিষয়টি সম্পর্কে আমরা পরিষ্কার ধারণা পাবো ইনশা'আল্লাহ। বস্তুত দাঁত ও মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার

ব্যাপারে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা জীবনের অন্যতম একটি নিয়মিত আমল হলো মিসওয়াক করা। আমির ইবনে রবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে যখন রোযা রাখতেন তখন সে মাসে আমি বিভিন্ন সময়ে তাঁকে মিসওয়াক করতে দেখেছি।" (সহীহ আল বুখারী) [৭৭৯]
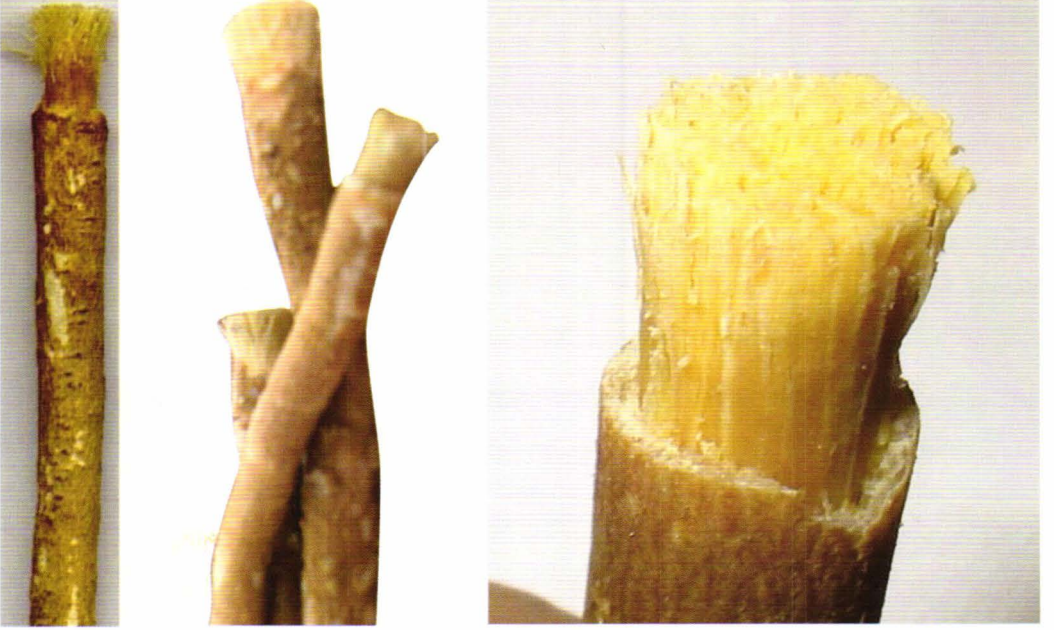
আরক গাছ থেকে তৈরি মিসওয়াক (Miswak from Salvadora persica plant)

হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যা সহীহ আল বুখারী শরীফে উদ্ধৃত আছে। হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে ঘুম থেকে উঠতেন তখন তিনি মিসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার করতেন।" (সহীহ আল বুখারী) [৭৮০]

এ হাদীসে নামায বা তাহাজ্জুদ নামাযের কথা নেই।

হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠতেন, তখন তিনি মিসওয়াক দিয়ে তাঁর মুখ পরিষ্কার করতেন।" (সহীহ মুসলিম ও ইবনে মাজাহ) [৭৮১]

সুরাইহ ইবনে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কী কাজ করতেন? তিনি জবাব দিলেন, সর্বপ্রথম তিনি মিসওয়াক করতেন।" (সহীহ মুসলিম, ইবনে মাজাহ ও আন-নাসাঈ) [৭৮২]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরো বর্ণনা করেন, "ইন্তেকালের পূর্বেও আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক ব্যবহার করেছেন।" (সহীহ আল বুখারী) [৭৮৩]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু রোযা রেখে সকালে ও বিকালে মিসওয়াক করতেন। ইবনে শিরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রোযা অবস্থায় কাঁচা রসযুক্ত মিসওয়াক ব্যবহারেও কোনো ক্ষতি নেই।" (সহীহ আল বুখারী) [৭৮৪]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদা তিনি আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রাত যাপন করেছিলেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাতে জেগে বাইরে গিয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে ইমরানের এ আয়াতটি (ইন্না ফি খালকিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব..........ওয়াক্বিনা 'আযাবান্নার) পাঠ করলেন। এরপর ঘরে ফিরে এসে মিসওয়াক করলেন ও উযূ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন।" (সহীহ মুসলিম) [৭৮৫]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে আমরা জানতে পারি যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ও দাঁতের যত্নে মিসওয়াক-এর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি নিজে নিয়মিত মিসওয়াক করতেন এবং সাহাবাদেরও মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতেন।

প্রশ্ন-২৬৯ : এবার মিসওয়াকের উপকারিতা বা স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এর গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করুন।

উত্তর : **মিসওয়াকের উপকারিতা অনেক এবং তা বিভিন্ন প্রকারের। এটি দাঁতকে পরিষ্কার রাখে এবং মুখমণ্ডলকে দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত করে এবং তা পরিচ্ছন্ন রাখে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,** "মিসওয়াক মুখকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে এবং মহান আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালার সন্তুষ্টি বিধান করে।" (সহীহ আল বুখারী ও আন-নাসাঈ) [৭৮৬]

অপরদিকে আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মিসওয়াক করো। কেননা মিসওয়াক মুখ পবিত্র ও পরিষ্কার করে এবং মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের উপায়।" (ইবনে মাজাহ) [৭৮৭]

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "তোমরা কুরআন তিলওয়াতের জন্য মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো।" (মুসনাদে আল বাযযার) [৭৮৮]

হযরত আলী ইবনে তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমাদের মুখ হলো কুরআনের রাস্তা। অতএব তোমরা দাঁতন (মিসওয়াক) করে তা পবিত্র ও সুগন্ধিযুক্ত করো।" (ইবনে মাজাহ) [৭৮৯]

বস্তুত মুখ পরিষ্কার রাখার বড় মাধ্যম বা উপায় হচ্ছে দাঁত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। যদি দাঁত পরিষ্কার না থাকে বা দাঁতে কোনো রোগ-ব্যাধি থাকে, তাহলে তা বিশ্রী দেখায় এবং মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। আশপাশের লোকেরা এতে ক্ষুব্ধ হয় ও তিরস্কার করে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি খানা খাবে, সে যেনো খিলাল করে।" (দারিমী) [৭৯০]

খিলাল করার মাধ্যমে দাঁতের গোড়ায় আটকে থাকা খাদ্যাংশ বের হয়ে যায়- তা বের না হলে মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয় ও এগুলো দাঁতকে নষ্ট করে ফেলে।

মিসওয়াকের উপকারিতা সম্পর্কে আরো একটি রিওয়ায়াত পেশ করেন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বর্ণনা করেন যে, "মিসওয়াক ব্যবহার করলে ১০ ধরনের উপকার পাওয়া যায়।" (সুনানে দারে কুতনী, জামে সগীর ও আস-সুয়ূতী) [৭৯১]

এ উপকারগুলো হচ্ছে মুখে সুঘ্রাণ আসা, মুখের অভ্যন্তরে gumকে শক্তিশালী করা, phlegm দ্রবীভূত করা, দাঁত থেকে scaling দূর করা, পেটকে খাদ্য গ্রহণের জন্য উপযোগী করে তোলা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, মানুষের প্রতিভা বৃদ্ধি পাওয়া, ফেরেশতাদের খুশি করতে পারা ইত্যাদি। মিসওয়াক নিঃশ্বাসকে সুগন্ধিযুক্ত করে, gingivaকে শক্তিশালী করে এবং dental caries প্রতিরোধ করে। যারা নিয়মিত মিসওয়াক ব্যবহার করেন তারা দাঁতের ক্ষয়রোগ থেকে রক্ষা পান। এছাড়া মিসওয়াক দাঁতের উপরিভাগে যে scale পড়ে, তা থেকে রক্ষা করে এবং জীবাণুযুক্ত প্লেক দূর করে।

মিসওয়াকের অপরিসীম গুরুত্বের কথা অনুধাবন করে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মিসওয়াক শেষে উযূ করে নামায পড়া মিসওয়াক না করে নামায পড়া অপেক্ষা ৭০ গুণ উত্তম।" (মুসনাদে আহ্‌মাদ ও মুসতাদরাকে হাকিম) [৭৯২]

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহ আনহুর ছেলে আব্দুর রহমান তার পিতা থেকে জেনে বলেন, "প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য শুক্রবার গোসল করা, মিসওয়াক ব্যবহার করা, আর সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক।" (সহীহ মুসলিম) [৭৯৩]

প্রশ্ন-২৭০ : কী কী গাছের ডাল দিয়ে মিসওয়াক তৈরি করা যায়? এ বিষয়ে হাদীস শরীফে উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহ বিস্তারিতভাবে দর্শক-শ্রোতা-পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলুন?

উত্তর : আবি জাহিদ আল-গাফিকী রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তিন ধরনের মিসওয়াক রয়েছে। তুমি যদি 'আরক' পাও তাহলে তা ব্যবহার করো। যদি না পাও তবে anam and batm ব্যবহার করো।" (আবূ নু'য়াইম, কানজুল উম্মাল ও জামেউল আহাদীস) [৭৯৪]

আরবি 'আনাম' বা 'খা'রুব' গাছের botanical নাম হচ্ছে *Ceratonia siliqua*. English name হচ্ছে Carob গাছ। এটি উদ মাসটাকি নামেও পরিচিত, যা Leguminaceae family-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে আরো জানা যায় যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের হাতের লাঠিটি ছিল এই Carob গাছ থেকে তৈরি।

বাবুই তুলসী গাছটির আরবি নাম রায়হান, ইউনানী নাম ফারাজন মুশক্ ও ইংরেজি নাম *Ocinum basilicam*. এটা সুগন্ধি গাছ। অনেকেই acacia twig কে প্রকৃত আনাম বলে অভিহিত করেন। এই 'আনাম' ছাড়া আর যে গাছটির ডাল মিসওয়াক হিসেবে ব্যবহারের জন্য রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তা হলো 'Batm', বুটুম বা উদ

মাসটাকি। এটির হিন্দি, উর্দু ও পারস্যীয় নাম হচ্ছে, 'মুসটাগী কাবুলী'। বোটানিক্যাল নাম হচ্ছে, *Pistacia terebinthus* L. এটি Anacardiaceae family-এর অন্তর্ভুক্ত।

Carob tree

ডালিম গাছ (Pomegranate plant)

Pistacia নামে তিনটি species আছে, যা চাষ করার উপযোগী। *Pistacia vera* থেকে pistacia বাদাম পাওয়া যায়। Mustaci resin পাওয়া যায় *Pistacia lentiscus* থেকে, যাকে আমরা 'রূমী মস্তকী' বলে থাকি। এই গাছ থেকে এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায় যা দন্ত মাজনের অন্যতম উপাদান। তবে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম *Pistacia terebinthus* species-কেই পছন্দ করেছেন বলে plant scientists-গণ মত প্রকাশ করে থাকেন।

যাহোক, আবূ নু'য়াইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি উদ্ধৃত রিওয়ায়াতটি *Pistacia terebinthus* L. কেই বুঝিয়ে থাকে, কেননা গাছটিতে ছোট ছোট শাখা রয়েছে যা টুথব্রাশ হিসেবে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হয়ে আসছে। (ফারূকী, ২০০৪) [৭৯৫]

প্রশ্ন-২৭১ : সবচেয়ে বহুল প্রচলিত, সহজলভ্য ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত মিসওয়াক কোন্ গাছের ডাল থেকে তৈরি করা হয়?

উত্তর : আরবিতে মিসওয়াক গাছের নাম হচ্ছে আরক বা খাম্‌ট। আর বাংলা, হিন্দি বা উর্দু নাম হচ্ছে আরক। এই আরক গাছটিকেই ইংরেজিতে Aloe wood বলা হয়, যার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে *Salvadora persica* L. এটি একটি গাছ, যা Capalvadracae family-এর অন্তর্ভুক্ত। ইউনানি নাম হচ্ছে ডারাকটে মিসওয়াক।

ইমাম আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে আল-হাদিকা বলেছেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সকালে ঘুম থেকে উঠতেন তখন তিনি আরক গাছের ডাল (a twig of aloe wood) দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।" (আস-সুয়ূতী) [৭৯৬]

আবূ নূ'য়াইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে আরকের তৈরি মিসওয়াক ব্যবহার করলে মানুষের বাকপটুতা বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য যেসব গাছের ডাল দিয়ে মিসওয়াক তৈরি করা যায়, সেগুলো হচ্ছে জলপাই গাছ, একাসিয়া গাছ, রিড গাছ ইত্যাদি। ডালিম বা বাবুই তুলসী গাছের কথা আগেই বলেছি।

মুস্তাগী কাবুলি গাছ (*Pistacia terebinthus* plant)

প্রশ্ন-২৭২ : *Salvadora persica* বা টুথব্রাশ গাছ কোথায় পাওয়া যায় এবং এর গুণাগুণ কী?

উত্তর : *Salvadora persica* plant-টি আরব দেশে ও মধ্যপ্রাচ্যে সাধারণত জন্মে থাকে। এটি 'শাজারাল মিসওয়াক' বা কাবাথ নামেও পরিচিত। অনেক সময় একে খারদাল নামেও অভিহিত করা হয়। এই গাছের ডাল দিয়েই মিসওয়াক তৈরি করা হয়, যা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ভিত্তিতে মুসলিম জাহানে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই গাছের ডাল থেকে তৈরি মিসওয়াক সর্বোৎকৃষ্ট বলে অভিহিত করেছেন।

বস্তুত এই গাছের গুণাগুণ প্রচুর। এই গাছের বাকলে triethylamine, alkaloid salvadorine, chlorides, high amounts of fluorides, silica, sulphur, vitamin C and small amounts of tannins, saponins and sterols আছে। The plant also contains substances with antibacterial principle. আর এ জন্যই দাঁতের যত্নে এর ব্যবহার সর্বজনবিদিত। Vitamin C and sitosterol capillaries কে শক্তিশালী করে দাঁতের পুষ্টি যোগায় এবং দাঁতকে জীবাণু আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

আরক গাছের ডালের সাহায্যে মিসওয়াক করা সম্পর্কে বেশ কিছু বর্ণনা এসেছে হাদীস শরীফে। এ সবের কয়েকটি রিওয়ায়াতের বর্ণনাকারী হলেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেন, "রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে ইন্তেকাল করেন। ঐ সময় আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরের হাতে আরক গাছের একটি আদ্র মিসওয়াক ছিলো। ঐ মিসওয়াকের প্রতি রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকান। তাকানোর পর তিনি বললেন হে আব্দুর রহমান! মিসওয়াকটি একটু চিবিয়ে দাও। সে মিসওয়াকটি তখন আমাকে (আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে) দিলে আমি তা চিবিয়ে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিলাম। এরপর রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করলেন।" (মুসতাদরাকে হাকিম) [৭৯৭]

প্রশ্ন-২৭৩ : আধুনিক toothbrush কি মিসওয়াকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়?

উত্তর : বস্তুত আধুনিক টুথব্রাশ হচ্ছে মিসওয়াকের উন্নততর এক সংস্করণ। এটি একটি নতুন উদ্ভাবন। আনুমানিক ২০০ বছর যাবত এই practiceটি চালু আছে। Tasty twig-এর সাহায্যে দাঁত মাজা-ই পরবর্তী সময়ে আধুনিক টুথব্রাশ আবিষ্কারের প্রথম ধাপ। একদা আমি আমার এক বন্ধু dentist doctor-এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করি এবং তাকে প্রশ্ন করি যে আধুনিক toothbrush ও tooth paste দিয়ে দাঁত পরিষ্কার আর মিসওয়াকের মাধ্যমে দাঁত পরিষ্কার, এ দুটো উপায়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর বৈজ্ঞানিক, কার্যকরী ও নিরাপদ।

আরক গাছ (*Salvadora persica* plant)

তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেন যে, আধুনিক টুথব্রাশের ন্যায় মিসওয়াকও দাঁতের চারপাশের খাবার কণা দূর করতে সক্ষম। তবে মিসওয়াক দাঁতের উপরিভাগের scaling দূর করতে বেশি কার্যকর। তিনি আরো বলেন যে উভয় প্রকার টেকনিকই দাঁতের উপরিভাগে সৃষ্টি হওয়া calculus দূর করে এবং মুখের দুর্গন্ধ বিলুপ্ত করে মুখে সতেজতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। তাই আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, আমরা যদি মিসওয়াকের সাথে tooth paste ব্যবহার করে দাঁত পরিষ্কার করি, তাহলে দাঁতের যত্নে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসও মানা হবে, আর টুথপেস্টের মাধ্যমে দাঁত-মুখ পরিষ্কার করার ফলে মুখের দুর্গন্ধও দূর হবে, সতেজতার অনুভূতি সৃষ্টি হবে এবং এতে আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট হবেন।

অধ্যায়-২০

নিজের চিকিৎসা নিজে করা, ওষুধের বিরুদ্ধ ব্যবহার ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

প্রশ্ন-২৭৪ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম Self medication অর্থাৎ নিজের চিকিৎসা নিজে করা এই concept টি কি সমর্থন করতেন? একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

উত্তর : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম Self medication সমর্থন করতেন না। তিনি অসুস্থ হলে চিকিৎসকের নিকট যেতে পরামর্শ দিতেন বা ডাক্তার ডাকতে বলতেন। কারণ চিকিৎসা বিদ্যা বা চিকিৎসাশাস্ত্র অতীব জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিধায় যিনি তা অধ্যয়ন করেননি তার পক্ষে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। তাই তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

He used three types of remedies for various aliments, natural (physical), divine and finally a combination of natural and divine remedies. Divine remedies হচ্ছে Spiritual medicine বা রূহানী ওষুধ। অর্থাৎ দু'য়া-দরূদ, দম-এর মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা। যাহোক, Self medication প্রসঙ্গে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস আলোচনায় আনবো যা প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। হৃদরোগ বিষয়ে আলোচনার সময় হাদীসটি বেশ কয়েকবার আলোচনা করেছি। তিনি বলেন, "একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে তশরীফ আনেন। তিনি তাঁর হস্ত মুবারক আমার বুকের উপর রাখলেন। তাঁর পবিত্র হাতের শীতলতা আমার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, "তুমি অন্তরে কষ্ট অনুভব করছো? তুমি সাকীফ গোত্রের অধিবাসী হারিস ইবনে কালাদাহ-এর নিকট যাও। কারণ তিনি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। সাথে সাথে ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে সে যেনো মদীনার ৭টি আজওয়া খেজুর বীচিসহ পিষে ৭টি বড়ি তৈরি করে তোমার মুখে প্রবেশ করায়।" (আবূ দাঊদ) [৭৯৮]

হযরত যায়িদ ইবনে আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় জনৈক ব্যক্তি আঘাত পেলে ক্ষতস্থানে তার রক্ত জমাটবদ্ধ হয়ে যায়। উপস্থিতদের একজন বনী আনবার গোত্রের দুই ব্যক্তিকে ডেকে আনলে উভয়েই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখেন। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমাদের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কে ভাল জানে?" এ কথা শুনে উভয়েই বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! চিকিৎসাতেও কি কল্যাণ আছে?" বর্ণনাকারী যায়িদ ইবনে আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ধারণা করেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "যিনি রোগ দিয়েছেন চিকিৎসাও তিনি দিয়েছেন।" (যাদুল মা'আদ) [৭৯৯]

আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল হতে বর্ণিত হাদীসের ভাষা একটু আলাদা। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যান এবং বলেন, ডাক্তার ডেকে আনো। উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি বলে ওঠেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনিও কি তাই বলছেন? তখন নবী করীম

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। আল্লাহ্ কোনো রোগ-ব্যাধি পাঠাননি, যার নিরাময় বা ওষুধ তিনি পাঠাননি।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক) ৮০০

এই হাদীস তিনটির বিষয়বস্তু থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে, নিজের অসুস্থতায় নিজেই চিকিৎসা করা সমীচীন নয়। এটা সাধারণ মানুষের জন্য যেমন প্রযোজ্য, তেমন ডাক্তারদের বেলায়ও প্রযোজ্য। যে কোনো ফার্মাসিস্টকে জিজ্ঞেস করুন তিনি একথাই বলবেন যে Self medication is bad. নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হৃদরোগের চিকিৎসায় heart specialist-এর নিকট যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশ আধুনিক মেডিকেল সায়েন্স পুরোপুরি সমর্থন করে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে কোনো হৃদরোগ চিকিৎসাসেবা cardiac surgeon বা heart specialist ছাড়া প্রদান করা হয়না। কারণ cardiac arrest-এ মৃত্যুর ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। এটি কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার মাত্র। তাই একজন cardiologist or heart specialist ছাড়া অন্য কারো কাছে হৃদরোগীকে পাঠানো উচিত নয়।

যাহোক, জ্বর বা ব্যথা উপশম তথা সাধারণ রোগ নিরাময়ের জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রাথমিক অবস্থায় কিছু সাধারণ ওষুধ গ্রহণ করা যেতে পারে, রোগের তীব্রতা কমানোর জন্য। এসব ওষুধ হাতের কাছেই পাওয়া যায় বা ফার্মেসি থেকেও ক্রয় করা যায়। ফার্মাসিস্টগণ OTC হিসেবে prescription ছাড়াই এসব ওষুধ বিক্রি করে থাকেন। এই OTC ওষুধের বাইরে কোনো ওষুধ কোনো রোগী বা তার আপনজন prescription ছাড়া কিনতে পারেনা। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এই আইন বলবৎ আছে। তবে আমাদের দেশে এর ব্যতিক্রম আছে।

প্রশ্ন-২৭৫ : Contra-indication in sickness বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল concept. এ বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য কী?

উত্তর : গত একটি পর্বে আমরা contra-indication in sickness সম্পর্কে আলোচনা করবো বলে জানিয়েছিলাম। আজ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো ইনশা'আল্লাহ। ইসলামের মহান নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম drug-drug এবং drug-food interaction নামক বিস্ময়কর মেডিকেল concept-এর প্রথম আবিষ্কারক। Contra-indication in sickness একটি বিস্ময়কর মেডিকেল concept, যাকে বাংলায় 'বিরুদ্ধ ব্যবহার' বলে থাকি। অর্থাৎ কিছু রোগে কতিপয় খাবার বা ওষুধ নিষেধ। কারণ ঐসব ওষুধ বা খাবার অসুস্থতাকে আরো বাড়িয়ে দিতে পারে এবং এতে রোগীর অবস্থা আগের চেয়ে আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আমি একটি হাদীস উল্লেখ করতে চাই, যা চোখের অসুস্থতার সাথে সম্পর্কিত। আমরা জানি খেজুর উত্তম খাদ্য। এর অনেক উপকারিতা বিদ্যমান। এটি শক্তিকারক। হযরত মারিয়ম আলাইহাস সালামের সামনে বেহেশত থেকে খেজুর আসতো। হৃদরোগ, weight loss, giddinessসহ বেশ কয়েকটি রোগে খেজুর খাওয়ানো হয়। Date also treats night blindness and analgesia. It is a muscle relaxant. It is also used as a vitamin and mineral supplement. কিন্তু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের এতো উপকারিতা থাকা স্বত্ত্বেও চোখের অসুস্থতায় খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ খেজুরের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া গরম। এটি চোখের অসুখ বৃদ্ধি করে। একই সময়ে অধিক পরিমাণে খেজুর খাওয়া

ক্ষতিকর। হযরত উম্মে মুনযির বিনতে কায়েস আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট তশরীফ আনেন। তাঁর সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন চোখের অসুখ থেকে আরোগ্যলাভের পথে ছিলেন। ঐ সময় ঘরে বেশ কিছু খেজুর ঝুলানো ছিলো। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে খেজুর নিয়ে খেতে শুরু করেন। তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও উঠে খেজুর খাওয়া শুরু করলেন। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, তুমি অসুস্থ, দুর্বল। সবেমাত্র আরোগ্যলাভ করেছো। তুমি খেজুর খাবেনা। একথা শুনে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খেজুর খাওয়া বন্ধ করলেন।" (আবূ দাউদ, আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) [৮০১]

এ ধরনের আরো একটি হাদীস হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, যা ইবনে মাজাহ ও মুসতাদরাক কিতাবে উদ্ধৃত আছে। তিনি বলেন, "আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হই। তাঁর সম্মুখে তখন রুটি ও খেজুর রাখা ছিলো। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কাছে এসো, খেতে বসো। আমি বসে খেজুর খেতে শুরু করি। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তোমার চোখে অসুখ। আর তুমি এই অবস্থায় খেজুর খাবে?" (ইবনে মাজাহ ও মুসতাদরাক) [৮০২]

এখানে চোখের অসুখ বলতে opthalmia বা conjunctivitis কে বুঝানো হয়েছে।

এ দুটো হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, যখন চোখে ব্যথা ও জ্বালা-পোড়া থাকে, তখন খেজুর খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণও এ ব্যাপারে একমত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। Date is contra-indicated is conjunctivitis opthalmia and other sicknesses of the eye.

প্রশ্ন-২৭৬ : মেডিসিনের side effects বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে কী বর্ণনা করেছেন?

উত্তর : আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষতিকর ওষুধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ এমন কিছু ওষুধ রয়েছে, যার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন, "আমি ইবনে আবজারুল আকবারের দাদা হাইয়ানকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেন, যতোক্ষণ শরীর রোগ সইতে পারে ততোক্ষণ ঔষধ পরিহার করো।" (আল মু'জামুল কাবীর) [৮০৩]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর ওষুধ (যেসব ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি), অর্থাৎ বিষময় ওষুধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।" (ইবনে মাজাহ) [৮০৪]

নযর আহমদ রচিত তিব্বুন নববী কিতাবে উল্লেখ আছে যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যেসব ওষুধ এক রোগে উপকারী কিন্তু তাতে অন্য রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তা বর্জন করো।" (নযর আহমদ) [৮০৫]

এ রিওয়ায়াতের সূত্রভাষ্য অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়নি। যাহোক, এ দুটো রিওয়ায়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে আমাদের ঐসব ওষুধ বর্জন করা উচিত, যার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি। এবার হার্বাল মেডিসিন ও মডার্ন এ্যালোপ্যাথিক মেডিসিনের পার্থক্য সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করতে চাই।

হার্বাল মেডিসিন ও মডার্ন এ্যালোপ্যাথি মেডিসিনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে হার্বাল মেডিসিন বিশুদ্ধ নয়। এটি crude extract. অনেকগুলো উপাদানের সমষ্টি। তাই এর কাজও বেশ ধীর গতিতে। এর বিরুদ্ধ ব্যবহার নেই বললেই চলে। তাই কাজ বা উপকার না হলেও মানুষের শরীরে তেমন কোনো ক্ষতি করবেনা। অপরদিকে মডার্ন মেডিসিন বিশুদ্ধ এবং এর কাজ অত্যন্ত দ্রুত। এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা বিরুদ্ধ ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত মাযীদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের খেজুরগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম খেজুর হলো বরনি। এটি রোগ নিরাময় করে এবং এতে কোনো রোগ ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।" (মুসতাদরাকে হাকিম) [৮০৬]

বরনি খেজুর খুবই নরম ও সুস্বাদু প্রকৃতির। এটি চুষে খাওয়ার উপযোগী এক প্রকার খেজুর যা মদীনায় চাষ করা হয়। আজওয়া খেজুরও নরম ও শুকনো প্রকৃতির। এটিও মদীনায় চাষাবাদ করা হয়। এটি ফলজ খেজুর। হাদীস শরীফে আজওয়া খেজুর সম্পর্কে বেশ বর্ণনা এসেছে যা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি।

বরনি খেজুর (Barni date-palm)

প্রশ্ন-২৭৭ : আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ রোগের চিকিৎসা নেই বলে ইরশাদ করেছেন?

উত্তর : উসামা ইবনে শারীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হযরত যিয়াদ ইবনে ইলাকা বর্ণনা করেন, "আমি একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন কয়েকজন বেদুঈন লোক এসে প্রশ্ন করে, হে আল্লাহর রসূল! আমরা চিকিৎসা গ্রহণ না করলে কি আমাদের কোনো গুনাহ হবে? নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কারো। আল্লাহ তা'য়ালা একটি ব্যাধি ব্যতীত আর কোনো ব্যাধি সৃষ্টি করেননি, যার প্রতিষেধক

তিনি সৃষ্টি করেননি এবং যা দুরারোগ্য, অর্থাৎ incurable. তারা জিজ্ঞেস করলো, সেটা কোন্ রোগ? রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটা হলো বার্ধক্য, Old age". [৮০৭]

এ হাদীসটি মুসনাদে আহ্‌মাদ ও আত-তিরমিযী শরীফে লিপিবদ্ধ আছে। That is to saw, "Allah has not sent down an ailment for which no remedy has been prescribed except one disease, that is incurable. They ask what that? He said, "it is old age."

ইবনে মাজাহ শরীফে উদ্ধৃত হাদীসের ভাষা আলাদা। সেখানে হাদীসের শেষাংশে অতিরিক্ত বেশ কিছু শব্দ আছে, "তারা বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! বান্দাকে যা কিছু দেয়া হয় তার মধ্যে উত্তম জিনিস কী? তিনি বলেন "সচ্চরিত্র।" (ইবনে মাজাহ) [৮০৮]

যাহোক, বর্তমানে বিজ্ঞানীরা anti-aging drug তৈরির চেষ্টায় রত। আমরা কেউই এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাইনা। বৃদ্ধ বয়সেও সিঙ্গাপুর, মাদ্রাজ, ব্যাংকক যাই treatment এর জন্য। বার্ধক্য আমাদের কাম্য নয় বা তাকে আমরা জয় করতে চাই। তাই দেখা যায় plastic surgery-এর মাধ্যমে মানুষ নিজের চেহারাকে যুবক বা যুবতী দেখানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। সামান্য কয়েকদিনের জন্যে হলেও আমরা অন্যকে বোকা বানানোর চেষ্টা করি যে আমি এখনও যুবক ও কর্মক্ষম। কিন্তু হঠাৎ সেই সুস্থ সুন্দর মানুষকেও কোনো প্রকার নোটিশ ছাড়াই মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিতে হয়। এটিই সৃষ্টির নিয়ম।

অধ্যায়-২১

ভুল চিকিৎসায় রোগীর ক্ষতি বা প্রাণহানি

প্রশ্ন- ২৭৮ : মুহতারাম, আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে ভুল চিকিৎসার কারণে অথবা ডাক্তারের অবহেলার জন্য রোগী মারা গেছে। এই ভুল চিকিৎসা তখনই হয় যখন চিকিৎসক অনভিজ্ঞ হন অথবা তিনি একজন অজ্ঞ বা হাতুড়ে ডাক্তার হন। বাংলাদেশে এই ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুবরণের ঘটনা অহরহই ঘটে থাকে এবং আদালতে মামলাও হয়। বস্তুত ডাক্তারি বিদ্যায় বা চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞানলাভ শেষে সনদপ্রাপ্ত না হয়ে এবং বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল (BMDC) কর্তৃক registered না হয়ে বাংলাদেশে চিকিৎসা কাজে নিয়োজিত হওয়া আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের বিধান পৃথিবীর প্রায় দেশেই বলবৎ আছে। এ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী বক্তব্য আছে?

উত্তর : **জি হ্যাঁ, আছে। আমর ইবনে শু'য়াইব তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তার পিতামহের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,** "যদি কেউ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন না করে কারো চিকিৎসা করে, তাহলে সেই রোগীর জন্য সে সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে।" [৮০৯]

হাদীসটি আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ ও মুসতাদরাকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আব্দুল আযীয ইবনে উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার নিকট যারা আসতেন তাদের বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ডাক্তার না হয়ে রোগীর চিকিৎসা করে এবং তার ডাক্তার হওয়া সম্পর্কে যদি কেউ না জানে, তার চিকিৎসা দ্বারা কারো ক্ষতি হয়, তবে সে যিম্মাদার হবে। যেমন- কেউ যদি রক্তমোক্ষণ করতে গিয়ে কোন শিরা কেটে ফেলে, অথবা বড় করে কাটে বা ফাঁড়ে, অথবা এমনভাবে দাগ দেয়, যাতে রোগী মারা যায়, তবে তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে।" (আবূ দাঊদ) [৮১০]

আল-খাত্তাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি এ মত সমর্থন করি যে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো রোগীর চিকিৎসা প্রদান করতে গিয়ে তার সীমা লঙ্ঘন করে এবং এর ফলে যদি রোগী মারা যায়, তাহলে সে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবে। আর কোনো ব্যক্তি যদি যথাযথ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও নিজেকে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন বলে দাবি বা প্রচার করে, তাহলে সে সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং এ ক্ষেত্রে এটি সাধারণভাবে স্বীকৃত যে ঐসব ডাক্তার বা হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ সে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে।" [৮১১]

এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন আল্লামা আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা-পাঠক! মূলত এ দুটো হাদীসের মমার্থ ও আল-খাত্তাবীর রিওয়ায়াতটিই হচ্ছে Focal point of Islamic Medical Ethics. **হাদীস দুটোর শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি যদি যথাযথ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ছাড়াই কারো চিকিৎসা করে এবং রোগীর কোনো ক্ষতি সাধন করে, তাহলে উক্ত রোগীর অঙ্গ বা স্বাস্থ্যহানির জন্য সে দায়ী থাকবে। হাদীসটি এ ইঙ্গিতও দেয় যে, হাতুড়ে**

ডাক্তারগণ তাদের ভুল বা অবৈধ চিকিৎসা প্রদানের দরুন রোগীর ক্ষতি হলে দায়ী থাকবে। তাই যেসব ডাক্তার অনভিজ্ঞ অথবা যারা চিকিৎসাশাস্ত্র ভালভাবে অধ্যয়ন না করে অন্য কোনো উপায়ে সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন, তাদের মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা উচিত নয়। কারণ এর ফলে তারা যে শুধু আইনের দৃষ্টিতেই দায়ী হবেন তা নয়, বরং নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহর কাছেও জবাবদিহি করতে হবে। আমি তাই আহ্বান জানাবো হাতুড়ে ডাক্তারগণ আল্লাহর নিকট ক্ষমা চান এবং মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করার পেশা পরিত্যাগ করুন। এই সাথে ইসলামিক টিভির দেশ ও বিদেশের অগণিত দর্শক তথা সম্মানিত ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বলছি, **"বিশেষ কারণে যদি কোনো ডাক্তার রোগ নির্ণয়ে অক্ষম হন, অথবা সঠিক ওষুধ নির্বাচন করতে না পারেন, তখন শুধুমাত্র অনুমান বা কিয়াসের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপত্র দেয়া উচিত নয়। বরং তিনি যেনো সংকোচ পরিহার করে তার চেয়ে অভিজ্ঞ ও অধিকতর জ্ঞানী ডাক্তারের নিকট রোগীকে refer করেন, এজন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।"**

সম্মানিত চিকিৎসকদের অনেকে হয়তো অবগত আছেন যে ৯২০ খিস্টাব্দে আব্বাসীয় খলীফা আল-মুকতাদির একদা জানতে পারেন যে জনৈক ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার কারণে বাগদাদে একজন রোগী মারা গেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি একটি আইন জারি করেন, যে সকল ডাক্তার চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষে চিকিৎসা সেবায় কাজে নিয়োজিত থাকবেন, তাদেরকে নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে। উত্তীর্ণ ডাক্তারগণ পরে শপথ গ্রহণ করবেন এ মহান পেশায় যোগদান ও মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকার জন্যে। সেই শপথকেই Hippocratic oath নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে ইসলামী একত্ববাদের ধারণার আলোকে শপথ বাক্যাবলিতে যথেষ্ট পরিবর্তন আনা হয়।

প্রখ্যাত হাদীসশাস্ত্র বিশারদ ও হাফিয আল্লামা ইবনুল কাইয়িম তার তিব্বুন নববী বইয়ে হাদীস দুটোর ব্যাখ্যায় ডাক্তার কর্তৃক ভুল চিকিৎসার পাঁচটি ক্ষেত্র বর্ণনা করেন। পরবর্তীতে সুযোগ হলে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশা'আল্লাহ্।

অধ্যায়-২২

অন্তরের ব্যাধি ও তার চিকিৎসা

প্রশ্ন- ২৭৯ : সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা, বেশ কয়েকটি পর্বে আমরা Disease and Treatment অর্থাৎ রোগ ও চিকিৎসা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। আর আমাদের সে আলোচনা ছিলো বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কিত। That is, illness of the body. এবার আমরা আলোচনা করবো illness of the heart, অর্থাৎ অন্তরের ব্যাধি বা মনের রোগ সম্পর্কে। মুহতারাম, মনের রোগ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা কুরআন মজীদে কী ইরশাদ করেছেন?

উত্তর: আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা সূরা বাকারায় ইরশাদ করেন,

﴿فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا﴾

"তাদের অন্তরে আছে রোগ। আল্লাহ্ সে রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।" (আল বাকারাহ ২: ১০)

"In their hearts is a disease (of doubt and hypocrisy) and Allah has increased their disease." (Al-Baqarah 2:10)

এখানে মুনাফিকীকেই রোগ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর "আল্লাহ্ এ রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন" এ কথাটির অর্থ এই যে তিনি কালবিলম্ব না করে ঘটনাস্থলেই মুনাফিকদের কৃত কার্যকলাপের শাস্তি দেননা; বরং তাদেরকে ঢিল (সুযোগ) দিতে থাকেন। এর ফলে মুনাফিকরা নিজেদের কলা-কৌশলগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে সফল হতে দেখে আরো বেশি ও পূর্ণ মুনাফিকী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে থাকে। সূরা মুদ্দাস্সিরে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا﴾

"আর যাদের মনে রোগ (অন্তরে ব্যাধি) আছে, তারা এবং কাফিররা বলবে, এ অভিনব কথা (উক্তি) দ্বারা আল্লাহ্ কী বুঝাতে চেয়েছেন?" (আল-মুদ্দাসসির ৭৪:৩১)

"...... and those whose hearts are sick (due to hypocrisy) and the disbelievers say, What does Allah intend to mean with this parable." (Al- Muddaththir 74:31)

কুরআন মজীদে সাধারণত 'মনের রোগ' কথাটি 'মুনাফিকী' অর্থে ব্যবহার করা হয়। তবে নাযিল হওয়া আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করলে এর অর্থ দাঁড়ায়, সন্দেহের রোগ। অকাট্যভাবে এবং নিঃসংশয়ে আল্লাহ, আখিরাত, অহী, রিসালাত, জান্নাত ও দোযখ অস্বীকার করে এমন লোক শুধু মক্কায় নয়, গোটা পৃথিবীতে আগেও যেমন ছিলো, এখনও তেমনিই আছে। এরাই সন্দেহের রোগে আক্রান্ত। আল্লাহ্ আছেন কিনা, আখিরাত হবে কি হবে না, ফেরেশতা, বেহেশ্ত-দোযখ বাস্তবিকই আছে না কল্পকাহিনী মাত্র। প্রত্যেক যুগে এ ধরনের সন্দেহ পোষণকারী লোকের সংখ্যা একেবারে কম ছিলোনা।

তাই তাদের মুনাফিকীও ছিলো বেশ প্রবল। এরা মুখে বিশ্বাস করতো, কিন্তু অন্তরে নয়। অপরদিকে সূরা আন-নূরে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿وَإِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ۝ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا۟ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۝ أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓا۟ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ ۚ بَلْ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝﴾

"যখন তাদের ডাকা হয় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে, যাতে রসূল তাদের পরস্পরের মোকদ্দমার ফয়সালা করে দেন, তখন তাদের মধ্যকার একটি দল পাশ কাটিয়ে যায় (মুখ ফিরিয়ে নেয়)। তবে যদি সত্য তাদের অনুকূলে থাকে, তাহলে তারা বড়ই বিনীত হয়ে রসূলের কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে (মুনাফিকীর রোগ)? নাকি তারা সংশয় পোষণ করে, না তারা ভয় করে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি জুল্ম করবেন? বরং তারা নিজেরাই তো জালিম।" (আন-নূর ২৪:৪৮-৫০)

উপরের তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ সন্দেহ ও মুনাফিকীর কথা বর্ণনা করেছেন। সূরা আহযাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা আরো বলেন,

﴿وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا﴾

"স্মরণ করো যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ছিলো ব্যাধি তারা পরিষ্কার বলেছিল, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই ছিলোনা।" (আল আহ্যাব ৩৩:১২)

"And when the hypocrites and those in whose hearts is a disease (of doubt) said, Allah and His Messenger (SAWS) promised us nothing but delusion." (Al-Ahzab 33:12)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা মুনাফিকীকে 'অন্তরের রোগ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সূরা আহযাবের অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাকো তবে পর-পুরুষের সঙ্গে মিহিস্বরে বা কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। এবং সোজা ও স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ ন্যায়সংগতভাবে কথা বলো।" (আল আহ্যাব ৩৩:৩২)

এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে কোনো পর-পুরুষের সাথে কথা বলার সময় নারীর কথা বলার ভঙ্গি ও ধরন এমন হতে হবে, যাতে আলাপকারী পুরুষের মনে কোনো কুচিন্তার উদ্রেক না হয়। অর্থাৎ তার বলার ভঙ্গিতে কোনো নমনীয়তা বা মন মাতানো ভাব থাকবেনা। সে স্বজ্ঞানে তার স্বরে মাধুর্য সৃষ্টি করবেনা। কারণ তা হলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে কুপথে পা বাড়ানোর

প্ররোচনা বা সাহস পাবে। তাই এ আয়াতে কুচিন্তা, খারাপ কামনা, ব্যভিচারের ইচ্ছা ও পাপের অভিলাষকেই অন্তরের ব্যাধি বা মনের রোগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজিতে তাকে আমরা বলি illness of the heart. আর এই হৃদয়ের ব্যাধিকে spiritual or emotional ailmentsও বলা যায়।

প্রশ্ন- ২৮০ : অন্তরের ব্যাধির কোনো চিকিৎসা আছে কি? অর্থাৎ কী ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করলে এসব ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করা যাবে। বুঝিয়ে বলবেন কী?

উত্তর : অন্তরের ব্যাধির চিকিৎসা শারীরিক রোগের চিকিৎসার মতোই। তবে অন্তরের ব্যাধির চিকিৎসায় কোনো physical medicine অর্থাৎ tablet, capsule, syrup-এর দরকার নেই। নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে যেসব বিধি-বিধান বাতলে দিয়েছেন তার মধ্যেই অন্তরের ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভের ওষুধ নিহিত। যারা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নির্দেশনা মেনে চলেন এবং তাঁকে ভালোবাসেন, তাদেরকে এসব ব্যাধি স্পর্শও করতে পারে না। তারা মনে করেন, এর বিপরীত কিছু করা হলে অন্তরের ব্যাধিসমূহ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের মধ্যে জীবজন্তু ও পশুর মতো কাম স্বভাব ও আচরণের প্রতিফলন ঘটবে। নিজের মেয়ের বান্ধবীর সাথে ফষ্টি-নষ্টি বা 'প্রেম করা' এটি কাদের কাজ? এরাই ভীষণভাবে অন্তরের ব্যাধিতে আক্রান্ত। একজন কবি বলেছেন, **There is no medicine that can cure anyone who is sick with greed and there is no physician who can heal anyone who is sick with ignorance. "যে ব্যক্তি পাহাড় পরিমাণ অর্থ-সম্পদ অর্জনের লোভে পীড়িত, তার চিকিৎসার কোনো ওষুধ নেই। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা রোগে আক্রান্ত, তার জন্যে কোনো ডাক্তার নেই, যিনি তার চিকিৎসা করতে পারেন।"**

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, The world is sufficient to meet everybody's need, but not sufficient to meet everybody's greed. আর এজন্যই দেখতে পাই যে, হযরত লূত আলাইহিস সালামের সময় বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার কাজে মানুষ কতো বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। তারা তো নবীর কথা শোনেইনি; তদুপরি আল্লাহর ফেরেশতাদেরকেও অপমান করতে উদ্যত হয়েছিল। তাই তাদের কার্যকলাপের ফলাফল তো আপনারা সবাই জানেন। আল্লাহ তাদেরকে প্রত্যুষের আগেই ধ্বংস করে দিলেন।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম এসব অন্তরের ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিলেন। যৌবন বয়স, নির্জন কক্ষ, রাজ-উপদেষ্টার সুন্দরী স্ত্রী। এরপরও তাঁকে এ ব্যাধি স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি দৌড়ে পালাতে গিয়েছিলেন। পরের ইতিহাস আপনারা সবাই জানেন। Prophet Yusuf (AS) was a man of true heart. He was completely free from illness of the heart.

প্রশ্ন- ২৮১ : অন্তরের ব্যাধি নানা ধরনের হয়ে থাকে। যুবক-যুবতীদের মধ্যকার প্রেম ও প্রেমে ব্যর্থতাও এক প্রকার মনের রোগ। আমাদের সমাজে ইদানিং এ রোগের তীব্রতা ক্রমশ বাড়ছে। আজকাল প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের মাঝেও এ রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। এ ধরনের মনের রোগ বা হৃদয়ের ব্যাধির কোনো ওষুধ আছে কি? থাকলে তা কী ধরনের?

উত্তর : আপনি ঠিকই বলেছেন যে, প্রেমে পড়া ও প্রেমে ব্যর্থতা এক প্রকার মনের রোগ। শুধু তাই নয়,

এ রোগ ভয়ানক মারাত্মক এবং এর প্রভাব ব্যক্তি, পরিবার এমনকি সমাজের ওপরও পড়ে। পরকীয়া প্রেম আরো মারাত্মক। নিজের স্বামী বা স্ত্রী ও সন্তান পরিজন রেখে অন্যত্র চলে যায়। ঘটনাক্রমে যদি কোন যুবক-যুবতীর মধ্যে প্রেমের সর্ম্পক গড়ে ওঠে, তবে তার শেষ পরিণতি অর্থাৎ বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এ রোগের অন্য কোন চিকিৎসা সাধারণত থাকেনা।

যখন কোনো যুবক শুধু অবাধ মেলামেশার কারণে কোনো যুবতীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে তখন বিয়ের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর প্রস্তাব থাকলেও তাতে সে রাজি হয়না। কারণ, অন্তরের ব্যাধি। ঠিক তেমনি কোনো মেয়ে যদি কোন ছেলের প্রেমে পড়ে, তখন তার বিয়ের জন্য অনেক আকর্ষণীয়, উত্তম ও যোগ্য প্রস্তাব তার পিতামাতা নিয়ে এলেও সে তার প্রেমিককে বিয়ে করাই শ্রেয় বলে মনে করে, ফলাফল যাই হোক না কেনো। এটাই বাস্তব সত্য।

অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের মধ্যকার সম্পর্ককে সাধারণত প্রেম বলা হয়। ইংরেজিতে একে বলা হয় Passion বা infatuation. এ ধরনের প্রেম বা ভালোবাসায় উভয়ের উভয়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ থাকে, যার অর্থ ভালোবাসার তীব্র অনুভূতি, প্রবল অনুরাগ যা তীব্র অনভূতির বহিঃপ্রকাশ। এই infatuation-কে অন্তরের ব্যাধি বা illness of the heart বলা যায়। এটি এমন একটি রোগ, যা অন্তরকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। তবে এই রোগের উপসর্গ, কারণসমূহ, নিরাময় ইত্যাদি সব কিছু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটি একটি বিশেষ ধরনের রোগ। তবে এই রোগটি যখন তীব্র আকার ধারণ করে, তখন অধিকাংশ চিকিৎসক তা নিরাময় করতে ব্যর্থ হন। অপরদিকে যারা এই রোগে আক্রান্ত, তারাও পারিপার্শ্বিক কারণে এই রোগের ভয়াবহতা ও ফলাফলও সহ্য করতে পারেনা। বস্তুত এই passion রোগটি ঐসব হৃদয়কেই আক্রমণ করে বসে যে হৃদয় আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত নয় এবং যে হৃদয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা উপেক্ষিত হয়।

প্রশ্ন- ২৮২ : অন্তরের ব্যাধি বা মনের রোগ সৃষ্টি তথা passion রোগ দেখা দেবার কারণ কী? কীভাবে এ রোগের উৎপত্তি হয় বা বিস্তার ঘটে? অনুগ্রহ করে বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর : অন্তরের ব্যাধি বা infatuation গড়ে উঠে বাড়তি বয়সের ছেলেমেয়েদের বা যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার ফলে। Uncontrollled movement together বা free mixing-এর জন্য। একই সাথে আড্ডা দেয়া, কর্মক্ষেত্রে, একই প্রতিষ্ঠানে, অনেক সময় পাশাপাশি টেবিলে কাজ করার সুবাদে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি অথবা একই ক্লাসে অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রথমে পরিচয় ও পরে সখ্যতা গড়ে ওঠা ইত্যাদি এর অন্যতম কারণ। এসব পরিচয় ও সখ্যতাই পরবর্তীতে passion-এ রূপ নেয়। যারা যৌবনে পদার্পণ করে, তাদের মাঝে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম বা ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া স্বভাবজাত ধর্ম, অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে আমাদের দেশের রক্ষণশীল সমাজে এটি অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আমাদের নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একজন মহিলাকে বিয়ে করার সময় চারটি গুণ বিবেচনা করতে হয়- তার ধন-সম্পদ, তার বংশ-মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার ধর্মপরায়ণতা। তবে ধর্মপরায়ণা পাত্রীকেই তোমার বিয়ে করা উচিত। এতে তোমার কল্যাণ হবে (অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে)।" [৮১২]

এটি সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস।

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথার ওপর ভিত্তি করে আমাদের পিতা-মাতা তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যাপারে এ চারটি গুণ যার মাঝে বিদ্যমান, এমন বর বা কনে তালাশ করেন। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে অনেক কিছু তারা দেখে-শুনে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। মোটকথা সব পিতা-মাতা তথা অভিভাবকগণই তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে নিজেদের পছন্দ মোতাবেক নিজস্ব মত ও পথ অনুযায়ী নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সু-সম্পন্ন করতে চান। তারা সবাই ছেলেমেয়েদের কল্যাণই চান, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ বিয়ের পর ছেলেমেয়েরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নিজ বাড়িতেই অবস্থান করবে এবং তাদের উত্তরাধিকারী হবে। তাই ছেলেমেয়েরা সাধারণত পিতা-মাতা তথা অভিভাবকদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো কিছু করে ফেলতে সাহস পায়না বা করা উচিত নয়।

পিতা-মাতা কোনো বিয়েতে যদি রাজি না থাকেন বা প্রবল আপত্তি জানান অথবা বিয়ে মেনে না নেন তাহলে এই passion-এ আক্রান্ত যুবক-যুবতীদের জীবন ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। এ অবস্থায় অনেক পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে ঢুকতেই দেননা। ফলে এই রোগে আক্রান্তরা বাধ্য হয়ে বাসা থেকে পালিয়ে গিয়ে court marriage করে বসে অথবা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে, যেমন live together without marriage ইত্যাদি। আর উপার্জনশীল না হলে এরা মানবেতর জীবনযাপন শুরু করে। অপরদিকে ব্যর্থ প্রেমের প্রভাব সহ্য করতে না পেরে কেউ আবার আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, যা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। এরূপ উদাহরণ আমাদের সমাজে ভুরি ভুরি আছে। তাই preventive measures হিসেবে কিছু ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

কাজেই আমার পরামর্শ, ঘটনাক্রমে যদি কোনো দু'জনের ভেতর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে বা মন দেয়া-নেয়া হয় অথবা ভালোবাসার বীজ বপন হয়ে তা ধীরে ধীরে প্রেমের দিকে ধাবিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন অনতিবিলম্বে বিষয়টি তাদের পিতা-মাতার নজরে আনা উচিত বা তাদের সামনে পেশ করে পূর্বাহ্নেই সম্মতি বা অনুমতি নেয়া উচিত। আর অনুমতি পেলেই সামনে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। যদি সম্মতি না দেন তবে যে কোনো মূল্যেই হোক সেই মুহূর্তেই সম্পর্কের ইতি টানা উচিত অর্থাৎ উভয়কেই কেটে পড়া উচিত। নতুবা ultimate উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য তাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে, যা অনেক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আর যদি সম্মতি মিলেও যায়, তখন ব্যাধিটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবার পূর্বেই তাদের বিয়ে করে ফেলা উচিত। নতুবা এ প্রেমই তাদেরকে শেষ পর্যন্ত বিবাহ বহির্ভূত কাজ তথা অশ্লীলতা, ব্যভিচার বা যিনার দিকে ধাবিত করবে। কারণ শয়তান তো সেখানে catalyst হিসেবে কাজ করতে প্রস্তুত থাকে। অতএব সাধু সাবধান! এ ব্যাপারে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো পুরুষ মহিলার সাথে নির্জনে বাস করলে শয়তান তাদের তৃতীয়জন (সঙ্গী) হয়।" (আন-নাসাঈ কুবরা) [৮১৩]

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, তার জন্যে সাথে কোনো মাহরাম পুরুষ ছাড়া একদিনের দূরত্বের সফর করাও বৈধ নয়।" (সহীহ মুসলিম) [৮১৪]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাও একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে সাথে মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া কোনো পুরুষ যেনো কোনো মহিলার সাথে নিরিবিলি স্থানে সাক্ষাৎ না করে এবং কোনো স্ত্রীলোক যেনো কোনো মাহরাম লোক ব্যতীত একাকী সফর না করে।" (সহীহ্ মুসলিম) [৮১৫]

আর মুসনাদে আহ্মাদে যে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে, তার ভাষাটিও প্রায় একই : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, সে যেনো কিছুতেই কোনো মহিলার সাথে বিবাহ অযোগ্য কোনো পুরুষ আত্মীয় বা মাহরাম ব্যতীত নির্জনে মিলিত না হয়। কারণ তৃতীয়জন সেখানে থাকে, সে হলো শয়তান।" (মুসনাদে আহ্মাদ) [৮১৬]

আর শয়তানের কাজ যে কি তা তো আপনারা সবাই জানেন। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ইসলাম বিয়ের আগে boy-friend, girl-friend relationship নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। Islam does not support LBW. It supports LAW. এখানে LBW মানে leg before wicket নয়, এটি হচ্ছে love before wedding. আর LAW-এর অর্থ হচ্ছে love after wedding. তাই বিয়ের পর আপনি স্ত্রীকে যতো বেশি ভালোবাসবেন আপনার দাম্পত্য জীবন ততো বেশি সুখের হবে। আপনার ছেলেমেয়েদের মাঝে ততো বেশি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। তাই যারা বিয়ের আগে গভীর প্রেমে জড়িয়ে পড়ে এবং পিতা-মাতার অসম্মতিতে তাদের প্রেমকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিতে ব্যর্থ হয়, তারাই আত্মহত্যার মতো জঘন্যতম পথ বেছে নেয়। সুতরাং যথাসময়ে এ রোগের চিকিৎসা হওয়া উচিত।

প্রশ্ন- ২৮৩ : যদি পিতা-মাতা বা অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়ের প্রেম ও বিয়েতে রাজি না হন তাহলে কী উপায় আছে এই passion বা অন্তরের ব্যাধি নিরাময়ের? অর্থাৎ কী উপায়ে এই হৃদয়ের রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে?

উত্তর : প্রেম ও ভালোবাসাকে আমরা কয়েকটি প্রকারে ভাগ করতে পারি। কোনো বস্তুকে ভালোবাসা আর সেই ভালোবাসার বস্তুটিকে পাওয়ার অদম্য বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা ভালোবাসার একটি ধরন। এ ধরনের ভালোবাসায় দুটো উপাদানের ভিতর একটি যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সে ভালোবাসার অস্তিত্ব বা মূল্য নেই। That is, passion does not exist.

প্রথম ধরনের ভালোবাসা হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং রসূলের প্রতি অনুরাগ বা মহব্বত। এ ভালোবাসাও গভীর ও তীব্র হতে পারে। অনেকে আল্লাহর জন্য এবং তার জীবন বিধান এ যমীনে কায়েমের জন্যে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননা। জিহাদে তাই মুসলমানরা উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনপণ যুদ্ধ করেন।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রেম-ভালোবাসাও মানুষকে নিজের ঘর-বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করে। আমরা দেখেছি ইসলামের সূচনালগ্নে কিভাবে মানুষ নিজের ঘরবাড়ি, প্রিয়জন ত্যাগ করে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হিজরত করেছেন; ইতিহাস তার সাক্ষী। তেমনি দেশের প্রতি ভালোবাসা অর্থাৎ দেশপ্রেম আছে বলেই মানুষ মাতৃভূমির জন্য জান দিতে উদ্বুদ্ধ হয়, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, শাহাদাত বরণ করে। তাই বর্তমানেও রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত আর ভালোবাসা মানুষকে ব্যাকুল করে তোলে। আপনি দেখুন, রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কটাক্ষ করে, তাঁর নির্মল চরিত্রে কলঙ্ক লেপন

করে, তাঁকে কটূক্তি করে কেউ শান্তিতে থাকতে পারে কিনা? অনেকের বেঁচে থাকাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ইদানিং আমাদের দেশে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কটাক্ষ করা ও তাঁর প্রতি কটূক্তি করা এই সরকারের সময় বেড়ে গিয়েছে। অথচ সরকার দেখেও দেখেনা, শুনেও শোনেনা।

তৃতীয় প্রকার ভালোবাসার ভিত্তি হচ্ছে উভয় ব্যক্তির বা উভয় পক্ষের চাওয়া-পাওয়া ও ইচ্ছার সাদৃশ্য বা মিলের বিষয়। এ ধরনের ভালোবাসা ক্রমেই প্রকটতর হয় এবং এটি থামানো খুবই কঠিন। কারণ, এতে উভয় ব্যক্তির গুণাবলির সমন্বয় ঘটে থাকে। যাহোক, যুবক-যুবতীদের গভীর প্রেমে পতিত হওয়া এক প্রকার হৃদয়ের ব্যাধি বা মনের রোগ। তাই অন্যান্য রোগের ন্যায় এরও নিরাময় রয়েছে। যদি প্রেমিকের কোনো legal বা বৈধ উপায় থাকে সেই প্রেমকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিতে, তবে দোষের কিছু নেই। বরং এটিই তার এ রোগের চিকিৎসা বা নিরাময়। ইবনে মাজাহ শরীফে একটি হাদীস উদ্ধৃত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমরা প্রেমিক-প্রেমিকার (পারস্পরিক ভালোবাসা স্থাপনের) জন্য বিয়ে ছাড়া অন্য কোনো সমাধান দেখছিনা।" (ইবনে মাজাহ) [৮১৭]

অর্থাৎ প্রেমে আসক্ত দু'জনের জন্য বিয়েই হচ্ছে কার্যকরী বা চূড়ান্ত নিরাময়। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম উম্মাহ্কে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও বৈধ উপায় বেছে নিয়েই ভালোবাসার বস্তুটিকে নিজের করে পাবার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি যুবকদের নির্দেশ দিয়েছেন বিয়ে করার জন্য, কারণ তাঁর দৃষ্টিতে বিয়েই এ রোগের উৎকৃষ্ট ওষুধ। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের ভিতরে যারা স্বচ্ছল বা সামর্থ্যবান, তারা যেনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কারণ বিবাহ দৃষ্টিকে অবনত রাখে ও লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে। আর যারা বিয়ে করতে অপারগ বা অস্বচ্ছল, তারা যেনো রোযা রাখে, কেননা রোযা যৌন কামনাকে নিবৃত্ত করবে (অর্থাৎ এটিই তাদের নিরাময়)।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) [৮১৮]

তাই দ্বিতীয় নিরাময় হচ্ছে, ঘটনাক্রমে যদি কেউ প্রেম রোগে ভোগে, আর বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকে, বা বৈধ কোনো পন্থা না থাকে, তাহলে তাকে রোযা রাখতে হবে। কারণ এই রোযাই তাকে এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভে সাহায্য করবে। কারণ রোযা আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দেয়। অপরদিকে কুরআন মজীদে আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾

"আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে বিধি-নিষেধের বোঝা লঘু করে (তোমাদের জীবনকে সহজ করে) দিতে চান, (কারণ), মানুষকে অত্যন্ত দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।" (আন-নিসা ৪:২৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের দুর্বলতার কথা বলেছেন যে তারা তাদের যৌন চাহিদা পূরণ না করে থাকতে পারেনা। আর তাই বিয়ে করার মাধ্যমে মানুষের যৌন চাহিদা পূরণের কাজকে তিনি অনেক সহজ করে দিয়েছেন। আর যদি বৈধভাবে বিয়ের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে মিলিত হবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে এ রোগটি আরো প্রকট আকার ধারণ করে যার চিকিৎসা করা যেকোনো ডাক্তারের পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়ে। এখানে বৈধ উপায় বলতে দেশ, জাতীয়তা, ধর্ম,

পারিবরিক আইন-কানুন ইত্যাদির সমর্থন বুঝানো হয়েছে।

তাই আমার সুচিন্তিত পরামর্শ হচ্ছে, এমতাবস্থায় তাদের উভয়কেই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তাদেরকে জানতে হবে যে patience is the only cure. তাদের নিজেদের বুঝাতে হবে যে, তাদের এই তীব্র প্রেম-বাসনা বাস্তবায়িত হোক আল্লাহ্ পাক তা চাননা। তাই তাদের নিজেদেরকেই convince বা রাজি করাতে হবে। তাদেরকে বুঝতে হবে যে এর বাইরে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত তাদের জন্য সমূহ বিপদ ও ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেমন, মেয়েকে অপহরণ করা, গুম করা ইত্যাদি। এক গায়ক এক মেয়েকে অপহরণ করে কোর্টে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলে। মেয়ের বাবা থানায় মামলা করায় সেই প্রেমিককে বেশ কিছুদিন জেল খাটতে হয়। এতে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্মান বাড়ে না কমে? তাই নিজেদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করতে হবে যে এ পৃথিবীতে ভালোবাসার কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে নিজের করে পাওয়ার আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। আর পরকালীন আনন্দ, সুখ, সন্তুষ্টি চিরস্থায়ী। তাই এই চিরস্থায়ী আনন্দ ও সুখের আশায় ক্ষণস্থায়ী আনন্দবস্তুকে পরিত্যাগ করা কঠিন কিছু নয়; বরং এটাই উত্তম। কারণ ক্ষণস্থায়ী ভালোবাসার বস্তুর বিনিময়ে আল্লাহ্ তাকে অফুরন্ত নিয়ামতে ভরা জান্নাতে স্থান দেবেন। আরো উত্তম এবং আরো সুন্দর বা সুন্দরী সাথী তাকে প্রদান করবেন। এই চিন্তা ও অনুভূতিই তাকে ধীরে ধীরে এ রোগের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

প্রেম নামক ব্যাধির সর্বশেষ চিকিৎসাঃ

এতোক্ষণ passion-এর চিকিৎসা নিরাময়ের কথা বললাম, এসব চিকিৎসা থাকা সত্ত্বেও যদি কারো মন বা হৃদয় তা মেনে নিতে ব্যর্থ হয়, তখন তাকে নিম্নবর্ণিত একটি বৈধ পন্থার আশ্রয় নিতে হবে :

প্রথমত : তাকে প্রেমিক বা প্রেমিকার খারাপ, অপছন্দনীয় ও নেতিবাচক দিকগুলো স্মরণ করতে হবে, যাতে কোনো এক সময় তার মনে হয়, আমি তো এই প্রেমিক বা প্রেমিকার চেয়ে সব দিক দিয়ে অনেক উত্তম সঙ্গী পাবো।

দ্বিতীয়ত : তাকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে যে যেসব ভালো গুণের জন্য সে তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল, তার চেয়ে তার খারাপ দোষগুলো, তার ত্রুটি, ব্যর্থতা অনেক বেশি প্রবল ও লক্ষণীয়। যেমন তার ব্যবহার, সে অতি তাড়াতাড়ি রেগে যায় অথবা তার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো দিক, যা তার কাছে অপছন্দনীয় ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করতে হবে। তাই তাকে তার বিকল্প সঙ্গী খুঁজে পেতেই হবে।

তৃতীয়ত : তার প্রতিবেশী বা বন্ধুবান্ধবদের বা শুভাকাঙ্ক্ষীদের জিজ্ঞেস করে তাকে জানতে হবে তার প্রেমিকার অন্যান্য দিক, যা সে জানেনা। এটি নিশ্চিত যে প্রিয় বস্তুর ভেতরে লুকায়িত কোনো অপছন্দনীয় গুণাবলি বা চারিত্রিক দুর্বলতার বিষয় বা তথ্য জানা থাকলে এক পর্যায়ে সে তার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে। আর এইভাবে আস্তে আস্তে তাকে ভোলার চেষ্টা করবে। However, some people say one should not resort to this type of work, as it is against the teaching of the Qur'an.

۞ وَلَا تَجَسَّسُوا ۞
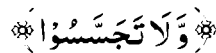
'অলা তাজাস্সাসু'– "তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করোনা।" (হুজুরাত ৪৯:১২)

চতুর্থত, তাকে মনে করতে হবে যে এই সুন্দর চেহারা ও বাহ্যিক লাবণ্যের ভিতরে একটি কুৎসিত চেহারা সুপ্ত অবস্থায় আছে, যা সে জানেনা। এটি একদিন প্রকাশ পেয়ে পরবর্তীতে তাদের দাম্পত্য জীবনে কলহের কারণ হিসেবে দেখা দিতে পারে বা অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা ভাই-বোনেরা! এর পরেও যদি হৃদয়ের এ ব্যাধিটির নিরাময় না হয়, তাহলে তাকে সর্বশেষ চিকিৎসা হিসেবে নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ করতে হবে। তাকে আল্লাহ্র সাহায্য চাইতে হবে। কারণ যারা এ ধরনের বিপদে পড়ে আল্লাহকে কায়মনোবাক্যে ডাকে, তখন আল্লাহ তাদের ডাক শোনেন। Passion-এ আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে তাঁর নিকট নিজের সকল দুর্বলতা পেশ করে এই রোগ থেকে আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। তাহলে আক্রান্ত ব্যক্তি শীঘ্রই এ রোগের প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে পারে। আল্লাহ্ বলেছেন,

﴿ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

"তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো (অর্থাৎ তোমাদের দু'য়া কবূল করবো)।" (মু'মিনুন ৪০:৬০)

উল্লেখ্য, এই দুয়াটি বেশি বেশি পড়লে ভাল ফল আশা করা যায়, দুয়া : "ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুমু বিরহ্মাতিকা আসতাগীছু আস্লিহ্ লী শা'নী কুল্লাহু অলা তাকিলনী ইলা নাফসী তরফাতা আইনিন।"

"হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! আপনার করুণা ও রহমতের উসীলায় আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি (দুঃখ-কষ্ট থেকে পানাহ চাচ্ছি)। আপনি আমার সকল অবস্থা সংশোধন (ঠিক) করে দিন। আর আমাকে আমার নফ্স (প্রবৃত্তি) এর কাছে এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিবেন না।" (আত-তিরমিযী) [৮১৭]

প্রশ্ন- ২৮৪ : আপনি যুবক-যুবতী, বালক-বালিকাদের মধ্যে গড়ে ওঠা প্রেমকে 'হৃদয়ের ব্যাধি' বলে উল্লেখ করেছেন। আজকাল শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক বিয়ে প্রেমের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আমার প্রশ্ন হলো, এই প্রেম-ভালোবাসা কি দূষণীয়? এটা দূষণীয় হলে কোন্ প্রেম দূষণীয় নয়?

উত্তর : **এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো, বৈধ প্রেম দূষণীয় নয়। যদিও অনেকে প্রেমকে বৈধ ও অবৈধ এই দু'ভাগে ভাগ করতে নারাজ। বস্তুত যে প্রেম সুন্দর, পবিত্র সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যেখানে লোভ-লালসা নেই, সেটা দূষণীয় নয়। যে প্রেমে অশ্লীলতা নেই, ব্যভিচার নেই, বেহায়াপনা নেই, নির্জন স্থানে বসে আড্ডা নেই, সে প্রেম দূষণীয় নয়। আর যদি বিয়ের পূর্বে দু'জনের মাঝে আলোচনা বা কথাবার্তার প্রয়োজন হয়, তাহলে সেখানে তৃতীয় একজন মেয়েটির নিকটাত্মীয় থাকা উচিত। আর যে প্রেমে যৌন চাহিদা থাকে, নির্জন কক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা থাকে, অশ্লীলতা-ব্যভিচার থাকে, তা অবৈধ প্রেম। এটি রীতিমতো দূষণীয়, নাজায়েয ও পরিত্যাজ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের উদ্দেশে বলেছেন, কোনো পরনারীর প্রতি প্রথম অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি ক্ষমার যোগ্য। দ্বিতীয় দৃষ্টি ক্ষমার অযোগ্য। তাই যারা প্রেমে মগ্ন, তারা কীভাবে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করবে? কাজেই বর্তমানে যে ধরনের

প্রেম সমাজে বা বাজারে চালু আছে, তা পুরোপুরি অবৈধ ও অশ্লীল প্রেম, unlawful প্রেম। তা নাহলে প্রেম করে বিয়ে করে বছর যেতে না যেতেই প্রেমিক প্রেমিকাকে হত্যা করে কেনো? তখন কোথায় যায় প্রেম? কোথায় যায় আকাশ ছোঁয়া গভীর ভালোবাসা? আসলে এ ধরনের প্রেম-ভালোবাসা নোংরামিতে পরিপূর্ণ। যৌন চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যেই এ প্রেম। এটি এক প্রকার হৃদয়ের অসুস্থতা বা ব্যাধি। এ ব্যাধির দ্রুত চিকিৎসা হওয়া উচিত।

সম্মানিত দর্শক! আপনারা মুনির-খুকুর প্রেমের কথা হয়তো বা জানেন কিংবা শুনেছেন। অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে গভীর প্রেম ও দিনের পর দিন দৈহিক মিলন। তারপর এ প্রেম থাকা অবস্থায় একজন বিখ্যাত সাংবাদিকের মেয়ের সাথে পুনরায় প্রেম ও পরে বিয়ে। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই নতুন সুন্দরী স্ত্রী, যাকে প্রেমের মাধ্যমে বিয়ে করেছে, তাকে হত্যা করা হলো। এগুলোকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? এসব কাজ কি সমর্থনযোগ্য? কখনোই নয়। আর ভুক্তভোগী পিতা-মাতারই বা কী অবস্থা হয়? তারা তো জীবিতই মৃত। তাই আমার সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে, সব অবৈধ প্রেম আইন করে বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে তা করতে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যর্থ প্রেমের ভয়ংকর দিক ও কুফল সংশ্লিষ্টদের অবহিত করতে হবে। যতো তাড়াতাড়ি এই প্রেমের ব্যাধি দূর হবে ততোই মঙ্গল।

প্রশ্ন- ২৮৫ : অবৈধ প্রেমের প্রভাব কী কী? অভিভাবকদের এসব ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য কী কী?

উত্তর : বৈধ হোক আর অবৈধ হোক, প্রেমের প্রভাব ব্যাপক। রাজা-বাদশাহ থেকে শুরু করে জ্ঞানী-গুণী এমনকি অনেক মহৎ ব্যক্তি এই প্রেম নামক ব্যাধির ফাঁদে পড়েছেন। ইতিহাস সাক্ষী যে প্রেমিকার জন্য মানুষ যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যন্ত করেছে। এই ব্যাধির শিকার হয়ে অনেক বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও বিপাকে পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। অনেকে প্রায় পাগলপারা হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অনেককে স্বাভাবিক জীবন শুরু করতে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়। প্রেমে ব্যর্থতা ভয়ংকর। এর পরিণতি আরো মারাত্মক ও অসহনীয়। এক্ষেত্রে আত্মহত্যার মতো ঘটনা অহরহই ঘটে থাকে। তাই এসব ব্যাপারে পিতা-মাতাকেই এগিয়ে আসতে হবে। আগে থেকেই ছেলেমেয়েদের সতর্ক করতে হবে। ব্যর্থ প্রেমের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে অবগত করাতে হবে।

যদি স্বাভাবিকভাবে কোনো যুবক কোনো যুবতীর সাথে নির্জনে বসে নিয়মিতভাবে গল্পগুজব করে সময় কাটায়, তাহলে মনের অজান্তেই তাদের ভেতর অশ্লীল কাজ বা ব্যভিচারের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই ইসলাম এটা স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে। Free mixing, socialization, seclusion between men and women, boy and girls are forbidden in Islam. তাই হঠাৎ করে কোনো মেয়ের সৌন্দর্য কাউকে মুগ্ধ করলে তার অন্যান্য গুণের দিকে তাকাতে হবে। যদি সবদিক দিয়ে ভালো ও গ্রহণযোগ্য মনে হয়, তখন তাদের উভয়ের পিতা-মাতাকে বিষয়টি অবহিত করা উচিত। পিতা-মাতা যদি সবকিছু দেখে সম্মতি দেন এবং প্রস্তাব অনুমোদিত হয়, তাহলে সামনে অগ্রসর হতে বাধা নেই এবং যতো তাড়াতাড়ি বিয়ের আয়োজন করা সম্ভব ততোই মঙ্গল। আর যদি প্রস্তাব অনুমোদিত না হয়, তাহলে সেখানেই যাত্রা বিরতি করা উচিত। Completly full stop. সম্মুখে অগ্রসর হওয়া আর ঠিক হবেনা।

তাই প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত তাদের ছেলেমেয়েদের বিষয়টি ভালো করে আলোচনা করে বোঝানো

যে, যা কিছু করতে হয় তা পিতা-মাতার সম্মতিতে বৈধভাবেই করা উচিত। অবৈধ প্রেম, ইভটিজিং ইত্যাদি অগ্রহণযোগ্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বখাটে ছেলেদের অবৈধ প্রেম নিবেদনও এর মতোই খারাপ। এরাই প্রেমিকার মুখে এসিড মেরে তার চেহারা বিকৃত করে দেয়। এসবই সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে; পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট করে। আমাদের প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এটা নিষেধ করেছেন। তাই এসব বখাটে ছেলের সমাজ বিরোধী ও অশ্লীল কাজের কঠোর শাস্তির বিধান থাকা উচিত এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ সময়ের দাবি। অতএব সম্মানিত পিতা-মাতাগণ সাবধান!

প্রশ্ন- ২৮৬ : স্কুলগামী বালক-বালিকাদের মধ্যে তীব্র প্রেম বা গভীর ভালোবাসার সৃষ্টি হওয়া কি দূষণীয়? ইসলাম এ বিষয়ে কী নির্দেশনা দেয়? অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগে গড়ে ওঠা প্রেম-ভালোবাসার বিষয়টি উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করুন।

উত্তর : ছোট বালক-বালিকাদের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠা রীতিমতো দূষণীয়। এ ভালোবাসা সৃষ্টির একমাত্র কারণ free mixing বা অবাধ মেলামেশা। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান কাজ হচ্ছে লেখাপড়া করা। কেউ প্রেমে পড়লে তার লেখাপড়ার যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে। সর্বদা এই চিন্তা তাদের তেড়ে নিয়ে চলে। সর্বদা তারা নির্জনে সময় কাটানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। দিনের বেলায় স্কুলের ইউনিফর্ম পরে পার্কে গিয়ে সময় কাটায়। তাই এই প্রেমে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। কারণ, অনেকেই প্রেমে পড়ে সব শেষ করে ফেলে। এই প্রেম তাদেরকে পড়াশোনায় অমনোযোগী করে এবং উজ্জ্বল ক্যারিয়ার গড়ায় তীব্র বাধার সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে তারা পরীক্ষায় ফেল করে। শিক্ষা জীবন ধ্বংস হয়, লেখাপড়া আর হয়না।

তবে যুবক-যুবতীদের প্রেমে পড়ার আগে তাদের পিতা-মাতার সম্মতি নেয়া প্রয়োজন। উভয় পক্ষ রাজি না হলে বা কোনো একজনের অভিভাবক রাজি না হলে আর কোনো কথা নেই। সেখানেই থামতে হবে। নতুবা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে উভয়কেই চরম মূল্য দিতে হবে। আর ছেলেমেয়ে উভয়ের লেখাপড়া শেষ হবার পর তাদের প্রস্তাবে যদি পিতা-মাতা রাজি থাকেন তাহলে আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের আয়োজন করতে হবে। নতুবা বিবাহ বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের জন্য উভয় পক্ষের অভিভাবকই দায়ী থাকবেন। বাল্যবিবাহ যদি অবৈধ হয় তাহলে বাল্যপ্রেম কীভাবে বৈধ হয়? কারণ প্রেমের পরিণতিই তো বিয়ে। আর বিয়ে না হলে তো বিয়ে বহির্ভূত অশ্লীল কাজ হতেই থাকবে। এটা open secret যে বিদেশীদের প্রেমে দুই-একশত বার যিনার আগে বিয়েই হয়না। ইসলাম এসব বিষয়ে কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে।

প্রশ্ন- ২৮৭ : বিগত কয়েকটি পর্বে আমরা 'হৃদয়ের ব্যাধি' বা 'মনের রোগ' বিষয়ে আলোচনা করেছি। সে আলোচনায় হৃদয়ের ব্যাধিতে আক্রান্ত যুবক-যুবতীদের করুণ পরিণতির কথা আলোচনা করেছি। কারণ অবৈধ প্রেমের প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। এই 'প্রেম' নামক ব্যাধি ছাড়া আরো কোনো বিষয় আছে কি, যেখানে এ ধরনের রোগ প্রকট আকার ধারণ করে?

উত্তর : প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও যে কোনো উপায়ে, যেভাবেই হোক, অত্যধিক অর্থ-সম্পদ অর্জনের অদম্য বাসনা এবং সে লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা এক প্রকার অসুস্থতা। It is a serious sickness of the heart. আর এ ব্যাধিই মানুষকে অবৈধ সম্পদ অর্জনের পথে ধাবিত করে; ঘুষ-দুর্নীতিতে নিমজ্জিত করে।

সুপ্রিয় দর্শক-পাঠক! একটি পরিবারের সদস্যদের সুন্দরভাবে, উত্তমভাবে জীবনযাপনের জন্য কতো অর্থ দরকার? ১ কোটি, ৫ কোটি, ১০ কোটি, না ১০০০ কোটি টাকা। নাকি আরো বেশি? একটি পরিবারের বসবাসের জন্য কয়টা বাড়ি দরকার? চলাচলের জন্য কয়টা গাড়ি দরকার? কয়টি Industry থাকলে একজন লোক সুখী? কি পরিমাণ জমি থাকলে একজন সন্তুষ্ট ও সুখী? একজন মানুষ একসাথে কয়টি মুরগির রান খেতে পারে? আসলে এসব প্রশ্নের উত্তর আপেক্ষিক। মানুষের প্রয়োজনের শেষ নেই। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস আলোচনা করছি, যা হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের ভেতর কে আছো যে নিজের সম্পদের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে বেশি ভালোবাসে? সাহাবীরা উত্তর দিলেন, "আমাদের ভেতর এমন কেউই নেই যে নিজ সম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশি ভালোবাসে।" তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তার সম্পদ সেটাই, যা সে খেয়েছে, আর যা সে পরিধান করে পুরনো করেছে এবং নিজ হস্তে তার জীবদ্দশায় আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে। যে সম্পদ তার মৃত্যুকালে রেখে যাবে, সেটাই তার উত্তরাধিকারীদের বা ছেলেমেয়েদের সম্পদ।" (সহীহ্ আল বুখারী) [৮১৯]

তাই মাত্র ৩০/৪০/৫০ বছরের যিন্দেগির জন্য **যে কোনো উপায়ে যে কোনভাবে সম্পদ অর্জনের মাত্রাতিরিক্ত বাসনা বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে 'হৃদয়ের অন্যতম ব্যাধি'**। যে অর্থের দরকার নেই অথচ তা অর্জনের তীব্র বাসনা। ছেলেমেয়েদের জন্য পিতা-মাতাই এ ব্যাধির চিকিৎসক হতে পারেন।

অধ্যায়-২৩

ক্রোধ সৃষ্টি ও তা নিবারণের উপায়

আমরা অনেক সময় সামান্য কারণেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি এবং হতাশাগ্রস্ত হই বা রেগে যাই। আবার অনেক ক্ষেত্রে অল্পকিছুতেই আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই এবং হৃদয়ে খুশির বন্যা বয়ে যায়। অন্যদিকে ছোটো-খাটো বিষয়ে বা তুচ্ছ ঘটনায় রাগান্বিত হই, রাগের মাথায় মারধর করি বা অন্যান্য বাড়াবাড়ি করি। তাই বিপদে ধৈর্য ধরা, খুশির সংবাদে আনন্দ প্রকাশে সংযত হওয়া, অপ্রত্যাশিত কাজে বা সংবাদে রাগান্বিত হলে সে রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা, এসব বিষয়েই আমাদের প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। এসবের মধ্যে প্রথমেই আমরা রাগ বা ক্রোধ বিষয়ে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন-২৮৮ : আচ্ছা মুহতারাম, প্রথমেই জানতে চাইবো, কেউ রাগান্বিত হলে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যে কী উপদেশ দিয়েছেন? সম্মানিত দর্শকদের উদ্দেশে বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর : সুসংবাদ, দুঃসংবাদ উভয় অবস্থায়ই আমাদের আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। কুরআন মজীদে যেসব আবেগ-অনুভূতির বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে বা সংযমের পরিচয় দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে ক্রোধ অন্যতম। ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশকিছু উপদেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া আনন্দ-বিষাদ, হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা, মানসিক অস্থিরতা, উদ্বেগ ইত্যাদি বিষয়েও তিনি আমাদের করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

ক্রোধ ষড়রিপুর অন্যতম। বস্তুত রাগান্বিত হওয়া মনের একটি রোগ বা 'মনোরোগ'। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি নিজে তাঁর কাজের লোককে ভুল করলেও দিনে ৭০ বার ক্ষমা করেছেন। কখনো রাগান্বিত হননি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"শক্তিশালী সে নয় যে তার প্রতিপক্ষকে মুষ্টিযুদ্ধে পরাজিত করে, বরং শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাঊদ) [৮২১]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুও একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। (সহীহ মুসলিম) [৮২২]

প্রশ্ন-২৮৯ : ক্রোধের উৎপত্তি কোথা থেকে? এ বিষয়ে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস আছে কি? থাকলে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর : ক্রোধ শয়তান থেকে উৎপত্তি হয়। কেউ রেগে গেলে শয়তান খুশি হয়। আবূ ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে উরওয়া ইবনে মুহাম্মদ সা'দী তার পিতার সূত্রে পিতামহ আতীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ক্রোধ শয়তান থেকে উৎপত্তি। আর শয়তানকে অবশ্যই আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আগুনকে পানি দ্বারা নেভানো হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ রাগান্বিত হলে তার উযূ করা উচিত।" (মুসনাদে আহমাদ ও আবূ দাঊদ) [৮২৩]

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা! রাগান্বিত হওয়া এক প্রকার শয়তানি কাজ, যা মানুষকে প্রভাবিত করে এবং তাকে এমন কাজ করতে বাধ্য করে, যে কাজ সে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে কখনো করতোনা। রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ অনেক খারাপ কাজ করে বসে, যেমন স্ত্রীকে তালাক দেয়া, কাউকে খুন করা, জিনিসপত্র ভেঙে ফেলা, ছেলেমেয়েকে মারধর করা ইত্যাদি। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "একদা এক ব্যক্তি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তখন তিনি উত্তরে বলেন, কখনো রাগন্বিত হয়োনা। (That is, never get angry.) লোকটি পুনঃ পুনঃ রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপদেশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকবারই বললেন, ক্রোধান্বিত হয়োনা।" (সহীহ আল বুখারী) [৮২৪]

এ হাদীসটি আমাদের এ শিক্ষাই দেয় যে রাগান্বিত হয়ে বা রাগের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করা বা জটিল কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। ইহা নবীজির শিক্ষা। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "তোমরা তার মতো কিছু করো না যে ব্যক্তি রাগের বশবর্তী হয়ে কাজ করে থাকে।" **তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো,** "এমন কোনো ব্যক্তি আছে কি, যে রাগান্বিত হয়না? তিনি উত্তরে বললেন, না, নেই। তবে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা রাগান্বিত হলে তাদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং যদি তারা বদমেজাজী হয়ে থাকে, তাহলে তারা তাদের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, যাতে ক্রোধ তাদের পরাজিত করতে না পারে এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ যেনো তারা না করতে পারে।" (আস-সুয়ূতী) [৮২৫]

"নবী ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম (John the Baptist) একদা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিসটি কষ্টকর? তিনি উত্তর দেন, আল্লাহর রোষ। হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কোন কাজ বা জিনিসটি একজনকে আল্লাহর রোষ সৃষ্টিতে সহায়তা করে? হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম উত্তর দেন, ক্রোধ। হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস বা কাজটি ক্রোধ সৃষ্টি করতে বা তা বাড়াতে সাহায্য করে? ঈসা আলাইহিস সালাম উত্তর দেন, দাম্ভিকতা, মান-সম্মানের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ঔদ্ধত্য ও অহংকার।"

এ রিওয়ায়াতটি পেশ করেছেন ইমাম গায্যালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'এহইয়াউল উলূমুদ্দীনে'।

রাগ আগুন হবার প্রমাণ এই যে, রাগে চোখ লাল হয়ে যায়, ঘাড়ের রগ ফুলে যায়, রং বিবর্ণ হয় ও সমস্ত শরীরে উদ্দাম আসে। বস্তুত রাগান্বিত ব্যক্তির মুখ থেকে রাগান্বিত অবস্থায় কুফরি বাক্য বের হয়ে যেতে পারে। তাই ঐরূপ ব্যক্তির মান-সম্মান মানুষের কাছে কমে যায়। তার শত্রু বাড়ে ও বন্ধু কমে যায়। রাগ হতে হিংস্রতা, পরশ্রীকাতরতা ও শত্রুতার মতো ব্যাধির সৃষ্টি হয়। রাগান্বিত ব্যক্তি শক্তিশালী হলে অন্যের ক্ষতি করতে দ্বিধা করেনা, আর শক্তি না থাকলে নিজেই নিজের জীবন বা ধন-সম্পদ ধ্বংস করে কিংবা নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত রাগ মানুষকে আত্মহত্যার পথে ধাবিত করে।

প্রশ্ন-২৯০ : কুরআন মজীদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা ক্রোধ সম্পর্কে কী ইরশাদ করেছেন?

উত্তর : আল্লাহ সুব্‌হানাহু ওয়া তা'য়ালা সূরা আলে ইমরানে বলেন,

﴿الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় ব্যয় করে, আর ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।" (আলে ইমরান ৩:১৩৪)

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে মানুষের কল্যাণে অর্থ ব্যয় করা, ক্রোধ সংবরণ করা ও ক্ষমাশীলতা মহৎ গুণাবলির অন্যতম। এ আয়াত থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে ক্রোধ সংবরণকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তারা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন-২৯১ : ক্রোধ কি মনের রোগ বা হৃদয়ের ব্যাধি? এ রোগ প্রশমিত করতে বা এ রোগের চিকিৎসায় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উপদেশ দিয়েছেন?

উত্তর : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বলেছেন, "ক্রোধ নিশ্চয়ই মানুষ তার অন্তরে ধারণ করে থাকে।" (মুসনাদে আহমাদ ও মুসতাদরাকে হাকিম) [৮২৬]

এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ক্রোধ বা রাগকে 'মনের রোগ' বা 'হৃদয়ের ব্যাধি' হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। ইমাম গায্যালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "ক্রোধ নিবারণের উপায় হচ্ছে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা ও কার্যাবলির সমন্বয়ে গৃহীত কতিপয় বাস্তব পদক্ষেপ।" বস্তুত ক্রোধ একপ্রকার ব্যাধি যা মানুষকে আল্লাহর রোষ জন্মাতে সাহায্য করে। অহংকার, গৌরব, ঔদ্ধত্য, সুখ্যাতি জনিত সম্মান, প্রশংসনীয় কাজ, অর্জিত সাফল্য, উচ্চতর মর্যাদালাভের বাসনা ইত্যাদি ক্রোধ সৃষ্টির অন্যতম সহায়ক। তাছাড়া অতিমাত্রায় আত্মগর্ব বা আত্মতুষ্টি, নিজের সম্পর্কে উন্নত ধারণা, আত্ম-প্রশংসা, অধিক সম্পদ অর্জনের অভিলাষ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস ইত্যাদি উৎপত্তির কারণে মানুষের মাঝে ক্রোধ নামক ব্যাধিটি সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই মানুষের এসবের প্রতি অদম্য বাসনা কমাতে হবে; পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ, এসব খারাপ বিষয় বা দিক যদি কারো মাঝে বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার আচরণ বা স্বভাবে পরিবর্তন আসে এবং তখন তার ক্রোধ না এসে পারেনা। তাই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশমতো আমাদের এ রোগের চিকিৎসা করতে হবে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তুমি রাগন্বিত হও, তখন নীরবতা অবলম্বন করো (এভাবে তিনবার বলেছেন)।" (মুসনাদে আহমাদ) [৮২৭]

এ দুটো উপদেশই অত্যন্ত কার্যকর।

প্রশ্ন-২৯২ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দুটো উপদেশ ছাড়া ক্রোধ দমনে আর কি করা উচিত?

উত্তর : প্রথমত : রাগের সময় কারো ভিতর অন্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা জাগ্রত হলে তাকে

আল্লাহর ভয় করতে হবে এবং স্মরণ করতে হবে যে, আমি যদি এ ব্যক্তির ওপর প্রতিশোধ নিই, তাহলে কিয়ামতের দিন আমার ওপর আল্লাহও প্রতিশোধ নিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত : কেউ যদি রাগের মাথায় কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হয়, তখন তাকে মনে রাখতে হবে যে, উক্ত ব্যক্তি বা তার লোকজন একদিন তার উপরও প্রতিশোধ নিতে পারে। একটি কথা আছে যে, বাঘের প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে থাকে বার বছর, আর মানুষের থাকে সারা জীবন।

তৃতীয়ত : কেউ যখন রাগান্বিত হয় তখন তার চেহারার মধ্যে ক্রোধের প্রভাব পড়ে। রাগান্বিত মানুষের কুৎসিত চেহারা ভয়ংকর প্রাণীর চেহারার মতো। আর যে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার চেহারা কোমল, মিষ্ট ও জ্ঞানী লোকের চেহারার মতো।

চতুর্থত : রাগান্বিত লোককে মনে রাখতে হবে যে শয়তান বলে, তুমি যদি রাগান্বিত না হও তাহলে তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে। সুতরাং শয়তানের প্ররোচনায় কান দেয়া উচিত নয়।

পঞ্চমত : রাগান্বিত ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে যে, আমি কী কারণে রাগান্বিত হবো। আল্লাহ যা চান তা তো ঘটবেই।

ষষ্ঠত : তাকে মনে রাখতে হবে যে, ক্রোধ সংবরণে যে পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে, তার ভিত্তি হচ্ছে কুরআন মজীদ এবং নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা। ক্রোধ দমন করার পুরস্কারের আশাই মানুষকে ক্রোধান্বিত হয়ে প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত রাখবে। সাহল ইবনে মুআয রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার পিতা থেকে জেনে বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ক্রোধকে সংবরণ করে অথচ সে কাজ করতে সে সক্ষম; (তার এ সবরের কারণে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সকলের সামনে ডেকে বলবেন; তুমি যে হূরকে চাও, পছন্দ করে নিয়ে যাও।" (আবূ দাউদ) [৮২৮]

জামে আত-তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত হাদীসের বর্ণনাকারীর নাম মু'আয ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ক্রোধ কার্যকর করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা সংবরণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সমস্ত মাখলূকের সামনে ডেকে আনবেন এবং তাকে তার পছন্দমতো যে কোনো হূর বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিবেন।" (আত-তিরমিযী) [৮২৯]

সুলায়মান ইবনে সারাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি একটি বাক্য সম্পর্কে অবহিত, যা কেউ উচ্চারণ করলে তার রাগ দূরীভূত হবে। বাক্যটি হচ্ছে, 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শ'য়ত্বনির রাজীম।' অর্থাৎ "আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তান থেকে, যে বিতাড়িত (গৃহহীন ও নির্বান্ধব)।" [৮৩০]

এটি সহীহ আল বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফের হাদীস।

সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা! রেগে যাওয়া এক প্রকার হৃদয়ের ব্যাধি। তাই এসব পরামর্শ প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এসব পরামর্শ মেনে চললে রাগ দূর করা সম্ভব।

প্রশ্ন-২৯৩ : এবার আলোচনা করুন, কী কী সুনির্দিষ্ট কাজ করলে তৎক্ষণাৎ রাগ সংবরণ করা সম্ভব?

উত্তর : এক নম্বর কাজ হচ্ছে যখন রাগান্বিত হবেন, তখন দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বেন, আর বসে থাকলে শুয়ে পড়বেন।

দুই নম্বর কাজ হচ্ছে, তাকে উযূ করতে হবে। কারণ আগুন পানি ছাড়া দূর করা যায়না।

তিন নম্বর কাজ হচ্ছে, তাকে মুখে উচ্চারণ করতে হবে, "আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তান থেকে, যে গৃহহীন ও নির্বান্ধব।" অর্থাৎ "বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

চার নম্বর যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে, তাকে মাটির কাছে যেতে হবে। কারণ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেহেতু ক্রোধের ফলাফল হচ্ছে উত্তাপ। এর বিপরীত কাজটি হচ্ছে তাকে মাটিতে শুয়ে পড়তে হবে যাতে তার দেহ প্রশান্ত হয় ও ঠাণ্ডা থাকে।

সম্মানিত দর্শক-পাঠক! আশা করা যায়, এই ৪টি কাজ আপনাকে রাগ বা ক্রোধ নিবারণে সহায়তা করবে। আর এসবের পরেও যদি তার রাগ না থামে, তখন তাকে ঠাণ্ডা পানিদ্বারা গোসল করাতে হবে, কারণ আগুনকে পানি দ্বারা নিভানো হয়ে থাকে। রাগের ব্যাপারে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের নিম্নের কতিপয় ঘটনা প্রণিধানযোগ্য :

১. একদা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত থাকাকালে হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একদল কাফির অন্যায়ভাবে তিরস্কার করছিলো। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ধৈর্যের সাথে তিরস্কার হজম করছিলেন। তখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাগ চলে আসায় তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলে তিনি উক্ত বিরোধীদের প্রতিবাদ করেন। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ভার করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। পরবর্তীতে যখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাত হয় তখন তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমার কেমন বন্ধু, যখন কাফিররা বিনা অপরাধে অন্যায়ভাবে আমাকে ভর্ৎসনা করছিলো তখন আপনি আমার পক্ষে টু'শব্দটিও না করে মুচকি হাসলেন। আর যখন আমি অধৈর্য হয়ে নিজেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করলাম তখন আপনি মুখ অন্ধকার করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন?

   জবাবে রহমাতুল্লিল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আবূ বকর! কাফিরদের সীমাহীন যুলুম-অত্যাচার যখন তুমি ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করছিলে তখন আল্লাহ্র রহমতের হাজার হাজার ফেরেশতা তোমার পক্ষে কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিলো। যেটি ছিলো তোমার জন্যে খুবই কল্যাণকর। কিন্তু যখনই সেখানে শয়তান চলে এসেছিলো, তখন তুমি রাগান্বিত হয়ে প্রতিবাদের পথ বেছে নিলে আর অমনি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তোমার পক্ষের হাজার হাজার রহমতের ফেরেশতাকে আসমানে তুলে নিলেন। যেটি ছিলো তোমার জন্যে অত্যন্ত অকল্যাণকর। তাই আমি মুখ ভার করে সেখান থেকে চলে এসেছি। কারণ শয়তান যেখানে আসে আল্লাহর রসূল তো সেখানে থাকতে পারেনা।

২. হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলা করছিলেন। উভয়ে তখন কিশোর। খেলার ছলে এক পর্যায়ে হুসাইন

রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহকে 'বান্দির বাচ্চা' বলে গালি দিলেন। তখনকার আরবে 'বান্দির বাচ্চা' গালি খুবই ক্ষমাহীন অপরাধ বলে বিবেচিত হতো। গালি তো গালি, তাও আবার আমিরুল মু'মিনীনের ছেলেকে। আর যায় কোথায়! আবদুল্লাহ রেগে লাল হয়ে আমিরুল মু'মিনীনকে (যাঁর ব্যাপারে প্রবাদ আছে 'ওমর যে পথ দিয়ে যাতায়াত করে শয়তানও সে পথে হাঁটেনা) বিচার দিলো। যথাসময়ে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো ইমাম হুসাইনকে। জেরা করলেন স্বয়ং আমিরুল মুমিনীন নিজেই। 'তুমি কি আমার ছেলেকে বান্দির বাচ্চা বলেছো?' শের-ই-খোদা হযরত আলীর সন্তান হুসাইন, তিনিও দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, হ্যাঁ। উত্তরে ক্ষুব্ধ আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এর অর্থ কী, তা কি তুমি জানো? এবারও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত স্বাভাবিক অথচ দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, উমর দাস (গোলাম) তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ হলো দাসের ছেলে অর্থাৎ 'বান্দার বাচ্চা।' হঠাৎ আগুনে পানি দিলে যেমন 'ধপ' করে নিভে যায়, তেমনি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও রাগ সংবরণ করে করুণকণ্ঠে জবাব দিলেন, আমিও আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, এ 'দাসকে' সাথে না নিয়ে মনিব যদি জান্নাতে যায় তাহলে কিয়ামতের সেই কঠিন ময়দানে আমিও কিন্তু আওলাদে রসূলের (মনিবরূপী হুসাইনের) বিরুদ্ধে আপিল করবো।

৩. একবার এক কাফিরের সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মল্লযুদ্ধ বাঁধলে এক পর্যায়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত কাফিরকে কুপোকাত করে তার বুকের উপর চেপে বসে তলোয়ার দিয়ে তাকে বধ করতে উদ্যত হলেন। ঠিক এ মুহূর্তে উক্ত কাফির নিচ থেকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মুখে থু থু নিক্ষেপ করলো। এতে উক্ত কাফিরের প্রতি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র রাগ চলে আসে। সাথে সাথে তিনি তাকে কতল না করে ছেড়ে দিয়ে বললেন, তোমার সাথে আমার বিরোধ ছিলো আল্লাহ্‌র দীন নিয়ে। সেজন্যে তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। যখন তুমি আমাকে থু থু দিলে, তখন তোমার প্রতি আমার ব্যক্তিগত ক্রোধ চলে এসেছে। ব্যক্তিগত ক্রোধের কারণে তোমাকে হত্যা করলে আমাকে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। তাই তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তুমি মুক্ত।

৪. একবার এক নও মুসলিম ও এক ইয়াহূদীর সাথে একটি বর্মের মালিকানা নিয়ে ঝগড়া বাধে। প্রকৃতপক্ষে বর্মটির মালিক ছিলো উক্ত ইয়াহূদী। মুসলিমটি প্রকৃত মুসলিম ছিলোনা বিধায় সে ভেবেছিল, রসূলের কাছে বিচার নিয়ে গেলে (আমি মুসলমান হওয়ার কারণে) রসূল তো আমার পক্ষেই রায় দিবেন। এ আশায় তারা রসূলের নিকট গেলো। কিন্তু রহমাতুল্লিল আলামীন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের বর্ণনা শুনে উক্ত ইয়াহূদীর পক্ষেই রায় দিলেন। কিন্তু এ রায় ঐ মুনাফিক মুসলমানের মনোঃপূত হলোনা। সে ভাবলো, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যেহেতু ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, তাঁর কাছে গেলে সে বর্মটি পাবে। তাই সে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পুনরায় বিচার চাইতে গেলো। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত মুনাফিক মুসলিম ব্যক্তির বক্তব্য শুনে প্রশ্ন করলেন, রাসূলের দেয়া রায়ের পর আবার আমার নিকট কেনো এলে? উত্তরে মুসলিমটি বললো, 'আল্লাহর রাসূলের রায় আমার পছন্দ হয়নি।' আর যায় কোথায়? সাথে সাথে

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কোমরে বাধা তলোয়ার খাপমুক্ত করেই এক কোপে উক্ত ভণ্ড মুসলিমকে দ্বি-খণ্ডিত করে দিলেন। ঐ কথিত মুসলিম ব্যক্তিটি প্রভাবশালী বংশের ছিলো বিধায় এ নিয়ে সমাজে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এ মর্মে যে, হযরত উমর একজন মুসলমান হয়ে আরেকজন মুলমানের রক্তপাত করেন কীভাবে? কারণ ইসলামে এক মুসলমানের রক্ত অন্য মুসলমানের জন্য হারাম করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ওহীর মাধ্যেমে জানিয়ে দিলেন, উমরই প্রকৃত মুসলমান। যাকে হত্যা করা হয়েছে সে ছিলো মুনাফিক। এ ঘটনার দ্বারা রাগান্বিত হয়ে রূঢ় আচরন করে অনেকে সত্য-ন্যায়ের পক্ষে রাগকে বৈধ মনে করে অধীনস্তের প্রতি। আসলে এখানে বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে-

ক. আপনি আপনার অধীনস্তের ওপর রাগ করেন কিন্তু আপনি যার অধীনে কাজ করেন, অর্থাৎ আপনার প্রতিষ্ঠানের মালিকের হাজারো অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তো টু-শব্দটিও করেননা। অথচ হাদীসে বলা আছে- "জালিম শাসকের বিরুদ্ধে ন্যায় কথা বলা উত্তম জিহাদ।"

খ. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধাচারন করায় রাগের বশবর্তী হয়ে উক্ত মুনাফিক মুসলমানকে কতল করেছিলো। আপনি যাদের প্রতি রাগ করছেন এ ক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম কোনো যুক্তি নেই। নিম্নোক্ত হাদীসের দ্বারা বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে আশা করি।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এ পৃথিবীর কোনো বিষয়ে বা কারণে রাগান্বিত হননি। যখন কোনো সত্যের সীমা লংঘন হতো তখন কেউ তাঁর ক্রোধ নিবারণ করতে পারতোনা, যতক্ষণ না তিনি হকের জন্য প্রতিশোধ নিতেন। তিনি নিজের বিষয়ে রাগান্বিতও হতেননা এবং প্রতিশোধও নিতেননা।" (শামায়েলে তিরমিযী) [৮৩১]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একদা রাগান্বিত হলে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাক ধরে সোহাগের সাথে কাছে নিয়ে এসে বললেন, "হে আমার প্রিয় সহধর্মিণী! তুমি বলো, হে আল্লাহ! আপনি আমার নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রভু। আমার পাপ মার্জনা করুন, আমার অন্তর থেকে ক্রোধ দূর করুন এবং আমাকে ভুল পথে পরিচালিত হওয়া থেকে রক্ষা করুন।" (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা, ইবনুস সুন্নী) [৮৩২]

প্রশ্ন-২৯৪ : রাগ নিবারণে আর কী উপায় আছে? রাগ সম্বন্ধে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান কী বলে? ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল জাতীয় কোনো ঔষুধ খেলে কি রাগ থেমে যাবে? Psychological কোনো চিকিৎসা এর আছে কি?

উত্তর : সম্মানিত দর্শক-শ্রোতা ভাই-বোনেরা! ক্রোধ দূরীকরণের জন্য sedative tablet সেবন করা একেবারেই অনুচিত। কারণ এসব ট্যাবলেট পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করলে ফল পাওয়া যেতে পারে। তবে এসব ওষুধ সেবনে রোগী addict হতে পারে। যেহেতু ক্রোধ মানুষের মানবীয় ব্যবহার ও আচরণের পরিবর্তন ঘটায়, তাই ক্রোধ দমনে মানুষকে তার আচরণ ও ব্যবহার পরিবর্তন করতে হবে এবং

ক্রোধের সময় তাকে পারিবারিক অন্যান্য সমস্যা সমাধানের চিন্তা মাথায় আনতে হবে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাতো, ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্য শান্ত ও স্থির থাকতে হবে। আর চিত্তের প্রশান্তি অর্জন করতে হবে।

ইদানীং ক্রোধান্বিত রোগীদের শান্ত করার জন্য psychotherapy-এর প্রচলন শুরু হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় রোগীকে প্রথমে প্রশিক্ষণ নিতে হবে যে, কীভাবে তার sensitiveness to actions and reactions কমানো যায়। সংকটময় অবস্থায় কীভাবে self control or relaxation করা যায়। অর্থাৎ কীভাবে আত্মসংযম ও শরীর-মন শিথিল করা যায় তার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাহলে রোগী নিজেই আস্তে আস্তে এই psychotherapy-এর সাহায্যে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

দ্বিতীয় নিয়ম বা পদ্ধতিটি হচ্ছে muscle and psychological relaxation. এ পদ্ধতিতে চিকিৎসক রোগীকে তার জীবনের সবচেয়ে জটিল ও সমস্যা জর্জরিত মুহূর্তগুলো স্মরণ করতে বলবেন এবং তৎক্ষণাৎ তার অবস্থান পরিবর্তন করতে বলবেন। অর্থাৎ তিনি যে কাজে নিয়োজিত আছেন তা বন্ধ করে অন্য কাজ করতে বলবেন। উদাহরণস্বরূপ রোগী দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে বসতে বলবেন, আর বসা থাকলে তাকে বিছানায় শুয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হতে বলবেন। অর্থাৎ meditation করতে বলবেন। এ পদ্ধতিই আধুনিক psychotherapist-গণ অনুসরণ করে থাকেন। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, tension kills meditation heals. তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, ঠিক একই ধরনের approach আমাদের নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৪৫০ বছর আগে গ্রহণ করার জন্য মুসলিম উম্মাহকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যখন psychotherapy বলতে কিছু ছিলোনা।

হযরত আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি রাগান্বিত হয় তাহলে দাঁড়িয়ে থাকলে সে যেনো বসে পড়ে, আর বসে থাকলে সে যেনো শুয়ে পড়ে।" (আবূ দাউদ) ৮৩৩

তাই ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ব্যবস্থাপত্রের চেয়ে উৎকৃষ্ট আরো কোনো ব্যবস্থা আছে কি?

অধ্যায়-২৪

বিপদে ধৈর্য ধারণ ও সুসংবাদে আনন্দ প্রকাশ

প্রশ্ন-২৯৫ : বিপদে আপদে ও প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা একটি মহৎ গুণ। ধৈর্য ধারণ করাকে অনেক বুযুর্গানে দ্বীন 'হৃদয়ের ওষুধ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ বিষয়ে কুরআন মজীদে আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'য়ালা কী কী ইরশাদ করেছেন?

উত্তর ঃ ধৈর্যকে ঈমানের ভিত্তি বলা হয়ে থাকে। বস্তুত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সমন্বয়ই ঈমান। ইসলামের কতিপয় পূর্বপুরুষ মনিষী বলেছেন, "ঈমানের দুটো অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা আর অপরটি হচ্ছে প্রশংসা করা। আর এ প্রশংসাই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও উপলব্ধির সমন্বয় সাধন।"

আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআন মজীদে (সূরা ইবরাহীম ও সূরা সাবায়) বলেন,

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾

"নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (ইবরাহীম ১৪:৫ ও সাবা ৩৪:১৯)

এ আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের প্রশংসা করেছেন। বস্তুত অসুস্থতায় ধৈর্যধারণ করাকে রোগের নিরাময় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। Patience is the remedy to many sicknesses. কুরআন মজীদে ধৈর্যশীলদের সম্বোধন করে আরো বলা হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"হে মু'মিনগণ! ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (আল বাকারাহ ২:১৫৩)

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾

"আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।" (আলে ইমরান ৩:১৪৬)

﴿وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾

"কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো, তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটা ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম।" (আন-নাহল ১৬:১২৬)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমরা ধৈর্য ধারণের মাধ্যমেই জীবনের সবচেয়ে সর্বোত্তম অবস্থাটি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।" (ইবনুল কাইয়িম) [৮৩৪]

অতএব আমাদের ঈমানের পূর্ণতা অর্জন করতে হলে সকল ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন-২৯৬ : ধৈর্য ধারণ কতো প্রকার ও কী কী? অনুগ্রহপূর্বক বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর : হাফিয ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, দেহের সাথে মাথার তুলনা যেমন

তেমনি অন্যান্য গুণের মধ্যে ধৈর্যের তুলনাও তেমন। তিনি বলেছেন, তিন প্রকারের ধৈর্য আছে। এক. আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ। দুই. আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ। তিন. আল্লাহর ন্যায়বিচার ও ভাগ্যের লিখন তথা ভালোমন্দের উপর বিশ্বাস সহকারে ধৈর্য ধারণ করা। এই তিনটি ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা হলে ধৈর্যের উৎকর্ষ লাভ হয় এবং মানুষের ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে। ফলে সে এ পৃথিবী ও পরকালের আনন্দ ও সুখ অর্জনে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন-২৯৭ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশির সংবাদে আনন্দিত হতেন বা আনন্দ প্রকাশ করতেন। এ বিষয়ে কুরআন মজীদে আল্লাহ কী ইরশাদ করেছেন?

উত্তর : খুশি, উল্লাস আর আনন্দ প্রকাশের বৈশিষ্ট্যাবলি মানুষের অভ্যন্তরস্থ বা ভেতরের কর্মশক্তি বা ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। It strengthens the inward egergy. তাই যে কোনো সুসংবাদে আনন্দ বা উৎফুল্লতা প্রকাশ করা দোষের কিছু নয়। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সাহাবাদের উত্তম কাজে আনন্দিত হতেন। ঐ সময় তাঁর চেহারার দিকে তাকালে যে কেউ সে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ অনুধাবন করতে পারতো। তবে আনন্দ-উল্লাসের একটা সীমারেখা আছে। সেই সীমালঙ্ঘন করা উচিত নয়। অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ বা মাত্রাতিরিক্ত হাসি-তামাশা আমাদের সকলের জন্যেই ক্ষতিকর। ভালো সংবাদে অত্যধিক বা মাত্রাতিরিক্ত আনন্দ প্রকাশ ও উল্লসিত হওয়া নিষিদ্ধ না হলেও কাম্য নয়। ইতিহাস আমাদের বলে যে অত্যধিক আনন্দ প্রকাশের কারণে বেশ কয়েকজন মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। আল্লাহ সুব্‌হানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ﴾

"আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত।" (আলে ইমরান ৩:১৭০)

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴾

"হে নবী! বলো, এ জিনিসটি যে তিনি পাঠিয়েছেন, এটি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর মেহেরবানী। এ জন্য তো লোকদের আনন্দিত হওয়া উচিত।" (ইউনুস ১০:৫৮)

সূরা কাসাসে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴾

"তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ বা অহংকার করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেননা।" (কাসাস ২৮:৭৬)

সউদি আরবের Dr. M. T. Al-Hilali and Dr. M. M. Khan রচিত The Nobel Qur'an, 1996 এ আয়াতের অনুবাদ এভাবে করা হয়েছে, "অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করোনা বা উল্লসিত হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় আনন্দ উল্লাসীদেরকে পছন্দ করেননা।" (কাসাস ২৮:৭৬)

যা হোক, এ আয়াতে অতিরিক্ত ও সীমাহীন আনন্দ প্রকাশ করা, বিজয়োল্লাস করা, মহাউল্লসিত হতে আল্লাহ

নিষেধ করেছেন। আর যারা এসব করে, তাদের আল্লাহ ভালোবাসেননা। তবে বিজয়ে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। দেখা যায়, অনেক খেলোয়াড় মাঠে এসব বিজয় মুহূর্তে আল্লাহকে সিজদাহ করে থাকেন। তবে রাস্তায় পথচারী মানুষের গায়ে রং বা পানি ছিঁটিয়ে ও রাস্তায় রং ঢেলে আনন্দ প্রকাশ করা কারো কাম্য নয়। এতে সাধারণ মানুষ বিরক্ত হয়। অনেকে রেগে যায় এবং খারাপ মন্তব্য করে।

প্রশ্ন-২৯৮ : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে রসিকতা, ঠাট্টা-তামাশা বা মজা করতেন? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলবেন কি?

উত্তর : সাধারণভাবে মজা, তামাশা, ঠাট্টা করা মহৎ লোকদের পক্ষে মানায়না। তবু তারা মাঝে-মধ্যে একটু আধটু করতেন। তবে সেখানে কোথাও অসত্য, অন্যায়, অসুন্দর বা মিথ্যার লেশ থাকতোনা। কাউকে হাসি-তামাশার মাধ্যমে আনন্দ দান করা দোষের না হলেও নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই সতর্ক থাকতেন যাতে এসব তামাশার মাঝে সত্য ছাড়া অন্য কিছু না থাকে। এমন কোনো কথা মুখ থেকে হঠাৎ বের হয়ে না যায়, যা অসুন্দর বা যা কাউকে আঘাত দিতে পারে বা কারো মনোকষ্টের কারণ হতে পারে। হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেন, "একদা একজন বৃদ্ধা মহিলা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন এবং তাঁর নিকট অনুরোধ করেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য দু'য়া করুন যাতে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হে অমুকের মা! কোনো বৃদ্ধা মহিলা তো বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেনা। একথা শুনে বৃদ্ধা মহিলা যখন কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছিলেন তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা মহিলাকে গিয়ে বলো, কেউ বৃদ্ধ অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশের আগেই সকল মহিলাকে যুবতী ও কুমারী নারী বানাবেন।" (শামায়েলে তিরমিযী) [৮৩৫]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

﴿إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً ۝ فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا ۝ عُرُبًا أَتْرَابًا﴾

"তাদের স্ত্রীদের (হূর) কে আমি বিশেষভাবে নতুন করে সৃষ্টি করেছি এবং কুমারী বানিয়ে দিয়েছি। তারা হবে নিজের স্বামীর প্রতি আসক্তা (সোহাগিনী) এবং তাদের সমবয়স্কা।" (ওয়াকিয়াহ ৫৬: ৩৫-৩৭)

অপরদিকে আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য তার জন্য একটি প্রাণী বাহন দেয়ার জন্য আরয করলেন। তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, একটি উটনীর বাচ্চা তোমাকে দেয়া হবে। লোকটি আরয করলেন, এই উটের বাচ্চা দিয়ে আমি কী করবো হে আল্লাহর রসূল! আমার তো একটা বয়স্ক বাহন প্রয়োজন। তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক উটই হচ্ছে কোনো না কোনো উটনীর বাচ্চা।" (আত-তিরমিযী) [৮৩৬]

এ দুটো হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য সাহাবীদের গভীরভাবে মনোনিবেশ সহকারে শোনা উচিত। তাহলে উপস্থিত ব্যক্তিরা সবাই বুঝতে পারবে যে তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে কী বুঝাতে চেয়েছেন। ফলে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকবে না।

অধ্যায়-২৫

মর্মপীড়া, দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতার নিরাময়

প্রশ্ন-২৯৯ : মর্মপীড়া, দুঃখ-বেদনা, বিষন্নতা ও উদ্বিগ্নতার চিকিৎসার ব্যাপারে আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উপদেশ দিয়েছেন?

উত্তর : নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখ-বেদনা, মনোকষ্ট, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচবার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। উদ্বেগ বা উদ্বিগ্নতা হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যা চলে যায়, আবার আসে। যেমন, অমুক ঘটনায় আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি। প্রতিকার হলে উদ্বেগ তখন আর থাকেনা। কিন্তু দুঃখ-বেদনা, মনোকষ্ট এমন একটা অবস্থা যা প্রতিনিয়ত মানুষকে দংশন করে। কোনো ঘটনা যা অতীতে ঘটে গেছে বা ঘটনাটি অতীত হয়ে গেছে যার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা। যেমন কোনো শিশু আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে তার জন্য পিতা-মাতার যে অবস্থা হয়। কেউ যদি গুম হয়ে যায়? তখন তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের কী অবস্থা হয়? অনেকে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মানসিক পীড়া ও পেরেশানীতে প্রতিনিয়ত ভুগতে থাকে। যাহোক, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কেউ যদি অত্যধিক পেরেশানীতে ভোগে, তাহলে তার শরীর পীড়িত হয়ে পড়বে।" (আবূ নু'য়াইম) [৮৩৭]

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব মানসিক অসুস্থতা বা mental sickness থেকে দূরে থাকার জন্য সর্বদা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং আল্লাহর সাহায্য চেয়েছেন আরোগ্য লাভের জন্য।

প্রশ্ন-৩০০ : দুঃখ-কষ্ট, বিষণ্নতা, মনোবেদনা, দুশ্চিন্তা থেকে আরোগ্য লাভের জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কী করতেন? তিনি কি এ ব্যাপারে কোনো দু'য়া বর্ণনা করেছেন যা আমরা নিয়মিত পাঠ করতে পারি?

উত্তর : দুঃখ-কষ্ট, বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তা মানুষের বর্তমান অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি সর্বদা এসবে ভোগে, তাকে এমন কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে, যাতে সে ঐসব চিন্তা ভুলে যায় বা ভুলে থাকতে পারে। ইমাম আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি দুঃখ-কষ্ট তোমাদের কাউকে পেয়ে বসে, তখন তার উচিত তীর-ধনুক নিয়ে বের হয়ে যাওয়া।" (আস-সুয়ূতী) [৮৩৮]

অর্থাৎ শিকারে যাওয়া। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আক্রমণ করতো অথবা কোনো জটিল সমস্যায় পড়তেন, তখন তিনি মাথা আকাশের দিকে উত্তোলন করে বলতেন, "সমস্ত গৌরব ও প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি মহান ও অতীব পবিত্র।" (আত-তিরমিযী) [৮৩৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কোনো বান্দা যখন প্রচণ্ড দুঃখ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত হয়ে বলে, "হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা আপনার বান্দা ও বান্দীর ছেলে। আমার যা কিছু আছে তা আপনারই হাতে। আপনার হুকুম আমার ব্যাপারে অবধারিত এবং আপনার ফয়সালার বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত যে আমি আপনার নিকট সেসব নামের উসীলায় প্রার্থনা করছি যার দ্বারা আপনি নিজের নামকরণ করেছেন অথবা তা আপনি আপনার কোনো বান্দাকে শিখিয়েছেন, অথবা আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন, বা আপনি আপনার নিকট অদৃশ্যের জ্ঞান ভাণ্ডারে গোপন রেখেছেন। আপনি কুরআনকে আমার হৃদয়ের ঝরণা বানিয়ে দিন, একে আমার বুকের আলো করে দিন, আর একে আমার দুঃখ বিনাশকারী এবং আমার মর্মপীড়া, দুঃখ-কষ্ট নিবারণের উসীলা বানিয়ে দিন।" [৮৪০]

হাদীসটি আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মুসনাদে এবং ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ-এ উদ্ধৃত করেছেন।

এ দু'য়াটি যদি কেউ নিয়মিত পাঠ করেন তাহলে ইনশা'আল্লাহ তিনি সর্বপ্রকার মর্মপীড়া, মনোকষ্ট, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও দুঃখ-বেদনা থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারবেন এবং আনন্দ লাভ করবেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "কেউ যদি এসব রোগে তথা দুঃখ-কষ্ট, বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতায় ভোগে, তাহলে তাকে নিয়মিত এ দু'য়া পাঠ করতে হবে।" (ইবনুল কাইয়িম) [৮৪১]

"লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।"- "কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া, যিনি মহান ও সর্বশক্তিমান।"

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে এ দু'য়া জান্নাতের অলংকার বা ভাণ্ডার বিশেষ। [৮৪২]

হযরত কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাঁকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করার জন্য পাঠান। তিনি (কায়েস) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমি নামায পড়ে নিয়েছি। তিনি তাঁর পা দিয়ে আমাকে খোঁচা দিয়ে বললেন "আমি কি তোমাকে জান্নাতের দরজাসমূহ হতে একটি দরজার সন্ধান দিব না? আমি বললাম, অবশ্যই! রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বললেন, "দরজাটি হলো, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।" (আত-তিরমিযী) [৮৪৩]

আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"আমি কি তোমাকে কিছু কালেমা বা এমন কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেবোনা- যখন তুমি দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা ও মর্মপীড়ায় পতিত হবে, তখন তা পাঠ করবে, "আল্লাহু, আল্লাহু রাব্বী, লা উশরিকু বিহি শাঈয়ান।"- "আল্লাহ, আল্লাহই আমার প্রভু, যাঁর সাথে আমি কাউকে বা কোনো কিছুকে শরীক করিনা।" (মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী) [৮৪৪]

ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করেছেন, "যখন কোনো ভয়ানক বা গুরুতর বিষয় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুঃখ-কষ্ট বা পেরেশানিতে

ফেলতো, তখন তিনি নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাইতেন।" (মুসনাদে আহমাদ) [৮৪৫]

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন,

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ ﴾

"ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করো।" (আল বাকারাহ ২:৪৫)

আবূ দাউদ শরীফে উদ্ধৃত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, "নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন।" (আবূ দাউদ) [৮৪৬]

বস্তুত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রার্থনার শব্দগুলো ছিলো, "হে চিরস্থায়ী, হে চিরঞ্জীব! সর্বসত্তার ধারক! আমি আপনার করুণা ও রহমত থেকে সাহায্য কামনা করছি।" (আত-তিরমিযী) [৮৪৭]

এই কথাগুলো মানুষের দুঃখ-কষ্ট, মর্মপীড়া দূর করতে অত্যন্ত উপকারী।

অধ্যায়-২৬

গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যসূত্রসমূহ (Bibliography of Works Cited)

১. আল কুরআনুল করীম (Al-Qur'anul Karim) Bengali Translation of the Holy Qur'an by a Board of Translators, published by Islamic Foundation Bangladesh, 1989.

২. হাফিজ ইমামুদ্দিন ইবনু কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ১৯৪-২৫৬ (হিজরী), তাফসীর ইবনে কাসীর, অনুবাদ : ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, আল-মাইমানা, পুরানা পল্টন, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৩।

৩. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' রহমাতুল্লাহি আলাইহি, তাফসীর মাআরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সউদি আরবের বাদশাহ ফাহ্দ ইবনে আব্দুল আজীজের নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কুরআনের এ তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, খাদেমূল হারা'মাইন বাদশাহ ফাহ্দ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, রিয়াদ, সউদি আরব।

৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, তাফহীমুল কুরআন, ১-১৯ খণ্ড, বাংলা অনুবাদ : আব্দুল মান্নান তালিব ও মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪।

৫. Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali and Dr. Muhammad Muslim Khan, Interpretation and Meaning of the Noble Qur'an in English Language, Darussalam Publishers, Riyadh, Saudi Arabia, 1996.

৬. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ১৯৪-২৫৬ (হিজরী), সহীহ আল বুখারী (Traditions), বাংলা অনুবাদ : অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, অধ্যাপক মাওলানা এ. এম. মো. মোসলেম, মাওলানা সাঈদ আহ্মদ, মাওলানা আফলাতুন কায়সার, মাওলানা সিফাতুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব, মাওলানা আতিকুর রহমান, অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল খালেক, অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন, অধ্যাপক মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী ও অধ্যক্ষ মাওলানা আদূর রাজ্জাক, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিশির দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, ২ আগস্ট ২০০৮, ৩ অক্টোবর ২০০৬, ৪ ডিসেম্বর ২০০৭, ৫ নভেম্বর ২০০৬, ৬ ডিসেম্বর ২০০৭।

৭. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন-নিশাপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২০৬-২৬১ (হিজরী), সহীহ মুসলিম (Traditions), বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনা, সোলেমানিয়া বুক হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারী ২০০৭।

৮. ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহমাতুল্লাহ আলাইহি, ৯৩-১৭৯ (হিজরী), আল মুয়াত্তা, কিতাবুল আরাবী, বৈরূত, লেবানন, চতুর্থ প্রকাশ ১৪১৮ (হিজরী), ১৯৯৮ (ঈসায়ী)।

৯. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনে হাম্বল আশ শায়বানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ১৬৪-২৪১ (হিজরী), আল মুসনাদ (মুসনাদে আহমাদ) (Traditions), মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ ১৪২৮ (হিজরী), ২০০৮ (ঈসায়ী)।

১০. ইমাম আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২০২-২৭৫ (হিজরী), আবূ দাঊদ শরীফ (Traditions), বাংলা অনুবাদ : অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক ও মাওলানা নূর মোহাম্মদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ১ম-৫ম খণ্ড, আগস্ট ২০০৬।

১১. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২০৯-২৭৯ (হিজরী), জামে আত-তিরমিযী (Traditions), বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, আগস্ট ২০০০।

১২. ইমাম আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুয়াইব আন-নাসাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২১৫-৩০৩ (হিজরী), সুনান আন-নাসাঈ (Traditions), অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, বড় মগবাজার, ঢাকা-১১০০, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড, অক্টোবর ২০০২।

১৩. ইমাম আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুয়াইব আন-নাসাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২১৫-৩০৩ (হিজরী), আস-সুনানুল কুবরা আন-নাসাঈ (Traditions), মুআস্সাতুর রিসালা বৈরূত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ, ২০০১ (ঈসায়ী) এবং দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, লেবানন, বৈরূত, ১৯৯১ (ঈসায়ী)।

১৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২১৫-৩০৩ (হিজরী), সুনানে ইবনে মাজাহ (Traditions), অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, অক্টোবর ২০০০।

১৫. ইমাম আবুল কাসেম সুলায়মান ইবনে আহম্মাদ আশ-শামী আত-তাবারানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২৬০-৩৬০ (হিজরী), আল মু'জামুল কাবীর (Traditions), মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া, কায়রো, মিসর, ১৪০৪ (হিজরী), ১৯৮৩ (ঈসায়ী) ও দারুত তুরাসিল আরাবী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪০৩ হিজরী, ১৯৮২ (ঈসায়ী)।

১৬. ইমাম আবুল কাসেম সুলায়মান ইবনে আহম্মাদ আশ-শামী আত-তাবারানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২৬০-৩৬০ (হিজরী), আল-মু'জামুল আওসাত (Traditions), দারুল হারামাইন, কায়রো, মিসর ও সূদান, ১৪১৫ (হিজরী), ১৯৯৫ (ঈসায়ী) ।

১৭. ইমাম আবুল কাসেম সুলায়মান ইবনে আহম্মাদ আশ-শামী আত-তাবারানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আল-মু'জামুস্ সাগীর (Traditions), দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, লেবানন, বৈরূত, ১৪০৩ (হিজরী), ১৯৮৩ (ঈসায়ী)।

১৮. ইমাম হাফিজ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল হাকিম আন নিশাপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৩২১-৪০৫ (হিজরী), আল মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন (মুসতাদরাকে হাকিম),

কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ ১৪১৮ (হিজরী), ১৯৯০ (ঈসায়ী)

১৯. ইমাম হাফিজ আবূ বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন আল বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৩৮৪-৪৫৮ (হিজরী), শু'য়াবুল ঈমান (Traditions), দারুল কুতবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরূত ১৪১০ (হিজরী), ১৯৯০ (ঈসায়ী)।

২০. ইমাম আবূ নূ'য়াইম আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আস্‌বাহানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৩৩৬-৪৩০ (হিজরী), আত্-তিব্বুন নববী, দারু ইবনে হাযম, কায়রো, প্রথম মুদ্রণ ২০০৬।

২১. ইমাম মুহীউদ্দিন ইয়াহ্ইয়া আন্-নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, মৃত্যু ৭ম হিজরী, রিয়াজুস সালেহীন (Traditions), অনুবাদ : আব্দুল মান্নান তালিব, সম্পাদনা : মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, মে ১৯৯২।

২২. হাফিজ আবূ শায়খ আল-ইস্‌ফাহানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, মৃত্যু ৩৮৯ (হিজরী), আখ্‌লাকুন্ নবী (সা.), অনুবাদ : মাওলানা মুশতাক আহমদ, মুহাম্মদ হাসান রহমতী, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অধ্যাপক মোজাম্মেল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯৮।

২৩. শায়খ ওয়ালিউদ্দিন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতীব আত-তিবরিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, মৃত্যু ৭৪১ (হিজরী), মিশকাতুল মাসাবীহ (Traditions), আল-মাকতাব আল-ইসলামী, বৈরূত, লেবানন, তৃতীয় মুদ্রণ ১৪০৫ (হিজরী), ১৯৮৫ (ঈসায়ী)।

২৪. ইমাম শামসুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর আদ দিমাশকী ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৬৯১-৭৫১ (হিজরী), যাদুল মা'আদ ফী হাদ্‌য়ি খায়রিল 'ইবাদ, মু'আস্‌সাসাতুর রিসালা, বৈরূত, লেবানন, ৪র্থ মুদ্রণ ১৪২৪ (হিজরী), ২০০৩ (ঈসায়ী)।

২৫. জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর আস-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৮৪৯-৯১১ (হিজরী), আল জামিউস্ সাগীর ফী আহাদীসিল বাশীরিন নাযীর (Traditions), দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, লেবানন, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪২৫ (হিজরী), ২০০৪ (ঈসায়ী) ।

২৬. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah (Rah), died 751 (H), Healing with the Medicine of the Prophet (SAWS), Translated by : Jalal Abual Rub, published by Darussalam Publishers, Riyadh, Saudi Arabia 1999.

২৭. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah (Rah), died 751 (H), Healing with the Medicine of the Prophet (SAWS), Translated by : Dr. Penelope Johnstone, Oxford University, Published by The Islamic Texts Society, 22A Brookands Avenue, Cambridge CB2 2DQ, UK 1998, Reprinted in 2001.

২৮. ইমাম শামসুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর আদ দিমাশকী ইবনুল কাইয়িম আল জাওযিয়্যা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৬৯১-৭৫১ (হিজরী), আত-তিব্বুন নববী, মু'আস্‌সাসাতুর রিসালা, বৈরূত, লেবানন, ৪র্থ মুদ্রণ ১৪২৪ (হিজরী), ২০০৩ (ঈসায়ী)।

২৯. Imam Jalalu'd-Din Abd'ur-Rahman As-Suyuti (Rah), 848-911 (H), As-Suyuti's Medicine of the Prophet (SAWS), Ta-Ha Publishers Ltd., 1 Wynne Road, London 2004.

৩০. প্রিন্সিপাল হাফেয নযর আহমদ (লাহোর), তিব্বে নববী (সা) (বিশ্বনবীর চিকিৎসা বিধান), অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্ যামান, সম্পাদনা : মুফতী মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ, হক লাইব্রেরি, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০, জুলাই ১৯৯৭।

৩১. Dr. Muhammad Iqtedar Hossain Farooqi, Medicinal Plants in the Traditions of Prophet (SAWS), Sidrah Publishers, Lucknow, India 2004.

৩২. মুফতী মুতিউর রহমান, রোগীর সেবায় মহানবী (সা.), সম্পাদনা : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৫।

- গ্রন্থকার

হাদীস ও তিব্বুন নববী গ্রন্থপঞ্জী (References to Hadith & Citations)

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
		অধ্যায়-১	
১	যা'দুল মা'আদ	বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহনে নির্দেশনা	৪/১২১
	মুয়াত্তা	রোগীর চিকিৎসা ২/২৬০(১০১)	১৭৫৭, ৩৪৭৪
২	ইবনুল কাইয়িম	---	পৃষ্ঠা ২৯
৩	মুসনাদে আহমদ	মুসনাদে আয়েশা (রা)	২৫২৬৪
	তিরমিযী	জানাযা	৯০৭
৪	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৪২
৫	মুসনাদে আহমদ	হাদীসু মাহমুদ ইবনে লাবীদ	২৩৬২৩
৬	তিরমিযী	পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি	২৩৩৮
৭	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৩৩
৮	মুসনাদে আহমদ	হাদিসু সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা)	১৪৮১
	ইবনে মাজাহ	কলহ-বিপর্যয়	৪০২৩
৯	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৩৩
১০	মু'য়াত্তা	রোগীর সওয়াব	১৭৫০, ৩৪৬৫
১১	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৪০
	মুসলিম	সদাচার, সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক	৬৩৩৯
১২ *	মুসনাদে বাযযার	হাদীসু আব্দুল্লাহ বিন মাসুউদ (রা)	১৭৬১ শাদীদ যয়ীফ
১৩ *	মু'জামুল আওসাত	আবূ বকর রাবী	৩১০২
	মু'জামুস সগীর	আবূ বকর রাবী	৩০৪ যয়ীফ
১৪	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৬৯
১৫	আবু দাউদ	জানাযা	৩০৭৯
১৬	শুআবুল ঈমান	মুসীবাত ও ধৈর্য ধরা	৯৮৬৬ মুরসাল
১৭ *	আস-সূয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১৪৬
	কাশফুল খফা	১/৩৬৭	১১৭৩ যয়ীফ
১৮	জামে সগীর	---	৩৮৪৮
১৯	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২২৯
	মুসলিম	সদাচার, সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক	৬৩৩১, ৬৩৩৩ ৬৩৩৪, ৬৩৩৫
	মুয়াত্তা	রোগীর প্রতিদান ২/২৫৯ (৯৫)	১৭৫১, ৩৪৬৬
২০	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৩০
২১	মু'য়াত্তা	রোগীর প্রতিদান ২/২৫৯ (৯৭)	১৭৫৩, ৩৪৬৮
২২	মুসনাদে আহমদ	মু. আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রা)	৬১৬০, ৬৪০৮
	তিরমিযী	তাওবা	৩৫৩৭
	ইবনে মাজাহ	তাওবা	৪২৫৩
২৩	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৩০
	মুসলিম	সদাচার, সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক	৬৩৩৬
২৪	তিরমিযী	জানাযা	৯০৮
	মুসনাদে বাযযার	মু. আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা)	২৪৪৫
২৫	শু'আবুল ঈমান	ব্যথা-বেদনা, রোগ-বালাই কাফফারা	৯৮৩৫
২৬	আবু দাউদ	জানাযা	৩০৭৭
২৭	মুসলিম	পাত্র ঢেকে রাখা	৫০৮৭
২৮	মুসলিম	সদাচার, সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক	৬৩৩৮
২৯	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৬৯
৩০	মু'য়াত্তা	রোগীর প্রতিদান ২/২৫৯ (৯৭)	১৭৫৩, ৩৪৬৮
৩১	ইবনে মাজাহ	জানাযা	১৪৪১
৩২	ইবনে মাজাহ	জানাযা	১৬১৫
৩৩	মুসনাদে আহমাদ	মু. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ	৩৭৭২
	আস-সূয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১৭৭
৩৪	ইবনে মাজাহ	জানাযা	১৬১৩
৩৫	আবু দাউদ	প্লেগ	৩০৯৭
	মু'য়াত্তা	জানাযা ১/১৫৬ (৩৪)	৫৫২, ৮০২
৩৬	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫৩১৩
৩৭	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৬৪
	মুসলিম	সালাম	৫৫২১
৩৮	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৪৯৬
৩৯	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৩৬৬
৪০	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৩৬৫
৪১	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৩৬৪
৪২	মুসলিম	সালাম	৫৫৫৫
৪৩	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৬৭
৪৪	যাদুল মা'আদ	অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা গ্রহনের নির্দেশনা	৪/১২১
	মুয়াত্তা	রোগীর চিকিৎসা ২/২৬০ (১০১)	১৭৫৭, ৩৪৭৪
৪৫	মুসলিম	শিঙ্গার বিনিময়	৪০০৭
৪৬	আবু দাউদ	আজওয়া খেজুর	৩৮৩৫
	মাজমাউয যাওয়াইদ	হার্টের রোগের ওষুধ	৮৩০০
৪৭	যাদুল মা'আদ	অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা গ্রহনের নির্দেশনা	৪/১২১

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
	মুয়াত্তা	রোগীর চিকিৎসা	১৭৫৭, ৩৪৭৪
		২/২৬০ (১০১)	
৪৮ *	মুসনাদে বাযযার	মু. আবূ হুরায়রা (রা)	৭৮৫২ যয়ীফ
৪৯	আবু দাউদ	চিকিৎসা	৩৮১৫
	তিরমিযী	চিকিৎসা	১৯৮৮
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৩৬
	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৭৪২৭
৫০ *	মু'জামুল কাবীর	হাদীসু আব্দুল্লাহ বিন	১২৭৮৪
		আব্বাস (রা)	শাদীদ যয়ীফ
	জামে সগীর	২/১৮	৪২৮৭, হাসান যয়ীফ
৫১	তিরমিযী	কাদর	২৯৫
৫২	মুসলিম	সালাম	৫৫৫৫
	যাদুল মা'আদ	চিকিৎসার প্রতি	৪/১২, ৪/১৩
		উদ্বুদ্ধকারী হাদীসসমূহ	
৫৩	বুখারী	জিহাদ	২৭৭৮
	আবু দাউদ	জানাযা	৩০৭৮
৫৪	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৫৫
৫৫	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৬৪
৫৬	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৬৩
	মুসলিম	মর্যাদা ও গুণাবলী	৫৫২১, ৬০৭৬
			৬০৮০
৫৭	তিরমিযী	জানাযা	৯২০
৫৮	বুখারী	দু'য়া সমূহ	৫৯০০
৫৯	মুসলিম	জানাযা	১৯৯৬
৬০	আবু দাউদ	জানাযা	৩১০২
	তিরমিযী	ঈমান	২৫৭৫
	মুসতাদরাক	জানাযা	১২৯৯
৬১	মুসলিম	জানাযা	১৯৯৪
৬২	আবূ দাউদ	জানাযা	৩১০৭
৬৩	আবূ দাউদ	জানাযা	৩০৯৪
৬৪	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৬০
	মুসলিম	যিকির-আযকার,	
		দু'য়া-কালাম, তাওবাহ	
		এবং ইস্তিগফার	৬৫৭২
	আবূ দাউদ	জানাযা	৩০৯৪
	তিরমিযী	জানাযা	৯১৩
৬৫	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৬২
৬৬	বুখারী	জানাযা	১১৬১
	ইবনে মাজাহ	জানাযা	১৪৩৫
৬৭	তিরমিযী	শিষ্টাচার	২৬৭৩
	ইবনে মাজাহ	জানাযা	১৪৩৩
৬৮	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৩৭
৬৯	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২২৪, ৫২৩৮
	মুসলিম	পোষাক ও সাজ-সজ্জা	৫২১৭

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৭০	ইবনে মাজাহ	জানাযা	১৪৩৭
৭১	মুসলিম	সদাচার, সদ্ব্যবহার ও	
		আত্মীয়তার সম্পর্ক	৬৩১৯
	তিরমিযী	জানাযা	৯০৯
৭২	তিরমিযী	জানাযা	৯১১
৭৩	আবূ দাউদ	জানাযা	৩০৮৪
৭৪	মুসলিম	সদাচার, সদ্ব্যবহার ও	
		আত্মীয়তার সম্পর্ক	৬৩২৪
৭৫	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০৩৬
	ইবনে মাজাহ	জানাযা	১৪৩৮
৭৬	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৫১
৭৭	মুসলিম	জানাযা	২০০০
৭৮	তিরমিযী	অনুমতি প্রার্থনা	২৬৬৭
৭৯	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ১৭৯
৮০	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৬৪, ৫২৬৫
৮১	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৬৫
৮২	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৪৮
	আবূ দাউদ	জানাযা	৩০৯০
৮৩	আবূ দাউদ	জানাযা	৩০৮৮
৮৪	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৪৪
	মুসলিম	জানাযা	২০০৬
৮৫	শু'আবুল ঈমান	রোগীর সেবা	৯২১৯
৮৬ *	শু'আবুল ঈমান	রোগীর সেবা	৯২২২, শাদীদ যয়ীফ
৮৭	শুআবুল ঈমান	রোগীর সেবা	৯২২১, মুরসাল
৮৮	মুসলিম	সালাম	৫৫৩৩
৮৯	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৪০
৯০	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৪৪
৯১	তিরমিযী	পানাহার ব্যতীত	৭৭৮
		নিরবিচ্ছিন্ন রোযা নিষেধ	
৯২	বুখারী	জানাযা	১২৭০
৯৩	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৪৬
	আবূ দাউদ	জনাযা	৩০৮২
৯৪	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৪৬
৯৫	মুসলিম	যিকির-আযকার,	
		দুয়া-কালাম এবং তাওবাহ	
		ও ইস্তিগফার	৬৬০৭

অধ্যায়-২

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৯৬	মুসলিম	সালাম	৫৫৫৫
৯৭	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৬৭
৯৮	নাসাঈ কুবরা	স্বাস্থ্য ও সুস্থতা চাওয়া	১০৭২২
৯৯	বুখারী	মর্মস্পর্শী হাদীস	৫৯৬৪
১০০	মুসনাদে আহমাদ	মু.আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)	২৩৪০
১০১	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ১১

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
১০২	তিরমিযী	আপোষে নিরাপদে	২৩৪৬
১০৩	তিরমিযী	দুয়াসমূহ	৩৪৪৬
১০৪	তিরমিযী	দুয়াসমূহ	৩৪৪৪
	ইবনে মাজাহ	ক্ষমা ও নিরাপত্তা লাভের দু'য়া	৩৮৪৮
১০৫	তিরমিযী	দু'য়াসমূহ	৩৪৭৮
১০৬	মু'জামুল আওসাত	আবু বকর রাবী	৩১০২
	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ৬
১০৭	মুসনাদে আহমাদ	মু. ইবনে উমর (রা)	৪৭৮৫
	আবূ দাউদ	সকালে কি বলবে	৫০৭৪
	নাসাঈ কুবরা	---	১০৪০১
১০৮	মুসনাদে আহমাদ	মু. আবু বকর (রা)	০৫, ৩৪
১০৯	আবূ দাউদ	দু'য়া	৩৮৪৫
১১০	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৪১৩
১১১	মুসনাদে আহমাদ	হাদীসু আবু বকর (রা)	০৫
১১২	তিরমিযী	দু'আ অধ্যায়ে বিক্ষিপ্ত হাদীসসমূহ	৩৬২৯
	নাসাঈ কুবরা	সুস্থতা চাওয়া	১০৭১৭
১১৩	বুখারী	মর্মস্পর্শী হাদীস	৫৯৯৪
		অধ্যায়-৩	
১১৪	মুসলিম	পাক-পবিত্রতা	৪২৭
১১৫ *	জামে সগীর	---	৩৩৬৯, যয়ীফ
	আত-তাদভীন ফি আখবারে কাযভীন লির রাফিয়ী	---	১১৬
১১৬	তিরমিযী	শিষ্টাচার-পরিচ্ছন্নতা	৩০২৯
১১৭	বুখারী	প্রবেশানুমতি প্রার্থনা	৫৮৫৩
		পোষাক	৫৪৬১, ৫৪৬৩
	মুসলিম	মানুষের প্রকৃতিগত অভ্যাস	৪৯০
	তিরমিযী	আদাব	২৬৯৩
	নাসাঈ	পবিত্রতা	৯, ১০, ১১
১১৮	বুখারী	প্রবেশানুমতি প্রার্থনা	৫৮৫৪
	মুসলিম	মর্যাদা ও গুণাবলী	৫৯৩০
১১৯	মুসলিম	মানুষের প্রকৃতিগত অভ্যাস	৪৯৭, ৪৯৮
	তিরমিযী	আদাব	২৬৯৪
১২০	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১৯৮
১২১	মুসলিম	জুমু'আ	১৮৩২
১২২	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১৯৮
১২৩	নাসাঈ	পবিত্রতা	১২
১২৪	বুখারী	পোশাক	৫৪৬২
১২৫ *	মুসনাদে বাযযার	মু. আবূ হুরায়রা (রা)	৮২৯১, যয়ীফ
১২৬ *	মু'জামুল আওসাত	১/২৫৭	৮৪৬, যয়ীফ
	আখলাকুন্নবী	জুমুয়ার দিন নখ কাটা	৭৫৬
১২৭	তিরমিযী	আদাব	২৬৯৮
	নাসাঈ	পবিত্রতা	১৩
১২৮	বুখারী	পোশাক	৫৪৬৫
	মুসলিম	পাক-পবিত্রতা	৪৯৩-৪৯৫
	তিরমিযী	আদাব	২৭০১
১২৯	সুনানুল কুবরা	লোমনাশক সম্পর্কিত	৭২৮
	লিলবাইহাকী	১/১৫২	
১৩০	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১৯৮
১৩১	মুসলিম	পাক-পবিত্রতা	৪৯২
	আবূ দাউদ	চিরুনি করা	৪১৫২
	তিরমিযী	আদাব	২৬৯৫, ২৬৯৬
	নাসাঈ	পবিত্রতা	১৪
১৩২	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১৯৮
	জামে সগীর	---	৬১৩০
১৩৩ *	আখলাকুন্নবী	জুমুয়ার দিন নখ কাটা	৭৫৬
	আল-আনওয়ার ফী শামায়িলিন নাবিয়্যিল মুখতার		১১০৭, যয়ীফ
১৩৪	জামে সগীর	৩/২৫৫	৬১২৯
	নাওয়াদিরুল উসূল	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	১/৭২, ১৯৬
১৩৫	জামে সগীর	৩/২৫৫	৬১২৯
	নাওয়াদিরুল উসূল	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	১/৭২, ১৯৬
১৩৬	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১৯৮
১৩৭	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৩৯
১৩৮	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৪০
১৩৯	মুসলিম	সংক্রমন, কুলক্ষন, পেট কামড়ানো কীট ইত্যাদি	৫৫৯৮
১৪০	মুসলিম	সংক্রমন, কুলক্ষন, পেট কামড়ানো কীট ইত্যাদি	৫৫৯৯
১৪১	মুসলিম	সংক্রমন, কুলক্ষন, পেট কামড়ানো কীট ইত্যাদি	৫৬০০
১৪২	মুসলিম	সংক্রমন, কুলক্ষন, পেট কামড়ানো কীট ইত্যাদি	৫৬০২
১৪৩	মুসলিম	সংক্রমন, কুলক্ষন, পেট কামড়ানো কীট ইত্যাদি	৫৫৯৬
১৪৪	মুসলিম	সংক্রমন, কুলক্ষন, পেট কামড়ানো কীট ইত্যাদি	৫৫৯৭
১৪৫	বুখারী	শুভ-অশুভ লক্ষণ	৫৩৩৩
১৪৬	বুখারী	শুভ-অশুভ লক্ষণ	৫৩৩৪
১৪৭	বুখারী	শুভ-অশুভ লক্ষণ	৫৩৩৫
১৪৮	বুখারী	শুভ-অশুভ লক্ষণ	৫৩৩৬
১৪৯	বুখারী	শুভ-অশুভ লক্ষণ	৫৩৩৭
১৫০	মুসলিম	সংক্রমন, কুলক্ষন, পেট কামড়ানো কীট, পথভুলানো ভূত-প্রেত	৫৬০৩

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
১৫১	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৬৩
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা, কুষ্ঠরোগ	৩৫৪২
১৫২	মু'য়াত্তা	রোগীর শুশ্রূষা ২/২৬১ (১০৭)	৩৪৮৩
	মু'জামুল আওসাত	কিতাবের শুরু	২০৪
১৫৩	মু'য়াত্তা	রোগীর শুশ্রূষা ২/২৬১ (১০৭)	৩৪৮৩
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৪১
১৫৪	মুসলিম	সালাম	৫৫৯৯, ৫৬০০
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৪১
১৫৫	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৪৩
১৫৬	মুসনাদে আবি ইয়ালা	---	৬৭৪১
১৫৭	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫৩৮০, ৫৩৮৭
		কুষ্ঠ রোগ	৫৪২৫, ৫৪৩৭, ৫৪৪৯
১৫৮	মুসলিম	সালাম	৫৬৩০
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৪৪
১৫৯	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৬৩
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা, কুষ্ঠরোগ	৩৫৪২
১৬০	বুখারী	চিকিৎসা	৫৩০৮
	মুসলিম	সালাম	৫৫৮২
১৬১	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫৩১২
	মুসলিম	শাহাদত বরনকারী ব্যক্তি	৪৭৯২
১৬২	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫৩১৩
	মুসলিম	শাহাদত বরনকারী ব্যক্তি	৪৭৮৮
১৬৩	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	
		প্লেগ	৫৩১৩
১৬৪	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	
		প্লেগ	৫৩১১

অধ্যায়-৪

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
১৬৫	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যগ্রহণ	৫০৪২
	মুসলিম	মদীনার খেজুরের ফযীলত	৫১৬৮
১৬৬	মুসনাদে আহমাদ	---	১৭১৮৬
	তিরমিযী	অধিক আহার নিষেধ	২৩৮০
১৬৭	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ১২
১৬৮	মু'জামুল আওসাত	---	৮৩০৮
১৬৯	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৫৮
	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ১৭২
১৭০	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৫৮
১৭১	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৭৮
১৭২	ইবনে মাজাহ	পানীয় ও পানপাত্র	৩৪১০
১৭৩	ইবনে মাজাহ	পানীয় ও পানপাত্র	৩৪১২
১৭৪	ইবনে মাজাহ	পানীয় ও পানপাত্র	৩৪১১
১৭৫	মুসলিম	পানীয়	৫০৮৯
১৭৬	বুখারী	প্রবেশানুমতি প্রার্থনা	৫৮৪৯
	ইবনে মাজাহ	শিষ্টাচার	৩৭৬৯
১৭৭	বুখারী	প্রবেশানুমতি প্রার্থনা	৫৮৫২
১৭৮	বুখারী	প্রবেশানুমতি প্রার্থনা	৫৮৫০
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৯০
	ইবনে মাজাহ	শিষ্টাচার	৩৭৭০
১৭৯	বুখারী	দু'য়াসমূহ	৫৮৭৫
১৮০	আবূ দাউদ	বিচার	৩৫৯৪
	ইবনে মাজাহ	বিচার ও বিধান	২৩৩৮
১৮১	ইবনে মাজাহ	বিচার ও বিধান	২৩৩৯
১৮২	বুখারী	রীতিনীতি ও স্বভাব চরিত্র এবং আদব-আখলাক	৫৭৮২
	তিরমিযী	আদাব	২৬৮৩
১৮৩	বুখারী	আদাব ও আখলাক	৫৭৮৩
	তিরমিযী	আদাব	২৬৭৮
১৮৪	আবূ দাউদ	আদব	৪৯৪৫
১৮৫	আখলাকুন্নবী	হাঁচির অধ্যায়	৭৫৫-৭৬০
১৮৬	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৭১৪
১৮৭	বুখারী	আদাব-আখলাক	৫৭৮২
১৮৮	বুখারী	আদাব-আখলাক	৫৭৮২
	আবূ দাউদ	আদব	৪৯৪৪
	তিরমিযী	শিষ্টাচার	২৬৮৪
	নাসাঈ কুবরা	---	১০০৪৩, ১০০৪৪
১৮৯	বুখারী	আদাব-আখলাক	৫৭৮০, ৫৭৮৪

অধ্যায়-৫

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
১৯০	আবূ দাউদ	পবিত্রতা	০৭, ০৮
	নাসাঈ	পবিত্রতা	৪৮
১৯১	বুখারী	উযূ	১৫০, ১৫১
১৯২	মুসনাদে আহমাদ	হাদীসু মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন সালাম	২৩৮৩৩
	আবূ দাউদ	পবিত্রতা	৪৪
১৯৩	আবূ দাউদ	পবিত্রতা	০৮
	নাসাঈ	পবিত্রতা	৪৪, ৪৫
১৯৪	তিরমিযী	পবিত্রতা	১৬
	নাসাঈ	পবিত্রতা	৩৯, ৪১, ৪৯
১৯৫	বুখারী	উযূ	১৫১
১৯৬	তিরমিযী	পবিত্রতা	১৮
	নাসাঈ	পবিত্রতা	৩৯
১৯৭	আবূ দাউদ	পবিত্রতা	৩৩
১৯৮	নাসাঈ	পবিত্রতা	৫০
১৯৯	নাসাঈ	পবিত্রতা	৫১
২০০	আবু দাউদ	পবিত্রতা	৮
	নাসাঈ	পবিত্রতা	৪০
২০১	বুখারী	উযূ	১৪১
	মুসলিম	পাক-পবিত্রতা	৫০২

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
	নাসাঈ	পবিত্রতা	৪০, ৪১
২০২	মুসলিম	পাক-পবিত্রতা	৫০২
	আবূ দাউদ	পবিত্রতা	০৯
২০৩	আবূ দাউদ	পবিত্রতা	২৯
	নাসাঈ	পবিত্রতা	৩৪
২০৪	মুসলিম	পবিত্রতা	৫১১
২০৫	বুখারী	উযূ	২৩২
	মুসলিম	পাক-পবিত্রতা	৫৫০
২০৬	বুখারী	উযূ	২১৪
		অধ্যায়-৬	
২০৭	মুসনাদে আহ্মদ	---	১৭১৮৬
	তিরমিযী	প্রার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি অনাসক্তি	২৩২১
	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩৩৪৯
২০৮	আস-সূয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১২
২০৯	আস-সূয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১২
২১০	আস-সূয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১২
২১১	আস-সূয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১১
২১২	তিরমিযী	কিয়ামত ও মর্মস্পর্শী বিষয়	২৪২০
	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩৩৫০
২১৩	ইবনুল কাইয়িম	---	পৃষ্ঠা ৯৮
২১৪	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৯৭, ৫২০০
২১৫	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৪৯৯১
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৯৬
২১৬ *	মু'জামুল কাবীর	২০/৮৫ (১৬২)	১৬৯১৯, যয়ীফ
২১৭	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৮৮-৫১৯০
২১৮	মুসলিম	সদাচার, সদব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক	৬৪৫৭
২১৯	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৫০৩৭
	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৯৩
২২০	আবূ দাউদ	শপথ ও মান্নত	৩২৪৩
২২১	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৮২
২২২	আবূ দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৭৯৩
	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৯২
২২৩	আবূ দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৭৯২
	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৯৩
২২৪	আবূ দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৭৯৪
২২৫ *	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩৩০৫ শাদীদ যয়ীফ
	তবে ইবনে কুতায়বাহ তদীয় মুখতালাফিল হাদীস গ্রন্থে ইহাকে হাসান বলেছেন।		(৮২, ১/২২৭)
২২৬ *	আবূ দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৭৪১ যয়ীফ
২২৭	ইবনে মাজাহ্	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩২৮১

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
২২৮	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৫০২৮
২২৯	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৭৯
২৩০	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৯৯
২৩১	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৮০০
২৩২	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৫০৩৩, ৫০৩৬
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৫৫
২৩৩	বুখারী	জানাযা	৬৭৮৬
২৩৪	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৫০০৬
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫২১২
	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩২৫৯
২৩৫	নযর আহমদ	---	পৃষ্ঠা ১৫৬
২৩৬	তিরমিযী	কিয়ামত ও মর্মস্পর্শী বিষয়	২৪২০
	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩৩৫০
২৩৭	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৪৯৯৫
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫২০৪
	তিরমিযী	আহার ও খাদ্য দ্রব্য	১৭৬৪
২৩৮	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৪৯৯৩, ৪৯৯৬
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫২০৬, ৫২০৮
২৩৯	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৬৫
২৪০	মুসনাদে আহমাদ	হাদীসু সুয়াইব (রা)	২৩৯২৯
	মুসতাদরাক	আদব ও তার শিষ্টাচার	৭৭৩৯
	শুআবুল ঈমান	মুছাফাহা ও মুআনাকা	৮৯৭৩
			হাসান লিগয়রিহী
২৪১	মুসতাদরাক	সৎকর্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক	২১৬৬, ৭৩০৭
	মু'জামুল কাবীর	হাদীসু ইবনে আব্বাস (রা)	১২৭৪১
২৪২	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩২৮৯
২৪৩	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩২৯১
২৪৪	তিরমিযী	আহার ও খাদ্য দ্রব্য	১৭৪৬
২৪৫	আবূ দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৭৩৪
২৪৬	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩২৬৬
২৪৭	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৯৪
২৪৮	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৯৫
	তিরমিযী	আহার ও খাদ্য দ্রব্য	১৭৪৭
২৪৯	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৪৯৭৫
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৯৯
	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৮০৫
২৫০	আবূ দাউদ	পবিত্রতা	৩৩, ৩৪
২৫১	নাসাঈ	কোন হাত দ্বারা নাক ঝারতে হবে	৯১
২৫২	নাসাঈ	পবিত্রতা	৮৫
২৫৩	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৯৮
২৫৪	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৮৪
২৫৫	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৮৩
	নাসাঈ	পবিত্রতা	৯১
২৫৬	বুখারী	পানীয়	৫১৯৯

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
২৫৭	আবূ দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৭৩১
	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩২৬৩
২৫৮	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৪৯৯৭, ৪৯৯৮
	আবু দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৭২৭
২৫৯ *	ইবনে আদি		
	আল-কামিল ফী দুয়াফা		
	ইর-রিজাল	মু. আব্দুল হাকাম ১৪৮৯ (৬৪৫৮), যয়ীফ	
২৬০	আবূ দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৭৩২
	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩৩৭০
২৬১	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৩১
	তিরমিযী	আহার ও খাদ্য দ্রব্য	১৭৪৯
	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩২৭৯
২৬২	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৩৩
২৬৩	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৩৬
২৬৪	মু'জামুল কাবীর	মু. আবূ উমামা	৭৯৭
		আল-বাহিলী (রা:)	
২৬৫	ইবনে মাজাহ	আহার ও শিষ্টাচার	৩৩৫৫
২৬৬ *	তিরমিযী	আহার ও খাদ্য দ্রব্য	১৮০৪
	ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে মুনকার (প্রত্যাখাত) বলেছেন।		
২৬৭	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ১৩
২৬৮	বুখারী	আযান	৬৩১
২৬৯	তিরমিযী	আহার ও খাদ্য দ্রব্য	১৭৫৪
২৭০	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৮৫
২৭১	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৫৭
২৭২	মুসলিম	নামায	১১৩৫
২৭৩	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৫০৪৯
	মুসলিম	নামায	১১৩৬
২৭৪	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৫০৪৮
২৭৫	আবূ দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৭৮৫
	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৫৫
২৭৬ *	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৪৭
	তারিখে আস্‌বাহান	২/২১৮	১/২৯৪
	আখবারে আস্‌বাহান	---	১৭৫৯
			শাদীদ যয়ীফ
২৭৭	মুসলিম	নামায	১১৪০
	মুসনাদে আহ্‌মদ	মু. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)	৮৯
২৭৮	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৮০৭
২৭৯	মুসনাদে আহ্‌মদ	---	১৬০৭৮
	আবূ দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৭২২
	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩২৮৬
২৮০	মু'জামুল আওসাত	৭/২১৭	৭৩১৩
২৮১	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৫০
২৮২	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৩০
২৮৩	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১২৭, ৫১২৮
২৮৪	মুসলিম	পানীয়	৫১৩১
	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৫০
২৮৫	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৫০৫২
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১২৪, ৫১২৫
২৮৬	মুসনাদে আহমাদ	হাদীসু নুবাইশা	
		আল-হুজালী (রা)	২০৭২৪
	ইবনে মাজাহ	পাত্র পরিস্কার করা	৩২৭১
			হাসান লিগয়রীহি
২৮৭	আবু দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৭১৯
	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৯৫
২৮৮	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩২৬০
২৮৯	মিশকাত	খাদ্যদ্রব্য	৪২৫৫, মুরসাল
২৯০ *	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩২৯৫ যয়ীফ
২৯১	মুসতাদরাক	পানাহার	৭০৮৪
২৯২	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৪৯৭৫
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৯৯
	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৮০৫
২৯৩	আবূ দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৭২৫
	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৮০৭
২৯৪	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৯৩
২৯৫	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৩৯১
	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩২৮৩
২৯৬	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৩৯০
	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩২৮৪
২৯৭	বুখারী	অধিক প্রশ্ন ও অনর্থক কষ্ট করা	
		অপছন্দনীয়	৬৮৮২
২৯৮	শু'আবুল ঈমান	মেহমানের সম্মান	
		প্রদর্শন করা	৯৫৯৮
			হাসান লিগয়রিহী
২৯৯	বুখারী	মেহমানদের আপ্যায়ন ও যত্ন করা	৫৬৯৮
৩০০	মু'জামুল কাবীর	লৌকিকতা	৬১৮৭
			হাসান লিগয়রিহী
		অধ্যায় -৭	
৩০১	মুসতাদরাক	পানীয়দ্রব্য	৭২০০
৩০২	মুসতাদরাক	পানীয়দ্রব্য	৭২০২
৩০৩	মুসতাদরাক	পানীয়দ্রব্য	৭২০৩
৩০৪	শু'আবুল ঈমান	তিন নি:শ্বাসে পান করা	৬০১২, মুরসাল
৩০৫	তিরমিযী	পানপাত্র ও পানীয়	১৮৩৪
৩০৬	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১১৭
	আবূ দাউদ	পানীয়	৩৬৮৫
	তিরমিযী	পানপাত্র ও পানীয়	১৮৩২
৩০৭	তিরমিযী	পানপাত্র ও পানীয়	১৮৩৪
৩০৮	আমানুল ইয়াওমি	পান করার সময়	৪৭০

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
	ওয়াল লাইলা (ইবুনস সুন্নি)	কি বলবে	
৩০৯	বুখারী	পানীয়	৫২২০
৩১০ *	আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা (ইবুনস সুন্নি)	তিন নি:শ্বাসে পান করা	৪৭১, যয়ীফ
	জামে সগীর	---	৬৭৩১, যয়ীফ
৩১১	ইবনে মাজাহ	পানীয় ও পানপাত্র	৩৪১৬
৩১২	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১০৭, ৫১০৮
	আবূ দাউদ	পানীয়	৩৬৭৫
৩১৩	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১০৯
৩১৪	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১০৫
	তিরমিযী	পানপাত্র ও পানীয়	১৮২৭
৩১৫	মুসলিম	দাঁড়িয়ে পানি পান করা	৫১০৪
৩১৬	তিরমিযী	পানপাত্র ও পানীয়	১৮৩০
৩১৭	আবূ দাউদ	পানীয়	৩৬৮৬
	তিরমিযী	পানপাত্র ও পানীয়	১৮৩৭
৩১৮	মুসনাদে আহ্‌মদ	মু.আবু সাঈদ খুদরী (রা)	১১৫৪১
	তিরমিযী	পানপাত্র ও পানীয়	১৮৩৬
	মুসতাদরাক	পানীয়দ্রব্য	৭২০৮
৩১৯	বুখারী	পানীয়	৫২১৭
৩২০	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১০১
৩২১	আবূ দাউদ	পানীয়	৩৬৮০
৩২২	বুখারী	পানীয়	৫২১৪
৩২৩	বুখারী	পানীয়	৫২১৩
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৭৮
৩২৪	আবূ দাউদ	পানীয়	৩৬৮৯
৩২৫	আবূ দাউদ	পানীয়	৩৬৯০
৩২৬	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৮৭
৩২৭	মুসলিম	পাত্র ঢেকে রাখা	৫০৮৮
৩২৮	বুখারী	পানীয়দ্রব্য	৫১৯৫

অধ্যায়-৮

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৩২৯	আখবারে আসবাহান	৩/৭০	৬৮৯
	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ১৭
৩৩০	আস সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ১৭
৩৩১	বুখারী	অনুমতি লওয়া, কায়লুলা	৫৮৩৭
৩৩২	ইবনে মাজাহ	সাহরী সম্পর্কিত	১৬৯৩
	শু'আবুল ঈমান	আল্লাহর নিয়ামত ও তাঁর শুকরিয়া	৪৭৪২
৩৩৩	ইবনে মাজাহ	ইকামাতিস্ সালাত	১৩৩২
৩৩৪	মুসনাদে আহমাদ	মু.ইসমান ইবনে আফফান (রা)	৫৩০
৩৩৫	ইবনুল কাইয়্যিম	---	পৃষ্ঠা ২১৫
৩৩৬	বুখারী	তাহাজ্জুদ নামায	১০৭৩
৩৩৭ *	জামে সগীর	৪/১৪৮	৯০৫৫ যয়ীফ
৩৩৮	ইবনুল কাইয়্যিম	---	পৃষ্ঠা ২১৫
৩৩৯	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ১৭
৩৪০	বুখারী	তাহাজ্জুদ নামায	১০৮৬
৩৪১	বুখারী	দু'য়াসমূহ	৫৮৬৯
৩৪২	বুখারী	তাহাজ্জুদ নামায	১০৮৭
	আবূ দাউদ	সলাত	১২৬২, ১২৬৩
	তিরমিযী	সলাত	৩৯৩
৩৪৩	বুখারী	নামাযের সময়	৫৬৪
৩৪৪	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ১৩
৩৪৫	নাসাঈ কুবরা	---	১০৫৯৭-১০৬০০
৩৪৬	মুসলিম	চুতুষ্পদ জন্তুর সুযোগ সুবিধার প্রতি খেয়াল ও রাস্তায় রাত্রি যাপন	৪৮০৭
	মিশকাত	সফরের আদব	৩৮৯৭
৩৪৭	মুসলিম	ছুটে যাওয়া নামায কাযা	১৫৯৭
৩৪৮	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৪৭
৩৪৯	মুসনাদে আহ্‌মদ	হাদীসু আবি উমামা	১৯৪৫৮, ২৩৬১৪
	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩৭২৫
৩৫০	আবূ দাউদ	নিদ্রা সম্পর্কীয়	৪৯৫৬
৩৫১	তিরমিযী	আদাব	২৭০৫
৩৫২	ইবনুল কাইয়িম	---	পৃষ্ঠা ২১৪
৩৫৩	বুখারী	পোশাক	৫৫৩৬
	মুসলিম	পোশাক ও সাজ-সজ্জা	৫৩২৮
	তিরমিযী	আদাব	২৭০২
৩৫৪	মুসলিম	পোশাক ও সাজ-সজ্জা	৫৩২৭
৩৫৫	তিরমিযী	আদাব	২৭০৭
৩৫৬	আবূ দাউদ	আদব	৪৭৪৬
	মুসতাদরাক	আদাব-শিষ্টাচার	৭৭১০
৩৫৭	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩৭২২
	মুসতাদরাক	আদব-শিষ্টাচার	৭৭১০
৩৫৮	আবূ নু'য়াইম	পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় ঘুম	১৫৬
৩৫৯	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৯০
৩৬০	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৮৯
৩৬১	বুখারী	পানীয়	৫২১৩
৩৬২	বুখারী	দু'য়াসমূহ	৫৮৭৫
৩৬৩	বুখারী	দু'য়াসমূহ	৫৮৬৬
৩৬৪	বুখারী	দু'য়াসমূহ	৫৮৬৮
	মুসলিম	যিকির-আযকার, দুয়া-কালাম, তাওবাহ ও ইস্তিগফার	৬৬৩৮
৩৬৫	বুখারী	দু'য়াসমূহ	৫৮৬৯
৩৬৬	বুখারী	দু'য়াসমূহ	৫৮৬৭, ৫৮৭৯
	আবূ দাউদ	নিদ্রা সম্পর্কিত	৪৯৬৫
৩৬৭	মুসলিম	যিকির-আযকার, দু'য়া-কালাম	

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
		তাওবাহ ও ইস্তিগফার	৬৬৪১
৩৬৮	বুখারী	দু'য়াসমূহ	৫৮৮০
৩৬৯	তিরমিযী	পবিত্রতা	২৪
		অধ্যায়-৯	
৩৭০	বুখারী	পোশাক	৫৪৯৭
৩৭১	মুসলিম	শালীনতা	৫৬৮৯
৩৭২	আবু দাউদ	চিরুণি করা	৪১২৪
	নাসাঈ	সাজ-সজ্জা	৫২৫৮
৩৭৩	বুখারী	পোশাক	৫৪৯৮
৩৭৪	বুখারী	জুম'আ	৮৩২
৩৭৫	বুখারী	জুম'আ	৮২৯
৩৭৬	আবূ দাউদ	সুগন্ধির পছন্দনীয়তা	৪১৬২
	শামায়েলে তিরমিযী	রসূল (স.) এর সুগন্ধি	২১৫
৩৭৭	মুসনাদে আহ্মদ	মু. আনাস ইবনে মালিক (রা)	১২২৯৩ ১২২৯৪
	নাসাঈ	মহিলার সাথে ব্যবহার	৩৯৪১, ৩৯৪২
৩৭৮	বুখারী	নবী কাহিনী	অনুচ্ছেদ-২
	ইবনুল কাইয়িম	----	পৃষ্ঠা ২৪৬
	আস-সুয়ূতী	----	পৃষ্ঠা ২০
৩৭৯	আস-সুয়ুতী	----	পৃষ্ঠা ২০
৩৮০	বুখারী	নামায	৩৩৬
		নবী কাহিনী	৩০৯৮
	মৃসলিম	ঈমান	৩১২
৩৮১	নাসাঈ	সাজ-সজ্জা	৫১১৫
৩৮২	মুসলিম	শাসন-প্রশাসন	৪৭১০
৩৮৩	বুখারী	যবেহ ও শিকার	৫১২৬, ২৩১
		উযু	২৩১
	মুসলিম	শাসন-প্রশাসন	৪৭১১
৩৮৪	বুখারী	হুজুর (সা) তাঁর সাহাবীগনের মার্যাদা	৩২৯৭
	মুসলিম	মর্যাদা ও গুণাবলীসমূহ	৫৮৪৭
৩৮৫ *	মুসনাদে আবি ইয়ালা আল মাওছিলী	মুসনাদে আনাস (রা)	৩১২৫ যয়ীফ
৩৮৬	বুখারী	অনুমতি লওয়া	৫৮৩৯
	মুসলিম	মর্যাদা ও গুণাবলী	৫৮৪৯-৫৮৫১
৩৮৭	বুখারী	হুযুর (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের মর্যাদা	৩২৮৯
৩৮৮	মুসলিম	শালিনতা	৫৬৮৮
	নাসাঈ	সাজ-সজ্জা	৫১১৮
৩৮৯	বুখারী	হজ্জ	১৪৩৮
	মুসলিম	হজ্জ	২৭১০
৩৯০	বুখারী	পোশাক	৫৪৯৬
		রোযার মাহাত্ম	১৭৬০
৩৯১	তিরমিযী	আদাব	২৭২৪
	নাসাঈ	সাজ সজ্জা, নরনারীর সুগন্ধির পার্থক্য	৫১১৬, ৫১১৭
৩৯৩	নাসাঈ	সাজসজ্জা ও মহিলাদের সুগন্ধি ব্যবহার করে বাহিরে যাওয়া	৫১২৭
৩৯৪	নাসাঈ	---	৫১২৮
৩৯৫	নাসাঈ	---	৫১২৯
৩৯৬	নাসাঈ	---	৫১৩০
৩৯৭	নাসাঈ	---	৫১৩১
৩৯৮	নাসাঈ	---	৫১৩২
৩৯৯	নাসাঈ	---	৫১৩৩
৪০০	নাসাঈ	সাজসজ্জা	২১২৫
৪০১	বুখারী	যুদ্ধ বিগ্রহ	৪০১৬
	মুসলিম	পানি ও সাগরের মৃত হালাল	৪৮৪৫
	আবু দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৭৯৭
৪০২	মুসলিম	শালিনতা	৫৬৯০
৪০৩	বুখারী	পোশাক	৫৪৯৮
		রোযা	১৭৫৯
		অধ্যায়-১০	
৪০৪	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৫০৪৯
	মুসলিম	নামায	১১৩৪, ১১৩৬
৪০৫	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৫০৪৮
৪০৬	তিরমিযী	কিয়ামাহ মর্ম স্পর্শী বিষয়	২৩৫৮
৪০৭	বুখারী	যাকাত	১৩৮২
	মুসলিম	বিচার-ব্যবস্থা	৪৩৩৯
৪০৮ *	তিরমিযী	দু'য়াসমূহ	৩৪৪৪
	ইবনে মাজাহ	ক্ষমা ও সুস্থতার দু'য়া	৩৮৪৮ যয়ীফ
৪০৯	ইবনে মাজাহ	ক্ষমা ও সুস্থতার দু'য়া	৩৮৪৯
৪১০	তিরমিযী	দু'য়াসমূহ	৩৪৪৬
৪১১	তিরমিযী	দু'য়াসমূহ	৩৪৪৪
৪১২	তিরমিযী	দু'য়ার উত্তমতা	৩৪৭৮
৪১৩	তিরমিযী	পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি অনাসক্তি	২২৮৮
৪১৪	বুখারী	আদব-আখলাক	৫৫৮৪
৪১৫	বুখারী	যবেহ ও শিকার	৫১২৭, ১৯৫৬
	মুসলিম	সদাচার, সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক	৬৪৫৫
৪১৬	বুখারী	আদব-আখলাক	৫৬৭৪
	মুসলিম	সদাচার, সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক	৬৪০৫

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
		অধ্যায়-১১	
৪১৭	আবু দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৩০
	মু'জামুল কাবীর	---	৬৪৯, ২০৬৭০
৪১৮	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৩২
৪১৯	মু'জামুল কাবীর	মুসনাদে উম্মে সালমা	৭৪৯ (১৯৭০১)
			হাসান লিগয়রিহী
	মুসান্নাফে ইবনে		
	আবি শায়বাহ		২৩৯৫৮
৪২০	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৭৮
	মুসলিম	বিদ্রোহীদের বিধান	৪২০৯
৪২১ *	আবূ নূ'য়াইম	হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা	৫৩, যয়ীফ
	আস-সুয়ুতী	---	৫৩
৪২২	যাদুল মা'আদ	---	৪/১৫৬, ৪/১৪৩
	মুসান্নাফে ইবনে		
	আবী শায়বাহ	মদ দ্বারা চিকিৎসা	২৩৯৬৪
	আবূ নূ'য়াইম	হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা	৫৬
৪২৩	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৪৯৭৯
	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৩৪
	তিরমিযী	চিকিৎসা	১৯৯৬
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫০০
৪২৪	বুখারী	পানীয়	৫১৯১
৪২৫	মু'জামুল কাবীর	---	১১৩৭২
	জামে সগীর	২/১৬৮	৪১৪২
৪২৬	আবূ দাউদ	নেশাদ্রব্য থেকে নিষেধাজ্ঞা	৩৬৩৯
৪২৭	বুখারী	পানীয়	৫১৭৬, ৫১৭৭
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৫০, ৫০৫১, ৫০৫৩
৪২৮	বুখারী	পানীয়	৫১৭৬
৪২৯	বুখারী	পানীয়	৫১৬৯, ৫১৭৫
	মুসলিম	শরাব হারাম	
		হওয়ার বিধান	৭২৭৯, ৭২৮০
৪৩০	মুসনাদে আহমাদ	মু. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)	১৪৭০৩
	আবূ দাউদ	পানীয়	৩৬৪০, ৩৬৪৬
	তিরমিযী	পানীয় ও পানপাত্র	১৮১৪
৪৩১	আবূ দাউদ	পানীয়	৩৬৩৯
	তিরমিযী	পানীয় ও পানপাত্র	১৮১৫
৪৩২	আবূ দাউদ	পানীয়	৩৬৪৬
৪৩৩	আবূ দাউদ	পানীয়	৩৬৪৫
৪৩৪	ইবনে মাজাহ	পানীয় ও পানপাত্র	৩৩৮১
৪৩৫	ইবনে মাজাহ	পানীয় ও পানপাত্র	৩৩৮০
৪৩৬	আবূ দাউদ	পানীয়	৩৬৩৯
	তিরমিযী	পানীয়	১৮১১
	ইবনে মাজাহ	পানীয় ও পানপাত্র	৩৩৭৭
৪৩৭	মুসলিম	গুনাহের কারণে	১০৮
		ঈমানের ক্ষতি	
	ইবনে মাজাহ	গনিমত লুণ্ঠন	৩৯৩৬
	নাসাঈ	চোরের হাত কাটা	৪৮৭০
৪৩৮	ইবনে মাজাহ	পানীয় ও পানপাত্র	৩৩৭৬
৪৩৯	নযর আহমদ	---	পৃষ্ঠা ৭১
৪৪০	নযর আহমদ	---	পৃষ্ঠা ৭১
৪৪১	ইবনে মাজাহ	পানীয় ও পানপাত্র	৩৪৫৯
৪৪২	আবূ দাউদ	গর্হিত ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা	৩৮৩২
৪৪৩	মুসনাদে আহ্‌মাদ	হাদীসু আব্দুর রহমান	
		ইবনে উসমান (রা)	১৫৭৫৭
	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৩১
	নাসাঈ	শিকার যবেহকৃত জন্তু	৪৩৫৬
	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৮২৬১
৪৪৪	আস-সুয়ুতী	-	পৃষ্ঠা ৭৫
৪৪৫	আস-সুয়ুতী	-	পৃষ্ঠা ১৪৪
৪৪৬	আবূ দাউদ	চিকিৎসা (অপছন্দনীয় ওষুধ)	৩৮৭০
৪৪৭	মুসলিম	শিকার	৪৮৭২, ৪৮৭৩
	আবূ দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৭৫১, ৩৭৫২
৪৪৮	বুখারী	যবেহ ও শিকার	৫১২৯
৪৪৯	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১৪৩
৪৫০	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১৪২
৪৫১	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১৪২
৪৫২	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৩৪
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫০০
৪৫৩	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৬০, ৫০৬১
	আবূ দাউদ	পানীয়	৩৬৭১
৪৫৪	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৪৯৮৩, ৪৯৮৪
৪৫৫	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৪৯৮৭
৪৫৬	বুখারী	পানীয়দ্রব্য	৫১৯৫
৪৫৭	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৪৯৯৩
৪৫৮	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৪৯৯১
৪৫৯	মুসনাদে আহমাদ	---	১৭১৮৬
	তিরমিযী	পার্থিব ভোগবিলাসের	
		প্রতি অনাসক্তি	২৩২১
	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩৩৪৯
	নাসাঈ কুবরা	যে পরিমান খাওয়া মুস্তাহাব	৬৭৬৮, ৬৭৬৯
		অধ্যায়-১২	
৪৬০	বুখারী	চিকিৎসা	৫৩১৫
	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৬২
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫২৯
৪৬১	মুসলিম	সালাম	৫৫২৮, ৫৫৩০
৪৬২	নাসাঈ	আশ্রয় গ্রহণ করা	৫৪৯২
৪৬৩	বুখারী	মর্মস্পর্শী হাদীস	৬০৯০
	মুসলিম	ঈমান	৪২০

হাদীস ও তিব্বুন নববী গ্রন্থপঞ্জী (References to Hadith & Citations)

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৪৬৪	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০০৬
৪৬৫	আবূ দাউদ	আংটির বিবরণ	৪১৭৪
	মুসতাদরাক	পোশাক-পরিচ্ছদ	৭৪১৮
৪৬৬	মুসলিম	সালাম	৫৫৪৬
৪৬৭	মুসলিম	সালাম	৫৫৪৫
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫১৫
৪৬৮	মুসলিম	সালাম	৫৫৪১
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫১৯
৪৬৯	মুসলিম	সালাম	৫৫৩১, ৫৫৩২
	মুসনাদে আহ্‌মাদ	মু. আয়েশা (রা)	২৪০১৮
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫১৭
৪৭০	মুসলিম	সালাম	৫৫৩৭
	মুসনাদে আহ্‌মাদ	মু. আনাস (রা)	১২১৭৩
	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০০৭, ২০০৮
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫১৬
৪৭১	মুসলিম	সালাম	৫৫৩৮
৪৭২	মুসনাদে আহ্‌মাদ	হাদীসু হাফসা উম্মুল মুমিনীন (রা)	২৬৪৫০
৪৭৩	মুসনাদে আহমাদ	হাদীসু শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ	২৭০৯৫
	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৪৭
৪৭৪	মু'জামুল আওসাত	মুহাম্মদ রাবী	৬০৪০ (৫৮৮৯)
	মু'জামুস সগীর	---	পৃষ্ঠা ৮০৩
	মুসানাফে ইবনে আবি শায়বাহ	---	২৪০১৯
৪৭৫	বুখারী	নবী কাহিনী	৩১২৪
	মুসনাদে আহ্‌মাদ	মু. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)	২৪৩৪
	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০১২
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫২৫
৪৭৬	মুসলিম	সালাম	৫৫৫১
	মুসনাদে আহমাদ	মু. ওসমান ইবনে আবিল আস (রা)	১৬২৬৮
৪৭৭	মুয়াত্তা	অসুস্থতায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা ২/২৬০ (৯৮)	১৭৫৪, ৩৪৭০
	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০৩০
৪৭৮	মুসনাদে আহ্‌মাদ	হাদীসু আলী ইবনে শায়বান (রা)	১৬২৯৮, ১৬৩৪১
৪৭৯	মুসলিম	সালাম	৫৫১৪
	তিরমিযী	জানাযা	৯১৪
৪৮০	মুসনাদে আহ্‌মদ	হাদীসু ওবায়দা বিন সামিত (রা)	২২৮১১
৪৮১	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫৩২২
৪৮২	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫৩২৪
৪৮৩	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫৩১৬, ৫৩২৯
৪৮৪	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫৩২০
৪৮৫	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০৩৩
৪৮৬	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫৮৯৯
৪৮৭	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৪৫৮
৪৮৮	মুসনাদে আহমাদ	হাদীসু আবী বাকারাহ	২০৪৩০
৪৮৯	মুসলিম	যিকির-আযকার দু'য়া-কালাম, তাওবাহ ও ইস্তিগফার	৬৬৩৪
৪৯০	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৪৭
৪৯১	তিরমিযী	দূয়া	৩৮৯৩
৪৯২	মুসলিম	সালাম, জ্যোতিষী ও জ্যোতিষের নিকট যাতায়াত	৫৬২৯
৪৯৩	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৩৬
৪৯৪	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৩৮
৪৯৫	আবূ দাউদ	ভাগ্য গণনা ও ফাল দেখা	৩৮৬৭
৪৯৬	আবূ দাউদ	ভাগ্য গণনা ও ফাল দেখা	৩৮৬৯
৪৯৭	মুসলিম	সালাম	৫৬১২, ৫৬১৩, ৫৬১৫, ৫৬১৭
	আবূ দাউদ	ভাগ্য গণনা ও ফাল দেখা	৩৮৮১
৪৯৮	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৩১
৪৯৯	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৩০
৫০০	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৪৩
৫০১	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৩০
৫০২	আবূ দাউদ	---	৩৮৮৯
	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৪৫৫
	নাসাঈ	---	১০৬০১, ১০৬০২
	আল-মুসান্নাফ	---	২৪০১৩
৫০৩	আল-মুসান্নাফ	---	২৪০০৯
৫০৪	আল-মুসান্নাফ	---	২৪০১০
৫০৫	আল-মুসান্নাফ	---	২৪০১১
৫০৬	আবূ দাউদ	নুশরাহ	৩৮২৮
৫০৭	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ১৭২
৫০৮	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৪৩
৫০৯	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ১৩৩
৫১০	বুখারী	তাফসীর সূরা ফাতিহা	৪১১৬
৫১১	বুখারী	চিকিৎসা	৫৩১৬
	মুসলিম	সালাম	৫৫৪৯
৫১২	শু'আবুল ঈমান	সূরা ফাতেহার আলোচনা	২৩৬৭
৫১৩ *	শু'আবুল ঈমান	কুরআনের মর্যাদা দান	২৩৬৮ শাদীদ যয়ীফ
৫১৪	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫৩১৭
৫১৫	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫৩২১

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৫১৬	মুসনাদে আহমাদ	হাদীসু খারিজা ইবনিস্ সালত্	২১৮৩৬
	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৬০
৫১৭	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮১৩
৫১৮	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৪৯
৫১৯	ইবনুল কাইয়িম	---	পৃষ্ঠা ১৬১
৫২০	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮২০
		অধ্যায়-১৩	
৫২১	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৫২
৫২২	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৭২, ৫২৮৮ ৫২৯০
	মুসলিম	সালাম	৫৫৫৭
৫২৩	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৬৯, ৫২৭০
৫২৪ *	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৫০, যয়ীফ
	মু'জামুল আওসাত		৪০৮, যয়ীফ
৫২৫	বুখারী	পানীয়	৫২৭১
৫২৬	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৮০-৮১
৫২৭	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৮০
৫২৮	ইবনে মাজাহ	কলহ-বিপর্যয়	৪০১৯
৫২৯	ইবনে মাজাহ	কলহ-বিপর্যয়	৪০০৯
		অধ্যায়-১৪	
৫৩০	মুসনাদে আহ্মাদ	মুসনাদে আয়শা (রা)	২৪১০০
	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৮৪৪
৫৩১	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৮৪৫
৫৩২	বুখারী	পানীয়	৫২০২
	ইবনে মাজাহ	পানীয় ও পানপাত্র	৩৪৩২
৫৩৩	ইবনে মাজাহ	কূপ বা জলাশয়	৫২১
৫৩৪	আবূ দাউদ	বৃষ্টিবর্ষন	৫০১২
৫৩৫	বুখারী	দাওয়াত	৩৯
৫৩৬	মুয়াত্তা	পবিত্রতা	৬০
	আবূ দাউদ	পবিত্রতা	৮৩
	তিরমিযী	পবিত্রতা	৬৮
৫৩৭	মুসলিম	ফাযায়েলে আবু যর (রা)	৬১৩৭
৫৩৮	মু'জামুল কাবীর	হাদীসু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)	১১১৬৭
৫৩৯	মুসনাদে বায্যার	হাদীসু আবূ যর গিফারী	৩৯২৯
	মু'জামুল আওসাত	যমযমের পানি	৮১২৯
৫৪০	ইবনে মাজাহ	হজ্জ	৩০৬২
৫৪১	ইবনে মাজাহ	হজ্জ	৩০৬১
৫৪২	মু'জামুল কাবীর	হাদীসু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)	১১১৬৭
	মু'জামুল আওসাত	রাবী আলী	৮১২৯
৫৪৩	মু'জামুল কাবীর	হাদীসু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)	১০৬৩৭
	মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক	যমযম	৯১২০
৫৪৪ *	সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী	যমযম পানি নিয়ে বাহিরে যাওয়ার অনুমতি ৫/২০২	৯৭৬৮, ৯২৫৯
	শু'আবুল ঈমান	হজ্ব ও উমরার ফযীলত	৪১২৯, যয়ীফ
৫৪৫	যাদুল মা'আদ	নবী (সা) মুখ নি:সৃত ওষুধ-পথ্য, পানি	৪/৩৬০-৩৬১
	শু'আবুল ঈমান	হজ্ব ও উমরার ফযীলত	৪১২৮
	ইবনুল কাইয়িম	---	পৃষ্ঠা ৩৪১
		অধ্যায়-১৫	
৫৪৬	মুসলিম	বিবাহ-শাদী	৩৪৩২
	মুসনাদে আহ্মাদ	হাদীসু যুদামা বিনতে ওয়াহাব (রা)	২৭০৩৪
	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৪২
	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০২৬
	ইবনে মাজাহ	নিকাহ	২০১১
৫৪৭	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৪১
	তিরমিযী	---	২০২৭
৫৪৮	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৪১
	ইবনে মাজাহ	নিকাহ	২০১২
৫৪৯	শু'আবুল ঈমান	খাদ্য ও পানীয় (গোশত ভক্ষণ)	৫৯৫৬
	সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী	নবী (স.) এর ওষুধ-পথ্যাদি	২০০৫৬
৫৫০	নাসাঈ কুবরা	গরুর দুধ দ্বারা চিকিৎসা	৭৫৬৭
	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৯৫
৫৫১	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৯৪
৫৫২	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৯৪
৫৫৩	বুখারী	পানীয়	৫১৬৭
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৭২
৫৫৪	বুখারী	পানীয়, উযূ	৫১৯৯,২০৮
	মুসলিম	উযূ	৩৫৮
৫৫৫	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৯৪
৫৫৬	আবূ দাউদ	পানীয়	৩৬৮৮
	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৩৮৯
৫৫৭	বুখারী	পানীয়	৫১৯৮
৫৫৮	কানজুল উম্মাল	৭খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪০	১৯১৬৮
৫৫৯	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৭৪
		অধ্যায়-১৬	
৫৬০	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৭৫
৫৬১	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৩০২৪, ৩০২৫ ৫৩০৬, ৫৩০৫
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৭৩

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৫৬২	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৩০২৬, ৫৩০৩
৫৬৩	বুখারী	সৃষ্টির সূচনা	৩০২৩
৫৬৪	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৭৪৩৮
	আবু নু'য়াইম	পানি দ্বারা ঠান্ডা করা	৬০১
	মু'জামুল আওসাত	মুসনাদে মুহাম্মদ	৫১৭৪
	মুসনাদে আবি ইয়ালা	হুমাইদ আত ত্বভীল	৩৭৮২, ৩৭৯৪
৫৬৫	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৭৪
৫৬৬	বুখারী	চিকিৎসা	৫৩০৪
	মুসলিম	সালাম	৫৫৭১
৫৬৭	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০৩৪
৫৬৮	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০৩৪
৫৬৯	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১৪৫
৫৭০	বুখারী	চিকিৎসা	৫২৯৬
৫৭১	বুখারী	পানীয়দ্রব্য	৫২৫৬
৫৭২	বুখারী	পানীয়দ্রব্য	৫২৩৪
৫৭৩	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা, জ্বর	৩৪৭০
৫৭৪	মুসনাদে আহ্মদ	মুসনাদে আয়েশা (রা)	২৪৫০০
	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৮২৪৫
৫৭৫	তিরমিযী	চিকিৎসা	১৯৮৯
৫৭৬	বুখারী	চিকিৎসা	৫২৭৮
৫৭৭	বুখারী	চিকিৎসা	৫২৭৯
৫৭৮	তিরমিযী	চিকিৎসা	১৯৮৯
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৪৫
৫৭৯	বুখারী	খাওয়া	৫০১৪
	মুসলিম	সালাম	৫৫৮০
৫৮০	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৪০
৫৮১	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৪১
৫৮২	ইবনুল কাইয়্যিম	---	পৃষ্ঠা ৩৩৭
৫৮৩	আবু নু'য়াইম	চিকিৎসা, লুবান	৬৪৭
	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ৯১
	কানযুল উম্মাল	প্রাণী, উদ্ভিদ ও পর্বতের ফযীলত, লুবান	৩৮৩১৮
৫৮৪	আবু নু'য়াইম	চিকিৎসা, লুবান	৬৪৭
	ইবনুল কাইয়্যিম	---	পৃষ্ঠা ৩৩৭
	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ৯১, ৯২
৫৮৫	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫৩২
৫৮৬	শু'আবুল ঈমান	উৎকৃষ্ট হালাল খাওয়ার দাওয়াত (খাদ্য ও পানীয়দ্রব্য)	৬০৮১
৫৮৭	ইবনুল কাইয়িম	---	পৃষ্ঠা ৩৩৭
	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৭৩
৫৮৮ *	আবূ নূ'য়াইম	ওষুধ বস্তুসমূহের গুণাগুণ	৬৪৯, যয়ীফ
	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৯২, যয়ীফ
৫৮৯	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৭৩
	মুসলিম	সালাম	৫৫৮১
	মুসনাদে আহ্মাদ	মু. আবু সাঈদ খুদরী (রা)	১১১৪৬, ১১১৪৭
	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০৩২
৫৯০	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৭৫
	মুসলিম	শক্র-শূন্য ও মুরতাদদের বিচার	৪২০৮
	তিরমিযী	চিকিৎসা	১৯৯২
৫৯১	নাসাঈ	হত্যা অবৈধ হওয়া	৪০৩৬
৫৯২	যাদুল মা'আদ	ফোঁড়া রোগের চিকিৎসা	৪/৯১
	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৭৭
৫৯৩	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৭৪৩৩
৫৯৪	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৭৫
৫৯৫	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৮৪
৫৯৬	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৮৮, ৫২৭২
৫৯৭	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৬৯, ৫২৭০
৫৯৮	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৭৪৭০
৫৯৯	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৮৪
৬০০	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৮৭
	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৭৪৮১
৬০১	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৮৬
৬০২	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৭৭
৬০৩	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০০৩
৬০৪	ইবনে মাজাহ	রক্তমোক্ষন	৩৪৭৯
৬০৫	নাসাঈ	হজ্জের বিধি-বিধানসমূহ	২৮৫১
৬০৬	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮২০
	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০০২
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৮৩
৬০৭	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮২৪
৬০৮	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৮৫
৬০৯	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৮৭
	নাসাঈ	হজ্জের বিধি-বিধানসমূহ	২৮৫২
৬১০	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৮৬
	মুসলিম	হজ্জ	২৭৫৫
৬১১	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৮২
৬১২	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৭৪৮৩
৬১৩	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৭৮
৬১৪ *	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৭৪৮১, ৭৪৭৯
৬১৫	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৮৫
৬১৬	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৮১, ৫২৯৫
৬১৭	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৯৫
	মুসলিম	সালাম	৫৫৭৬
৬১৮	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৮৪
৬১৯	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৬২
৬২০	মুসনাদে আহ্মদ	মু. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)	১৪৩৮৫
	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৮২৪১
৬২১	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৮২৩৯

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৬২২	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৬২
৬২৩	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৯৪
	মুসলিম	সালাম	৫৫৭৫
৬২৪	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০২৯
	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৭৪৪৩
৬২৫	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০২৮
৬২৬	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৬৭
৬২৭	তিরমিযী	যয়তুন খাওয়া	১৮০০
৬২৮	তিরমিযী	যয়তুন খাওয়া	১৭৯৯
৬২৯	মুসনাদে আহ্মদ	হাদীসু উম্মে কায়স বিনতে মিহসান	২৬৯৯৭, ২৭০০০
৬৩০	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৬৮, ৩৪৬২
৬৩১	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫৩০২
	মুসলিম	ওহুদ যুদ্ধ	৪৪৯২
৬৩২	বুখারী	উযু	২৩৬, ২৭৫৪
৬৩৩	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৬৫
৬৩৪	শু'আবুল ঈমান	কুরআন দ্বারা চিকিৎসা	২৫৭৫
	মিশকাত	চিকিৎসা মু. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)	৪৫৬৭
৬৩৫	মুসনাদে আহ্মাদ	কতিপয় সাহাবীদের হাদীস	২৩১৪১
	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৭৪৬৩
৬৩৬	বুখারী	পোশাক	৫৪৯৮
	মুসলিম	হজ্জ	২৬৯৭
৬৩৭ *	মুসনাদে আবি ই'য়ালা	মুসনাদে আলী (রা)	৪৫৪
	মাজমাউয্ যাওয়াইদ	ফোঁড়াকাটা	৮৩৭৬, যয়ীফ
৬৩৮	যাদুল মা'আদ	ফোঁড়ার চিকিৎসা	৪/৯১
৬৩৯	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৬৩
৬৪০	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৭৪৫৯
৬৪১	ইবনুল কাইয়্যিম		পৃষ্ঠা ৭৫
৬৪২	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১৫১
৬৪৩ *	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৭৪৬১
	আবূ নূ'য়াইম	নিতম্বের বেদনা	৪৯৪, ৪৯৫, যয়ীফ
	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ৩৮
৬৪৪	মুসনাদে আহমাদ	হাদীসু আবি রিমসা আত-তামিনী	১৭৪৯২
৬৪৫	আবূ দাউদ	চিরুণি করা	৪১৫৯
৬৪৬	বুখারী	পোশাক	৫৪১৩,
	মুসলিম	পোশাক ও সাজ-সজ্জা	৫২৫৭, ৫২৫৯
৬৪৭	বুখারী	পোশাক-পরিচ্ছেদ, পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান	৫৪০৫
৬৪৮	বুখারী	পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড়	৫৪০৬
৬৪৯	বুখারী	পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড়	৫৪০৭, ৫৪০৮
৬৫০	মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ	---	২৪১৯২
	কানযুল উম্মাল	---	২৮২৪২
	ইবনুল কাইয়িম	---	পৃষ্ঠা ১০৩
	হাদীসটি মুরসাল, তবে বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।		
৬৫১	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৩৯
৬৫২	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৩৫
৬৫৩	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৫০৪২
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৬৭, ৫১৬৮
৬৫৪	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৩৬
৬৫৫	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৫৫
	নাসাঈ কুবরা	---	৬৭১৯
৬৫৬ *	মু'জামুল আওসাত	---	৭৪০৪, যয়ীফ
	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৭৪৫১
	আবূ নূ'য়াইম	ফলের শক্তি, উৎকৃষ্ট জাতের খেজুর বরনি	৮২২
৬৫৭	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৫৪
	মুসলিম	হজ্জ	২৭৪৬
			২৭৪৯, ২৭৫০
	মুসনাদে আহ্মাদ	হাদীসু কা'ব ইবনে উজরাহ (রা)	১৮১০৭
৬৫৮	বুখারী	চিকিৎসা	৫২৮৯
	মুসলিম	হজ্জ	২৭৫০, ২৭৫১
৬৫৯	মুসলিম	হজ্জ	২৭৪৮
৬৬০	মুসলিম	হজ্জ	২৭৪৮
৬৬১	বুখারী	চিকিৎসা	৫২৯৩
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৭২
৬৬২	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৭৪, ৫১৭৬
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৫৪
৬৬৩	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৭৫
৬৬৪	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৭৭
৬৬৫	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ৮৮
৬৬৬	কানযুল উম্মাল	---	২৮৩১১
	আবূ নূ'য়াইম	চক্ষুরোগের চিকিৎসা	২৫৮
৬৬৭	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০২০
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৫৫
৬৬৮	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৫৩
৬৬৯	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০১৮
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৫৩
৬৭০	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৫৪
৬৭১	ইবনে মাজাহ	দু'মুখো সাপ নিধন	৩৫৩৪, ৩৫৩৫
৬৭২	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০২০
	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ৯১
৬৭৩	ইবনুল কাইয়িম (ড. জনসষ্টোন অনূদিত)	---	পৃষ্ঠা ৮০
	আস-সুয়ুতী	---	পৃষ্ঠা ১২৯
৬৭৪	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৯৫
	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৭৪৬২

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৬৭৫	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৩৮
	তিরমিযী	সুরমা	১৯৯৮
৬৭৬	তিরমিযী	সুরমা	১৮৫১, ১৮৫২
	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৩৫
৬৭৭	তিরমিযী	চিকিৎসা	১৭০১
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৯৭, ৩৪৯৯
৬৭৮	আবূ দাউদ	সুরমা ব্যবহার	৩৮৩৮
৬৭৯	আবূ দাউদ	পবিত্রতা	৩৫
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৯৮
৬৮০	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৯৬
৬৮১	আবূ দাউদ	রোযা	২৩৭০
৬৮২	আবূ দাউদ	রোযা	২৩৭১
৬৮৩	মুসনাদে আহমদ	মু. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)	১৬০৭২
	তিরমিযী	চিকিৎসা	১৯৯৮, ১৯৯৭
৬৮৪	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮২৭
		অধ্যায়-১৭	
৬৮৫	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৭৭
	মুসলিম	সালাম	৫৫৭৯
	মুসনাদে আহমাদ	মু. আবূ হুরায়রা (রা)	৭৫৫৭, ৯৪৬৭ ১০০৪৮
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৪৭
৬৮৬	মুসলিম	সালাম	৫৫৭৮
	মুসনাদে আহমাদ	মু. আবূ হুরায়রা (রা)	১০০৪৯, ৭২৮৭
৬৮৭	তিরমিযী	চিকিৎসা, কালিজিরা	১৯৯১
৬৮৮	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫২৭৬
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৪৯
৬৮৯	মুসনাদে আহমাদ	মু. আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা)	২২৯৩৮
৬৯০ *	মু'জামুল আওসাত	---	১০৯/২০৯, মওযূ
৬৯১	মু'জামুল আওসাত	---	১০৯, শাদীদ যয়ীফ
৬৯২	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যগ্রহণ	৫০৪৪
	মুসলিম	কিয়ামত, বেহেশত ও দোযখ	৬৮৪১, ৬৮৪৪
৬৯৩	বুখারী	তাজা-পাকা শুকনো খেজুর	৫০৪১
৬৯৪	আস-সুয়ূতী	---	---
৬৯৫	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫০৬০, ৫০৬১
৬৯৬	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যগ্রহণ	৫০৪২
৬৯৭	মুসলিম	পানাহারের শিষ্টাচার ও রীতিনীতি	৫১৭০
৬৯৮	মুসলিম	পানাহারের শিষ্টাচার ও রীতিনীতি	৫১৬৫, ৫১৬৬
৬৯৯	তিরমিযী	ইফতার করানো	৬৪৬
	নাসাঈ কুবরা	উত্তম ইফতার	৩৩১৭
৭০০	আবূ দাউদ	মোটা হওয়া	৩৮৬৩
	ইবনে মাজাহ	আহার ও তার শিষ্টাচার	৩৩২৪
	নাসাঈ কুবরা	----	৬৭২৫
৭০১	বুখারী	আকীক্বাহ	৫০৬২
	মুসলিম	পানাহারের শিষ্টাচার ও রীতিনীতি	৫৪৩২
৭০২	মুসলিম	পানাহারের শিষ্টাচার ও রীতিনীতি	৫৪৩৬, ৫৪৩৭
৭০৩	মুসলিম	পানাহারের শিষ্টাচার ও রীতিনীতি	৫৪২৯, ৫৪৩০
৭০৪	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৪৬
৭০৫	মুয়াত্তা	স্বামীর মৃত্যুতে সাজ-সজ্জা পরিহার করা ১/৪০৪ (৯৩)	১২৭৫
	আবূ দাউদ	তালাক	২২৯৯
৭০৬	মুসলিম	ইহরাম বাধা ব্যক্তির চিকিৎসা	২৭৫৬
৭০৭	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৭৩
৭০৮	তিরমিযী	চিকিৎসা	১৯৯৯, ২০০০
৭০৯	মুসলিম	ইহরাম বাধা ব্যক্তির চিকিৎসা	২৭৫৭
৭১০ *	আবূ নু'য়াইম	ছুফ্ফা দ্বারা চিকিৎসা	৬৪০ যয়ীফ
৭১১	ইবনুল কাইয়িম	---	পৃষ্ঠা ২১৭
	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৫১
৭১২ *	জামে সগীর	৩/২৬	৬৩৯৩
	আবূ নু'য়াইম	ফুলে যাওয়া রোগ	৪৬৮, ৪৬৭, যয়ীফ
৭১৩	জামে সগীর	৩/২৯১	৬৩৯৩
	আবূ নু'য়াইম	গীটবাত	৪৬৭ হাসান লিগাইরিহী
৭১৪	শু'আবুল ঈমান	গোসত খাওয়া	৫৯০৪
৭১৫	ইবনুল কাইয়িম (ড. জনসটোন অনুদিত)	---	পৃষ্ঠা ২৪৮
৭১৬	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৫৬
৭১৭ *	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮১৪ যয়ীফ
৭১৮	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা, মেহেদী	৩৫০২
	আস সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৫৫
৭১৯	তিরমিযী	চিকিৎসা	২০০৫
৭২০ *	নাসাঈ	খিযাব	৫০৭৮-৫০৮২
	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৫৬
৭২১ *	নাসাঈ	খিযাব	৫০৭৮-৫০৮২
	আবূ নু'য়াইম	যৌনশক্তি বৃদ্ধি	৪৫০, ৪৫১
	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৫৬
৭২২	মুসনাদে আহমাদ	হাদীসু আবূ যার আল গিফারি (রা)	২১৩৩৭
	ইবনে মাজাহ	পোশাক, মেহেদি	৩৬২২

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
	নাসাঈ	সাজ-সজ্জা	৫৯৭৮, ৫৯৭৯
৭২৩ *	আবূ নু'য়াইম	যৌনশক্তি বৃদ্ধি	৪৫১
	মুসনাদে বাযযার	মু. আবী হামযাহ	৭৩৩০, শাদীদ যয়ীফ
	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৫৬
৭২৪	তিরমিযী	বিবাহ	১০১৮
	ইবনুল কাইয়িম (ড. জনষ্টোন অনূদিত)	---	পৃষ্ঠা ১৮৩
৭২৫	বুখারী	পোশাক-পরিচ্ছদ	৫৪৬৯
৭২৬	বুখারী	পোশাক-পরিচ্ছদ	৫৪৬৯
৭২৭	তিরমিযী	রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিযাব	৪৭
৭২৮	আবূ দাউদ	চিরুনি করা	৪১৫৭
	তিরমিযী	পোশাক-পরিচ্ছদ	১৬৯৭
	ইবনে মাজাহ	পোশাক-পরিচ্ছদ	৩৬২২
	নাসাঈ	সাজ-সজ্জা	৫০৭৬- ৫০৭৯
৭২৯	আবূ দাউদ	খিযাব	৪১৬৬
	নাসাঈ	সাজ-সজ্জা	৫০৮৮
৭৩০	আবূ দাউদ	চিরুণি করা	৪১৬৩
	ইবনে মাজাহ	পোশাক পরিচ্ছদ	৩৬২৭
৭৩১	আবূ দাউদ	চিরুণি করা	৪১৩১
৭৩২	আবূ দাউদ	চিরুণি করা	৪১৩২
৭৩৩	মুসলিম	পোশাক পরিচ্ছদ	৫৩৩২, ৫৩৩৩
	ইবনে মাজাহ	পোশাক-পরিচ্ছদ	৩৬২৪
৭৩৪	আবূ দাউদ	চিরুণি করা	৪১৬৪
৭৩৫	তিরমিযী	শিষ্টাচার	৩৭২১
৭৩৬	বুখারী	নবী কাহিনী, বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ	৫৪৭০
	মুসলিম	পোশাক পরিচ্ছদ	৫৩৩৪
	আবূ দাউদ	খিযাব	৪১৫৫
	ইবনে মাজাহ	পোশাক-পরিচ্ছদ	৩৬২১
৭৩৭	ইবনে মাজাহ	পোশাক পরিচ্ছদ	৩৬২৫
৭৩৮	মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ	---	২৫৫২০
৭৩৯	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৫৭
৭৪০	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৫৭
৭৪১	তিরমিযী	সানা দ্বারা চিকিৎসা	২০৩১
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা, রক্ত মোক্ষনের স্থান	৩৪৬১
৭৪২	নাসাঈ কুবরা	সানা দ্বারা চিকিৎসা	৭৫৭৭
	আবূ নু'য়াইম	সানা দ্বারা চিকিৎসা, স্বভাব কোমল রাখার উপকারিতা	৬১২
	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৭১
৭৪৩ *	ইবনে মাজাহ	ফল খাওয়া	৩৩৬৯ যয়ীফ
৭৪৪ *	মু'জামুল কাবীর	নিসবাতু তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রা:)	২১৯ যয়ীফ
৭৪৫ *	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৬৮

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
	আবূ নু'য়াইম	বিহিদানা খাওয়া	৭৯৩, শাদীদ যয়ীফ
৭৪৬ *	মু'জামুল কাবীর	হাদীসু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)	১১২০৯ যয়ীফ
৭৪৭	জামে সগীর		৬৪০৩
	হাদীসটি শাদীদ যয়ীফ, তবে মতন বা ভাষ্য হাসান লিগয়রিহী।		
৭৪৮	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৬৮
৭৪৯	আস-সুয়ূতী	----	পৃষ্ঠা ৬৮
	জামে সগীর	---	৬৪০৫
৭৫০	মু'জামুল কাবীর	২২/৬৩ (১৫২)	১৮০০৩
৭৫১ *	ইবনুল কাইয়িম	লাউ	পৃষ্ঠা ২৮২
	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৮৫ শাদীদ যয়ীফ
৭৫২	বুখারী	তরকারীর ঝোল	৫০৩৬
	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৫৪
৭৫৩	তিরমিযী	আহার ও খাদ্যদ্রব্য	১৭৯৭
৭৫৪	মুসলিম	পানীয়দ্রব্য	৫১৫৫
৭৫৫	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৮৫
৭৫৬	বুখারী	খাদ্যদ্রব্য, কদু	৫০৩২
৭৫৭	ইবনুল কাইয়িম		পৃষ্ঠা ২৮২
	তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফুআহ		১৫৭৯, ২/৩০২
	হাদীসের সনদ পাওয়া যায়নি।		
৭৫৮ *	মু'জামুল কাবীর	২০/৯৬, ১৭৮	১৬৯৪৪, ১৬৬৪৮ শাদীদ যয়ীফ
	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৫৪
	আবূ নু'য়াইম	মেথি দ্বারা চিকিৎসা	৬৫০
৭৫৯	ইবনুল কাইয়িম	---	পৃষ্ঠা ২৬৬
৭৬০	ইবনুল কাইয়িম	---	পৃষ্ঠা ২৬৫
৭৬১	ইবনুল কাইয়িম (ড. জনষ্টোন অনূদিত)	---	পৃষ্ঠা ২১৮
৭৬২ *	আবূ নু'য়াইম	কাসনী দ্বারা চিকিৎসা	৬৭৮, যয়ীফ
৭৬৩ *	আবূ নু'য়াইম	হানদাবা	৬৭৬, শাদীদ যয়ীফ
৭৬৪ *	আবূ নু'য়াইম	মারজানজুস দ্বারা চিকিৎসা	৬৭৩ যয়ীফ
	ইবনুল কাইয়িম (ড. জনষ্টোন অনূদিত)	---	পৃষ্ঠা ১০২, ৩৪৪
	জামে সগীর	---	৫৫৪৯
৭৬৫	আস-সুয়ূতী	----	পৃষ্ঠা ১০২

অধ্যায়-১৮

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৭৬৬	মুসলিম	পাক-পবিত্রতা	৫১১
৭৬৭	বুখারী	উযু	২৩২
	মুসলিম	পাক-পবিত্রতা	৫৪৯, ৫৫০
৭৬৮	বুখারী	উযু	২৩২
	মুসলিম	পাক-পবিত্রতা	৫৪৯, ৫৫০

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৭৬৯	বুখারী	রোগ, রোগী ও চিকিৎসা	৫৩৫৭
	আবূ দাউদ	খাদ্যদ্রব্য	৩৮০১
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫০৫
৭৭০	মুসনাদে আহমদ	মু. আবূ হুরায়রা (রা)	৯১৫৭
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৫০৪
৭৭১	বুখারী	যবেহ ও শিকার	৫১৩১
৭৭২	বুখারী	যবেহ ও শিকার	৫১৩২
৭৭৩	মুসতাদরাক	পানাহার	৭২০৬
৭৭৪	বুখারী	পানীয়দ্রব্য	৫২১৯
৭৭৫	আবূ দাউদ	পানীয়	৩৬৮৬
	তিরমিযী	পানপাত্র ও পানীয়	১৮৩৭
৭৭৬	তিরমিযী	পানপাত্র ও পানীয়	১৮৩৬

অধ্যায়-১৯

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৭৭৭	বুখারী	জুমু'আ	৮৩৭
	নাসাঈ	পবিত্রতা	৬
৭৭৮	বুখারী	জুমু'আ	৮৩৬
	মুসলিম	পাক-পবিত্রতা	৪৮২
৭৭৯	বুখারী	রোযা	অনুচ্ছেদ-২৮
৭৮০	বুখারী	উযূ	২৩৮
৭৮১	মুসলিম	মিসওয়াকের বিবরণ	৪৮৬
	ইবনে মাজাহ	পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ, মিসওয়াক	২৮৬
৭৮২	মুসলিম	পাক-পবিত্রতা	৪৮৩, ৪৮৪
	ইবনে মাজাহ	পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ, মিসওয়াক	২৯০
	নাসাঈ	পবিত্রতা	০৮
৭৮৩	বুখারী	জিহাদ, রসূলের অসুস্থতা ও মৃত্যু	৪০৯৬, ৪০৯৭
৭৮৪	বুখারী	রোযা	অনুচ্ছেদ ২৬
৭৮৫	মুসলিম	পবিত্রতা	৪৮৯
৭৮৬	বুখারী	রোযা	অনুচ্ছেদ ২৮
	নাসাঈ	পবিত্রতা	৫
৭৮৭	ইবনে মাজাহ	পবিত্রতা, মিসওয়াক	২৮৯
৭৮৮	মুসনাদে বায্যার	মু. আলী (রা)	৬০৩
৭৮৯	ইবনে মাজাহ	পবিত্রতা, মিসওয়াক	২৯১
৭৯০	সুনানে দারেমী	খাদ্যদ্রব্য খিলাল করা	২০৮৭
৭৯১ *	দারাকুতনী	মিসওয়াক	১৬৫
	জামে সগীর	---	৫৯৩০ যয়ীফ
	আস সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৩৬
৭৯২	মুসনাদে আহমাদ	মুসনাদে আয়েশা (রা)	২৬৩৪০
	মুসতাদরাক	পবিত্রতা	৫১৫
৭৯৩	মুসলিম	জুমু'আ	১৮৩২
৭৯৪	আবূ নু'য়াইম	তরজমাতু আবূ যায়িদ	
		আল-গাফিকী	৬৩১১
	কানজুল উম্মাল	মিসওয়াকের পরিপূর্ণকরণ	২৬২২৭
	জামেউল আহাদীস	---	১০১৬১
৭৯৫	ফারূকী (২০০৪)	---	পৃষ্ঠা ৬৬
৭৯৬	আস সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ৩৬
৭৯৭	মুসতাদরাক	মিসওয়াক	৬৭১৯

অধ্যায়-২০

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৭৯৮	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮৩৫
৭৯৯	যাদুল মা'আদ	রোগীর চিকিৎসায় ডাক্তার ডেকে আনা	৪/১২১
৮০০	মুয়াত্তা	রোগীর চিকিৎসা	১৭৫৭
		২/২৬০ (১০১)	
৮০১	আবূ দাউদ	চিকিৎসা	৩৮১৬
	তিরমিযী	চিকিৎসা	১৯৮৫
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৪২
৮০২	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৪৩
	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৫৭০৩, ৮২৬৩
৮০৩	মু'জামুল কাবীর	হাদীসু হাইয়্যান বিন আবযার	৩৫৭৬
৮০৪	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৫৯
৮০৫	নযর আহমদ	---	পৃষ্ঠা ৭৪
৮০৬ *	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৮২৪৩ শাদীদ যয়ীফ
৮০৭	মুসনাদে আহমাদ	হাদীসু উসামা ইবনে শারীক (রা)	১৮৪৫৪, ১৮৪৭৭
	তিরমিযী	চিকিৎসা	১৯৮৮
৮০৮	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৩৬

অধ্যায়-২১

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৮০৯	আবূ দাউদ,	রক্তপণ	৪৫১৭
	ইবনে মাজাহ	চিকিৎসা	৩৪৬৬
	মুসতাদরাক	চিকিৎসা	৭৪৮৪
৮১০	আবূ দাউদ	রক্তপণ	৪৫১৮
৮১১	আস-সুয়ূতী	----	পৃষ্ঠা ১৩১-৩২

অধ্যায়-২২

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৮১২	বুখারী	বিবাহ	৪৭১৭
	মুসলিম	স্তনদান	৩৫০২
৮১৩	নাসাঈ কুবরা	মহিলাদের সাথে উঠা বসা	৯২১৯
৮১৪	মুসলিম	হজ্জ	৩১৩৫
৮১৫	মুসলিম	হজ্জ	৩১৪০
৮১৬	মুসনাদে আহমাদ	জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)	১৪৬৫১
৮১৭	ইবনে মাজাহ	বিবাহ	১৮৪৭

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৮১৮	বুখারী	বিবাহ	৪৬৯৩
	মুসলিম	বিবাহ	৩২৬৮
৮১৯	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৪৫৮
৮২০	বুখারী	মর্মস্পর্শী হাদীস	৫৯৯২

অধ্যায়-২৩

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৮২১	বুখারী	আদব-আখলাক	৫৬৭৪
	মুসলিম	সদাচার, সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক	৬৪০৫
	আবূ দাউদ	আদব	৪৭০৪
৮২২	মুসলিম	সদাচার, সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পক	৬৪০৭, ৬৪০৮
৮২৩ *	মুসনাদে আহমাদ	হাদীসু আতিয়্যাহ আস্-সা'দী (রা)	১৭৯৮৫
	আবূ দাউদ	আদব	৪৭০৯ যয়ীফ
৮২৪	বুখারী	আদব-আখলাক	৫৬৭৬
৮২৫	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ২৪
৮২৬	মুসনাদে আহমাদ	হাদীসু আবূ সাঈদ খুদরী	১১১৫৯
	মুসতাদরাক	যুদ্ধবিগ্রহ	৮৫৪৩
৮২৭	মুসনাদে আহমদ	মু. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)	২৫৫৬ হাসান লিগয়রিহি
৮২৮	আবূ দাউদ	আদব	৪৭০২
৮২৯	তিরমিযী	কিয়ামত ও মর্মস্পর্শী বিষয়	২৪৩৪
৮৩০	বুখারী	আদব-আখলাক	৫৬৭৫
	মুসলিম	সদাচার, সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক	৬৪১০, ৬৪১১
	আবূ দাউদ	আদব	৪৭০৬
	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৩৮৬
৮৩১	শামায়েলে তিরমিযী	রসূল (সা.) এর কথাবার্তার অবস্থা	২২৩
৮৩২	আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ (ইবনুস সুন্নী)	আয়েশা (রা) রাগ হলে	৬২২
৮৩৩	আবূ দাউদ	আদব	৪৭০৭

অধ্যায়-২৪

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৮৩৪	ইবনুল কাইয়িম	---	পৃষ্ঠা ২৮৯
৮৩৫	শামায়েলে তিরমিযী	রসূল রসূল (সা.) এর রসিকতা	২৩৮
৮৩৬	তিরমিযী	সদব্যবহার ও পারস্পারিক সম্পর্ক রক্ষা করা	১৯৪২

অধ্যায়-২৫

রেফারেন্স নম্বর	কিতাবের নাম	অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	হাদীস নম্বর
৮৩৭ *	আবূ নু'য়াইম	চিন্তা পেরেশানী না থাকা (শরীর সুস্থ থাকা)	১২২ শাদীদ যয়ীফ
৮৩৮	আস-সুয়ূতী	---	পৃষ্ঠা ২৫
৮৩৯	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৩৭০
৮৪০	মুসনাদে আহ্মাদ	মু.আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)	৪৩১৮
	ইবনে হিব্বান	দু'য়া	৪৪৯
৮৪১	ইবনুল কাইয়্যিম	---	পৃষ্ঠা ১৭৯
৮৪২ *	মুসনাদে আহমাদ	মু. ইবনে মাসউদ (রা)	৪৩১৮ যয়ীফ
	ইবনে হিব্বান	আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা ও ছিন্ন করা	৪৪৯
৮৪৩	তিরমিযী	দু'য়াসমূহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওতা ইল্লা বিল্লাহির ফযিলত	৩৫৮১
৮৪৪	মুসনাদে আহমাদ	হাদীসু আসমা বিনতে উমাইস (রা)	২৭০৮২
	আবূ দাউদ	সালাত	১৫২৫
	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৮৮২
৮৪৫ *	মুসনাদে আহমাদ	হাদীসু হুযায়ফাহ (রা)	২৩৩৪৭ যয়ীফ
৮৪৬	আবূ দাউদ	সালাত	১৩১৯
৮৪৭	তিরমিযী	দাওয়াত	৩৪৫৮

লেখক পরিচিতি

ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, খ্যাতনামা ভেষজ বিজ্ঞানী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৪৮ সালে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানার ৬নং আদারভিটা ইউনিয়নের অন্তর্গত হেমড়াবাড়ী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ্ব মফিজ উদ্দিন আহমদ তদানিন্তন ময়মনসিংহ জেলার কৃষি বিভাগের একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। লেখকের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে অত্যন্ত আদর সোহাগে নিজ গ্রামে ও তার নানার বাড়ি একই ইউনিয়নের পাটাদহ-কয়ড়া গ্রামে। ১৯৬৪ সালে তিনি শ্যামগঞ্জ হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৬৬ সালে ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে এইচএসসি এবং ১৯৬৮ সালে জামালপুর আশেক মামুদ সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে বিএসসি পাশ করেন। ১৯৭০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্মাসী বিজ্ঞানে গবেষণাসহ ফলিত রসায়ণে এম এসসি ডিগ্রী লাভ করেন।

স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের পর ড. মুশাররফ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি খ্যাতনামা ওষুধ শিল্পে বিভিন্ন উর্ধ্বতন পদে দায়িত্বপালন করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে ভারতের মুম্বাই-এ অনুষ্ঠিত 'কমনওয়েলথ্ ফার্মাসিউটিক্যাল সম্মেলনে' অংশগ্রহণ করেন। ঐ বছরই তিনি পশ্চিম আফ্রিকার বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ নাইজেরিয়ার আহমাদু বেল্লো ইউনিভার্সিটিতে সিনিয়র ফার্মাসিস্ট ও লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি সপরিবারে হজ্জব্রত পালন করেন। ১৯৮১ সালে তিনি প্রধান ওষুধ বিশ্লেষক হিসেবে পদোন্নতি পান। ১৯৮৮ সালে তিনি ফার্মাকগ্নসীতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। পরে নাইজেরিয়ার জস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারি অধ্যাপক হিসেবে ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি নাইজেরিয়া টেলিভিশনে Know Your Religion Islam (Significance of Sacrifice) বিষয়ে ইংরেজীতে একটি (সচিত্র) ভাষণ দেন যা ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালে পরপর তিনবার ঈদুল আয্হার দিনে টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়। এছাড়া ১৯৮৩ সালে Drug Abuse and Its Control শীর্ষক বিষয়ের উপর 'কাদুনা স্টেট টেলিভিশন' কর্তৃপক্ষ ২X৩০ মিনিটব্যাপী তাঁর এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।

১৯৮৯ সালে তিনি **In Search of Truth** নামে একটি বই লিখেন যা সমগ্র নাইজেরিয়ায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। বইটিতে সাত শতাধিক প্রশ্ন রয়েছে চিন্তাশীল পাঠক এবং আন্তরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য (Over seven hundred Questions to Sincere and Intellectual Minds), যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন এবং কোন ধর্মীয় দর্শন গ্রহণের আগে খোলা মন নিয়ে অধ্যয়ন করে থাকেন। বইটিতে অনেক প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের মাধ্যমেই দেয়া হয়েছে। যাহোক, বইটি প্রকাশের পরপরই তাকে নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী গ্রেফতার করে তাদের কার্যালয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে বেশ কয়েকটি মসজিদ থেকে তার মুক্তির জন্য মাইকে ঘোষণা দেয়া হলে একদিন পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। বইটি পড়ে ঐ সময় বেশ কয়েকজন খ্রিস্টান ছাত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বাইবেলে যে অসংখ্য ভুল ও অসংগতি রয়েছে তা তারা বইটি পড়ে জেনে বিস্মিত হয়েছে। বাইবেল একটি মানব রচিত গ্রন্থ। তাই ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। বইটির জন্য 'রাবেতা আলম আল ইসলামী' মক্কা মুকাররমাহ এবং 'ইক্রাহ্ চেরিটেবল্ সোসাইটি' জেদ্দা তাকে পুরস্কৃত করে। ১৯৯০ সালে তিনি সপরিবারে বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

১৯৯১ সালে ড. মুশাররফ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাদারগঞ্জ-মেলান্দহ আসন (জামালপুর-৩) থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে **পানির গ্লাস** প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ঐ সময় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, জামালপুর জেলার ৭১ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে যোগ্যতম ব্যক্তি। নির্বাচনের পরে তিনি বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকায় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং এক বৎসরকাল তিনি সে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ সালে ১লা ডিসেম্বর World AIDS Day উপলক্ষে Indian Board of Alternative Medicine West Bengal হারবাল মেডিসিন-এর ওপর অবদান রাখার জন্য তাকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে।

১৯৯৭ সালে তিনি জাপানের National Institute of Health Sciences Tokyo-এতে পোস্ট-ডক গবেষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি **Know Your God (Allah)** নামে ইংরেজীতে একটি বই লিখেন। বইটি কাতার চ্যারিটেবল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। তিনি **Export Quality Management** নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বই-এর অনতম লেখক। বইটি ITC / WTO (UNCTAD), Geneva, European Union এবং DCCI কর্তৃক ২০০৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি বাংলাদেশসহ তেরটি দেশে পাওয়া যায়। তিনি প্রায় তিন বৎসর হামর্দদ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ ঢাকায় Quality Control Department এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ থেকে ২০০৯ সাল
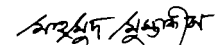
পর্যন্ত তিনি Quality Institute of America ঢাকায় ১০ বছর Senior ISO Consultant হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ডঃ মুশাররফ ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, জাপান, সৌদি আরব, মিসর, ভারত, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, মালয়েশিয়া, ইটালী, নেদারল্যান্ডস, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ডের বড় বড় শহর ভ্রমণ করেছেন এবং সেসব দেশে ইসলাম ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন। তিনি নাইজেরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, ভারত ও বাংলাদেশের অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সম্মেলনে ভাষণ দেন এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার ২৫টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের জার্নাল ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ছয়টি বই লিখেছেন। তার চতুর্থ বইটির নাম হচ্ছে **Medicine and Pharmacy in the Prophetic Traditions (Sunnah)**। বইটিতে ২৭টি অধ্যায় ও আট শতাধিক পৃষ্ঠা রয়েছে। বর্তমানে এটি সৌদি আরবের রিয়াদে International Islamic Publishing House-এ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। পঞ্চম বইটি হচ্ছে নামাজ ও সমাজ। ইহা ২০১৩ সালের ১১ জুলাই বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইট লিমিটেড ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১১৪ পৃষ্ঠার বক্ষ্যমাণ একটি বই। বইটিতে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায আদায় করতেন সে পদ্ধতিসহ আল্লাহ ও রসূলের শেখানো অনেক দু'য়া বর্ণনার পাশাপাশি নামায কায়েমে সমাজে যে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা লেখক বর্ণনা করেছেন। ৬ষ্ঠ বইটি হচ্ছে ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান। এটি ইসলামিক টিভিতে ২০০৭ সাল থেকে ৭ বৎসর যাবত সম্প্রচারিত তিবরুন নববীর ওপর প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠানে আলোচিত বিষয়বস্তুর লিখিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ। বইটি প্রায় চার শতাধিক পৃষ্ঠা ও ২৭টি অধ্যায় সম্বলিত। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড এ বইটিরও প্রকাশক।

রোগ প্রতিরোধ, নিরাময় ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই বইটি যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি। যে সকল মুসলমান কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত, ইনশা'আল্লাহ তাদের জন্য বইটি দুনিয়া ও আখিরাতের অমূল্য পাথেয় হিসেবে বিবেচিত হবে। বইটির বিশেষত্ব হলো সাধারণ পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে বিষয়বস্তুকে লেখক প্রশ্নোত্তর আকারে অত্যন্ত সহজ, সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় সাজিয়েছেন এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত হাদীসের বৈজ্ঞানিক দিকগুলোর যুক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সাথে সাথে বইয়ের শেষে আট শতাধিক বিষয়ের ওপর বারো শতাধিক হাদীসের বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত ১৭ পৃষ্ঠার একটি চার্ট সংযোজন করেছেন যা খুবই কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ। ফলে সাধারণ মানুষ ও চিন্তাশীল সুধী পাঠকবৃন্দ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক হাদীসের সুপ্ত নির্যাস ও জ্ঞান অতি সহজে আহরণ, অনুধাবন এবং উপলব্ধিতে সক্ষম হবেন। বইটির আরেকটি বিশেষত্ব, বিষয়ভিত্তিক কিছু দুর্লভ ছবিসহ চার রংয়ে আর্ট পেপারে ইনার এবং চার রংয়ে বর্ণাঢ্য প্রচ্ছদে বোর্ড বাইন্ডিংসহ কভার ছাপা হয়েছে, যা বইটিকে করেছে অনন্য। ইনশা'আল্লাহ বইটি সকল যুগের বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

ড. মুশাররফ এক পুত্র ও তিন কন্যার জনক। বড় মেয়ে ডাক্তার দীনা এ এস হুসাইন উত্তরা শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজের বায়োকেমিষ্ট্রির সহযোগী অধ্যাপক। ছেলে ডক্টর মাহমুদ মুস্তাকীম হুসাইন ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভ্যানিয়া, আমেরিকা থেকে জৈব রসায়ণে ডক্টরেট। বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকায় রিসার্চ এসোসিয়েট হিসেবে গবেষণারত। দ্বিতীয় মেয়ে ডাক্তার বুশরা হুসাইন আমরিকায় এমপিএইচ কোর্সের একজন ছাত্রী। তৃতীয় মেয়ে নুসরাহ্ হুসাইন ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভ্যানিয়ায় জৈব রসায়ণে পিএইচডি করছেন। বড় জামাতা ডাক্তার রেজা-ই-রাব্বি একজন প্লাস্টিক সার্জন। দ্বিতীয় জামাতা এন এম মোশারফ কবীর চৌধুরী বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন গ্রাজুয়েট। তিনি কানাডা থেকে এম. ম্যাথ. ডিগ্রী লাভের পর বর্তমানে বার্কলে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন। তৃতীয় জামাতা আব্দুল্লাহ আল-নাঈমও একজন বুয়েট গ্রাজুয়েট। তিনি আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সায়েন্সস এ সম্প্রতি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

ডক্টর মুশাররফ ইসলামিক টেলিভিশনে ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান শীর্ষক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের নিয়মিত আলোচক। অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:৩০ মিঃ নিয়মিতভাবে এবং রবিবার ও শুক্রবারে যথাক্রমে বিকেল ৪:৩০ মিঃ ও সকাল ৮:৩০ মিঃ অনিয়মিতভাবে সুদীর্ঘ সাত বৎসর যাবত সম্প্রচারিত হয়ে আসছে।

মাহমুদ মুস্তাকীম

(ডক্টর মাহমুদ মুস্তাকীম হুসাইন)
লেখকের ছেলে

তারিখ : ৩১ আগস্ট, ২০১৩

প্রকাশকের কথা

ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান বইটি স্যাটেলাইট চ্যানেল ইসলামিক টিভি আয়োজিত কুরআন ও হাদীসের আলোকে রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ক সাপ্তাহিক ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠানে আলোচিত বিষয়বস্তুর লিখিত ও পরিমার্জিত রূপ। বইটিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ নিরাময় সম্পর্কিত কুরআন মাজীদের অনেক আয়াত ছাড়াও প্রায় আট শতাধিক বিষয়ের ওপর বারো শতাধিক হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে অসুস্থ ব্যক্তিরা প্রায়ই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করতেন। তিনি তাদের নিরাময়ের জন্য ব্যবস্থাপত্র দিতেন এবং আল্লাহর নিকট আরোগ্য লাভের জন্যে দু'য়া করতেন। তাঁর রোগ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত এসব বাণীর ওপর ভিত্তি করেই তদানিন্তন আরব সমাজে তিববুন নববী বা Prophetic Medicine নামে এক বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠে যা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উত্তীর্ণ একটি যৌক্তিক ও কার্যকরী ব্যবস্থা। ঐ সময় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার বলতে কিছুই ছিলোনা। কিন্তু রোগ-ব্যাধি তখনও ছিলো। তাই যদিও নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ডাক্তার বা ফার্মাসিস্ট হিসেবে ছিলোনা, তথাপি তিনি রোগ নিরাময়ে অনেক ব্যবস্থাপত্র সম্বলিত বক্তব্য রেখেছেন এবং অসুস্থ ব্যক্তি তাঁর ব্যবস্থাপত্রে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন।

বইয়ের লেখক ও টিভি অনুষ্ঠানের আলোচক বিশিষ্ট ভেষজ বিজ্ঞানী **ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন** নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ক হাদীসসমূহের ভেতর লুকানো বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। লেখকের মতে রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ে একটি হাদীসও খুঁজে পাওয়া যাবেনা, যা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। বরং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যেখানে ব্যর্থ, তাঁর চিকিৎসা সেখানে অত্যন্ত সফল ও কার্যকর বলে প্রমাণিত। কারণ তিনি দেহ ও আত্মা উভয়েরই চিকিৎসক ছিলেন। তিনি রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম মূলনীতিও বটে। বইটি তাই সকল দেশে সকল যুগে সকল এলাকার বাংলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও রোগ নিরাময়ে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস। যারা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহকে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর, তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বইটি অমূল্য রত্ন ও উল্লেখযোগ্য উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। বইটির শেষে উদ্ধৃত প্রত্যেকটি হাদীসের তথ্যসূত্র তথা মূল হাদীস গ্রন্থের নাম, অধ্যায় ও হাদীস নম্বর সন্নিবেশিত করা আছে, যা তিব্বুন নববীর ওপর গবেষকদের দীর্ঘ দিনের চাহিদা পূরণ করবে বলে বুক সোসাইটি আশাবাদী। আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট দু'য়া করছি তিনি যেন লেখকের ওপর তাঁর অপার অনুগ্রহ ও অশেষ করুণা বর্ষণ করেন। কারণ নিশ্চয়ই তাঁর এ মহান কাজ ভবিষ্যৎ প্রজন্মে সযত্নে লালিত হবে এবং পাঠক তা হৃদয়ে ধারণ করে রাখবে।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
ঢাকা-চট্টগ্রাম